সূচিপত্র।

ভ্রম বশতঃ ৩৩৯ হইতে ৩৫৫ পৃষ্ঠার স্থানে ৪০০ হইতে ৪৪২ পৃষ্ঠা ছাপা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীচরণ ভরসা।

জয় গুরুদেব !!

তত্ত্ব-মঞ্জরী

উনবিংশ বর্ষ; প্রথম সংখ্যা।
বৈশাখ, সন ১৩২২ সাল।

নববর্ষ।

তত্ত্ব-মঞ্জরী অষ্টাদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া এই বৈশাখে উনবিংশে পদার্পণ করিল। এতাবৎকাল তত্ত্ব-মঞ্জরী আপন কর্ম্ম নীরবে করিয়া যাইতেছে, ইহার উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইয়াছে, তাহা পাঠকগণের বিবেচ্য। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয়বার্ত্তা, তাঁহার অমৃতোপম উপদেশ প্রচার, তাঁহার ভক্তগণের সহিত তাঁহার সুমধুর লীলাকাহিনী এবং তাঁহার প্রাণ প্রিয়তম-শিষ্য মহাত্মা রামচন্দ্রের অদ্ভুত বিশ্বাস, ত্যাগ ও বৈরাগ্য ও যিনি তত্ত্ব-মঞ্জরীর জন্মদাতা ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা ও কৃপা জগতের সমক্ষে সর্ব্বপ্রথম প্রচার করিয়া জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাজন হইয়াছেন, তাঁহার বিষয় পাঠকগণের নিকট নিবেদন করাই তত্ত্ব-মঞ্জরীর প্রধান উদ্দেশ্য। নববর্ষের প্রারম্ভে নবোৎসাহে তত্ত্ব-মঞ্জরী আপন কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সাধারণের নিকট মহোল্লাসে দণ্ডায়মান হইয়াছে। যখন দেখিব, দিন দিন ইহার উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য জনসাধারণ উৎকুণ্ঠিত হইয়াছেন, তখনই বুঝিব ইহার উদ্দেশ্য সফল হইতেছে। যখন দেখিব, ঘরে ঘরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ ও জীবন-

কাহিনী লইয়া আন্দোলন হইতেছে, যখন দেখিব ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উপযুক্ত শিষ্য ও ভক্তগণের উপর জনসাধারণ দিন দিন আকর্ষিত হইতেছেন, যখন দেখিব জগতবাসীর জন্য প্রভুর প্রেম-ভাণ্ডার উন্মোচনকারী মহাত্মা রামচন্দ্রের প্রতি ভক্তগণ কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ জানিয়া মহাত্মার হৃদয়ের প্রকৃত মহত্ত্ব ও উদারতা দেখিয়া স্তম্ভিত ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া কৃতাঞ্জলীপুটে মহাত্মার কৃপা দৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করিতেছেন, তখনই জানিব তত্ত্ব-মঞ্জরীর কার্য্য প্রকৃতই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। জানি না কতদিনে ইহা কৃতকার্য্য হইবে। প্রেমময়ের প্রেমে বিভোর হইয়া মধুমাখা শ্রীরামকৃষ্ণ নামে জগত প্লাবিত হইতে আরও কত বৎসর লাগিবে, তাহা ঠাকুরই জানেন! কবে দেখিব, জগত সংসার রামকৃষ্ণময় হইয়া আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছে! তত্ত্ব-মঞ্জরী! ইহাই তোমার কার্য্য, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ও তোমার জন্মদাতা মহাত্মা রামচন্দ্রের আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া আপন কার্য্য করিয়া যাও।

ভজন-সঙ্গীত।

সাহানা—ধামার।

জয়তে শ্রীরামকৃষ্ণদেব-দরবারা,
অদ্ভুত অপূর্ব্ব জগ মে প্রচারা!
মূরখ পণ্ডিত হোয় প্রেমিক গঁওয়ারা,
পা'য়ে পরশ অয়স্, কণক উজারা॥
জ্ঞান-ভক্তি-যোগ-সেবানন্দ-ভাণ্ডারা,
যো চাহি সো পাই, ধন্য অবতারা!—
হংস জপ রামকৃষ্ণ নাম সারাৎসারা,
কলি-কলুষ-জীব-তরী-ভব-পারাবারা॥

চরণ-ভিখারী
প্রণতঃ শ্রীরাধিকানাথ রায় সারস্বত হংস।
৺বারাণসী।

প্রাণের কথা।

"স্থাপকায় চ ধর্ম্মস্য সর্ব্বধর্ম্ম স্বরূপিনে।
অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥"

বর্ষাকাল; জগতের একটা নূতন প্রাণময় দৃশ্য, মানব-মনে একটা নূতন ভাবের প্রেরণা জাগাইয়া তুলিয়াছে। বসন্তের চঞ্চলতা ও গ্রীষ্মের ঔদাস্য আত্মসাৎ করিয়া, প্রকৃতির গাম্ভীর্য্য সর্ব্বত্রই বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। নদীকূল দুর্দ্দাম-তরঙ্গ-ব্যাকুলা হইয়া, পূর্ণ-যৌবনা যুবতীর ন্যায় আপন পূর্ণতায় আপনি উছলিয়া পড়িতেছে। সদ্যঃ প্রস্ফুটিত যূথিকা-সুন্দরী নবানুরাগপ্রায় বর্ষার প্রথম বারি-ধারাটি বক্ষে ধারণ করিয়া, হাসি রাশি ছড়াইয়া দিয়া, বর্ষাসার-সম্পাত-সিক্ত পবনের তালে তালে নৃত্য করিতেছে। দেখিতে দেখিতে ঘনকৃষ্ণ মেঘদাম আসিয়া, সান্ধ্য গগন ছাইয়া ফেলিল। বৃষ্টি হয় হয়; পৃথিবী যেন "নিবাতনিষ্কম্প মিব প্রদীপম্"। আমি সেই গভীরান্ধকারের স্নিগ্ধতায় উৎফুল্ল হইয়া, একটি ভগ্নগৃহের বারাণ্ডায় বসিয়া, অনন্তাকাশের দিকে চাহিয়া, কি এক শূন্য ভাবনা ভাবিতেছি। একটা বিরাট নিস্তব্ধতা, একটা নিথির নিঝুমতা, আমার মনে অনন্তের ভাব আনিয়া দিল। চাঞ্চল্যের পরিবর্ত্তে সংযম, ভোগের পরিবর্ত্তে আকাঙ্ক্ষা, মিলনের পরিবর্ত্তে বিরহ স্মৃতি উদ্দীপিত হইয়া, আমাকে কোথায় কোন্ অজানা প্রদেশে লইয়া চলিল। অনন্তের আভাস চিন্তাবরণের মধ্য দিয়া অস্পষ্ট প্রতিফলিত হইয়া, আমার অন্তরে ভগবৎ প্রেমানন্দের কণামাত্র যেন ঢালিয়া দিল। আমি আত্মহারা হইয়া কত কি ভাবিতে লাগিলাম। সহসা সেই নীরবতা ভেদ করিয়া, প্রসুপ্ত হৃদয় তন্ত্রী আলোড়িত করিয়া, তৃষিতাত্মার বিপুল মর্ম্মবেদনা জীবজগতে ব্যক্ত করিয়া, মধুর গীত ধ্বনি আমার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। গায়ক গাহিতেছিল;—

জীবনের তৃষা, মরমের আশা, প্রাণের পিয়াসা মিটিল কৈ।
নয়ন-সলিল, কৈ মা মুছিল, বাসনা-অনল নিভিল কৈ ॥

ভক্তের এই অন্তর-নিঃসৃত, উচ্ছ্বাসপূর্ণ অমিয়-প্রবাহে আমি ভাসিয়া গেলাম, যেন এক নূতন রাজ্যের সন্ধান পাইলাম; নব-জীবন লাভ করিলাম। ভাবিতে লাগিলাম—"সত্যইত জীবনের তৃষা মিটিলনা, আশার বন্ধন ছিঁড়িল না, মনের

আঁধার ঘুচিল না, মায়ার আবরণ খসিল না। বুঝি মানবের অনন্ত পিপাসা এই ক্ষুদ্র সংসার-নদীতে মিটেনা; বুঝি উহার জন্য কোথাও লোক-চক্ষুর অন্তরালে ক্ষীর সমুদ্র লুক্কায়িত আছে। যতদিন না মনুষ্য সেই অপার সমুদ্রের সন্ধান পায়, তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িতে না পারে, তাহাতে একেবারে ডুবিয়া না যায়, ততদিন বুঝি তাহার প্রাণের অদম্য পিপাসার শান্তি হয় না। জীবের তৃষিতাত্মা কি সেই সাগরান্বেষণেই অবিশ্রান্ত গতিতে ছুটিতেছে? কেমন করিয়া বলিব? কখন ত জীবন-সমস্যার মীমাংসা করিতে চেষ্টা পাই নাই। তবে মহাজনদিগের মতে তাহাই বটে। তাঁহারা বলেন—"এই সংসারোদ্যানে বিকশিত মানব-জীবন-পুষ্প যদি ভক্তি-চন্দনানুলিপ্ত হইয়া, শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে উৎসর্গীকৃত না হয়, তবে তাহা সৌরভ-সম্পদ্-গর্ব্বি হইলেও অকিঞ্চিৎকর। হায়! একদিনের জন্যও কি আমার এই ক্ষুদ্র জীবন-যুথিকাটী প্রেম-সমীরণের মৃদুল-স্পর্শে ফুটাইবার প্রয়াস পাইয়াছি? স্বপ্নেও কি কখন এই ফুলটি প্রেমময়ের শ্রীচরণে প্রেমোপহার দিবার মানস করিয়াছি? কেবলমাত্র স্ত্রীপুত্ররূপ কাচের পুতুলগুলিকে জীবনের সর্ব্বস্বজ্ঞান করিয়াছি; ক্ষণেকের তরেও ভাবি নাই—ঐগুলি অতীব ক্ষণভঙ্গুর; স্বল্পাঘাতেই ভাঙ্গিয়া যায়। 'সংসার' 'সংসার' করিয়া উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছি, উহার চরণে আত্মবলি দিয়াছি, উহার উন্নতি-সাধনার্থ হৃদয়ের শোণিত তিল তিল করিয়া ক্ষয় করিয়াছি; কিন্তু কৈ আকাঙ্ক্ষা ত পুরিল না? প্রাণের জ্বালা ত জুড়াইল না? শান্তির বাতাস ত বহিল না? না বুঝিয়া—মোহের ছলনে ভুলিয়া—আশার কুহকে মজিয়া, ভোগের বিষের পিয়ালা আকণ্ঠ পান করিয়াছি; কিন্তু তাহাতে তৃপ্তি হওয়া দূরে থাক্, বাসনার জ্বালাময়ী শিখা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া, আমার মন প্রাণ ছারখার করিয়া দিতেছে; হৃদয়ের পরতে পরতে বিষের প্রবলাগ্নি জ্বলিতেছে। নিভাইব কিসে? সংসার-মরুভূমিতে যে জল নাই! হায় হায়! সংসারের মোহিনী মায়ায় কেন মুগ্ধ হইয়াছিলাম? আপাতরম্য, পরিণামগরল, ইন্দ্রিয় সুখে কেন মজিয়াছিলাম? সুধা ভ্রমে হলাহল কেন পান করিয়াছিলাম? রত্নহার ভ্রমে কালসর্প কেন কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলাম? আবার 'হা অর্থ' 'যো অর্থ' করিয়া দেহপাত করিলাম, আয়ুঃক্ষয় করিলাম, কত অসাধ্যসাধন করিলাম, কত দাসত্বের বোঝা বহিলাম, কত ছুটাছুটি করিলাম, কিন্তু হইল কি? মরীচিকানুসরণে মৃগের ন্যায় হাত পা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া রহিলাম মাত্র। নাম যশঃ

বিদ্যা লাভের জন্য কি না করিলাম? কিন্তু তাহাতে কেবল যন্ত্রণাই সার হইল; বুঝিলাম "প্রাণ হীন ধ'রেছি ছায়ায়।" তাহার পর মাতা, পিতা, ভাই, ভগ্নী প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের মনস্তুষ্টির জন্য না করিলাম এমন কার্য্যই নাই; কিন্তু তখন জানি নাই—তাহারা আমার কে? তাহাদের সহিত আমার কি সম্বন্ধ? তখন বুঝি নাই,—

"তারা আসে, তারা চ'লে যায় দূরে, ফেলে যায় মরু মাঝারে।
কে আছে তখন, মুছাতে নয়ন, ডেকে ডেকে মরি কাহারে॥"

এখন বুঝিয়াছি—সবই নশ্বর, সবই ভ্রান্তি, সবই স্বপ্ন, সবই ছায়াবাজি! এখন জানিয়াছি—সংসারে সুখের লেশ নাই; উহা দুঃখের রুদ্রশ্মশান। এখন শিখিয়াছি—ভোগে তৃপ্তি নাই, শান্তি নাই; আছে কেবল বাসনার তীব্র প্রদাহ। এখন প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি—এই শোক-মোহময় অসার সংসারে শ্রীভগবানই সার; তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত শান্তিলাভ অসম্ভব। তিনিই আমাদের প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন, আত্মার আত্মা; তিনি আপনার হইতেও আপনার; তিনি আছেন বলিয়াই আমরা আছি। তিনি অনাদিকাল হইতে আমাদিগকে করুণার অমৃতধারা-নিষেকে চির-সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন। কিন্তু আমরা এম্নি আত্মপ্রতারক, এম্নি মোহাচ্ছন্ন যে, তাঁহার এই অসীম অহৈতুক দয়ার বিষয় একবারও ভাবিয়া দেখি না; তাঁহার দিকে যাইতে চাহি না; তাঁহার মঙ্গলাহ্বানে কর্ণপাত করি না, তিনি অযাচিতভাবে কোলে টানিয়া লইতে চাহিলেও ছুটিয়া পলাইয়া যাই! তবে যখন সংসার-সমুদ্রে পড়িয়া উহার প্রবল তরঙ্গাঘাতে হাবুডুবু খাই, কোন দিকে কূলকিনারা না পাইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখি, আঘাতের পর আঘাত আসিয়া সুখাশার সকল স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দেয়, তখন সেই বিপৎপাতের হস্ত হইতে আশু মুক্ত হইবার জন্য কিম্বা কোনরূপ স্বার্থসিদ্ধির আশায় ধার্ম্মিক সাজিয়া, লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবানের নামোচ্চারণ করি এবং আপনাকে আপনি বঞ্চনা করিয়া, প্রেমিক হইয়া বসি! ভক্ত সাধক আবেগোচ্ছ্বসিত প্রাণে যথার্থই গাহিয়াছেন;—

হরি তোমায় ভালবাসি কৈ।
(আমার প্রেম কৈ।)
আমার লোক দেখান ভালবাসা, মুখে হরি হরি কই।

যে যাহারে ভালবাসে, সে বাঁধা তার প্রেম পাশে,
আমি যদি বাস্‌তাম ভাল, জান্‌তাম না আর তোমা বই ॥
নয়নের অশ্রুবিন্দু, প্রেম নাই তার এক বিন্দু,
আমি সংসার পীড়নে কাঁদি, লোকের কাছে প্রেমিক হই ॥

তবে কি প্রভো! আমি জন্মমৃত্যুরূপ সংসারচক্র হইতে নিষ্কৃতি পাইব না? আমার প্রাণের আশা মিটিবে না? হৃদয়ের আগুন নিভাইবে না? তবে কি নাথ! তোমার তরঙ্গায়িত প্রেমসমুদ্রের সুশীতল নীরে চিরনিমজ্জিত থাকিতে পাইব না? তুমি কি মঙ্গল করে আমার মোহ-কালিমা মুছাইয়া দিয়া চক্ষের আবরণ টানিয়া লইবে না? তোমার মানসমোহন বিনোদরূপ মাধুরী কি এ হৃদয়ে বিকশিত করিবে না? করিবে বৈ কি! তুমি যে অনাথের নাথ, অশরণের শরণ, পতিতের বন্ধু; তুমি অহেতুক কৃপাসিন্ধু মঙ্গলময় বিভু! অতএব হে ভুবনসুন্দর! তোমার অনন্তরূপের পসরা লইয়া একবার হৃদয়মন্দিরে আসিয়া দাঁড়াও; আমি সকল ভুলিয়া, আপনা হারাইয়া, তোমার ঐ অপরূপ রূপরাশি অনিমেষনয়নে দেখিতে দেখিতে অনন্তে ডুবিয়া যাই। কিন্তু কি করিয়া তোমায় হৃদয়াসনে আনিয়া বসাইব। তাহা ত জানিনা; বলিয়া দিবে কি প্রভো! কি করিলে—কোন্ পথে যাইলে—তোমায় পাইব? শুনিয়াছি—কেহ বলে তুমি দর্শনবিচার বা জ্ঞান দ্বারা লভ্য; কেহ বলে—তুমি যোগগম্য; কেহ বলে—তুমি কর্ম্মীর প্রাপ্য; আবার কেহ বলে—একমাত্র ভক্তিই তোমার প্রিয়। আমি এখন কাহার আশ্রয় লই? জ্ঞানের? না, না, উহার আলো বড় প্রদাহী—চক্ষু প্রতিহত করে, ঝলসিয়া দেয়; শেষে হয় ত আলোর পরিবর্ত্তে গাঢ় অন্ধকার আসিয়া উপস্থিত হয়! যখন দেহ বুদ্ধি সম্পূর্ণ বিদ্যমান, যখন ইন্দ্রিয় তাড়নায় আকুল, যখন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সুখ, দুঃখ সকলি রহিয়াছে, যখন ভিতরে বাসনা 'গজ্‌গজ্' করিতেছে, তখন শুধু মুখে 'সোঽহং' উচ্চারণ করিয়া, "ভাবের ঘরে চুরি" করিয়া কি ফল? আবার জ্ঞানে নাকি তুমি নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ—'অস্তি' মাত্র? যদি তাহাই হয়, তবে তাহাতে আমার লাভ কি? উহাতে আমার সাধ মিটিবে না। ক্ষীরনিধির অস্তিত্ব মাত্রে আমি সন্তুষ্ট হইতে চাহি না; চাই তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িতে; চাই তাহাতে ডুবিয়া থাকিতে—সন্তরণ করিয়া বেড়াইতে; চাই

প্রাণ ভরিয়া পান করিতে। জ্ঞানে যদি সে আশা পূর্ণ না হয়, তাহা হইলে জ্ঞানের আমার আবশ্যকতা নাই। দর্শন বিচারও তদ্রূপ। উহা মানুষকে অন্ধকার হইতে অন্ধকারে লইয়া যায়,—ভ্রান্তির গভীর কূপে নিক্ষেপ করে। তবে কি যোগাবলম্বন করিব? তাহাও আমার অসাধ্য। কেননা, বাসনা-বায়ু-তাড়নে চিত্ত-হ্রদ প্রতিনিয়ত আলোড়িত হইতেছে, সংস্কারের অনন্ত বুদ্‌বুদ্ উহাতে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। এমতাবস্থায় কি যোগসাধন হইতে পারে? বিশ্ববিপদহন্তা তুমি ভীমমূর্ত্তিধারণ করিয়া, লক্ষ্যহীন বাসনা পরম্পরার গতিরোধ করিয়া না দাঁড়াইলে, কাহার সাধ্য চিত্তনিরোধ করে? আর কর্ম্মেও আমার প্রয়োজন নাই। উহার সদসৎ সকল অবস্থাই বিপজ্জনক। যদি কেহ অগ্রে তোমায় না পাইয়া, তোমার বিশ্বরূপ দর্শন না করিয়া, কর্ম্মযোগে প্রবৃত্ত হয়, তাহার বন্ধন অনিবার্য্য। ঐরূপ কর্ম্মযোগীর কর্ত্তৃত্বাভিমান ফুলিয়া উঠিয়া, অহংত্ব জাগাইয়া তুলে। যে অহংটা সর্ব্বানিষ্টের মূল, যে অহংজ্ঞানে মত্ত হইয়াই তোমায় হারাইয়াছি, যাহা ব্যবধান থাকাতেই নিকটে থাকিলেও তোমায় দেখিতে পাইতেছি না, তাহাকে আবার জানিয়া শুনিয়া প্রশ্রয় দিব? সাধ করিয়া নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করিব? অহং জ্ঞান ত একটা ভ্রম; উহা কিছুই নহে, মিথ্যা। সবই তুমি; তুমিই জীবকে ইচ্ছামত ঘুরাইতে ফিরাইতেছ। জীব কেবল যন্ত্র মাত্র; তাহার 'নিজত্ব' বলিয়া কিছু নাই। অতএব আর আমি অহং কথা শুনিতে চাহি না। আমি শুনিতে চাই;——

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥"

আমি ভোজনে-বিহরণে, শয়নে-উপবেশনে, স্বপনে-জাগরণে ধ্যান করিতে চাই;—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥"

আমি চাই শরণাগত হইয়া পড়িয়া থাকিতে, প্রাণারাধ্যে আত্মনিবেদন করিতে, প্রিয়তমের চরণে জীবন বলি দিতে। আমি যথেষ্ট জ্ঞানালোচনা করিয়াছি, দর্শনশাস্ত্রাদি প্রভূত পরিমাণে অধ্যয়ন করিয়াছি, বহুল সৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছি, কিন্তু প্রাণের অভাব তাহাতে ঘুচে নাই;

যেন একটা অপূর্ণতা অস্ফুটভাবে হৃদয়াভ্যন্তরে রহিয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমি হৃদয়-মনদ্রাবিণী, সর্ব্বসন্তাপনাশিনী, জগদাহ্লাদিনী শুদ্ধাভক্তির প্রার্থী। ভক্তি বড় মধুর—বড় মিষ্ট—বড় সুন্দর! ভক্তিতে তুমি নিরাকার নহ, সাকার; নির্গুণ নহ, সগুণ; অনন্ত নহ, সান্ত; অবাঙ্মানসোগোচর নহ, নিত্য প্রত্যক্ষ। আমি যখন সাকার, তখন নিরাকারে আমার আশা পূরিবে কেন? আমি যে তোমার জগন্মোহনরূপের ভিখারী। নির্গুণে সগুণের তৃপ্তি হইবে কিসে? আমি যখন অনন্ত নহি, তখন তুমি সান্ত না হইলে তোমায় পাইব কি করিয়া? তুমি বাক্যমনাতীত হইয়া থাকিলে, আমার বিরহ বেদনা জুড়াইব কোথায়? অতএব তোমার শ্রীপাদপদ্মে অচলা, অহৈতুকী ভক্তি দাও প্রভো!" ইত্যাকার বিবিধ চিন্তা করিয়া, সেই অন্ধকারময়ী নিস্তব্ধ রজনীতে লোক লোচনের অলক্ষ্যে, অকপটভাবে বিশ্ববিধাতার চরণে ভক্তি প্রার্থনা ক'রলাম। একটী প্রতপ্ত সুদীর্ঘ নিশ্বাস বেগে বহির্গত হইয়া গেল; আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম, ভক্তি তরুলতা শ্রেণী বিধূনিত করিয়া, নিবিড়কাদম্বিনী-অঙ্গে প্রতিঘাত তুলিয়া, বিশাল নীরবতামথিত করিয়া, অনন্তাকাশে প্রতিধ্বনিত হইল ভক্তি! আহা কি মধুর! শুষ্ক জ্ঞানীরা ভক্তিকে 'অন্ধ-আঁধার' বলিয়া উপহাস করে করুক, আমি কিন্তু ঐ আঁধারেই ডুবিয়া থাকিব। হে ব্যর্থ জ্ঞানী! তোমার জ্ঞানের প্রোজ্জ্বলালোক আমি চাহিনা; তোমার দর্শনবিজ্ঞানের প্রদাহীজ্যোতিতে আমি মুগ্ধ নহি; তুমি তোমার বিফল পাণ্ডিত্যের ক্ষণস্থায়িনী দীপ-প্রভা সরাইয়া লও; আমি একবার অন্ধকারে গা ঢালিয়া দিয়া, বিশ্বাসের সুকোমল শয্যায় শয়ন করি। এ আঁধার বড় স্নিগ্ধ, বড় শীতল! ইহা যেমন গভীর, তেমি স্থির; কোন প্রকার চাঞ্চল্য নাই, বিক্ষেপ নাই। ইহাতে অহংত্বের স্ফুরণ নাই, সংকীর্ণতার গণ্ডী নাই, ভেদ জ্ঞানের বিকাশ নাই। এ আঁধারে আলো আছে, প্রখরতা নাই; সুখ আছে, পেদাহ নাই; পূর্ণতা আছে, অভাব নাই; মিলন আছে, বিরহ নাই; শান্তি আছে, জড়তা নাই; প্রীতি আছে, স্বার্থ নাই। এ আঁধারে বিশ্বপতির "কোটী-শশী-বিনিন্দিত" রূপছবি, সাধকের হৃদয়-পটে অতি সুন্দরভাবে সহজেই ফুটিয়া উঠে। আঁধার-সাধক তাই প্রেম-বিহ্বল-কণ্ঠে জগৎ মাতাইয়া গাহিয়াছেন;—

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান করে হ'রে গিরিগুহাবাসী॥

অনন্ত আঁধার-কোলে, মহানির্ব্বাণ-হিল্লোলে,
চিরশান্তি-পরিমল, অবিরত যায় ভাসি ॥
মহাকালরূপ ধরি, আঁধার বসন পরি,
সমাধি-মন্দিরে ওমা, কে তুমিগো একা বসি ॥
অভয়-পদ কমলে, প্রেমের বিজলী জ্বলে,
চিন্ময়-মুখমণ্ডলে, শোভে অট্ট অট্ট হাসি ॥

যাহা হউক, রাত্রি ক্রমশঃ অধিক হইল। ঘনীভূত তামিস্র-জাল উদ্ভিন্ন করিয়া, সহসা বিদ্যুৎ চমকাইয়া গেল; মেঘগর্জ্জনের গম্ভীরা রবে নভোমণ্ডল বিকম্পিত হইতে লাগিল। আমি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া, দ্বার অর্গলরুদ্ধ করিলাম। দেখিতে দেখিতে মুষলধারে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল। আমিও শ্রীভগবানের অভয়পদে আত্মসমর্পণ করিয়া, ভক্তিকেই জীবনের সার জানিয়া, আশ্বস্ত-হৃদয়ে ঘুমাইয়া পড়িলাম। পরদিন বৈকালে গ্রামস্থ পুস্তকাগারে (Library) যাইয়া, "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও উপদেশ" নামক একখানি পুস্তিকা দেখিতে পাইলাম। আমি ঔৎসুক্যের সহিত উহা লইয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। পাঠান্তে আমার জীবন-নাটকের এক নূতন অঙ্ক আরম্ভ হইল। যেন এক আনন্দরাজ্যের দ্বার নয়ন-সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইল। কি এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি-প্রভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ আমার শূন্য-হৃদয় অধিকার করিয়া বসিলেন। আমি আত্মহারা হইলাম; "রূপ না দেখে, নাম শুনে কাণে, মন গিয়ে তায় লিপ্ত হ'ল" সিদ্ধ মহাপুরুষ-কথিত এই মহাবাক্যের সার্থকতা সত্য সত্যই অনুভূত হইল। আমি ভগবদ্‌বোধে তাঁহার শ্রীচরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলাম; অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দিয়া, তৎপদে প্রণত হইলাম; হৃদয়-সিংহাসনে তাঁহাকে চিরদিনের মত স্থান দিয়া কৃতকৃতার্থ হইলাম, নিশ্চিন্ত হইলাম, শান্তি পাইলাম, অভাব মিটাইলাম। এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল। অনন্তর একদিন প্রথম চৈত্রে পুণ্যভূমি 'শ্রীযোগোদ্যানে' উপনীত হইলাম। প্রফুল্ল-বাসন্তী-নিশি সর্ব্বাঙ্গে জ্যোৎস্না মাখিয়া, যেন বিশ্বপতির বাসর শয্যা রচনা করিতেছিল; উদ্যানস্থ তরুরাজির কৌমুদী-স্নাত নবকিশলয়গুলি দক্ষিণ-পবন-হিল্লোলে হিল্লোলিত হইতেছিল; নক্ষত্রপতি নক্ষত্রগণসহ 'রামকৃষ্ণকুণ্ডে'র স্বচ্ছ পূত সলিলে অবগাহন করিয়া, যেন অনন্ত-পুণ্য-সঞ্চয়ে তরল হাসি হাসিতেছিল; শান্তি যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া

প্রতিলতামণ্ডপে, প্রতিবৃক্ষচূড়ায়, প্রতি কুসুম-স্তবকে, প্রতি সরসী-কল্লোলে, এক কথায়, প্রতি পদার্থে বিরাজ করিতেছিল। সেই শান্তরসপূর্ণ, তূষ্ণীভূত, গম্ভীর-মুহূর্ত্তে, সেই শুভযোগে, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে, আমি শ্রীমন্দিরে প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিলাম। ভূমানন্দে হৃদয় আপ্লুত হইয়া উঠিল; সকল বাসনা যেন শুদ্ধ হইয়া গেল; তৃষিতাম্বাবাঞ্ছিত ক্ষার সমুদ্রের দর্শন পাইয়া, তাহাতে ডুব দিল; চিত্ত-চকোর প্রাণ ভরিয়া সে রূপ-সুধা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইল, মর্ম্মের বন্ধন ছিঁড়িয়া পড়িল; অভাব-জ্ঞান তিরোহিত হইল; পূর্ণতায় ভ'রপুর হইয়া রহিলাম। মন আকুল প্রচোদনায় বলিয়া উঠিল;——

"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হ'বনাকো পথহারা॥"

বলা বাহুল্য, সেইদিন হইতে আমি সকল খেলা সায় করিয়াছি, সকল বাসনা বিদায় দিয়াছি, মায়ার শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি, প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া কালযাপন করিতেছি। কোন অভাব নাই, দুঃখ নাই, ইন্দ্রিয়-তাড়না নাই, ভোগ প্রদাহ নাই; কেবল পূর্ণশান্তি সারা জীবনটীকে মধুময় করিয়া রাখিয়াছে। ধন্য প্রভু! ধন্য আমি! হে অখণ্ড প্রেম-স্বরূপ! হে হৃদয়নাথ! হে সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সখা রামকৃষ্ণ! আজ এই নবীন বর্ষে, নবীন প্রাণে, নবীন-উৎসাহে, পূজা পাত্র হস্তে তোমার বিশ্বনিকেতনের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়াছি। ক্ষুদ্র হৃদয়ের ক্ষুদ্র পূজা গ্রহণ করিয়া, দাসের মন-স্কামনা সিদ্ধ কর প্রভো! প্রকৃতির এই নূতন উৎসবের দিনে আশীর্ব্বাদ কর,—যেন তোমার সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়রূপ নব-ধর্ম্মভাব-তরঙ্গে ভাসমান হইয়া জগৎ চিরশান্তির অধিকারী হয়; মর্ত্ত্যভূমি যেন স্বর্গীয় সম্পৎ-শোভায় বিভূষিত হইয়া অপূর্ব্বাকার ধারণ করে; বিদ্বেষের মরুভূমি যেন প্রীতির নন্দনকানন হইয়া উঠে! আর তোমার ভববন্ধনছেদি সুধামাখা নামগুণ গান করিতে করিতে, যেন আমার অবশিষ্ট দিনগুলি ধীরে ধীরে চলিয়া যায় এবং সংসারের বৃথা গণ্ডগোল ভেদ করিয়া, কাম-কাঞ্চনের শূন্য কোলাহল স্তব্ধ করিয়া, যেন দিবারাত্র আমার জীবন-কুঞ্জে ললিত রাগিণীতে অনন্তের সুরে বাজিতে থাকে;—

"সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দন-ফুল-হার।
তুমি অনন্ত নব বসন্ত অন্তরে আমার॥" ওঁ শান্তিঃ—

শ্রীঅমূল্যরত্ন কাব্যতীর্থ।

যুগাবতার

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও হিন্দুশাস্ত্র।

পঞ্চম উপদেশ।

অবতার-তত্ত্ব।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, "অবতার যখন আসে, সাধারণ লোকে জান্‌তে পারে না, গোপনে আসে। দুই চার জন অন্তরঙ্গ ভক্ত জান্‌তে পারে। সকলে কি সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে ধরতে পারে? রাম পূর্ণ-ব্রহ্ম, পূর্ণ-অবতার, এ কথা বারো জন ঋষি কেবল জান্‌তে পেরেছিল। সকলে ধরতে পারে না।" কেউ সাধারণ মানুষ ভাবে;—কেউ সাধু ভাবে;—দু চারজন অবতার বলে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে উক্ত আছে,—

অবতার নাহি কহে আমি অবতার।
মুনি সব জানি করে লক্ষণ বিচার॥

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে,—

যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরিষ্ব শরীরিণঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈ র্বীর্য্যৈ র্দেহিষ্ব সঙ্গতৈঃ॥

(ভাঃ ১০।১০।৩৪)

'হে ভগবন্! আপনার শরীর নাই, কিন্তু যে সকল অতুল আতিশয্য-সম্পন্ন বীর্য্য দেহীর পক্ষে অসম্ভব, সেই সকল বীর্য্য দর্শন করিয়া দেহীদিগের মধ্যে আপনার অবতার জ্ঞানীগণ জানিতে পারেন।'

ইহা দ্বারা স্বতঃপ্রমাণিত হইতেছে যে, যে দেহী, তৎসদৃশ অন্যান্য দেহী অপেক্ষা অতুলনীয়, অসম্ভাবিত, অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রদর্শন করেন, সেই দেহীকেই শ্রীভগবানের অবতার বলা যাইতে পারে।

আবার,

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ॥

(ভাঃ ১০।৩৩।৩৭)

শ্রীভগবান ভক্তগণের অনুগ্রহের নিমিত্ত অর্থাৎ জীবের মঙ্গল সাধন করিবার নিমিত্ত মনুষ্য দেহ আশ্রয় করিয়া তাদৃশ বিবিধ ক্রীড়া সম্পাদন করিয়া থাকেন। জীবগণ সে সকল ক্রীড়া শ্রবণ করিবামাত্রই অর্থাৎ ভক্ত ও ভক্তাতিরিক্ত জনগণও তাঁহার প্রতি ভক্তিমান হয়।

কোন সময় ভগবান অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তদ্‌সম্বন্ধে বলিতেছেন ;—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

(গীতা, ৪ অঃ, ৭ শ্লোঃ)

'হে ভারত, যখন যখনই ধর্ম্মের নিন্দা এবং অধর্ম্মের আধিক্য হয়, তখনই আমি আবির্ভূত হই।'

এক্ষণে ঠাকুরের উক্তি এবং গীতা ও ভাগবতাদি হিন্দু-শাস্ত্র-মধ্যগত উপরোক্ত উক্তি সমূহ হইতে অবতারগণকে জ্ঞাত হওয়ার নিমিত্ত আমরা স্থূলতঃ এই দ্বিবিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, (১) যখন ধর্ম্মের নিন্দা এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন শ্রীভগবান মানব দেহে অবতীর্ণ হইয়া জীবের মঙ্গল সাধন জন্য যে সকল অলৌকিক শক্তির পরিচয় দান করেন, তাহা মানবের পক্ষে অসম্ভব জানিয়া ও লক্ষণাদি দ্বারা শাস্ত্রজ্ঞ সাধকগণ তাঁহাকে অবতার বলিয়া জানিতে পারেন। (২) অবতারগণের উক্তরূপ অলৌকিক কার্য্যাদি দর্শন ও শ্রবণাদি দ্বারা মানবগণ অর্থাৎ বিষয়ী, মুমুক্ষু, এমন কি জড়বাদী, নাস্তিক ও ম্লেচ্ছ প্রভৃতি জনগণও তাঁহার প্রতি ভক্তিমান হয়।

অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন ভ্রান্ত অবিশ্বস্তচিত্ত কলির জীবের প্রতি করুণা-বশতঃ শ্রীভগবান পুনঃ পুনঃ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া, দুর্ব্বল চিত্ত মানবগণকে মুক্তির সহজ পথ দেখাইয়া যাইতেছেন, কিন্তু অজ্ঞান মানবগণ তৎ-প্রদর্শিত সহজ পথ (উপায়) ত্যাগ করিয়া নিয়ত বিপথে পরিচালিত হইতেছে। এমন কি, আমাদের সনাতন হিন্দু শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মার্থ অবগত না হইয়া, অবতার পুরুষগণকে সাধারণ মনুষ্য জ্ঞান করিতেও সঙ্কুচিত হইতেছে না। এই বিংশ শতাব্দিতে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অনেকে অবতার বলিয়া স্বীকার করেন না। কিন্তু তাঁহারা যদি হিন্দু শাস্ত্রের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখেন, তাঁহারা যদি প্রকৃত প্রেমিক ভক্ত হইয়া থাকেন, তাঁহারা যদি সাম্প্রদায়িক গোঁড়া

না হন এবং সর্ব্বোপরি তাঁহারা যদি পতিতপাবন পরম দয়াল শ্রীভগবানের যথার্থ কৃপার পাত্র হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত মহাত্মা রামচন্দ্র-কৃত প্রভুর জীবনী এবং শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ স্বামিজী প্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা-প্রসঙ্গ গুরু ভাব ও সাধক ভাব, তিন খণ্ড পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

তাহাতে ঠাকুরের অলৌকিক দেবমানব চরিত্র যদি হিন্দু শাস্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য থাকে, যদি তাঁহার চরিত্র পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারগণের চরিত্রের সহিত সমতুল হয়, যদি তৎকালীন শাস্ত্রজ্ঞ সাধক মহাত্মাগণ তাঁহাকে শ্রীভগবানের অবতার জ্ঞানে হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও পূজা অর্পণ করিয়া থাকেন এবং জগতে তাদৃশী ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ, বাক্যটী তাঁহার সম্বন্ধে যদি বর্ণে বর্ণে প্রয়োজিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে হইবে যে, যথার্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ভগবদাবতার।

পূর্ব্বোল্লিখিত শাস্ত্রমর্ম্মার্থ হইতে আমরা অবতারগণের যে প্রধানতঃ বিবিধ লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তদ্বিষয় লইয়া ঠাকুরের সৌসাদৃশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে ঠাকুরের অন্তরঙ্গ সাধক ভক্তগণের রচিত উপরোক্ত পুস্তকাবলীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ, বর্ত্তমান কালে ঠাকুর মানব-দেহাবলম্বনে ধরাধামে বর্ত্তমান নাই—অথবা ঠাকুরের শ্রীচরণ দর্শন আমাদের অদৃষ্টে ঘটেও নাই—সুতরাং ঠাকুরের প্রিয় অন্তরঙ্গ সাধক ভক্তগণ যে সকল লীলা-গুণাবলী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাকেই শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করা ভিন্ন আমাদের উপায়ান্তর নাই। যে হেতু মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে লীলা করিয়া গিয়াছেন, তদ্বিষয় তাঁহার অন্তরঙ্গ সাধক মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়া জন-সমাজে প্রচারিত হওয়ায় আমরা অকাট্য ভক্তি বিশ্বাস বলে তাহাকেই শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, তাহাও মহামুনি বেদব্যাস কর্ত্তৃক লিখিত হইয়া আমাদের পৌরাণিক শাস্ত্র বলিয়া গৃহীত হইতেছে। সত্য, ত্রেতা যুগেরও ইতিহাস আমরা এইরূপে অবগত হইতেছি। অতএব এক্ষণে ঠাকুরের লীলাসমন্বিত পূর্ব্বোক্ত পুস্তকাবলীর অন্তর্গত প্রধান প্রধান দুই চারিটী ঘটনা লইয়া আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, পূর্ব্বোল্লিখিত শাস্ত্রোক্ত

বাক্যের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে। এখানে দুই চারিটী ঘটনা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ লোকোত্তর পুরুষের অলৌকিক ঘটনা সমূহ মৎ-সদৃশ অজ্ঞ, মূর্খ, ভ্রান্ত, সেবক দাসানুদাসের দ্বারা আলোচিত হওয়া পঙ্গুর গিরি-লঙ্ঘনের অথবা বামনের চাঁদ ধরিবার আশার ন্যায় হইবে। অথবা পূর্ব্বোক্ত পুস্তকাবলীর অবিকল অনুকরণ করা ভিন্ন কিছুই হইবে না। এখানেও যে দুই চারিটী ঘটনা লইয়া আলোচিত হইবে, তাহাও পূর্ব্বোক্ত পুস্তকাবলীর অন্তর্গত ঘটনা সমূহের স্থূল স্থূল মর্ম্মার্থ মাত্র। যদি তদ্বিষয়ে সম্বন্ধে কাহারও বিস্তারিত বিবরণ জানিবার বাসনা থাকে, তিনি পূর্ব্বোক্ত পুস্তক সমূহ পাঠে অবগত হইবেন।

ঠাকুর অন্যান্যাবতারের ন্যায় বর্ত্তমান অবতারেও নিজ প্রচ্ছন্ন ভাব হেতু মানব স্বভাবসুলভ বাল্য-খেলা, বিবাহ, সংসার নির্ব্বাহার্থ বেতনভোগী পূজকের পদ গ্রহণ, কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হইয়া সরোদনে 'মা আমায় দয়া কর মা, মা আমি শাস্ত্র জানি না—আমি পণ্ডিত নই, মা আমি মন্ত্র তন্ত্র কিছুই জানি না, মা, আমি তোর ছেলে, তোর দাস, ইত্যাকার প্রার্থনাদি মানব-স্বভাব-সুলভ যাবতীয় কার্য্য করিতেন বটে, কিন্তু সাধু মহাত্মাদের দিব্য চক্ষের নিকট প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারিতেন না। কামারপুকুরে লাহা বাবুদের অতিথিশালাতে যে সকল সাধু শান্ত আগমন করিতেন, তাঁহাদের কেহ কেহ ক্রীড়া-রত বালককে তিলক চন্দনাদি দ্বারা সাজাইয়া স্বহস্তে দাল রুটী প্রস্তুত করিয়া ভোজন করাইয়া সানন্দে বালকের প্রসাদ, দেব-প্রসাদ বলিয়া প্রাপ্ত হইতেন। কখন ঠাকুর বাটীতে আসিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও জননীকে বলিতেন 'তোমরা দেখ, আমি কেমন সাধু সেজেছি।' কখনও বলিতেন, 'মা, আজ আমি কিছুই খাব না, একটী সাধু আমায় খুব খাইয়েছে।' ইত্যাদি বাল-স্বভাব-সুলভ প্রচ্ছন্ন ভাব দ্বারা সাধারণ লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকিলেও, মহাত্মা সাধু ভক্তগণের চক্ষে ধুলি দিতে পারিতেন না।

আপনা লুকাইতে প্রভু নানা যত্ন করে।
তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে॥
অসুর স্বভাবে কৃষ্ণে কভু নাহি জানে।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন স্থানে॥ (চৈঃ চঃ)

ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, ঠাকুর মানব সাধারণের ন্যায় যে সকল লৌকিক কার্য্য করিতেন, তাহা কেবল নিজ প্রচ্ছন্নভাব হেতু। আরও আমরা পৌরাণিক শাস্ত্রাদি পাঠে বেশ বুঝিতে পারি যে, প্রচ্ছন্নভাব হেতু শ্রীগৌরাঙ্গদেব সমবয়স্ক শিশুগণের সহিত বাল্যখেলা, ঔদ্ধত্য, বিবাহ আদি লৌকিক কার্য্য করিয়াছিলেন। যে প্রচ্ছন্ন-ভাব হেতু পূর্ণাবতার পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ, ননী-চুরি, গোচারণ, নন্দরাণী শ্রীমতী যশোদামাতা কর্তৃক বন্ধন-স্বীকার এবং বসুদেব ও দেবকীর কারা-বন্ধন হেতু মিথ্যা শোক মোহে আচ্ছন্ন হইয়া সাধারণ মানবের অনুকরণ করিতেন, যে প্রচ্ছন্নভাব হেতু পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র মানব সাধারণের ন্যায় বৃথা শোক মোহে মুগ্ধ হইতেন, সেই প্রচ্ছন্নভাব হেতু ঠাকুর, মানব সাধারণের ন্যায় যে সকল লৌকিক কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, কেবল মাত্র তদৃষ্টেই ঘোর অবিশ্বাসী, এক-দেশী ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কোন লোক তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য জ্ঞান করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না। ইহাপেক্ষা দুর্ব্বল, অবিশ্বস্তচিত্ত, ভ্রান্ত কলির মানবের দুরদৃষ্ট আর কি হইতে পারে?

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মকালীন ব্রাহ্মণবেশী এক সাধু মহাপ্রভুকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—

বিপ্র বলে এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ইহা হৈতে সর্ব্ব-ধর্ম্ম হইবে স্থাপন॥
ইহা হৈতে হইবেক অপূর্ব্ব প্রচার।
এ শিশু করিবে সর্ব্ব জগৎ উদ্ধার॥
ব্রহ্মা শিব শুক যাহা বাঞ্ছে অনুক্ষণ।
ইহা হৈতে তাহা পাইবেক সর্ব্বজন॥
সর্ব্বভূত দয়ালু নির্ব্বেদ দরশনে।
সর্ব্ব জগতের প্রীত হইব ইহানে॥
অন্যের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারাও এ শিশুর ভজিবে চরণ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কীর্ত্তি গাইব ইহান।
আদি বিপ্র এ শিশুরে করিবে প্রণাম॥
ভাবগত ধর্ম্মময় ইহান শরীর।

দেব দ্বিজ গুরু পিতৃ মাতৃ ভক্ত-বীর॥
বিষ্ণু যেন অবতরি লওয়ায়েন ধর্ম্ম।
সেই মত এ শিশু করিবে সর্ব্ব কর্ম্ম॥

(চৈঃ ভাঃ)

ব্রাহ্মণ, মহাপ্রভুকে নারায়ণ নির্দ্দেশে যে সকল ভবিষ্য সূচনা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা মহাপ্রভু ব্যতীত ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবেও বর্ণে বর্ণে প্রতিফলিত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা আরও বিশেষ প্রমাণিত হইতেছে যে, উক্ত সকল প্রকার গুণ ও কার্য্য, এক শ্রীভগবান ব্যতীত জীবে কখনও সম্ভাবিত নহে। কারণ ঈশ্বরের গুণ ও কার্য্য ঈশ্বরেই সম্ভবে; জীবে কখনও তাহা সম্ভাবিত নহে। অতএব, এক্ষণে স্বীকার করিতে হইবে যে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবেও যদি এই সকল গুণ ও কার্য্য থাকে, তবে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গদেব অথবা পূর্ণাকার পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। তিনি কখনও সাধারণ মানব পদবাচ্য হইতে পারেন না।

অলৌকিক ঠাকুরের অলৌকিক ঘটনা সমূহ যতই আলোচনা করা যাইবে, ততই আমাদিগকে আত্মহারা হইতে হইবে।

ঠাকুর যখন চতুর্থ কিম্বা পঞ্চম মাসে উপনীত হইয়াছেন, এক দিন তাঁহার মাতা গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার শিশু সন্তান নাই। একটী আট দশ বৎসরের বালক শয়ন করিয়া রহিয়াছে। তিনি চীৎকার করিয়া বাহিরে আসিয়া এবম্বিধ ঘটনা ঠাকুরের পিতার নিকট ব্যক্ত করিলে, তিনি বলিলেন, "এ সকল হইবে তাহা আমি জানি, তুমি গোলমাল করিও না।" বলিয়া ঠাকুরের মাতাকে যে কোন প্রকারে সান্ত্বনা করিলেন।

কোন সময়ে একটী কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি আসিয়া, ঠাকুরকে কাতর হইয়া বলে যে, তিনি একবার হাত বুলাইয়া দিলেই তাহার ঐ রোগ হইতে নিষ্কৃতি হয়। ঠাকুর তাহার প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া বলেন, "আমি তো কিছু জানিনা বাবু, তবে তুমি বলছ, আচ্ছা হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। মার ইচ্ছা হয় তো সেরে যাবে।" এই বলিয়া হাত বুলাইয়া দেন। তাহাতে সে রোগমুক্ত হইয়া, ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করে।

ঠাকুরের বিবাহের জন্য যখন চতুর্দ্দিকে পাত্রীর অন্বেষণ হইয়া কোনটিই স্থিরতর হইতেছিল না, তখন ঠাকুর নিজের ভাগিনেয় হৃদয় ও বাটীর অন্যান্য

সকলকে বলিয়াছিলেন যে, জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে। এই কথা তখন বাটীর আত্মীয়দের মধ্যে সম্যক্‌রূপে গৃহীত না হইলেও ভবিষ্যতে উক্ত স্থানে উক্ত কন্যার সহিতই যে ঠাকুরের বিবাহ হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত।

দক্ষিণেশ্বরের কালী বাটীর প্রতিষ্ঠাত্রী রাণী রাসমণির তৃতীয় জামাতা ৺ মথুরামোহন বিশ্বাস ধনী, ইংরাজী-বিদ্যাভিজ্ঞ ও তার্কিক ছিলেন। একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সহিত তাঁহার কথোপকথনকালে, মথুরবাবু বলিয়াছিলেন, 'ঈশ্বরকেও আইন মেনে চল্‌তে হয়। তিনি যা নিয়ম একবার করে দিয়েছেন, তা রদ করবার তাঁরও ক্ষমতা নেই।' ঠাকুর বলিলেন, 'তা হতে পারে না। যার আইন, ইচ্ছা কল্লে, সে তখনি তা রদ করতে পারে, বা তার জায়গায় আর একটা আইন করতে পারে।' এই কথা তার্কিক মথুর বাবু কিছুতেই মানিলেন না। বলিলেন, 'লাল ফুলের গাছে লাল ফুলই হয়, সাদা ফুল কখনও হয় না। কারণ তিনি নিয়ম ক'রে দিয়েছেন। কৈ, লাল ফুলের গাছে সাদা ফুল তিনি এখন করুন দেখি?' ঠাকুর বলিলেন, 'তিনি ইচ্ছা কর্‌লে সব করতে পারেন, তাও করতে পারেন।' মথুর বাবু কিছুতেই এ কথা বিশ্বাস করিলেন না। তৎপর দিন কালীবাড়ীর বাগানে ঠাকুর মথুর বাবুকে ডাকিয়া দেখাইলেন যে, একটী লাল জবা ফুলের গাছে একই ডালের দুটী ফেঁকড়িতে দুটী ফুল ফুটিয়াছে। একটী লাল, আর একটী ধপ্‌ধপে সাদা, তাতে এমন কি, লাল দাগের লেশ মাত্র নাই। মথুর বাবু বিশেষ পরীক্ষান্তে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, 'হাঁ বাবা, আমার হার হয়েছে।'

দক্ষিণেশ্বরে যে ঘরটিতে ঠাকুর থাকিতেন, তাহারই উত্তর পশ্চিম কোণে যে লম্বা বারাণ্ডাটী রহিয়াছে, সেখানে একদিন ঠাকুর আপন মনে পাদচারণ করিতেছিলেন। উক্ত স্থানের উত্তর দিকে বাবুদের যে কুঠী রহিয়াছে, সেখানে মথুর বাবু বসিয়া আপন মনে বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। ফলতঃ যেখানে মথুর বাবু বসিয়াছিলেন, তথা হইতে যেখানে ঠাকুর পায়চারি করিতেছিলেন, উক্ত স্থানটী বেশ দেখা যায়। শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত মথুর বাবু হঠাৎ ব্যস্তসমস্ত হইয়া দৌড়িয়া আসিয়া ঠাকুরের পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক কাঁদিতে লাগিলেন। ঠাকুর বলিলেন, 'আহা! একি করচ, তুমি রাণীর জামাই, লোকে এমন

করতে দেখলে তোমায় কি বলবে। স্থির হও, উঠ।' কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া বলিতে লাগিলেন, 'বাবা, আজ আমার সকল গর্ব্ব চূর্ণ হ'য়েছে। স্পষ্ট বুঝেছি, তুমি কে? বাবা, তুমি বেড়াচ্ছ আর আমি স্পষ্ট দেখলুম, যখন এদিকে এগিয়ে আসছ, যেন তুমি নও, আমার ইষ্টদেবী ঐ মন্দিরের মা! আর যাই পেছন ফিরে ওদিকে যাচ্চ, দেখি কি যে সাক্ষাৎ মহাদেব! প্রথম ভাবলুম চখের ভ্রম হ'য়েছে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যতবার ভাল ক'রে চোখ পুঁছে দেখলুম, দেখি তাই!' এই বলিয়া মথুর বাবু পুনরায় ঠাকুরের পদদ্বয় ধারণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে নানারূপে সান্ত্বনা করিলেন। এই সময় হইতে মথুর বাবুর পাকা বিশ্বাস হয় যে, ঠাকুর বাস্তবিক সামান্য মানব মাত্র নহেন। তাঁহার ইষ্টদেবী জগদম্বাই রামকৃষ্ণ বিগ্রহাবলম্বনে তাঁহার প্রতি কৃপার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন।

অঘোরমণি দেবী নাম্নী 'গোপাল' মন্ত্রে দীক্ষিতা এক বৈষ্ণব সাধিকা রমণী সর্ব্বদা শ্রীশ্রীবালগোপাল মূর্ত্তির ভজন পূজনে অতিবাহিত করিতেন। তিনি রাত্রি ২টার সময় উঠিয়া শৌচাদি সারিয়া ৩টার সময় হইতে জপে বসিয়া তৎপর দিন ৮টা ৯টার সময় জপ সাঙ্গ করিয়া স্নান ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণজীর দর্শন ও সেবা কার্য্যে যোগদান করিতেন। পরে আহারান্তে পুনরায় জপে বসিতেন ও সন্ধ্যায় আরতি দর্শন করিবার পর পুনরায় অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জপে কাটাইতেন। তারপর একটু দুধ পান করিয়া কয়েক ঘণ্টা মাত্র নিদ্রা যাইতেন। আবার রাত্রি ২টার সময় উঠিয়া ক্রমান্বয়ে পূর্ব্বানুরূপ কার্য্য করিতেন। এইরূপ তাঁহার বহুকালের (ত্রিশ বৎসরেরও অধিককাল) অভ্যাস ছিল। ঠাকুরের কথা লোক মুখে শ্রুত হইয়া ভক্তিমতী অঘোরমণি কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিয়া যাইতেন। কামারহাটিতে একদিন ঐরূপ রাত্রি তিনটার সময় জপে বসিয়াছেন, এমন সময় দেখেন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার নিকটে বাম দিকে বসিয়া রহিয়াছেন এবং ঠাকুরের দক্ষিণ হস্তটী মুটো করার মত দেখা যাইতেছে। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে যেমন দর্শন করেন, এখনও সেইরূপ স্পষ্ট জীবন্ত! ভাবিলেন একি, এমন সময় ইনি কোথা থেকে, কেমন ক'রে হেথায় এলেন?" এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণী বাঁ হাত দিয়া যেমন ঠাকুরের বাঁ হাতখানি ধরিলেন, অমনি সে মূর্ত্তিখানি অন্তর্হিত হইয়া

সত্যকার গোপাল হামা দিয়া, এক হাত তুলিয়া ব্রাহ্মণীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মা, আমায় ননী দাও!" ব্রাহ্মণী দেখিয়া আনন্দিত হইয়া তখনিই সেই অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট আসিয়া ঠাকুরকে কোলে বসাইয়া মা যেমন ছেলেকে খাওয়ায় সেইরূপ ভাবে ক্ষীর, সর, ননী খাওয়াইতে লাগিলেন। সেই দিবস হইতে ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে তাঁহার ইষ্টমূর্ত্তি বালগোপাল জ্ঞানে সেবা করিতেন।

ঠাকুর তীর্থ পর্য্যটন কালে, বৃন্দাবনে যাইয়া একদিন নিধুবনে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তথায় সিদ্ধপ্রেমিকা বর্ষিয়সী তপস্বিনী গঙ্গা মাতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তখন তাঁহার বয়স প্রায় ষাট বৎসর হইবে। ঠাকুরকে দর্শন করিবামাত্র গঙ্গামাতার আনন্দসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। তিনি "আরে! দুলালী (শ্রীমতির নামবিশেষ) দুলালী!" বলিয়া প্রেমালিঙ্গন করিলেন। ঠাকুর তখন বাহ্য-চৈতন্য হারাইয়াছিলেন। গঙ্গামাতার নয়নযুগল হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন কি বলিবেন, কিন্তু অপরিমিত আনন্দ হইলে যেমন বাক্‌রোধ হইয়া যায়, তাঁহার তদবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে পর ঠাকুর পূর্ব্ব প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং উভয়ে ঠারে ঠোরে নানাপ্রকার কথা কহিলেন। সে সকল কথার ভাব কেহ বুঝিতে পারে নাই। বহুকাল ধরিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রতি গঙ্গামাতার প্রেম-বিহ্বল ব্যবহার দেখিয়া এখানকার লোকে শ্রীরাধিকার প্রধানা সঙ্গিনী ললিতা সখী, জীবকে প্রেম শিক্ষা দিবার জন্য অবতীর্ণা বলিয়া মনে করিত। ইনি ঠাকুরকে দর্শন মাত্রেই ঠাকুরের শরীরে শ্রীমতি রাধিকার ন্যায় মহাভাবের প্রকাশ দেখিয়া, ঠাকুরকে শ্রীমতি রাধিকাই স্বয়ং অবতীর্ণা ভাবিয়া 'দুলালী' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। ঠাকুর যতদিন সেখানে ছিলেন, গঙ্গামাতা স্বহস্তে আহারাদি প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরকে ভোজন করাইতেন এবং সর্ব্বদাই তত্ত্ব প্রসঙ্গে দিন যাপন করিতেন। শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে যখন ঠাকুর প্রত্যাগমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, গঙ্গামাতা বিষাদিত হইয়া নানাবিধ প্রতিবন্ধক জন্মাইয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুর নানাবিধ প্রবোধ বচনে সান্ত্বনা করিয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কলিকাতার অন্তঃপাতী কলুটোলা নামক পল্লীতে একটী চৈতন্য সভা ছিল।

তথায় ঠাকুর একদিন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শুনিতে গিয়াছিলেন। পাঠ শুনিতে শুনিতে হঠাৎ প্রভু ভাবাবেশে শ্রীচৈতন্যদেবের আসনে দাঁড়াইয়া একেবারে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। এই বিষয় লোকমুখে ক্রমশঃ কাল্‌নায় শ্রীচৈতন্য পদাশ্রিত সিদ্ধ ভগবান দাস বাবাজীর কর্ণগোচর হইল। তিনি এই ব্যাপারে অর্থাৎ তাঁহার ইষ্টদেবতার আসন একজন অজ্ঞাত নামা মানবের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে শুনিয়া যারপর নাই রাগান্বিত হইয়া অযথা কটুকাটব্য বলিয়াছিলেন। একদিন ঠাকুর স্বতঃ প্রেরিত হইয়া কাল্‌নায় যান এবং লোক মুখে ঠিকানা জানিয়া ক্রমে ভগবান দাস বাবাজীর আশ্রম সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। বাবাজীকে কেহ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সিদ্ধ বাবাজী স্বতঃই বলিয়াছিলেন, "আশ্রমে যেন কোনও মহাপুরুষের আগমন হইয়াছে, বোধ হইতেছে।" পরে ঠাকুরের মুহুর্মুহু ভাবাবেশে ও উদ্দাম আনন্দে বাবাজী মোহিত হইয়া দেখিলেন যে, যে মহাভাবের শাস্ত্রীয় আলোচনা ও ধারণায় তিনি এতকাল কাটাইয়াছেন, তাহাই ঠাকুরের শরীরে নিত্য প্রকাশিত! পরে যখন বাবাজী শুনিলেন, ইনিই কলুটোলার হরি সভায় ভাবাবেশে আত্মহারা হইয়া শ্রীচৈতন্যাসন অধিকার করিয়াছিলেন, তখন, তিনি যে ঠাকুরকে অযথা কটুকাটব্য বলিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার মনে ক্ষোভ ও পরিতাপের অবধি রহিল না। তিনি ঠাকুরকে বিনীত ভাবে প্রণাম করিয়া তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

যে সময় ঠাকুরের অদৃষ্ট পূর্ব্ব ঈশ্বরানুরাগ ও ব্যাকুলতা, উন্মত্ততা ও শারীরিক ব্যাধি বলিয়াই অনেকটা গণ্য হইয়া আসিতেছিল, সেই সময় ভৈরবী বেশ ধারিণী একটী উচ্চদরের সাধিকা ব্রাহ্মণী হঠাৎ দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি ঠাকুরকে দেখিয়া, সকলের সমক্ষে প্রকাশ্যে বলেন যে, "ইঁহার মহাভাবের অবস্থা। উন্মত্ততা অথবা শারীরিক ব্যাধি নহে। যে মহাভাব শ্রীমতি রাধারাণী ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হইয়াছিল, ইহা সেই মহাভাব।" এই বলিয়া তাঁহার নিকট শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্য ভাগবতাদি যে সকল ভক্তিশাস্ত্র ছিল, তাহাতে অবতার পুরুষদের দেহমনে ঈশ্বরপ্রেমের প্রবলবেগ কিরূপ লক্ষণ সকলের আবির্ভাব করে, তদ্বিষয় শাস্ত্রবচন হইতে ঠাকুরের লক্ষণ সমূহের সহিত যথা সাধ্য মিলাইয়া নিজ বাক্য প্রমাণিত করিতে লাগিলেন। আরও রাসমণির জামাতা প্রভৃতি কালীবাটীর সকলকে বলিলেন, "শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত সকলকে

আন, আমি তাঁহাদের নিকট আমার একথা প্রমাণিত করিতে প্রস্তুত আছি।” এই কথায় সকলে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিলেও কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে আনাইয়া এ বিষয়ের স্থির সিদ্ধান্ত করিবার উদ্‌যোগ হইল।

কলিকাতার বৈষ্ণব মহলে তখন বৈষ্ণবচরণের খুব প্রতিপত্তি, তিনি শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া পাঠ করিতে পারিতেন। তিনি যে কেবল মাত্র পণ্ডিত ছিলেন, তাহা নহে; তিনি একজন ভক্ত সাধক বলিয়াও সাধারণে পরিচিত ছিলেন। তাঁহাকে আনাইবার জন্য মনোনীত করা হইল। বীরভূম অঞ্চলের ইঁদেশের গৌরীপণ্ডিতের অসাধারণ ক্ষমতা ও পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়া তাঁহাকেও আনাইবার সঙ্কল্প করা হইল। বৈষ্ণবচরণ আহূত হইয়া কতকগুলি ভক্ত সাধক ও পণ্ডিত সহ দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলেন। বৈষ্ণবচরণ সাধন প্রসূত সূক্ষ্মদৃষ্টি সহায়ে ঠাকুরকে মহাপুরুষ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। এবং ব্রাহ্মণীর সকল কথাই হৃদয়ের সহিত অনুমোদন করিয়া বলিয়াছিলেন, “যে প্রধান প্রধান উনবিংশ প্রকার ভাব বা অবস্থার সম্মিলনকে ভক্তিশাস্ত্র ‘মহাভাব’ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং যাহা কেবলমাত্র ভাবময়ী শ্রীরাধিকা ও ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনেই এ পর্য্যন্ত লক্ষিত হইয়াছে, কি আশ্চর্য্য, তাহার সকল লক্ষণগুলিই ইঁহাতে প্রকাশিত বলিয়া বোধ হইতেছে! জীবের ভাগ্যক্রমে যদি কখন জীবনে মহাভাবের আভাস উপস্থিত হয়, তবে ঐ উনিশ প্রকারের অবস্থার ভিতর বড়জোর দুই পাঁচটা অবস্থাই প্রকাশ পায়। জীবের শরীর ঐ উনিশ প্রকার ভাবের উদ্দাম বেগ কখনই ধারণ করিতে সমর্থ হয় নাই, এবং শাস্ত্র বলেন, পারেও ধারণে কখন সমর্থ হইবে না।” এই বলিয়া সাধক বৈষ্ণবচরণ চিরজীবনের মত ঠাকুরের শ্রীপাদ পদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ইহার কিছুদিন পরে নিমন্ত্রিত হইয়া ইঁদেশের একজন বিশিষ্ঠ তান্ত্রিক সাধক গৌরীপণ্ডিত দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌরী দক্ষিণেশ্বরে কয়েক-দিন থাকিয়া,—ঠাকুরের আকৃতি প্রকৃতি ও চালচলন দেখিয়া যখন শুনিলেন যে, পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ ঠাকুরকে অবতার বলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, “বৈষ্ণবচরণ ঠাকুরকে অবতার বলে? তবে ত ছোট কথা বলে। আমার ধারণা, যাঁহার অংশ হইতে যুগে যুগে অবতারেরা লোক কল্যাণ সাধনে জগতে

অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাঁহার শক্তিতে তাঁহারা ঐ কার্য্য সাধন করেন, ইনি তিনিই। এ বিষয়ে যদি কেহ বিরুদ্ধ পক্ষাবলম্বনে আমার সহিত বাদে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে আমি আমার ধারণা প্রমাণ করিতেও প্রস্তুত আছি।" ঠাকুর বালকের ন্যায় বলিলেন, "তোমরা সব এত কথা বল, কিন্তু কে জানে বাবু, আমি ত কিছু জানিনা!" গৌরী বলিলেন, "ঠিক কথা। শাস্ত্রও ঐ কথা বলেন— আপনিও আপনাকে জানেন না। অতএব অন্যে আর, কি ক'রে আপনাকে জান্‌বে বলুন! যদি কাহাকেও কৃপা ক'রে জানান, তবেই সে জানতে পারে।" গৌরী দিন দিন ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া, ঠাকুরের দিব্য সঙ্গগুণে সংসারে তীব্র বৈরাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। পাছে স্ত্রী, পুত্র, পরিজনেরা দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তাঁহাকে টানাটানি করিয়া সংসারে পুনরায় লিপ্ত করে, এই ভাবিয়া পণ্ডিতজী ঠাকুরের শ্রীপদে প্রণাম করিয়া সজল-নয়নে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "সেকি গৌরী, সহসা বিদায় কেন? কোথায় যাবে?" গৌরী করযোড়ে উত্তর করিলেন—'আশীর্ব্বাদ করুন, যেন অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। ঈশ্বর বস্তু লাভ না করিয়া আর সংসারে ফিরিব না।' তদবধি সংসারে আর কখনও কেহ বহু অনুসন্ধানেও গৌরী পণ্ডিতের দেখা পাইলেন না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিপদ নন্দী।

অবতার-স্তুতি।

—:•-:•:-•:—

(১)

প্রলয়-সলিলে যেই দিন এই পৃথিবী ছিল গো মগ্ন,
উদ্ধারিলে বেদ জলরাশি হ'তে, স্তব্ধতা করিলে ভগ্ন।
ওঙ্কারের মহাহুঙ্কার উঠিয়া ছাইল গগনময়,
জয় বিশ্বপতি মৎস্য মুরতি, জয় হে তোমার জয়।

(২)

বরাহ রূপেতে বজ্র-দ্রংষ্ট্রে করিলে উদ্ধার বিশ্ব ;
সমুদ্র মথনে কূর্ম্ম রূপ ধরি হইলে সবার নমস্য।
পৃষ্ঠে ধরিলে মন্দর তুমি, বিস্মিত দেবতাচয় ;
জয় হে বরাহ-কূর্ম্ম মূরতি, জয় হে তোমার জয়।

(৩)

দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু জিনিয়া স্বর্গ—অমরাবতী,
গর্ব্ব-স্ফীত মত্ত দানব লোহিত রক্তে ভাসাল ক্ষিতি।
দানবপতির তনয় প্রহ্লাদ ছিল গো তোমার ভক্ত,
অনলে, সলিলে বধিতে তাহারে হলোনা তাহারা শক্ত।
ভক্তেরে রক্ষিলে হিরণ্য বধিয়া, ওহে ভক্তপ্রাণা রাম,
জয় হে নৃসিংহ মূরতিধারী গাইব তোমার নাম।

(৪)

প্রহ্লাদ-পৌত্র বলির নিকটে আনত হইল স্বর্গ,
যশো গানে তার পূরিল ভুবন—অসীম শূন্যমার্গ।
ভীত অতি দেবতা নিচয়, হেরি অদম্য প্রভাব তার,
শরণ লইল তোমারে সবে—তুমি দেবের কর্ণধার।
বামন রূপেতে লইলা জনম দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘরে,
ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা তুমি যাচিলা বলির দ্বারে।
দুই পদে তোমার স্বরগ-মর্ত্ত্য—তৃতীয় চরণে বলি,
"জয় হে বামন" দেবতা গন্ধর্ব্ব গায় হ'য়ে কুতূহলী।

(৫)

ক্ষত্রিয় দর্প করিতে খর্ব্ব আসিলে তুমি দর্পহারী!
জমদগ্নি ঘরে—ঋষিপুত্র হ'য়ে জনম নিলেন হরি।
পরশু আঘাতে একবিংশবার করিলে ক্ষত্রিয় ধ্বংশ,
পরশুরাম নাম শুনিয়া কম্পিত হ'ল ক্ষত্রিয় বংশ।

(৬)

জন্মিলে পুনঃ অযোধ্যা নগরে লইয়া অপার প্রতিভারাশি,
পিতৃ আজ্ঞায় স্বেচ্ছায় তুমি হইলে ঘোর অরণ্যবাসী।
ভার্য্যারে হরণ করি নিয়ে গেল রাবণ লঙ্কাধিপতি,
নাশিলে তাহারে সবংশেতে তুমি সুগ্রীবে করিয়া সাথী।
বনবাস দিলে প্রিয় বনিতায়, প্রজারঞ্জনের তরে,
আদর্শ রাজা—আদর্শ পুরুষ দেখালে রাম অবতারে।

(৭)

দ্বাপরে নাশিতে ধরিত্রীর ভার ক্ষত্রিয় ঘরে জন্মিলা,
পালিত হইলা গোপরাজ গৃহে—কত না খেলিলা খেলা।
কুরুক্ষেত্র রণে নাশি ক্ষিতি ভার—অর্জ্জুনে দিলেক শিক্ষা,
জ্ঞান-কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ আদি কত না করিলে ব্যাখ্যা।
"মা ক্লৈব্য গচ্ছ" বলিয়া অর্জ্জুনে শিখালে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম,
কৃষ্ণ অবতারে দেখালে সবারে আদর্শ নিষ্কাম কর্ম্ম।

(৮)

শান্ত প্রকৃতি বুদ্ধ মূরতি ধরিয়ে এলে পৃথিবী'পরে,
ত্যজিয়া ঐশ্বর্য্য সাজিলা সন্ন্যাসী ধরার হিতের তরে।
পিতা-মাতা-পত্নী-পুত্র-পরিজন নারিল করিতে বদ্ধ,
জীবের দুঃখ করিবারে দূর চলিলে হইতে বুদ্ধ।
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" প্রচার করিলা এ নিখিল ভবে,
'জয় বুদ্ধ' বলি এ মহামন্ত্র গ্রহণ করিল সবে।

(৯)

জেরুজালেমে খ্রীষ্ট রূপে জন্মিলে 'মেরী'র গর্ভে,
অর্দ্ধ পৃথিবী গৌরব ভরে নমিছে তোমায় সর্ব্বে।
কিন্তু হে তখন অবিশ্বাসীগণ কত না দিলেক কষ্ট,
ক্ষমার আধার তুমি হে যীশু! তাহাতে হ'লে না রুষ্ট।
'ক্রুশ' কাষ্ঠে জীবন তোমার নাশিল দুষ্ট ইহুদিচয়,
(তাই) ক্রুশ চিহ্ন পবিত্র মানিয়া খ্রীষ্টান গায় তোমার জয়।

(১০)

ভুলি সত্যধর্ম্ম আরবে যখন প্রস্তর পূজিত সবে,
বিতরিতে সবে সত্য—আলোক আসিলে তুমি এ ভবে।
লইলে জন্ম মদিনানগরে মহম্মদ ধরিয়া নাম,
'একেশ্বর বাদ' করিয়া প্রচার সিদ্ধ করিলে মনস্কাম।

(১১)

বাণীর আবাস নবদ্বীপ যবে ভুলেছিল ভক্তিতত্ত্ব,
শুষ্কজ্ঞানের তর্কলয়ে সবে সদাই থাকিত মত্ত ;
ভক্তিযোগ তুমি শিখাইতে সবে জনমিলে নবদ্বীপে,
জ্ঞানযোগী পণ্ডিত সকলে বিঘ্ন ঘটাল অশেষরূপে।
ভেদজ্ঞান তুমি করিলে নির্ব্বাণ, প্রেমে ভাসিল ভারতবর্ষ—
প্রেমের তোড়ে ভেসে গেল সব, ঘুচিল সবার অমর্ষ।
নাম গুণ গানে জগাই মাধাই—কত পাপী গেল তরে,
প্রেমের আদর্শ মুরতি দেখালে শ্রীচৈতন্য অবতারে।

(১২)

ঈশ্বরে কারো নাইকো বিশ্বাস—ধর্ম্ম ল'য়ে করে তর্ক,
আসিলে তাই এ ভব মাঝারে লয়ে 'সমন্বয়' বালার্ক।
'ক্ষুদিরাম'* ঘরে লইলা জনম, কামারপুকুর গ্রামে,
'দক্ষিণেশ্বরে' দিবানিশি তুমি বিভোর "মা মা" নামে।
"যে ভাবে তাঁহারে ডাকনা কেনরে সবাই হবে তায় প্রাপ্ত,
কেনরে সদাই ধর্ম্ম লইয়া বিবাদে থাকিস্ মত্ত ?"
যেদিন এ বাণী শুনিল সবে হইল ধর্ম্ম সমন্বয়,
গগন ভেদিয়া উচ্চ রোলে উঠিল "শ্রীরামকৃষ্ণ জয়"।
ঘোষিল তোমার মহিমাবিশ্বে, "রাম" "বিবেকানন্দ" বীর,
স্তম্ভিত হ'লো বিশ্ববাসী—সম্ভ্রমে নত করিল শির।

(১৩)

যখন ধর্ম্মের হয় হে গ্লানি অধর্ম্মের প্রভাব বাড়ে,
যুগে যুগে ধর্ম্ম করিতে স্থাপন আস তুমি নরাকারে।
জগতের হিতে মতি থাকে যেন, না ভুলি ধর্ম্ম-মার্গ,
রেখো হে সদাই ও পদনলিনে—চাহিবনা কভু স্বর্গ।

শ্রীনলিনীকুমার চক্রবর্ত্তী।

* ৺ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়।

কাঙ্গালের কথা।

—:০:-:০:-০:—

কথায় বলে, "কাঙ্গালের কথা বাসি হইলে মিষ্ট লাগিবে", এ কথা অতি সত্য, সকলেই প্রাণে প্রাণে একদিন না একদিন বুঝিয়া থাকিবেন, তা বৈষয়িক ব্যাপার লইয়াই হউক, আর রূপ, রস, গন্ধ বা শব্দের ফাঁদে পড়িয়াই হউক। ঠেকিয়া শিক্ষা করা অপেক্ষা, কথা শুনিয়া কিম্বা দেখিয়া শিক্ষা করা সমধিক প্রশংসনীয়, কারণ জ্বালা সহিতে হয় না। কিন্তু কাঙ্গালের "ঠেকিয়া শেখা—নয় কথা শোনা," অনেক ঠেকিয়া, বিস্তর দাগা পাইয়া, জ্বালায় জর্জ্জরীভূত হইয়া তবে ভগবান শিখাইয়াছেন—কাঙ্গাল সাজাইয়াছেন। সেকি একবার ঠেকা, পুনঃ পুনঃ ঠেকিয়া—তবু পিয়াসা মেটেনা—কি নেশা—নেশা কি সহজে যাইতে চাহে, অনেক কাঁদিয়া—কাঁদাইয়া তবে দয়াময়—সকল জ্বালা দূর করিয়া কাঙ্গাল সাজাইয়াছেন—এমন কাঙ্গালের কথা শুনিবে কি? এরূপ মার্কামারা কাঙ্গালের কথা শুনিতে হয়, কেননা তাহার প্রাণে বড় ভয়, পাছে কেউ তাহার মত দিশে-হারা হইয়া,—দুনিয়ার দুদিনের মজায় বেজায় দাগা খাইয়া বুকে শেল বিদ্ধ হইয়া, জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে! ঐ যে দেখিতেছ, আপাতমধুর নয়ন ঝলসান, আহামরি ব্যাপার—মনে বুঝি হইতেছে—উহাতে বড় সুখ, বড় আনন্দ, সব ভুলিয়া উহাতে ডুবিয়া থাকি, কিন্তু ভাই, উহা বড় ভয়ঙ্কর—প্রস্ফুটিত পুষ্পের নিম্নে কাল ফণিনী লুক্কাইত রহিয়াছে, এখনি দংশাইবে—সাবধান, উহাতে অনেক বাবু—অনেক হোমরা চোমরা কাবু হইয়া বিষের জ্বালায় হা হুতাশ করিতে-ছেন। বাহিরে বেশ লেফাফা দোরস্ত যেন প্রস্ফুটিত গোলাপটী, কিন্তু ভিতরে কালি পড়িয়া গিয়াছে! কেমন "ভাবের ঘরে চুরি" চলিতেছে—ইহাই দুনিয়াদারী। যদি তুমি দুনিয়াদারীর বাহির হইতে চাও, মাটির মানুষ হইতে চাও, তোমার একজন আছে—তাহাকে চিনিতে চাও, তাহা হইলে সকলে তোমাকে পাগল বলিবে, সকলে তোমার পুর্ব্বের অবস্থার ন্যায় দিন-কতক ভাবিবে "বোকা"। এমন "বোকা" হওয়া ধন্য! শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থে উল্লেখ আছে, করমেতি বাই পরমা ভক্ত—কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী, বীর গিরিশ বাবু তাঁহার উক্ত গ্রন্থে করমেতির একটী উক্তি দিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর :—

"নয়তো মিছে আমার কে আছে,
শূন্য মনে বেড়াই যখন, সে বেড়ায় পাছে পাছে।
কোথায় যেন তারে দেখেছি—
সেদিন থেকে মনের ভিতর লুকিয়ে রেখেছি।
সে বলেছে, তাইতে এসেছি,
মন রেখে তার সদাই চলি, অভিমান করে পাছে।
লুকিয়ে থেকে আমায় দেখে, দেখলে সরে যায়,
ভুলে যাই কত কথা বলে সে আমায়;
বলবো কি আর, ফুরায় না কথায়।
বুঝতে নারি সে ফেরে কি,
আমি ফিরি—তার পাছে॥

এমন পাগল হইলে বুঝিতে পারিবে না—সে তোমার পাছু ফিরিতেছে, কি তুমি তাহার পিছে ফিরিতেছ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্রীমুখে বলিয়াছেন, কলিযুগে "সত্যই" একমাত্র তপস্যা, অন্নগত প্রাণ জীব—অন্য সাধন ভজন দুরূহ, সত্যে আঁট থাকিলেই হইল। সত্য কি না 'সৎ,' একমাত্র এ জগতে "ঈশ্বরই সৎ, আর সব অসৎ" তাঁহাকে ধরিয়া থাকিলেই, তাঁহার শ্রীচরণে আত্ম সমর্পণ করিতে পারিলেই—যো সো করিয়া একবার বুড়ী ছুঁইতে পারিলেই নিশ্চিন্ত; আর চোর হইয়া ভব কারাগারের কয়েদী হইতে না।

ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতি রেকা
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা॥

"সব শেয়ানের এক রা" ঐ দেখ, শঙ্করাচার্য্য মহারাজ বলিয়াছেন—এক ক্ষণমাত্র সজ্জন সঙ্গতি—'সৎসঙ্গ' ভবসমুদ্র পার হইবার নৌকা স্বরূপ। তাই "সৎসঙ্গই" একমাত্র উপায়, সৎসঙ্গ লাভ হইলে সকল দিক আপনিই বজায় হইবে। ঠাকুর বলিয়াছেন, "এলে গেলেই হয়"। তাই বলিতেছি দিন থাকিতে একটু সৎসঙ্গের নেশা করিলে হয় না? এ ভারি মৌতাতী নেশা—বড় জমায়েৎ খোঁয়ারি আদৌ নাই, এ নেশায় তোমার সকল নেশা কাটিবে। একটু করিয়া খাইয়া দেখিলে হয় না? জয় প্রভু রামকৃষ্ণ। কাঙ্গাল।

যোগোদ্যানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—পার্ব্বণাবলী।

১৩২২ সাল, ৮১ রামকৃষ্ণাব্দ।

১। ১লা বৈশাখ, বৎসরের প্রথম দিনে বিশেষ পূজা ও প্রার্থনা, প্রভুর খেচরান্ন ও নানাবিধ ফলমূল ও মিষ্টান্ন ভোগ হয়।

২। ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ২৮শে মে, শুক্রবার ফুলদোল। এই দিন শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত সেবক মহাত্মা রামচন্দ্রকে বিশেষ কৃপা করিয়া ভক্তগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার ২৬ নং মধুরায় লেনস্থিত আবাসে প্রথম শ্রীচরণধূলি প্রদান করেন ও তাঁহার আঙ্গিনায় প্রেমের উজান বহিয়া যায়। ইহা বিশেষ স্মরণীয় দিন। সেই জন্ম সেবকমণ্ডলী প্রতিবৎসর এই দিন উপবাসী থাকিয়া, রাত্র ৮ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরকে পুষ্পমাল্য প্রভৃতি দ্বারা সাজাইয়া বিশেষ পূজা করেন ও ভোগরাগ দেন, তৎপরে শ্রীচরণামৃত ধারণ ও মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন।

৩। ২৯শে আষাঢ়, ১৪ই জুলাই, বুধবার রথযাত্রা। এই দিবস অপরাহ্নে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত ও শিষ্য ৺মনোমোহন মিত্র মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান গৌরী-মোহন মিত্র, তাঁহার আবাসবাটী হইতে ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তি রথে করিয়া যোগোদ্যানে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে লইয়া আইসেন; এখানে ঠাকুরের রথ ৭ দিন থাকে। ৫ই শ্রাবণ, ২১শে জুলাই, বুধবার পুনর্যাত্রায় দিবস বৈকালে মহানন্দে ভক্তগণ রথে শ্রীমূর্ত্তিসহ প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

৪। ১৫ই ভাদ্র, ১লা সেপ্টেম্বর, বুধবার জন্মাষ্টমীর দিন, জগতের জন্ম শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্য-আবির্ভাবের দিন সমাধির দিন! মহাত্মা রামচন্দ্র ইহাকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণমহোৎসব বা নিত্য-আবির্ভাব উৎসব বলিতেন। ৭ই ভাদ্র ২৪শে আগষ্ট, মঙ্গলবার রাত্র ৩।২৩।৪ সেকেণ্ড সময়ে প্রতিপদ সঞ্চারে প্রভুর আরতি করিয়া পর্ব্বারম্ভ করা হয়। মঙ্গলবার দিবারাত্র সেবকমণ্ডলী উপবাসী থাকিয়া আরতি ও ভোগের পর শ্রীচরণামৃত ও মহাপ্রসাদ ধারণ করিবেন। প্রতিপদ হইতে সপ্তমী পর্য্যন্ত নিত্য হাঁড়ি হাঁড়ি দাল ও ভাত ভোগ হয় এবং জন্মাষ্টমীর দিন, প্রভুর সমাধির দিনে, তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য হইয়া থাকে। সমাধির বৎসর হইতে উনবিংশ বর্ষকাল অতীত হইল, প্রতিবৎসর যোগোদ্যানে নানা দেশ হইতে সম্প্রদায় সকল রামকৃষ্ণ গুণগান করিতে আসিয়া থাকেন

এবং তাঁহাদের ভক্তিতে যোগোদ্যানের এক অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদিত হইয়া থাকে। তাঁহাদের বিরহসূচক হৃদয়ভেদী রামকৃষ্ণ-গুণ-গানে অতি পাষণ্ডেরও হৃদয় ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া যায়। এই আট দিন প্রভুর মঙ্গল আরতি ও ভোগ আরতি হয়। তিথির দিন ও মহোৎসবের দিন ঠাকুরের নববস্ত্র। মহোৎসবের দিন মহাত্মা রামচন্দ্রের নববস্ত্র।

৫। ২৮শে আশ্বিন, ১৫ই অক্টোবর শুক্রবার, শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, তিন দিন খেচরান্ন ভোগ, মহাষ্টমীর দিন ভোগারতি, বিজয়ার দিন পূজার পর জলপানির সহিত দধিকড়মা। পঞ্চব্যঞ্জন সহিত অন্নভোগ ও ক্ষীর খাজা। তিন দিন রক্তচন্দন ও বিল্বপত্রে পূজা। মহাষ্টমী ও বিজয়ার দিন ভক্ত সমাগম। ৫ই কার্ত্তিক, শুক্রবার, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন রাত্রে চিড়া নারিকেল ভোগ।

৬। ২০শে কার্ত্তিক, ৬ই নবেম্বর—শনিবার শ্রীশ্রীকালীপূজা, রাত্র ৮টার সময় ঠাকুর যেরূপে শ্যামপুকুর বাটীতে পূজা করাইয়াছিলেন ও পূজা লইয়াছিলেন, সেইরূপ রক্তচন্দন-বিল্বপত্রে পূজা ও সঙ্কীর্ত্তন। সকলে সচন্দন বিল্বপত্রে অঞ্জলী প্রদান। তৎপরে লুচি তরকারী ও সুজীর পায়স ভোগ। দিবসে খেচরান্ন ভোগ।

৭। ২৬শে কার্ত্তিক, ১২ই নবেম্বর, শুক্রবার—শুক্লাষষ্ঠীর দিন মহাত্মা রামচন্দ্রের জন্মতিথি পূজা, নব বস্ত্র। ঠাকুরের খেচরান্ন ও পায়সান্ন ভোগ, পূজার সময় মাখন মিছরি প্রভৃতি। পরে ২৯শে কার্ত্তিক, ১৫ই নবেম্বর, সোমবার শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজার দিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব, কাঙ্গালী-ভোজন ইত্যাদি।

৮। ৯ই পৌষ, ২৫শে ডিসেম্বর, শনিবার বড়দিন—যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিন। বিশেষ পূজা, ভোগরাগ প্রার্থনা।

৯। ১৬ই পৌষ, ১লা জানুয়ারী, শনিবার শ্রীশ্রীকল্পতরু উৎসব। বিশেষ পূজা ও প্রার্থনা, সঙ্কীর্ত্তন, খেচরান্ন ভোগ, ভক্ত সমাগম ও প্রসাদ বিতরণ। ঠাকুর এই বিশেষ দিনে কল্পতরুভাবে জগতের সকলকে "চৈতন্য হউক" বলিয়া অশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। মহাত্মা রামচন্দ্র সেই সুযোগে যাহাকে সম্মুখে পাইয়াছিলেন, ঠাকুরের সম্মুখে টানিয়া লইয়া গিয়াছিলেন; ঠাকুর সকলের বক্ষে শ্রীহস্তার্পণ করিয়া চৈতন্যদান করিয়াছিলেন। বিশেষ দিন।

১০। ২৯শে পৌষ, ১৪ই জানুয়ারী, শুক্রবার—পৌষ-সংক্রান্তির দিন নানা রকম পিঠা, বড়া প্রভৃতি ভোগ হয়।

১১। ২৫শে মাঘ, ৮ই ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার—শ্রীপঞ্চমী বা সরস্বতী পূজা। মহাত্মা রামচন্দ্রের সমাধির দিন। খেচরান্ন ভোগ, ঠাকুরের সম্মুখে ও পার্শ্বে পুস্তক, লেখনী, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি শ্রীপঞ্চমীপূজার সমস্ত আয়োজন, যথা—শর, কলম, যবের শীষ, আম্রমুকুল, আবীর, অভ্র প্রভৃতি। এই দিবস মহাত্মা রামচন্দ্রের সমাধি যোগোদ্যানে দেওয়া হইয়াছিল। বিশেষ দিন।

১২। ২২শে ফাল্গুন, ৫ই মার্চ্চ রবিবার—শ্রীশ্রীঠাকুরের ৮২ বাৎসরিক জন্মতিথি। ঐ দিন প্রাতে ৮।৩৮।২১ সেকেণ্ডে শুক্লা দ্বিতীয়া পড়িবে—সেবকগণ সমস্ত দিবস উপবাসী থাকিয়া সন্ধ্যার পর ঠাকুরের জন্মতিথি পূজা করিবেন, ঠাকুরের নববস্ত্র, ব্রাহ্মমুহুর্ত্তে মঙ্গল আরতি। ৮২ রামকৃষ্ণাব্দ আরম্ভ। তৎপর দিবস ২৩শে ফাল্গুন সোমবার ঠাকুরের রাজভোগ।

১৩। ৬ই চৈত্র, ১৯শে মার্চ্চ, রবিবার—দোলোৎসব। পূর্ব্বদিন শনিবার চাঁচরের দিন উপবাস, ঠাকুরের নববস্ত্র, আতর, গোলাপ, পুষ্প প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য দেওয়া হয়; রাত্র ৮টার সময় বিশেষ পূজা ও আরতি, সরবৎ, ফল, মালপো ও মিষ্টান্নাদি ভোগ হয়। পূজার সময় শ্রীঅঙ্গে আবীর দেওয়া হয়। অতঃপর সেবকমণ্ডলী ঠাকুরের চরণামৃত ও প্রসাদ ধারণ করেন। ব্রাহ্মমুহুর্ত্তে মঙ্গল আরতি, দেবদোল, আরতির পর শ্রীচরণে আবির দেওয়া হয়। পরে প্রাতে বিশেষ পূজা, খেচরান্ন ভোগ, অপরাহ্নে দোলোৎসব, সঙ্কীর্ত্তন, সেবকমণ্ডলীর ঠাকুরকে লইয়া হোলী খেলা, আবীর কুঙ্কুম, গোলাপজল দেওয়া হয়। ফুটকলাই, মুড়কী, মঠ ও মালপো ভোগ। চৈত্রসংক্রান্তির দিন রাত্রে গুড়-ছাতু ভোগ।

মঙ্গল আরতি—কার্ত্তিক ও মাঘ মাসদ্বয়, পৌষের সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ। রাজভোগের পূর্ব্বে তিথিপূজার রাত্রে, দোলোৎসবে দেবদোলের সময় মহোৎসবের ৮ দিন প্রতিপদ হইতে জন্মাষ্টমী। মঙ্গল আরতির পর ঠাকুরকে মাখন, মিছরী ছানা, চিনি কিম্বা মোহনভোগ, ভোগ দেওয়া হয়।

নববস্ত্র—ঠাকুরের; মহোৎসবে ২ খানি, রাজভোগে ১ খানি ও দোলে ১ খানি। মহাত্মা রামচন্দ্রের ঠাকুরের উৎসবে ১ খানি ও স্বীয় জন্মতিথিতে ১ খানি।

ইতি—বারোমাসে তের পার্ব্বণ সমাপ্ত। যোগবিলাস।

নব বর্ষের সম্ভাষণ।

এ পরিবর্ত্তনশীল নূতনত্বপূর্ণ সংসারে যেমন সকল বিষয়ের পরিবর্ত্তন হইতেছে এবং সকল বস্তু যেমন নব কলেবর ধারণ করিতেছে, দিন-মাস-বৎসরাদিও তেমনি নব নব রূপ ধারণ করিয়া মানবের নিকট সমুপস্থিত হইতেছে। এই নূতনত্ব কিন্তু মনে। মনে বলি কেন—না ইংরাজের নূতন দিন যেমন জানুয়ারী মাসের ১লায় পড়িয়া তাহাকে সমস্ত বৎসরের ভাবি-চিত্রে আশান্বিত এবং মুগ্ধ করে, হিন্দুর তেমনি বৈশাখ মাসের ১লাটী বড়ই আনন্দের দিন। সেদিন সে পূর্ণ একটী বৎসরের সমস্ত ছবিখানি যেন সম্মুখে দেখিতে পায়—তার প্রাণে নব বলের সঞ্চার হয়। সে অতীতের ক্রটী এবং ভবিষ্যতের সংশোধন কল্পনায় প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করে। মহামহিমাময় ভগবানের অশেষ করুণা এবং অপার্থিব প্রেমকে জীবনের একমাত্র সম্বল জানিয়া সে সেই দুইটীর প্রার্থনা করে। আহা! তখন সে জানেনা যে অসাধুসঙ্গ, অসৎচিন্তা, পরনিন্দা, পরচর্চ্চায় আবার তার নূতন মনখানি পুরাতন হইয়া যাইবে; আবার কামিনী কাঞ্চনের বোঝা লইয়া তাহাকে সংসারের কণ্টকময় পথে চলিতে হইবে। মানব করিবে কি? সে যে স্বভাবতঃই বিস্মরণশীল! সে এক্ষণে যাহা করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, পরক্ষণে তাহা মনে থাকেনা—সে কাল যাহা করিবে স্থির করিয়াছে, কাল কাল বলিয়া কত কাল গত হইয়া যায়—সে এই মাসে যে সদানুষ্ঠান আচরণ করিবে ভাবিয়াছে, হায়রে! কত মাস গত হয়, কিন্তু অনুষ্ঠান আর তার ভাগ্যে ঘটেনা! এমন বিস্মরণশীল মানবের উপায় কি? উপায় এই যে কেহ যদি স্মরণ করাইয়া দিবার বন্ধু থাকে, তবেই এ ভোলা মনের কথঞ্চিৎ সাহায্য হয়।

এখন বুঝিলাম। এই ভোলা মনকে প্রতি মাসে একবার করিয়া জাগাইয়া দিবার জন্য বুঝি পরমপূজ্যপাদ প্রেমিক সেবক রামচন্দ্র তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা তত্ত্বমঞ্জরীকে আমাদের বন্ধুরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন। তত্ত্বমঞ্জরী অনূঢ়া ছিলেন, কিন্তু এখন বিবাহ করিয়াছেন। ভগবানে অটল বিশ্বাসই তাঁহার স্বামী, জ্ঞান ভক্তি তাঁহার পুত্রকন্যা। তত্ত্বমঞ্জরী বহু বৎসর যাবৎ পিতাকে হারাইয়াও হারাণ নাই। পিতার মৃন্ময় মূর্ত্তি ভুলিয়া গিয়া এখন চিন্ময় মূর্ত্তি দর্শন করেন এবং পিত্রাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রচার-কার্য্যে চিরনিযুক্তা রহিয়াছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তত্ত্বমঞ্জরীর পিতামহ। পিতামহের নিকট পৌত্রীর স্তব একেবারেই

থাকেনা—সে পিতামহের কান্ধে পিঠে উঠিয়া আবদার করে। তাই তত্ত্বমঞ্জরী আজ এই নব বর্ষের দিন পিতৃপ্রদত্ত প্রচার কার্য্যে নিবিষ্টা থাকিয়াও ঠাকুরের কান্ধে উঠিয়া এই অধম পতিত মানবকুলের জন্য ভগবানকে আকুল করিতেছেন। তত্ত্বমঞ্জরী আজ ঊনবিংশ বর্ষ বয়স্কা। কিন্তু সে ছেলেমি—সে আবদার তাঁর যায় নাই—যাবারও নয়।

কি বলিয়া তত্ত্বমঞ্জরীকে আজ অভিবাদন করিব। প্রেমময়ী ভগিনী বলিয়া সম্ভাষণ করি। ভগিনী! এই আঠারো বৎসর ধরিয়া অনন্য মনে যে ব্রতগ্রহণ করিয়াছ, তাহাতে মানবের কল্যাণ সাধিত হইয়াছে ও হইবে। ভগিনী, সাধুগণ আপন গুণে এ ভবসাগর পার হইয়া যাইবেন; কিন্তু পতিত কাঙ্গাল-গণের জন্য কি উপায় বিধান করিয়াছ? মাসে মাসে নব নব রঙ্গে নব নব অঙ্গে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নব নব লীলা—প্রসঙ্গে—মত্ত থাকিয়া সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমিতে থাক। কখনো অপথে চলিয়া গেলে পথে টানিয়া লইয়া এস। কখনো সন্দেহ রাক্ষসার হস্তে পড়িলে তোমার অমিত বীর্য্যের সহায়ে—আমাদিগকে উদ্ধার কর। ভগিনী যাহারা তোমার চেয়ে বয়সে বড়, তারা কিন্তু প্রেম ধনে বড় নয়। দেবী! পিতা পিতামহের—গুরু ইষ্টের—চিরসঙ্গ লাভ করিয়া তুমি দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ। দেবী! প্রভুর নামে পৃথিবীময় কত অনুষ্ঠান রহিয়াছে। তুমি সে সকলের উপর শুভদৃষ্টি রাখিয়া সে সকলের জন্য শুভাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা কর। মানবপ্রাণে যাহাতে দ্বেষানল বা ক্রোধানল জ্বলিতে না পারে, সেজন্য তুমি তোমার বাক্য সুধা বর্ষণ কর। প্রভুর সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের ধ্বজা লইয়া মানবকে মানবের সঙ্গে মিলাইয়া দাও—প্রাণের অশান্তি অস্বাস্থি দূর কর। দেবী! যদি সেই হিন্দুযবন—ব্রাহ্মণ চণ্ডাল—সাকার নিরাকার বাদীর সর্ব্বস্ব ধন রামকৃষ্ণের চরণপ্রান্তে বসিয়া কেহ ভেদমন্ত্রে দীক্ষিত হয়—কেহ বিবাদ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হয় কিম্বা মনোমালিন্যে জর্জ্জরিত হয়, তবে তাহা-দিগকে প্রভুর ধ্বজা দেখাইয়া, প্রভুর কথা শুনাইয়া, প্রভুর মঙ্গলময় নাম করিয়া মিলনের পথে লইয়া আইস। ভগিনী, মানবকে বলিয়া দাও যে রামকৃষ্ণের মন্দির মিলন-মন্দির। সেখানে অমেলের ভাব থাকিতে দেওয়া কোনো মতেই উচিত নয়। তবে সে মন্দিরের অপমান হয়।

দেবী! আর কি বলিব? সত্যপথে, নিত্যপথে, ধর্ম্মপথে যাহাতে আমরা বিচরণ করিতে পারি—যাহাতে ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমময় সুধামাখা নামে আপনা মাতিয়া ভাই বন্ধুকে মাতাইতে পারি—যাহাতে পতিব্রতা, সরলতা, সত্যবাদিতা হৃদয়কে অধিকার করিতে পারে—যাহাতে শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া প্রাণকে সার্থক করিতে পারি, যাহাতে "জয় গুরু জয় রামকৃষ্ণ" বলে প্রাণ সদাই নাচিতে পারে—প্রভুর নিকট আমাদের জন্য এইটুকু প্রার্থনা কর। নববর্ষে নববলে বলীয়ান হইয়া যেন গুরুইষ্ট এবং তোমারও সেবা করিতে পারি। ইতি শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীচরণ ভরসা।

জয় গুরুদেব !!

তত্ত্ব-মঞ্জরী
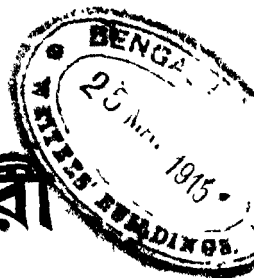
উনবিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা।
জ্যৈষ্ঠ, সন ১৩২২ সাল।

প্রার্থনা।

হে কাঙ্গালের ঠাকুর পতিতপাবন প্রাণেশ্বর! আজ বড় আশা, বড় সাধ লইয়া তোমার দীন সন্তান তোমার দুয়ারে করযোড়ে তোমার মুখ চাহিয়া কাতর ভাবে দণ্ডায়মান! তুমি না প্রভু কল্পতরু? তোমার প্রাণাধিক প্রিয়তম সন্তান মহাত্মা রামচন্দ্রের কৃপায় তোমায় কল্পতরু বলিয়া জানিয়াছি, বুঝিয়াছি প্রভু, তুমি ভক্তের জন্য সদাই আকুল, ভক্তের জন্য তুমি সব করিতে পার, ভক্তের জন্য তোমার সনাতন নিয়ম খণ্ডন করিতেও কুণ্ঠিত নও, নচেৎ প্রভু, আমার ন্যায় অকৃতি অধম সন্তান কোন গুণে তোমার অভয় ক্রোড়ে স্থান পাইয়াছে? নাথ! এ জীবনে ত তোমায় কখন প্রাণ ভরিয়া চাহি নাই, মোহ মদিরা পানে উন্মত্ত হইয়া অনুদিন অসার বাসনা চরিতার্থের জন্যই তোমার দ্বারস্থ হই, তুমিই ত প্রভু নিজগুণে সন্তানের সকল কালিমা নিজ অঙ্গে আদরে লেপন করিয়া তাহাকে ধুইয়া মুছিয়া নিজ অঙ্কে টানিয়া লও, তোমার অভয় করপদ্ম তাহার জ্বালাপূর্ণ হৃদয়ে স্থাপন করিয়া সকল জ্বালার নিবৃত্তি কর। প্রভু! প্রাণ ভরিয়া কালকূট পান করিয়া তোমার নিকট হইতে ছুটিয়া পলাইতে চাই,

তুমিইত ঠাকুর, ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া, গলা ফাটাইয়া ডাকিতে ডাকিতে আগে যাইয়া পথ আগুলিয়া ধর। এ ত প্রভু প্রতিক্ষণেই প্রাণে প্রাণে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছি, তুমিই ত নাথ তোমার অধম সন্তানের হৃদয়াসনে জোর করিয়া চিরদিনের জন্য বসিয়াছ। আমি তোমায় প্রাণপণে ভুলিতে চেষ্টা করিতেছি, তুমিইত প্রভু ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার আমার সম্মুখে অভয়ামূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান আছ। কি মোহন হাসিই হাসিতেছ নাথ! এস প্রভু, এস তোমায় পলকশূন্য নেত্রে নয়ন ভরিয়া দেখি! তুমি না প্রেমময়, তোমার বড় আদরের বড় আব্দারে প্রাণারাধ্য রামচন্দ্রকে ছলনা করিয়া ধ্যান করিতে বলিয়াছিলে? তিনি ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও তোমার বাক্য পালন করিতে পারেন নাই, পঞ্চবটীতে বৃথা প্রয়াস পাইয়া পুনরায় তোমার শ্রীচরণ-সরোজ-প্রান্তে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "প্রভু, আপনাকে দেখিতেই আমার সাধ, আমার অন্য কোন ধ্যান ধারণার আবশ্যক নাই, আপনার শ্রীচরণযুগলই আমার একমাত্র সম্পদ, অন্য কোনও ঐশ্বর্য্যে প্রয়োজন নাই, কোনও সাধ নাই, আপনার রূপসাগরে ডুবাইয়া রাখুন, জীবনে মরণে আপনার শ্রীচরণ সেবার অধিকারী করুন।" তাই না তিনি বলিতেন, যখন সাক্ষাৎ ভগবানকে সম্মুখে পাইয়াছি, তাঁহাকে দর্শন স্পর্শন করিয়াছি, আবার অন্য সাধন ভজন কেন? পুণ্যের ত আর আবশ্যক নাই এমন কি যে মেথর তাঁহাকে দর্শন করিয়াছে, তাহার পদধূলায় জীবের লক্ষ লক্ষ জন্ম উদ্ধার হইয়া যাইবে। পরশমণি স্পর্শে ত লৌহময় দেহ কাঞ্চন হইয়াছে, আর কোন বস্তুরই প্রয়োজন নাই। বীর বিশ্বাসী ভক্তরাজ গিরিশচন্দ্র তাঁহার রামদাদার কথা শুনিয়া বলিয়াছেন, "যাঁহাকে পলকশূন্য দৃষ্টিতে দেখিয়াও সাধ মিটে না, তাঁহাকে ছাড়িয়া চক্ষু বুজিয়া আবার কাহার ধ্যান করিব? তাই না রাধারাণীর উক্তি, এস এস বঁধু এস, আধ আঁচরে ব'স, নয়ন ভরিয়া তোমায় হেরি" "জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু, নয়ন না তিরপিত ভেল, লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু, তবু হিয়া জুড়ান ন গেল" কৈ আশাত মিটেনা, প্রাণে প্রাণে বাঁধা থাকিয়াও ত আশা মিটেনা, ইহাতে ত অবসাদ নাই; অনন্ত, অনন্ত আশা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া প্রেমময়ের অনন্ত প্রেমসাগরে নিমজ্জিত করে। এস প্রেমময়, এস আমার অনন্ত সুন্দর! এস হৃদয়াসনে বস, নয়ন ভরিয়া তোমায় হেরি, তোমার রূপ-সুধা পান করিয়া, রূপসাগরে ঝাঁপ দিয়া অনন্তে মিশিয়া যাই।

"বঁধু কি আর বলিব আমি, জনমে জনমে জীবনে মরণে প্রাণনাথ হৈও তুমি।"
এস প্রাণেশ্বর, চিরমঙ্গলময় এস, এস অনাথশরণ, প্রিয়দরশন, এস নিজগুণে হৃদাসনে চির-অধিষ্ঠিত হও, ইহাই তোমার কাঙ্গাল সন্তানের প্রার্থনা—

"(মোরে) কাঙ্গাল বলিয়া করিও না হেলা,
আমি পথের ভিখারী নহি গো।
শুধু তোমারি দুয়ারে অন্ধের মত, অঞ্চল পাতি রহি গো ॥
শুধু তোমাধন করি আশ, মোরে (তুমি) পরায়েছ দীনবাস,
শুধু তোমারি লাগিয়া করিয়া আশ,
মর্ম্মের কথা কহি গো ॥
মম সঞ্চিত পাপ-পুণ্য, আমি সকলি করেছি শূন্য,
তুমি পূর্ণ করিয়া ভরি দিবে তাই রিক্ত হৃদয় বহি গো ॥"

কাঙ্গাল।

বেদান্তে পাপবাদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৩২১ সালের ২০০ পৃষ্ঠার পর)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা 'পাপবাদ' সম্বন্ধে বেদান্তী বা জ্ঞানীর অভিমত ও শিক্ষা, শাস্ত্রীয় ও লৌকিক যুক্তিতে আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে দেখা যাউক, পৌরাণিক বা ভক্তের দৃষ্টিতে উহা কিরূপাকার ধারণ করে? পরিশেষে খ্রীষ্টীয় মতের যথাসাধ্য বিচার করিয়া, পাপের 'অনস্তিত্ব' প্রদর্শন করতঃ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ভক্তি শাস্ত্রানুশীলন করিয়া যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে মানুষকে 'পাপী' বলিবার ভক্তের কোন কারণই নাই; বরং মনুষ্য যে অপাপবিদ্ধ, ভক্তিশাস্ত্র তাহাই প্রমাণিত করে। প্রথমতঃ শাস্ত্র-সহায়ে উহার পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইব; পরে লোক ন্যায়েরও অনুসরণ করা যাইবে। ইতঃপূর্ব্বেই আমরা পাঠককে বলিয়া রাখিয়াছি—কি জ্ঞানী, কি ভক্ত, কি যোগী, সকলেই স্বভাবতঃ আত্মবাদী। সুতরাং ভক্ত যদি আত্মবাদী হন, তবে বেদের অনুশাসনে আত্মার নিষ্পাপত্ব ও নিত্যশুদ্ধত্ব স্বীকার করিয়া, মনুষ্যকে 'অমৃতের সন্তান' বলিয়া সম্বোধন তাঁহাকে করিতেই হইবে। আর যদি তিনি

আত্মবাদ অস্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহার ভগবদ্ ভক্তির কোন মূল্য নাই; তাঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠানের কোন ভিত্তি নাই; তাঁহার শাস্ত্রেরও কোথাও দাঁড়াইবার স্থল নাই; হিন্দুর চক্ষে তিনি নাস্তিক বলিয়া গণ্য। জগৎ পূজ্য আচার্য্যপাদ শ্রীবিবেকানন্দ বলিয়াছেন—"He who does not believe in himself is an Atheist." অধিক কি তিনি হিন্দুই নহেন। পৌরাণিক এই স্থলে আপত্তি করিতে পারেন—"আমি আত্মবাদী হইলেও, শ্রীভগবানই যে মানবের আত্মা অথবা জীবাত্মা ও পরমাত্মায় যে কোনরূপ পার্থক্য নাই, একথা বেদবেদান্তে উক্ত হইয়া থাকিলেও পুরাণ শাস্ত্রের নির্দেশ ব্যতীত, তোমার অদ্বৈতবাদ সম্মত 'পাপবাদ' ব্যাখ্যার আমি অনুমোদন করিতে পারি না।" তদুত্তরে আমরা বলি,—পুরাণ শাস্ত্র ভূয়োভূয়ঃ ঐরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। বিশেষতঃ ভক্তিতত্ত্বের চরমমীমাংসক, ভক্তের পরমধন, পুরাণ নিবহের মুকুটমণি শ্রীমদ্‌ভাগবত কি বলিতেছেন, একবার শ্রবণ করুন;—

"মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্ বহুমানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি॥" ৩।৯।২৯।

"এই সকল ভূতকে বহুমান সহকারে মনের সহিত প্রণাম করিবে; ভগবান ঈশ্বরই অংশের দ্বারা জীবরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন।" ভাগবতকার কি এই শ্লোকটীতে জীবের ব্রহ্মত্ব নির্দ্দেশ করিতেছেন না? অতএব জীবকে 'পাপী' বলিবার ভক্তের স্থান কোথায়? আরও ভগবান যে সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতস্থ, জীবসমূহের হৃদয়স্থিত অন্তর্য্যামী, মানবাত্মার অন্তরাত্মা, এ কথা তাঁহার অস্বীকার করিবার উপায় নাই। "সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ" "সর্ব্বভূতময়ো হরিঃ" ইত্যাদি মহাবাক্য কোন ভক্তের মানস-তন্ত্রীতে আঘাত না করে? কোন্ মানবপ্রাণ পবিত্রতার সুধাহ্রদে ডুবিয়া না যায়? কোন্ প্রেমিকের প্রেম-মন্দাকিনী সহস্রধারায় উছলিয়া না পড়ে? যদি তাহাই হয়, তবে নিত্যশুদ্ধ শ্রীভগবান যখন মানবের হৃদয়াকাশে বিরাজমান রহিয়াছেন, তখন মানুষ পাপী কিসে? ঈশ্বর-সন্নিধানেও কি কাহার কোন পাপ থাকিতে পারে? ঐরূপ বলা কি মূঢ়তার পরিচায়ক নহে? শুধু মূঢ়তা কেন, যদি 'পাপ' বলিয়া কিছু থাকে, তবে উহাই পাপ! উহাতে কি ভগবন্মহিমা খর্ব্ব করা হয় না? তাঁহার ভুবন পাবনত্বের অপলাপ হয় না? সহস্র-রশ্মি সহস্র কিরণ ধারায় জগদুদ্ভাসিত করিয়া

গগনপথে সমুদিত রহিয়াছেন, অথচ পৃথিবী ঘোরান্ধকারময়ী; প্রোজ্জ্বল-দীপ-শিখা প্রভা-বিস্তারে ব্যাপৃত, অথচ পুঞ্জীভূত তিমির-রাশি গৃহাভ্যন্তরে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে, একথা বাতুল ভিন্ন আর কে বলিতে সক্ষম? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উত্তম ও মধ্যমাধিকারী ভক্ত কদাপি মানুষকে 'পাপী' নামে আখ্যাত করিতে সম্মত নহেন; ঐরূপ করাই বরং তাঁহাদের চক্ষে প্রকাণ্ড পাপ ও ভীষণাপরাধ!

আর যাঁহারা শ্রীভগবানের উচ্চতর ভাব বা আদর্শের কোনরূপ তোয়াক্কা না রাখিয়া, তাঁহার নাম গুণ গানকেই ভব-পারাবারের একমাত্র তরণী বলিয়া ভাবিয়া লইয়াছেন, উহাকেই জীবন-সমুদ্রের ধ্রুবতারা করিয়াছেন, মুক্তি পথের অদ্বিতীয় সম্বলরূপে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন; যাঁহারা পরমাত্মাকে স্থানবিশেষে আবদ্ধ মহান ব্যক্তিমাত্র মনে করেন, নিম্নস্তরের দ্বৈতভাবনাই যাঁহাদের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য, সেই অধমভক্তেরাও মানুষকে 'পাপী' বলিতে পারেন না। কেননা, তাঁহারা বলিয়া থাকেন—"ভগবন্নামকীর্ত্তনাদেব সর্ব্বপাপং প্রণশ্যতি" অর্থাৎ ভগবানের নামোচ্চারণ করিবার মাত্র জীবের সকল পাপ প্রণষ্ট হয়। এখন যদি মুহূর্ত্তের জন্যও আমরা জগদীশ্বরের নাম গান করিয়া থাকি, যদি একবারও দুর্গা, শিব, হরি, রাম কি কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিয়া থাকি, তাহা হইলে আমরা 'পাপী' কি করিয়া? যাহারা শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন করে, অথচ বলিয়া থাকে—আমরা পাপী, তাহারা ঘোরতর মিথ্যাবাদী; নাম-মাহাত্ম্যে তাহাদের বিশ্বাস নাই; তাহারা জুয়াচোর ও আত্মবঞ্চক; 'ভাবের ঘরে চুরি করা'ই তাহাদের ব্যবসায়! কথিত আছে, মহর্ষি বশিষ্ঠের পুত্র, অপরাধ বিশেষের ক্ষালনার্থ কোন ব্যক্তিকে তিনবার রামনাম করিতে বলায়, মহর্ষি তাঁহার প্রতি অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"একবার 'রাম' নাম করিলেই সর্ব্বপাপ হইতে পরিনির্মুক্ত হওয়া যায়; তাহাতে যখন তিনবার নামোচ্চারণের ব্যবস্থা করিয়া, শ্রীভগবানের অনন্ত মাহাত্ম্যের হ্রাস করিয়াছ, তখন তুমি চণ্ডাল যোনিতে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হও।" বৈষ্ণব শাস্ত্রও বলেন;—

"একবার হরিনামে যত পাপ হরে।
জীব হ'য়ে তত পাপ করিতে না পারে॥"

এই সকল শাস্ত্রবাক্যে নামবাদীরা কি বিশ্বাস করেন? যদি করেন, তবে মনুষ্যকে 'পাপী' বলিবার আর তাঁহাদের অধিকার নাই। এই ত গেল ভক্তের দিক হইতে শাস্ত্রীয় বিচার। এক্ষণে একবার লৌকিক দৃষ্টান্তে উহা বুঝিতে চেষ্টা করি।

সংসারে দেখা যায়, প্রায় যাবতীয় দুষ্কৃতিই হীনকুলোদ্ভব এবং হীনাভিমানী ব্যক্তিদিগের দ্বারাই বিহিত হইয়া থাকে; সদ্‌বংশজাত, উচ্চাভিমানী জনসমূহ কর্তৃক কখনও ঘৃণিতকার্য্যের অনুষ্ঠান সম্ভবপর নহে। যাহারা পবিত্র বংশ-সমুদ্ভুত বলিয়া একটা যথার্থ মহত্বপূর্ণ গর্ব্বানুভব করিয়া থাকে, তজ্জনিত আত্মমর্য্যাদার ভাস্বর-ছবি যাহাদের মানসপটে চিরাঙ্কিত থাকিয়া যায়, যাহারা প্রাতঃস্মরণীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের নামে গৌরব প্রকাশের অবসর পায়, যাহাদের প্রতি পদবিক্ষেপে 'আমি অমুক মহাত্মার সন্তান' 'অমুক বিশুদ্ধ বংশে আমার জন্ম' ইত্যাকার সদভিমানের ভাব ফুটিয়া উঠে, তাহাদের কদাপি নীচজনোচিত অসৎকার্য্যে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কেননা, তাহাদের মনে অসৎ বা হীনভাব স্থানই পায়না। কিন্তু যাহারা নীচকুলে উদ্ভূত হইয়াছে, নীচত্ব ভাবনাই যাহাদের সমগ্র জীবনকে অধিকার করিয়াছে, যাহাদের পূর্ব্বপুরুষগত কোন গৌরব-গাথা বিদ্যমান নাই, যাহারা পৃথিবীতে জন্মিয়া অবধি ভাবিয়া লইয়াছে যে তাহারা নীচের সন্তান নীচ; একমাত্র নীচকর্ম্মই তাহাদের অবলম্বন; তাহাদের মতি অসৎকর্ম্মের দিকেই ধাবিত হয়—তাহাদের চিত্ত হীনাদর্শে হীনভাবেই পরিপূর্ণ থাকে। আমার এই কথায় কেহ যেন ভাবিয়া না বসেন যে, যিনি উচ্চবংশীয়, তিনিই সুকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা। আমার বক্তব্য এই যে, শুধু উচ্চবংশীয় হইলেই চলিবে না; 'আমি মহান' এই বিপুল আত্মগরিমা হৃদয়ে প্রতিনিয়ত জাগরূক থাকা চাই। নতুবা দুর্ভাগ্যবশতঃ যে ঐরূপ আত্মজ্ঞানটুকু হারাইয়া ফেলিয়াছে, সে সদ্‌বংশজ হইলেও ভ্রমে পড়িয়া কুকার্য্য করিতে পারে। চাই সদ্‌বংশ ও সদ্‌বংশে জন্মলাভজনিত আত্মসম্মান জ্ঞানের সম্মিলন। তাহা হইলেই কাহারও হীনবুদ্ধির স্ফুরণ হইবে না। ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিক জগতেও সেই কথা।

যিনি জানেন—আমি শ্রীভগবানের ভক্ত, অংশ, দাস, সন্তান বা সখা এবং তন্নিমিত্ত একটা স্বর্গীয় গৌরব প্রতিক্ষণ অনুভব করেন, তিনি কি স্বপ্নেও নিজেকে 'পাপী' ভাবিতে পারেন? না কোনরূপ পাপাভিনয় তাঁহাকে দ্বারা অভিনীত

হইতে পারে? কখনই না। ভগবান যখন অপাপবিদ্ধ পুরুষ, তখন তাঁহার ভক্তও যে তাহাই, সে বিষয়ে আর সংশয় কি? যে কেহ নিত্যশুদ্ধ ঈশ্বরের সহিত সংশ্লিষ্ট, যাঁহারা তাঁহার ভক্ত, তাঁহারাই পবিত্র। জীবমাত্রেই সেই পরম পিতার সন্তান; সুতরাং সকলেই নিষ্পাপ, আজন্ম পবিত্র ও অনন্তশক্তির আধার। যদি কেহ ভগবদ্‌ভক্ত হইয়াও বলেন—আমি পাপী ও দুর্ব্বল, তাহা হইলে নিশ্চিত জানিও—তিনি হয় মিথ্যাবাদী, নয় ভগবানের প্রকৃত ভক্ত, দাস বা তনয় নহেন। অনেকে ইহাতে বলিতে পারেন, মানুষ যদি নিষ্পাপ ও জন্ম শুদ্ধ, তবে তাহাকে অসৎ কর্ম্ম করিতে দেখা যায় কেন? ইহার উত্তর আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। তথাপি পুনরায় বলিতেছি, ইহার কারণ একমাত্র আত্ম-বিস্মৃতি। যখনই আমরা ভুলিয়া যাই যে, আমরা অমৃতের সন্তান, আমরা শ্রীভগবানের দাস, আমরা নিত্যশুদ্ধ অমরাত্মা, তখনই আমাদের পতনারম্ভ হয়, অসৎ প্রবৃত্তি জাগ্রত হইয়া উঠে। অতএব আমাদের কর্ত্তব্য, বৃথা ক্রন্দনে শক্তিক্ষয় না করিয়া, স্বরূপ-চিন্তায় তন্ময় হইয়া যাওয়া এবং আমাদের বালক বালিকাগণকে তাহাদের জীবনের প্রথমোন্মেষেই স্মরণ করাইয়া দেওয়া যে, তাহারা শুদ্ধাত্মা। কদাপি তাহাদিগের মস্তিষ্কে নানাবিধ কুসংস্কার প্রবেশ করাইয়া দিয়া, তাহাদিগকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিও না; তাহাদের জন্মগত স্বত্ব কাড়িয়া লইও না; অমৃতফলপ্রসূ তাহাদের জীবন-তরু পল্লবিত হইতে না হইতে তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিও না; ঐরূপ করিবার কাহারও অধিকার নাই। সুতরাং অনবরত তাহাদিগকে শোনাইতে থাক—"তোমরা আনন্দের তনয়; তোমরা জড় নহ, চৈতন্যস্বরূপ; তোমরা অনন্তশক্তির আধার, নিত্য পবিত্র, অপাপ বিদ্ধ চিদাত্মা; তত্ত্বমসি।" 'মানব, প্রকৃতির দাস; তাহার জীবন সম্পূর্ণ-রূপে বাহ্য বস্তুর উপর নির্ভর করে' ইত্যাদি ভয়ানক কুশিক্ষায় যেন তাহাদের জীবন-গঠনের চেষ্টা করা না হয়; কোনরূপ দুর্ব্বলতা যেন তাহাদের হৃদয়াধিকার না করে। সন্তান-সন্ততি সমূহের অভ্যন্তরস্থ ব্রহ্মশক্তির উদ্বোধন করাই মাতা পিতার একমাত্র করণীয় কার্য্য।

নব্যভারতের মন্ত্রগুরু স্বামীবিবেকানন্দ বড় দুঃখেই বলিয়াছিলেন—"যদি আমার একটী পুত্র থাকিত, তাহা হইলে সে ভূমিষ্ঠ হইবার মাত্র তাহাকে বলিতাম, 'ত্বমসি নিরঞ্জনঃ'।" প্রশ্ন উঠিতে পারে—মনুষ্যমাত্রেই কি অমৃতত্বের যোগ্য?

লৈকলেই কি মহাপুরুষ হইতে পারে? উত্তরে আমরা বলি—হাঁ পারে; অমৃতত্ব জীবমাত্রেরই লভ্য। 'মহাপুরুষ' বলিয়া কোন চিহ্নিত পৃথক সম্প্রদায় পৃথিবীতে নাই। প্রত্যেক মানুষের ভিতরই মহাপুরুষত্ব অব্যক্তভাবে অর্থাৎ বীজাকারে রহিয়াছে। যে উহাকে ব্যক্তাবস্থায় আনিতে পারে, বিকশিত করিয়া তুলিতে পারে, বৃক্ষরূপে পরিণত করিতে পারে, তাহাকেই জগৎ 'মহাপুরুষ' আখ্যায় আখ্যাত করে। বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, যীশু, মোহম্মদ প্রভৃতির ভিতর যে মহাপুরুষত্ব বিদ্যমান ছিল, তোমার আমারও ভিতর—সকল মনুষ্যের ভিতর সেই মহাপুরুষত্বই নিহিত রহিয়াছে। তাঁহারা উহাকে জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন, আমরা তাহা করি নাই, এই মাত্র প্রভেদ! কিন্তু এক্ষণে আমাদিগকে উহা জাগাইতেই হইবে—উহার উদ্বোধন করিতেই হইবে। যেহেতু মহত্বই আমাদের প্রকৃত স্বভাব; উহাই আমাদের জন্মগত অধিকার (Birth right)। শূন্য হইতে কখন মহাপুরুষত্বের উদ্ভব হইতে পারে না। উহা মানবের ভিতরই রহিয়াছে; কেবলমাত্র উহাকে প্রকাশিত করিতে হইবে। ইহা যদি সত্য না হয়, তবে কেহই কখন মহাপুরুষ হইতে পারেনা পারিবেওনা; পৃথিবী হইতে 'মহাপুরুষ' কথাটা একেবারে উঠাইয়া দিতে হয়। বীজমধ্যে যদি বৃক্ষত্ব অস্ফুটভাবে না থাকে, তবে বীজ হইতে কদাচ বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে না। তিলে তৈল অব্যক্তাবস্থায় থাকে বলিয়াই, তিল হইতে তৈল নির্গত হয়; নতুবা বালুকা-পেষণে বিন্দুমাত্র তৈল-নির্গম অসম্ভব। অতএব বৃথা সন্দেহান্দোলনে আন্দোলিত না হইয়া, অযথা প্রশ্নোত্থাপন না করিয়া, মানবকে তাহার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ-সাধনে শিক্ষিত কর, তাহাতে অনুপ্রাণিত কর।

বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বত্র এই অনুপম বৈদিক শিক্ষা অতিমাত্রায় আবশ্যক হইয়াছে; বিশেষতঃ ভারতবর্ষে। বহু শতাব্দী যাবৎ ভারতভূমি এই জীবনসঞ্চারিণী মহতী শিক্ষায় বঞ্চিতা হইয়াছে; সুদীর্ঘ সহস্র বৎসরকাল ধরিয়া, দ্বৈতবাদ-সম্ভূতা দুর্ব্বলতাবিধায়িনী বহুবিধ কুশিক্ষায় তাহার প্রাণস্পন্দন স্থগিত হইয়া গিয়াছে, তাহার আধ্যাত্মিকতা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে; সে আত্মশক্তি, আত্মগৌরব, আত্মমহিমায় অবিশ্বাসী হইয়া, জড়ের দাসত্বে সর্ব্বস্ব নিয়োগ করিয়াছে। সম্প্রতি আর একবার উহাকে উহার জীমূতনিনাদি, বলবীর্য্যপ্রসবি, প্রাচীন বেদমন্ত্র শুনাইতে হইবে; নচেৎ আসন্ন মৃত্যু হইতে উহাকে বাঁচাইবার কোন উপায়

নাই। যাহা হউক, বুঝিলাম, ভক্তেরও মানুষকে 'পাপী' বলিবার যুক্তিযুক্ত ও শাস্ত্রসম্মত কোন কারণ নাই। এইবার খ্রীষ্টীয় মতের একটু আলোচনা করা যাউক।

খ্রীষ্টধর্ম্ম যাজকেরা যে মানুষকে আজন্মপাপী, স্বভাব দুর্ব্বল ও চির-অপবিত্র বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তাহা তাঁহাদের ভ্রম বা কুসংস্কারমাত্র, সন্দেহ নাই। তাঁহারা ইহা বুঝেন না যে, যদি মানুষ স্বভাবতঃ পাপী বা অপবিত্র হয়, তাহা হইলে সে কখনও পবিত্র বা মুক্ত হইতে পারিবে না। কারণ ইহা ধ্রুব সত্য যে, কোন বস্তু স্বীয় প্রকৃতি পরিত্যাগ করিতে পারে না; কেহই স্বরূপকে অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে; আপনাকে ডিঙ্গাইয়া যাইতে সকলেই অপারক। মনুষ্য যদি স্বরূপতঃ অপবিত্র হয়, তবে তাহার মুক্তিলাভের আশা কোথায়? জন্মপাপী—আর ধর্ম্মানুষ্ঠান, দশাজ্ঞাপালন, গির্জ্জায় যাইয়া উপাসনা, প্রার্থনা প্রভৃতি করিয়া কি করিবে? অতএব খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকদের মানবকে স্বভাব পাপী না বলিয়া বরং ইহাই বলা উচিত যে, মনুষ্য নিত্য মুক্ত ও স্বভাব শুদ্ধ; কোন এক অজ্ঞাতকারণে তাহাতে মলিনতা আসিয়া পড়িয়াছে। এই মালিন্য টুকু মুছিয়া ফেলিতে পারিলেই, পুনরায় সে স্বরূপাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আপন মহিমায় আপনি দীপ্তি পাইবে। মহাত্মা যীশুরও ইহাই শিক্ষা। তিনি মানবের অমৃতত্বই প্রচার করিয়াছিলেন; তাহাকে 'পাপী' বলিয়া কদাচ ঘোষণা করেন নাই। "Ye are the temples of god." "The kingdom of heaven is within you." ইত্যাদি মহাবাক্যই উহার সুস্পষ্ট নিদর্শন। খ্রীষ্টধর্ম্মোপদেষ্টৃগণ ঐ সকল দুরবগাহ মহত্তত্ত্বের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া, নিজেদের মনোমত একটা বা' তা' বলিয়া দিয়া, মহাপুরুষের পবিত্রোপদেশসমূহের অবমাননা করিয়া থাকেন। নতুবা খ্রীষ্টধর্ম্মের মূলকথাটা বেদান্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে।

পৃথিবীস্থ সকল ধর্ম্মই মানবের ব্রহ্মত্ব উদ্‌ঘোষিত করিয়াছে; কোন ধর্ম্মেই তাহার হেয়ত্ব ও জন্মপাপিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। বিশেষতঃ বেদান্ত সগর্ব্বে পাপের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়াছে। সে বলে—"পাপ যখন আদিতে ছিল না, অন্তেও থাকিবে না, কেবলমাত্র মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য মরীচিকাবৎ প্রতিভাত হইতেছে, তখন তাহার অস্তিত্ব আছে, কিরূপে বলা যাইতে পারে? যাহা কালত্রয়েই সত্য, অপরিবর্ত্তনীয়; যাহা শাশ্বত, নিত্য; যাহার

কস্মিনকালে কোথাও অভাব হয় না, তাহাই একমাত্র সৎ; তাহারই কেবল অস্তিত্ব আছে। পাপ সেরূপ নহে। উহা যখন জ্ঞানের বিনাশ্য, সদনুষ্ঠানে উহার যখন পূর্ণাভাব পরিলক্ষিত হয়, মুক্ত পুরুষের নিকট উহা যখন সম্যকরূপে অন্তর্হিত হইয়া যায়, তখন পাপ কোন কালে সৎ নহে; উহার অস্তিত্ব কোন ক্রমেই সিদ্ধ হয় না।

মৃগতৃষ্ণিকা পরিদৃশ্যমান হইলেও যেমন উহাকে সত্ত্বাসম্পন্ন বলা যাইতে পারে না, তদ্রূপ পাপরূপ মলিনতা কোনরূপে মানবাত্মার পবিত্রতাকে কিছুদিনের নিমিত্ত আবৃত করিয়া রাখিলেও, তাহাকে পাপ স্বভাব বলা সর্ব্বথা অসমীচীন। বিপুলবীর্য্য পশুরাজ মৃগেন্দ্র একবার পিঞ্জরাবদ্ধ হইলেই উপপন্ন হয় না যে, সিংহের পিঞ্জরাবদ্ধ হওয়াই স্বভাব। দৈববশে তাহার ঐরূপ দুরবস্থা ঘটিলেও, একদিন না একদিন সে পিঞ্জর ভেদ করিয়া বাহির হইবে এবং গগনব্যাপী ভীমগর্জ্জনে বনভূমি সন্ত্রাসিত করিয়া তুলিবে। অনন্ত-প্রসৃত নীলাকাশ ক্ষণেকের জন্য নীরদ-দাম-সমাচ্ছন্ন হইলেই কি বলিতে হইবে যে, আকাশ চিরমেঘাবৃত? অথবা ভগবান সহস্ররশ্মি কালপ্রভাবে একবার রাহুগ্রস্ত হইলেই কি তিনি উহার করাল-কবলে চির-কবলিত থাকিয়া যাইবেন? কখনই না। যথা সময়ে মেঘমালা কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইবে, রাহুগ্রাস তিরোহিত হইবে; সুনীল গগন পূর্ব্ববৎ সুনির্ম্মল থাকিবে; তপনদেবও অনন্তকিরণোদ্ভাসিত হইয়া নভোবক্ষে বিরাজ করিবেন। পিঞ্জরবদ্ধ, মেঘাবরণ বা রাহুগ্রাস ক্ষণস্থায়ী, সত্ত্বাশূন্য ভ্রমমাত্র। মানবও সেইরূপ সময়ে সময়ে অপবিত্রতার স্বপ্ন দেখিলেও, কালে সে মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া উঠিবে, মহিমময় স্বস্বরূপ প্রকাশকরতঃ অমৃতত্বলাভে ধন্য হইবে, স্বীয় মেষত্বের পরিহার করিয়া সিংহত্ব প্রকটিত করিবে এবং প্রাণে প্রাণে বুঝিবে, তাহার পূর্ব্ব নিদ্রাবেশ মনের কল্পনামাত্র। সুতরাং মনুষ্যকে কদাচিৎ 'পাপী' বলিওনা; সে অমৃতের তনয়—অমৃতস্বরূপ।

দেখিতেছ না—মানব প্রাণ কি চাহিতেছে? সে চায় অমরত্ব—চায় অনন্ত জীবন; মৃত্যু তাহার অভিপ্রেত নহে; সে চায় জ্ঞান বা পবিত্রতা; অজ্ঞান বা অপবিত্রতা তাহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। সে স্বভাবতঃ সুখ ও আনন্দপ্রিয়; দুঃখ বা নিরানন্দ তাহার প্রতিকূল। ইহাতে বুঝা যাইতেছে

যে, মানুষ বস্তুতঃ সচ্চিদানন্দ। কোন এক অজ্ঞাত শক্তিবলে অপবিত্রতার একটা ছায়া আসিয়া, তাহার সচ্চিদানন্দত্বকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, এবং সে ঐ ছায়া অপসারিত করিয়া, পুনরায় নিজত্ব লাভের জন্য অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করিতেছে। কেননা, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কেহই আপনার স্বরূপকে লঙ্ঘন করিতে পারে না। মানুষের প্রকৃতিই যে সচ্চিদানন্দ; সে উহাকে পরিত্যাগ করিবে কিরূপে? সে যে স্বয়ং শুদ্ধি; পাপ তাহাকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে না এবং পাপ নিজেও অস্তিত্বহীন।"

গীতায় শ্রীভগবানও বলিয়াছেন—"না সতোবিদ্যতেভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ।" (অনিত্য বস্তুর সত্তা নাই; নিত্য বস্তুরও বিনাশ নাই।) পাপ যদি ভাব পদার্থ হয়, তবে তাহার কদাচ অভাব হইতে পারে না; পক্ষান্তরে, উহা অভাব পদার্থ হইলে, উহার ভাব বা অস্তিত্ব অসম্ভব। কি ওজঃ-প্রসবিণী, সংসার-পাশ-ছেদিনী, ভূমানন্দবিধায়িনী, প্রাণময়ী শিক্ষা! জীবের এই সর্ব্বমঙ্গলকরী, মহীয়সী শিক্ষা বহুকাল যাবৎ প্রচ্ছন্ন ছিল; মনুষ্য-সমাজ উহাকে বিস্মৃতির অতলগর্ভে চিরনিমজ্জিত করিবার উপক্রম করিয়াছিল। তাই শ্রীভগবান উক্ত সনাতনী শিক্ষার পুনরুদ্ধার করিবার জন্য—মানবকে তাহার দেবত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য, বর্ত্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া, বেদমন্ত্রে সমগ্র জগৎ প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীমুখ হইতে ললিত-গম্ভীর-নির্ঘোষে উচ্চারিত হইয়াছে—পাপ কি? পাপ দেখা বা মানুষকে পাপী বলাই পাপ; যে শালা 'পাপ' 'পাপ' করে, সেই শালাই পাপী।" হে মানব! এই অপূর্ব্ব শিক্ষার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হও; এই বিশ্বজনীন মহাভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠ; মানবজাতির এই মাহেন্দ্র মুহূর্ত্তে এই শুভক্ষণে তোমার প্রসুপ্ত, অলস হৃদয়-তন্ত্রীকে একটু উচ্চসুরে বাঁধিয়া লও; তোমার নিস্পন্দ, অবশ প্রাণকে এই মহামন্ত্রে উদ্বোধিত কর—জাগাইয়া তুল; তোমার জীবন-কুঞ্জ এই মহা সঙ্গীতের ভৈরব-রাগিণীতে মুখরিত হউক। তুমি মোহ নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া, দুর্ব্বলতা-মলিনতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া, মায়ার শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া দিয়া, কুসংস্কারের দৃঢ়গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া, আপনাকে চিনিয়া লও; হৃত গৌরবের পুনরানয়ন কর; আত্মানন্দে ডুবিয়া যাও।

দেখ, নবাবতারের নবভাবে জগৎ সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে; বেদান্তের

মঙ্গলময়ীবার্ত্তা প্রতিগৃহে সমুদ্‌ঘোষিত হইতেছে। ঐ শুন, প্রাচীন বেদ-গাথা পুনরুজ্জীবিত হইয়া, বহুদিন সুপ্ত সুখস্মৃতির ন্যায় মধুর ভাবে সর্ব্বজনকণ্ঠে সমুচ্চারিত হইতেছে—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।" ঐ শুন, ঠাকুরের প্রিয় সন্তান, বিশ্ববিজয়ী ধর্ম্মবীর বিবেকানন্দ, স্বকীয় শ্রীগুরু-কথিত মহাবাক্য, জীমূত-মন্দ্রে জগৎবাসীকে শ্রবণ করাইতেছেন ;——

"Ye are the children of God, the sharers of immortal bliss, holy and perfect beings, yea, divinities on Earth. Sinners? It is a sin to call a man so. Come up, oh lions! and shake off the delusion that you are sheep!"

এই মহাদর্শে জীবন গঠিত করিয়া, স্বীয় দেবত্বের—ব্রহ্মত্বের অনুধ্যান কর। শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ দুর্ব্বলতার সহিত সংস্রব পরিত্যাগ কর। দুর্ব্বলতাই পাপ; দুর্ব্বলতাই সকল দুঃখের—সকল অশান্তির জননী। উহা ধর্ম্ম নহে; ধর্ম্মের সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই। ধর্ম্ম বা সত্য বলপ্রদ, বীর্য্যপ্রদ, প্রাণপ্রদ! যদি তুমি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়, তবে বুঝিবে, তাহা ধর্ম্ম নহে—তুমি ধার্ম্মিক নহ। যাহাতে দুর্ব্বলতার লেশমাত্র বিদ্যমান, তাহার সহিত কোন প্রকার সম্পর্ক রাখিও না। চাই ওজঃ—চাই বীর্য্য; চাই শূরত্ব—চাই মহত্ত্ব। বর্ত্তমান সময়ে আমরা সকলদিকেই অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি এবং তন্নিমিত্তই আমাদের আধ্যাত্মিক চরিত্রের শোচনীয় অবনতি ঘটিয়াছে। এখন অদম্য মহাশক্তির আবশ্যক। শক্তি! শক্তি! শক্তি! সিদ্ধ মহাপুরুষ তাই উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া বলিয়াছেন ;—

"Let me tell you, strength, strength, is what we want-And the first step in getting strength is to uphold the upanishads, and believe that 'I am the Atman." ইহাই জীবন-সমস্যার একমাত্র সমাধান। স্বপ্নেও নিজেকে হীন ভাবিওনা। দৃঢ়তার সহিত দণ্ডায়মান হইয়া, বজ্র ভৈরব-রবে পুনঃ পুনঃ বলিতে থাক ;—

"ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং
ন মন্ত্রং ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।

অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥"

আহারে-বিহারে, শয়নে-স্বপনে, গমনে উপবেশনে, তোমার অকম্পিত কণ্ঠে নভোমণ্ডল বিকম্পিত করিয়া ধ্বনিত হউক ;—

"নমে দ্বেষরাগৌ নমে লোভমোহৌ
মদোনৈব মে নৈব মাৎসর্য্য ভাবঃ।
ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষ
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥"

সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে, গৃহে অরণ্যে, শ্মশানে প্রান্তরে, রোগে মৃত্যুতে অন্তরের অন্তস্থলে চিন্তা কর ;—

"ন মৃত্যুর্ণ শঙ্কা নমে জাতিভেদাঃ
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধু র্ণ মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্য
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥"

দেখিবে, সকল দুর্ব্বলতা—সকল অপবিত্রতার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে ; হৃদয়ে অনন্তশক্তির সঞ্চার হইবে ; তোমার স্বরূপাত্মা সহসা সিংহ গর্জ্জন করিয়া উঠিবেন। ইহাই ধর্ম্ম এবং বলা বাহুল্য, দুর্ব্বল ব্যক্তি কদাচ এই ধর্ম্মলাভ করিতে পারে না। বেদ উপদেশ করিতেছেন—"নায়মাত্মাবলহীনেন লভ্যঃ।" (দুর্ব্বল ব্যক্তি আত্মসাক্ষাৎকার করিতে পারে না।) "বীরানামেব করতলগতা মুক্তির্ণ পুনঃ কাপুরুষাণাম্।" (মুক্তি বীর পুরুষদিগেরই করতলগত ; কাপুরুষদিগের নহে।) অতএব কখনও বলিওনা—আমি দুর্ব্বল, আমি পাপী, আমি অপবিত্র, আমি অধম। ঐরূপ বলা মিথ্যা কুসংস্কার মাত্র ; উহা ভ্রান্তি ; উহা সত্যের অপলাপ ; উহা আত্ম-প্রতারণা ! ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

শ্রীঅমূল্যরত্ন কাব্যতীর্থ।

"একটী কথা"

——:০-:০:-০:——

যেমন আলো আছে বলিয়াই অন্ধকার বেশ বুঝিতে পারা যায়, যেমন সুখ থাকে বলিয়াই দুঃখ হৃদয়ঙ্গম হয়, সেইরূপ স্বর্গ আছে বলিয়াই নরক বুঝিতে কষ্ট হয় না আর পাপ বর্ত্তমানে পুণ্যের মহিমা প্রকটিত হয়।

প্রত্যেক মানবহৃদয়ে একটী হিতাহিত বিবেচনা করিবার শক্তি আছে। সেই শক্তি ভগবানের পরিচয়। উহা ভগবানের বাক্য। যখন মানব সৎকর্ম্ম করে, তখন স্বতঃই উহার অন্তঃকরণ আনন্দে মাতোয়ারা হয়, আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখন সে অসৎকর্ম্ম করে, তখন মনে মনে শত বৃশ্চিকের জ্বালা সহ্য করে। যখন কোন লোক কোন একটী বিপন্নকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার চেষ্টা পাইতেছে, যখন সে ত্যাগের জ্বলন্ত চিত্র সম্মুখে দেখাইবার আয়াস করিতেছে, নিজের সুখের দিকে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন হইয়া অপরকে সুখী করিবার চেষ্টা পাইতেছে, তখনই তাহার চিত্তপ্রসাদ উপস্থিত হয়, তখনই সে মনে ভাবে যে তাহার ন্যায় সুখী এ ভূভাবতে পাওয়া সুকঠিন, এরূপ সুখভোগ করা পুতি পুণ্যের কার্য্য। আবার যখন কোন লোক নিজের সুখকে সর্ব্বস্ব চিন্তা করিয়া অপরকে কষ্ট দেয়, নিজের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এরূপ কার্য্য করে, যাহাতে অপরে মরমে মরিয়া যায়, যখন স্বার্থই তাহার সম্মুখে ইষ্টদেবের ন্যায় নিত্য বিরাজ করে, তখন সে মনে মনে যে ক্লেশ অনুভব করে, তাহা এ সামান্য লেখনীতে বর্ণন করা অসাধ্য, সে জগতের সামনে বুক ফুলিয়ে, হাস্যবদনে থাকিলেও হৃদয়ের অন্তঃস্থলে যে জ্বালা নীরবে সহ্য করে, তাহা স্বপনে ভাবিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। সে মনে মনে ভাবে যে সামান্য আত্মসুখ লাভ করিতে গিয়া কি অশান্তি ক্রয় করিলাম।

এ জগতে প্রত্যেকেই সুখের আশায় নিয়ত ছুটিতেছে। কাহারও ভাগ্যে অমৃত উঠে, আর কেহ বা গরল পান করে। লোকে সুখ লাভ আশায় কিনা করিতেছে? কেহবা কামিনীর জন্য কেহবা কাঞ্চনের জন্য, আর কেহবা মানের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যাহার যাহাই লক্ষ্য হউক না কেন, সে উহা সিদ্ধ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে,

ভ্রমণে, বিহারে সর্ব্বসময়ে উহাই তাহার একমাত্র লক্ষ্যস্থল। লোকনিন্দা আত্মগ্লানি, সহস্র বিপদ, অর্থকষ্ট বাধাবিঘ্ন প্রভৃতি কিছুতেই উহাকে দমন করিতে পারে না। সে তখন মনে মনে ভাবে যে কিসে ঐ কামনা সিদ্ধ হইয়া সুখী হইবে। কিন্তু হতভাগ্য মানব দেখিয়াও দেখে না, বুঝিয়াও বুঝেনা, শুনিয়া ও শোনে না যে, উহা প্রকৃত সুখ নয়। সুখ স্বতন্ত্র জিনিষ, উহা বড় তপস্যার ফল। সামান্য শাকান্নভোজী দিবারাত্র পরিশ্রমকারী দরিদ্র ব্যক্তি যে সুখ ভোগ করে, তাহা বহু জন সেবিত বহু মাননীয় ক্ষমতাবলম্বী নৃপতির ভাগ্যে ঘটেনা।

তবে কি আমাদের বুঝিতে হইবে যে সুখ নাই? উহা কি কেবলই একটা স্বপ্নাসার জিনিষ? উহা পাইবার আশা করাও কেবলি কি মূর্খতার পরিচয় দেওয়া হয়?

ভগবান রামকৃষ্ণদেব ইহার একটী সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। যে কেহই তাঁহার মধুময়ী উপদেশবাণী শ্রবণ করিয়া চরিতার্থ হইয়াছে বা পাঠ করিয়া ধন্য হইয়াছে, সেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইয়াছে। যে কেহ ঠাকুরের সম্বন্ধে অতি প্রিয় বিশ্ববিজয়ী কর্ম্মবীর বিবেকানন্দের পুস্তকাবলী পাঠ করিয়াছেন, পুণ্যশ্লোক কলিকালের জনকরাজা রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছেন, গৃহী মহাত্মা মাষ্টার মহাশয় বর্ণিত কথামৃত পান করিতে পারিয়া ধন্য হইয়াছেন, ত্যাগী সাধুপুরুষ সারদানন্দের লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন যে, "রামকৃষ্ণ দীনের ঠাকুর, অনাথের নাথ, অগতির গতি, মূর্খের দেবতা, পতিতের অবতার। যাহারা নিরুপায়, সংসার কলে প্রতিনিয়ত ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়াছে, দশদিক শূন্যবোধ করিতেছে কেবল তাহাদের জন্যই রামকৃষ্ণ অবতার-ভাবাবেশে মুক্তকণ্ঠে বলেন, যে কেহ ভগবানকে জানিবার জন্য, ভগবানকে পাইবার জন্য আমার কাছে আসিবে তাহারই মনোরথ পূর্ণ হইবে।" আর এক স্থানে তিনি বলিতেছেন, 'কৃপা বাতাস বইছে, পাল তুলে দিলে হয়।' আবার কোথাও তিনি সংসারীদের আঁশচুবড়ি ত্যাগ করিতে বলিয়া কহিতেছেন—'কামিনীকাঞ্চনের লেশমাত্র চিহ্ন থাকিলে তাঁকে পাওয়া যায় না। আবার কোথাও কোন একটী গর্ব্বিত মানবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "অহঙ্কারের সামান্য মাত্র চিহ্ন থাকিলে তাঁর কাছে যাওয়া যায় না।"

এইরূপে কত শত শাস্ত্রীয় জটীল সমস্যা গ্রাম্যভাষায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা একমুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। এই জন্যই কর্ম্মবীর, ধর্ম্মপ্রাণ ত্যাগী সাধু 'সোনার নরেন' বলিয়া গিয়াছেন—অনন্তভাবময় ঠাকুরের অনন্তলীলা, আমরা সামান্য মানবে বুঝিতে পারি না। তিনি কৃপাবশতঃ যাহা দেখাইয়া দেন, তাহাই বুঝি। আমরা তো সামান্য সংসার হ্রদে পতিত মানব। আমরা যদি সহস্র বৎসর ধরিয়া বাসুকির ন্যায় সহস্র মুখ লইয়া চেষ্টা করি তা'হইলে লীলাময়ের কণিকামাত্র বুঝিতে পারিব কি না সন্দেহ।

ফল কথা মন লইয়াই সংসার। তিনি এখন এই ভাবে মনটাকে নিয়োগ করিয়াছেন, আবার তিনি যখন দয়া করিয়া মনকে অন্যভাবে চালিত করিবেন, তখন সেইরূপই হইবে। তিনি প্রতিনিয়ত আমাদিগকে সৎপথে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু মায়ার প্রভাবে ভ্রান্ত মানব তাহা বুঝিয়াও বুঝিবে না। রোগ-শোক-তাপ-বন্ধন-ব্যসন-পীড়িত ও ক্লান্ত মানবদিগকে তিনি পর-পারের বিষয় স্মরণ করিয়া দিতে কৃপণতা করেন না। তিনি তাঁহার সন্তানদের দুঃখে কাতর হইয়া মধ্যে মধ্যে চিৎকার করে বলেন, 'ওরে তোরা কে কোথায় আছিস হেথা আয় রে।' সেই কাতর ক্রন্দন শ্রবণ ক'রে, যাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে তাঁহার নিকট অশ্রয় গ্রহণ করেন, তিনিও তাহাদের সহস্র পাপ সত্ত্বেও শ্রীচরণে স্থান দিয়া কৃতার্থ ও সুখী করেন। আর যারা সংসার ধুলাখেলায় মত্ত হয়ে ঐ অমৃতময়ী বাণী গ্রাহ্য করে না, তাদের কি তিনি ত্যাগ করেন? না—কখনই নয়। কুপুত্র যদ্যপি হয় কুমাতা কখনও সম্ভব নয়।

তাই তিনি তাঁর প্রিয় সন্তান অমরকবির মুখে বলিয়াছেন—

"মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে।
কে যেন কাতর প্রাণে, ডেকে বলে আয় চলে আয় আমার পাশে।
বলে আয়রে যাদু আয়রে ত্বরা,
হেথা নাইক মৃত্যু নাইক জরা;
হেথা বাতাস গীতি গন্ধ ভরা চির স্নিগ্ধ মধু মাসে।"

দীন সেবক—

শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।

উত্তরাখণ্ডে ভ্রমণ ও স্থিতি।

———:০-:০:-০:———

(১০)

৩রা বৈশাখ ভোরে সেই মঙ্গলময়ের নাম স্মরণপূর্ব্বক শয্যাত্যাগ করিয়া যষ্টিবন্ধুর সাহায্যে শ্রীনগর মানসে—রওনা হইলাম। পথটি বড়ই সুন্দর, একেবারে সোজা। দুধারে বাগান। বনের মধ্যে থেকে পাখী ডেকে বলছে বদরীবিশাল বদরীবিশালকি জয়।"

"অং হঃ সং হর দখিলং সক্তদুদয়াদেব সকল লোকস্য।

তরনীরিব তিমির জলধের্জ্জয়তি জগন্মঙ্গল হরের্নামঃ॥"

একবার মাত্র যে নাম উদয় হইলে সকল লোকের অখিল পাপ দূর হয়, পাপ তিমির জলধির ন্যায় সেই যে জগন্মঙ্গল হরির নাম তাহা জয়যুক্ত হইতেছে। তাই বুঝি পাখী ডেকে ঐ নাম বলে। নদী হর হর ধ্বনি করে। মহান হিমালয় ধ্যানমগ্ন। যাত্রীসমূহের মুখেও নামের জয়ধ্বনি, পথিমধ্যে যাহার সঙ্গে দর্শন ঘটিল, দুজনের মুখেই "বদরীবিশাল কি জয়, কেদারনাথ স্বামী কি জয়" এই বুলি। আন্দাজ ৪॥টা রাত্রে আমরা চটি হইতে বাহির হইয়া শ্রীনগর অভিমুখে অগ্রসর হই। বেলা ৮টার সময় বিল্বকেদার চটি নামে এক স্থানে আসিয়া শ্রী ৺বিল্বকেশ্বর শিবালয়ে শিবলিঙ্গমূর্ত্তি দর্শন করিলাম। এ চটিতে ২।৩ খানি ঘর, খাদ্যদ্রব্য ও দোকান আছে। এখানে খাদ্য দ্রব্যের বিষয় বলা হয় নাই। আছে সুধু চাউল আর দাউল। ঘৃত, আটা, লবণ। তরকারির মধ্যে এক এক চটিতে আলু মেলে। দুই এক চটিতে বিলাতি কুমড়াও দেখা গিয়া ছিল। আর কিছু নয়।• দাল এধারের চটিতে সিদ্ধ হইতেছে। পথ হাঁটায় ক্ষুধা হইত, কাজেই নুন ঘি ভাত খাওয়াও যাইত। চাল ছয় আনা, সাত আনা সের। দাল অড়হর পাঁচ আনা, ছোলা, মুগ ঐ প্রকার। ঘৃত দুআনা ছটাক। সব চটিতে দর সমান নয়। দুধ সব চটিতে মেলে না। যাহা হউক, আমরা বিল্বকেদার দর্শনান্তে ১৩ মাইল হাঁটিয়া শ্রীনগরে কালী কমলী বাবার ধরমশালায় আসিলাম। মস্ত ধরমশালা। শ্রীনগরটি বেশ সহর। শ্রীনগর প্রাচীন গড়-বালের রাজধানী ছিল। এখানে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি আছে। ১৮৯৪

খৃষ্টাব্দে বিরহী নদীর বাঢ় ভাঙ্গিয়া এই নগরটি ভাসাইয়া লইয়া যায়। বর্ত্তমান শ্রীনগর ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের স্থাপিত সুন্দর শ্রীসম্পন্ন সহরটি। অলকনন্দা কিছু দূরগত ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে, অসংখ্য প্রস্তরখণ্ড সাদা গোলাপী নীল কত রকম বর্ণের তটোপরি এবং নদীর মধ্যে দেখা যাইতেছে। জল অল্পই, বেশ স্বচ্ছ শীতল। শ্রীনগরে সরকারী ডাক বাংলা, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস, দাতব্য চিকিৎসালয়, হাঁসপাতাল, সবই আছে। অনেকগুলি দেবমন্দির আছে। তার মধ্যে শ্রী৺শঙ্করনাথ, শ্রী৺কমলেশ্বর শিবের মঠ সর্ব্ব প্রসিদ্ধ। আমরা ধরমশালার দ্বিতলে নিরিবিলি একটী ঘর পাইলাম। সাধুছেলেরা সম্মুখের বারেণ্ডায় রহিলেন। এখানে অত্যন্ত জলকষ্ট ঠেকিল। তবে পাণ্ডাজীর লোকেদের জন্য বিশেষ অভাব হইল না। স্নান করিতে গিয়া রৌদ্রে ও বিশেষ চড়াই উৎরাই করিতে বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। সেদিন বুড়িয়া জলের জন্য বিষম রকম চীৎকার করিয়াছিল, সঙ্গে পাণ্ডাজী নাই, কে শান্ত করিবে, আমরাই শেষে তাহাকে ঠাণ্ডা করিলাম। হরি মা অত্যন্ত বিরক্ত হন। মধ্যাহ্নে বিশ্রাম অন্তে বৈকালে সহর ভ্রমণে বাহির হওয়া গেল। বেশ সহর। আমরা তিন জোড়া "রবার সু" দুসঙ্গিনীতে কিনিলাম, পুঁজি করিয়া রাখিলাম। মোজা ও একটা সোয়েটারও কিনিয়া লইলাম। কিছু লবঙ্গ ইত্যাদিও লইলাম।

আমরা বৈকালে যখন কেনাকাটা করিতেছি, সেই সময় মহানন্দজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দুই দিনত সঙ্গে ছিলেন না। দেবপ্রয়াগ থেকে বাড়ী গিয়েছিলেন। তাঁকে দেখিয়া যাত্রীরা খুব সন্তুষ্ট হইল। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মাকে কোন কষ্ট মিল্‌নাত ?" আমরাও বলিলাম "না বাবা।" তিনিও সন্তুষ্ট হইলেন ও বলিলেন, "মা সূর্য্যপ্রসাদ যেমন ছেলে আছে, আমিও তেমনি আপনার সকলকার ছেলে আছি মা।" আমরা রাত্রে ধরমশালার ঘরে আসিলাম। ভোরের ঠাণ্ডা লাগিয়া সেদিন আমার অত্যন্ত গলা ব্যথা ও গা ব্যথা হয়। রাত্রে সঙ্গিনী ব্রহ্মচারিণীর একান্ত অনুরোধে গরম দুধ ও কিছু গরম জিলিপি মিলিল. খাওয়াইয়া উত্তমরূপে গলায় টুক্‌রা ফ্ল্যানেল জড়াইয়া চারিদিক বন্ধ করিয়া শয়ন করিলাম। মধ্যাহ্নে দুখানি চিঠি লিখে বরদানন্দের নিকট পোষ্ট করিতে দিয়াছিলাম। রাত্রে সুনিদ্রার পর ভোরের সময় যাত্রীরা জয়ধ্বনি দিয়া বাহির হইল দেখে আমরাও উঠিলাম। শঙ্কর

এসে লণ্ঠন নিলে, শ্রীনন্দ ব্যাগ বিছানা নিলে, তাড়াতাড়ি ষ্টকীন জুতা পরিয়া আলোয়ান হাতে লইয়াই যষ্টিবন্ধুর সাহায্যে "জয় বদ্‌রিবিশাললাল কি জয়" দিয়া উপর হইতে নামিতে গিয়া দেখি, সিঁড়িই ভাঙ্গিতে পারি না, সর্ব্বনাশ, দারুণ গাত্র-বেদনা, দেহ যে অচল। নিঃশব্দে নামিলাম। আমার গতিক দেখিয়া পূর্ব্বদিন বৈকালে কেদারের পাণ্ডাজী কাশীরাম বাবা আমাকে ঝাম্‌পান করিতে বলেন। সঙ্গিনীরাও কেহ কেহ বলেন। কারণ শ্রীনগরে ঝাম্‌পান মেলে। পরে জঙ্গলের চটিতে মেলে না, আমি রাজি হই নাই। ভোরের সময় অতি কষ্টে দ্বিতলের সিঁড়ি ভাঙ্গিলাম। রাস্তা সোজা বেশ ভাল। যষ্টিবন্ধুর সাহায্যে খুবই আস্তে আস্তে চলিলাম। যাত্রীরা সব বলিল, সুশীল মা আজ সবার পিছনে পড়িয়াছে। সঙ্গিনী ব্রহ্মচারিণী বলিল, তুমি কেন ঝামপান করিলে না? এ চটিতে মেলেত গিয়াই করিতে হইবে। সঙ্গিনীর সহিত গল্প করিতে করিতে চলিলাম। এগার মাইল হাঁটিয়া গায়ে ঘাম্ ছুটিয়া গেল।

শঙ্কর ছাতা লইয়া যাইতেছিল, রৌদ্র দেখিয়া ছুটাছুটি আসিয়া দিয়া গেল, কম্ফর্টার আলোয়ান মোটা সোয়েটার সব নিয়ে গেল। এদের যত্ন ও না বল্‌তেও নিজেদের এ প্রকার হুঁসিয়ারী দেখে দেখে আমি মুগ্ধ হইতাম। দীনা আমি সুধুই কাঁদিতাম, "হে ঠাকুর এদের রাজা কোরে দাও" এই প্রার্থনা করিতাম। ব্রহ্মচারিণীও খুবই প্রার্থনা করিত ও প্রত্যেক পাহাড়ী ব্রাহ্মণকে দেখলেই বল্‌ত, সুশীলা এরা দেবতা। পাণ্ডাজীকে বলিত, স্বয়ং নারায়ণ। গাণ্ডিওলার, শ্রীনন্দের যশোদা মা হোয়েছিল, সে নিজে আমার নিকট থেকে যা যা কিছু নিয়ে গেল, জলখাবার, মেওয়া, তার অর্দ্ধেক শ্রীনন্দকে দিয়ে দিলে। যদি আমি বলিতাম কি কচ্ছিস্, হাসিয়া উঠিত, কিছু না কিছু না, ও ভাই খাক, আমার পেটভরা আছে। বাস্তবিক তার অচলা ভক্তি ও দয়া দেখে দেখে আমি মুগ্ধ হইতাম। তেমনি কষ্ট সহিষ্ণু গিন্নিমত হোয়েছিল। আমাদের দলের সকলে আমার চেয়েও এই ব্রহ্মচারিণীকে ভালবাসিতেন। মাথাটিতে লম্বা চুল নাই জুতা মোজা পরিয়া গায়ে ঢাকা দিয়া যখন চলিত, ঠিক একটি ছোট ছেলেই দেখাত, তাই আমরা ব্রহ্মচারিণী না বলিয়া ব্রহ্মচারী বলিতাম।

আমরা এগার মাইল হাঁটিয়া রৌদ্রে হাঁপাইয়া কিছু উৎরাইপূর্ব্বক "খাকরা' চটি নামে একটি চটিতে আসিলাম। দেখি, বড় সাধু ছেলেটি স্থান ঠিব

করিয়া আমাদের অপেক্ষায় বোসে আছেন। আমরা আসিতেই আসুন মা, আসুন 'মা করিয়া সেই স্থানে লইয়া গেলেন। তাঁর কর্ম ছিল যতগুলি যাত্রীর তত্ত্ব লওয়ার, সকলেই তাঁকে খুব ভালবাসিতেন ছেলের মত। কে এল, কার আসিতে দেরি হোলো, কার কি অসুখ হোল, ঔষধ দেওয়া, এই সমস্ত তাঁর কার্য্য। সেদিন আর স্নান করিলাম না। মহানন্দজী বলিলেন খিচুড়ী খাইতে। হোলোও তাই, খুব নিকটে একটী সুন্দর ঝরণা মিলিল, এক সঙ্গিনী ও আমি গিয়া খুব কতক্ষণ বোসে রইলাম। সঙ্গিনী আপন বহু সাংসারিক অগ্নিকাণ্ড মহামারি সংবাদগুলি জানাইলেন। একটু কাঁদিলাম, উদাস হইয়াই গেলাম। বলিলাম, মা, সংসার "ওল ও কচুবন। বিচুটীর বোন।"

আমার অরুচি হোয়ে গিয়েছে, আমি মনবুলবুলে একস্থলে লিখেছি—

"তারা গো নিম্‌তেতো সংসার
এই কি মা তোর লীলাকানন ?
মাগো এযে বিচুটি বোন
ছট্‌ফট্‌য়ে মলাম আমি থাক্‌ব নাক আর"।

(১১)

সঙ্গিনীকে কলিকাতায় এসে একখানি মনবুলবুল দিব প্রতিশ্রুতা হইয়া ঝরণার জল কিছু মুখে দিয়া উঠিতেই একজন ব্রাহ্মণ বদ্রীনাথের মাহাত্ম্য কথা শোনাতে চাহিলেন। তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক চটিতে যাইতে বলিলাম।, তিনি বলিলেন—সেই ঝরণার উপরই প্রস্তর খণ্ডে দাঁড়াইয়া, মায়ী বিষ্ণুভক্তির উৎপত্তি স্থান স্বরূপ বদরীক্ষেত্রের মাহাত্ম্য অধিক কি বলিব, এখানে অতি ভক্তি সহকারে বাস করিলে ও করুণাসাগর ভগবান্ পদ্মনাভের চরণে ভক্তি বাঞ্ছা করিলে, তাহা অনায়াসে লাভ হয় ও মানব বিষ্ণুপদ ধ্যান করিতে করিতে পবিত্র হয়। ব্রাহ্মণের কথাটি স্থান, কাল ও মনের উপযুক্ত ভাবাপন্ন সময়ে বড় ভাল লাগিল। আমরা চটিতে আসিলাম। এসে দেখি ব্রহ্মচারী একেবারে উত্তমরূপ খিচুড়ি আলু ভাজি, কুমড় ভাজি তৈরি কোরেছে। ঘি খানিকটা ক্ষীর এনেছে বুড়দিদির জন্য। ব্রাহ্মণটি বলিলেন, মায়ী পরে ঠাণ্ডা হোয়ে সকলেই বস্‌বে, সকলে এক সঙ্গে শুন্‌বে। হোলোও তাই। শ্রীনগরে আহারের অসুবিধা হওয়ায় ব্রহ্মচারী মধ্যাহ্নে

মোটেই খায় নাই, রাত্রে জলযোগ কোরেছিল, ঠাকুরের মূর্ত্তিটি বাহির করিয়া দুজনে প্রণামান্তে ঠাকুরকে উৎসর্গপূর্ব্বক বসিয়া গেলাম। বুড়িদিদিও বসিলেন। আশ্চর্য্য রকম খাওয়া হইল। কলিকাতা গৃহের তিনবারের আহার বোসে বোসে একবার খাওয়া গেল। জ্বর হোলে ত মানুষ মোটেই খেতে পারে না, তবে এত খাওয়া গেল কেন? ব্রহ্মচারী বল্লে, দেখ ভাই, আজ যেন যোগোদ্যান ও সেই প্রসাদ, না ভাই? চেয়ে দেখি ঠিক তাই। চারিদিকে জনতা (সে চটিতে অত্যন্তই ভীড় ছিল) সেই রকম স্থানটিও, প্রসাদও ঠাকুর কোরে দিলেন সেই প্রকার। পরমানন্দ উদয় হোলো, সেই আসনেই বহু গল্প দুসঙ্গিনীতে আরম্ভ হইল। বুড়ীদিদি ত ব্যাপার দেখে পালিয়ে কম্বলে গিয়ে শয়ন কল্লেন। বড় ছেলে নাকি পিছনে বোসে আমাদের গল্প দেখে চোলে গিয়েছেন। ক্ষণেক পরে সব যাত্রীদের খাওয়ার শেষে দুজনে উঠিলাম, চোকে দেখছি ঠিক যোগোদ্যান।

বদরিকা পথে থেকে থেকে আমাদের অদ্ভুত রকমই আনন্দ হইত, ঠিক ৬।৭ বৎসর বয়সে দুজনে যেমন খেলিতাম, বুড়ো বয়সের মধ্যে সেই বাল্য জীবন উদয় হইত। আমি বল্‌ছি ব্রহ্মচারি! দেখ, ঠাকুর সব সাধ মেটাচ্ছেন ভাই, বুলবুলে যে "সাধ" কবিতা আছে—

নীরব নিঝুম কাননের কোলে তটিনী বহিবে ধীরে
শ্যাম লতিকায় কুটীর বাঁধিব,
বার মাস তথা একাকী থাকিব,
হৃদয়ের গাথা গাহিব একাকী
বসিয়া তটিনী তীরে।
শুকন হৃদয়ে নব সুখরাশি
আবার আসিবে ফিরে
সাথী সখি হবে বিহগের কুল
সাথী সখি হবে কুসুম মুকুল
ভ্রমর মৌমাছি প্রজাপতি আদি
মিলনে এ হিয়া ফুটিবে
বিষাদ নিরাশা হৃদয় বেদনা
ধীরে ধীরে টুটিবে।

প্রথমে একজন ছুটে এলেন, আর জনকতক এল, "ওমা কি বল্লি বল মা, শুনি মা।"। বল্‌ছি দাড়াও বলিয়া যষ্টিবন্ধুকে আনিয়া ঠিক স্থানে রাখিতে যেই উঠেছি—ভোঁ করিয়া এক রাক্ষসের মত মৌমাছি নাকের ডগায় ভীষণ রকম কাম্‌ড়ে পালাল। বোসে পোড়ে যত হাসি তত কাঁদি। চুসের জল অনবরত দু চোক দিয়ে বেরিয়ে গেল। সঙ্গিনী ছুটে একটু ঘি মাখিয়ে দিলে। সে স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক আর এক ঘরে ইষ্টক নির্ম্মিত মস্ত নাট্‌মন্দিরের মতন গৃহে দুজনে পালাইয়া গেলাম। সেখানে কম্বল পেতে বসা গেল। সেই ব্রাহ্মণটি বদ্‌রী কেদার মাহাত্ম্য শোনাইতে লাগিলেন।

সেখানেও খুব মাছি ও মৌমাছি, কিন্তু আর কাম্‌ড়ালে না! দলের অনেককেই মৌমাছি কাম্‌ড়াইল সে দিন। আমার বেশী কষ্ট হইল না। পরে সেরে গেল, নাক রাঙা হোয়ে রইল। অদ্যাবধি একটি সুন্দর হুল ফুটানর ক্ষত—আমার নাসিকায় চিহ্নিত আছে, বোধ হয় আজন্মই থাকিবে।

বৈকালে ব্রহ্মচারী ও আমি দুজনে ঝর্‌ণার ধারে গিয়েছি, পূর্ব্বোক্ত সঙ্গিনী ছুটে এসে "ওমা ওরে" বোলে আমায় দুহাতে জড়াইয়া ধোরে মিনিট পাঁচ কিছুই বল্‌তে পারে না। ব্যাপার কি জানিবার জন্য সুসঙ্গিনীই উৎসুক হোলাম। সঙ্গিনী পরে বল্লেন, "সূর্য্য বাবা এসেছেন।" আমি ত হেসে উঠ্‌লাম, মা উন্মাদ হোয়েছে গো, কাকে দেখেছে গো। অসম্ভব পাওাজীর এখন আসা। তিনি লাল সাঙ্গায় যাবেন ১৮ দিন পরে। সঙ্গিনী বলেন "চ দেখ্‌বি চ।" ব্রহ্মচারি বল্লে, ও ভাই তা হবে, যে কান্না সব কেঁদেছে, ঠাকুর হয়ত এসেছে, আহা নারায়ণ যে রে।" সন্দেহ হইল ছুটিলাম চটিতে। গিয়ে দেখি টক্‌টোকে রাঙা সিদ্ধ মত মুখ—পাওাজী বোসেছেন চারিদিকে সব পাখা কোচ্ছে। দেখে আশ্চর্য্য। মহানন্দজীকে বলিলাম, "বাবা সূর্য্য বাবা এসেছেন যে দেখ্‌ছি।" মহানন্দজী বল্লে হাঁ মা—৩৯ মাইল হেঁটেছে; এসেছে, এই লোকটা কাপড় নিয়ে এসেছে থাক্‌তে পারেনি। শঙ্কর কদিন পাওাজীর জন্য বিষণ্ণই ছিল, সে ভয়ঙ্কর রকম আনন্দে হিন্দিতে আমায় জানালে, "পাওাজী এসেছে।" আমার ত বড় ভয় হোলো যে, ছেলেমানুষ পাওাজী সব কান্নাকাটিতে চোলে এলেন, কত লোকসান হবে, ওঁর ভাই কত রাগ কোর্‌বেন, চুপ কোরে ভাব্‌ছি।

পাণ্ডাজী সূর্য্যবাবা জামা খুলে সুধু গায়ে সুধু পায়ে এসে আমায় দেখে এমন সুন্দর রকম হাস্‌লেন, ঠিক যেন আমার সেই বালক বন্ধু "খুণ্টু বাবু।" কি রকম অপত্যস্নেহে হৃদয় ভরিয়া গেল, নারায়ণ রামকৃষ্ণই জানেন। বসাইলাম, বাতাস দিতে গেলাম, কিছুতেই বাতাস নিলেন না। "বোস্ মা বোস্ গো, কেমন আছে সব, ভালত? তুমি এমন হাঁট্‌লে কেন? ১৩ মাইল এক বেলা হেঁটেছ, রাম রাম কিগো সব।" মহানন্দজীকে একটু বক্‌লেন। পরে বল্‌লেন, মাগো আপনি সব চোলে এলে কি হোলো আমি ঘরে যেতে পারিনা। এমন লাগলো সেকি আছে গো, আমি খাইনা কেবল "বাবা বাবা ডাক্‌ছে শুনি, কেবল কাঁদছি। রাত্রে ঘুম কত্তে গিয়ে স্বপ্ন হোচ্ছে "বাবা বাবা" ডাক্‌ছে সকল। কি করিগো, আমি দাদাকে আর্জেণ্ট টেলিগ্রাফ করি। যে যাত্রী সব কেদার যেতে কান্না কোচ্ছে, আমি কি করি?" দাদা পাঠালে "তোমার যা ইচ্ছা বুঝে কর।" আমি নারায়ণকে কোটী কোটী প্রণাম কোরে আস্‌ছে। এমন চল্‌ছে পাখীর মত গো। সব চটিতে আমি দেখছে।" আমরা সব হাসিতেছি, বালকের মত মিষ্ট বোল, বড়ই মধুর। পাণ্ডাজীর লোক শিশি হইতে কি তৈল লইয়া পাণ্ডাজীর পায়ে মাখাইতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে মুখ হাত ধুয়ে জামা পরিলেন। খানিকটা গরম চা খেয়ে শয়ন করিলেন। শঙ্কর পা টিপে দিতে লাগল। যাত্রীদের আনন্দ কোলাহলে চটি মুখরিত, পাণ্ডাজী এসেছেন। বুড় বুড় মা সব আদুরে খুকী মত হইয়া উঠিল। পাণ্ডাজীকে যে যার তিন দিনের কথা বলিল। আমিও গিয়া "নাক" দেখাইয়া আসিলাম। পাণ্ডাজী টপ কোরে উঠে "মাকে কষ্ট আছে।" আমিত দেখে অবাক "না বাবা কিছু নয় ভাল হোয়ে গেছে।" শোনে কে? পাণ্ডাজী পাথরে লাটী ঘষিয়া ঔষধ করিয়া নাকে দিতে বল্লেন। দিলাম। সত্য কিন্তু পরদিন ব্যথাই রইল না। সে রাত্র সেই চটিতে সব রহিলাম। "ভক্তকিঙ্করী।"

গুরু কৃপাহি কেবলম্।

—:o-:o:-o:—

১। গুরু বিনা না'হি জ্ঞান, গুরু বিনা নাহি ধ্যান
গুরু বিনা কিছু নাই এই তিন ভুবনে—

গুরু বিনা কোথা যাই? ... স্থান পাই
মরমে মরিয়া থাকি, প্রাণে আর বাঁচিনে।

২। গুরু বিনা এ সংসার সকলি যে অন্ধকার
গুরু মোর ধ্রুবতারা এ সংসার মাঝারে।
গুরু মোর প্রাণপাখী এ দেহ পিঞ্জরে থাকি
আত্মারামে রত সদা, কাল ভয় নিবারে।

৩। বল বল গুরু বল, আর কিবা আছে বল?
যাঁর বলে প্রাণ পাই, শুষ্ক তরু মুঞ্জরে।
অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত চূড়া হেলায় লঙ্ঘিবতে পারা
মূক সে বাচাল হয়, গুরু কৃপা যে ধরে।

৪। গুরু বিনা কিছু নাই নিশ্চয় বুঝিনু ভাই
জয় জয় গুরু বল, গুরু বল রসনা।
তোমার তুমিত্ব যাবে, মরিয়া অমর হবে
শ্রীগুরু-চরণ ছাড়া, অন্য ধন চাবে না।

৫। গুরু মোর জপ তপ, হৃদি মরু, গুরু অপ,
শ্রীগুরুই সারাৎসার, প্রাণে কর ধারণা।
গুরুমূর্ত্তি ধ্যান জ্ঞান, গুরু বিনা নাহি জ্ঞান
গুরু বিনা জ্ঞান জেনো, অন্ধকারে আয়না।

"কাঙ্গাল।"

গুরু শিষ্যের কথোপকথন।

শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভু, আজ আমার মনে ভয়ানক সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, অনুগ্রহ করিয়া যদি এ সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দেন, তাহা হইলে আপনার নিকট মনোগত ভাব ব্যক্ত করি"—

গুরু বলিলেন, "বৎস! কি সন্দেহ তোমার চিত্তে উদ্রেক হইয়াছে, তাহা এইক্ষণেই ব্যক্ত কর"—

শিষ্য বলিল, "প্রভু, আপনি বলেন যে ঈশ্বরের নিকট পক্ষপাতিত্ব নাই, তিনি সকলকে সমান চক্ষুতে দেখেন, কিন্তু আমি দেখিতে পাই কেহ কেহ নিজের উদরান্নের জন্য কঠোর পরিশ্রম করিয়া শরীরপাত করিয়া ফেলিতেছে, তবুও সুখে দিনপাত করিতে পারে না, আবার কেহ কেহ বিনা পরিশ্রমে বা স্বল্পপরিশ্রমে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া আনন্দে দিন যাপন করিতেছে। এই সব দেখিয়া আমার মনের মধ্যে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে"—

গুরু শিষ্যের বাক্য শ্রবণ মাত্র ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "বৎস, ভগবান পক্ষপাতী নন, তাঁর করুণা অপার, অচিন্তনীয় ও বাক্যাতীত। তিনি মনুষ্য, জীব, জন্তু, এমন কি ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গাদি সকল প্রাণীকে সমান চক্ষুতে দেখেন, তাঁর করুণার বিষয় ক্ষণেক চিন্তা করিয়া দেখদেখি—শিশু ভূমিষ্ট হইবার পূর্ব্বে যিনি তার জীবন রক্ষার্থে মাতৃস্তনে দুগ্ধ দেন, তিনি কি কখনও পক্ষপাতী হইতে পারেন! আবার দেখ, যদি কেহ ঐ স্তনে ছুরিকাঘাত করে সে দুগ্ধ পায় না, কিন্তু শিশু যখন ক্ষুধায় কাতর হইয়া স্তনে নিজ মুখ দিয়া দুগ্ধ নিঃসরণ করিবার চেষ্টা করে, সে সুমিষ্ট দুগ্ধ পায়! বৎস, ঈশ্বরের কৌশল অতীব অদ্ভুত, সে রহস্যময়, ক্ষুদ্র মানব তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। তবে যে বুঝিতে চেষ্টা করে, তিনি তাকে ক্রমশঃ বুঝান। যথার্থ অভাব তিনি কখনও কাহারও রাখেন না, বরং সদাই তাহা মোচন করেন। এ বিষয় আমি তোমায় একটী ক্ষুদ্র গল্প বলিতেছি, শ্রবণ কর:—

কোন সময় একটী বৃদ্ধ সন্ন্যাসী এক গ্রাম হইতে অপরগ্রামে শ্রীশ্রী৺রাজ বল্লভী মাতার মন্দির দর্শনার্থে যাইতেছিলেন, কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর সম্মুখে একটী সুবৃহৎ প্রান্তর দেখিতে পাইলেন। তখন চৈত্র মাস, বেলা দ্বিপ্রহর, সূর্য্যের উত্তাপ অত্যন্ত প্রখরতর বলিয়া বোধ হইতেছিল—পথে ঘাটে জনপ্রাণী ছিল না, এমন কি পক্ষী সকলও নিজ নিজ বাসা ত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে সাহস করিতে ছিল না। চতুর্দ্দিকে লোকালয়ের চিহ্নমাত্রও নাই, কেবল বড় বড় মাঠ, এমন কি তথায় একটী বৃক্ষও দেখিতে পাওয়া যাইতে ছিল না। প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিবাব পর সন্ন্যাসীর অত্যন্ত পিপাসা পাইল। অনেক অনুসন্ধানের পর কোন জলাশয় বা স্রোতস্বিনী দেখিতে পাইলেন না, অধিকন্তু দেখিলেন যে মাঠের পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল প্রণালী

পর্য্যন্তও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তখন তিনি সত্বর মাঠ অতিক্রম করিয়া গ্রামে পৌঁছিবার জন্য দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ সন্ন্যাসী জল পিপাসায় এবং প্রখরতর রবির কিরণে পথ ভ্রমণ করতঃ এতদূর ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন যে, আর তাঁহার নড়িবার শক্তি রহিল না এবং কিয়ৎদূর অগ্রসর হইবার পর অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে স্থানে তখন কোন জন প্রাণীর সমাগম ছিল না, সুতরাং সন্ন্যাসী ঐ অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন। কিন্তু ভগবানের কি অপার করুণা! তৎক্ষণাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া গেল। অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বায়ু তুষার কণার ন্যায় শীতল রূপ ধারণ করিয়া তাহার চিরসঙ্গী বৃষ্টিকে আহ্বান করিল। সেই মুষলধারা শীঘ্রই সন্ন্যাসীর চৈতন্য সম্পাদন করিয়া অন্তর্হিত হইল।

সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান হইয়া ঊর্দ্ধপানে দৃষ্টি করতঃ করজোড়ে কহিলেন, "মা! তোমার লীলা বুঝা ভার, আমি এই নির্জ্জন প্রান্তরে অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিলাম দেখিয়া তুমি বারিরূপে আমার চৈতন্য সম্পাদন করিলে! তুমি ত বিনা কারণে কোন কার্য্য কর না, আজ আমায় যখন এত কষ্ট দিতেছ, তখন নিশ্চয়ই তোমার কোন মহৎ উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু আমি যে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি মা!"

সন্ন্যাসীর মুখ দিয়া এই কয়টী কথা বাহির হইবামাত্র তিনি শুনিতে পাইলেন, কে একজন উচ্চৈঃস্বরে গাহিতেছে:—

"সন্তান মঙ্গল তরে, বেড়াই আমি ঘুরে ঘুরে,
কিবা সুখে কিবা দুঃখে ছাড়িনা কভু তাহারে॥

উক্ত সঙ্গীতটী সন্ন্যাসীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি গদ্‌গদ্ চিত্তে অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "কে এ গান গাহিতেছে, এ যে আমার হৃদয়ের লুক্কায়িত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতেছে!" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি তখন সেই সুর লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং অনতিবিলম্বে দেখিলেন, একটী বৃদ্ধ কৃষক উক্ত গানটী গাহিতেছে। সন্ন্যাসী তখন সেই কৃষকের নিকট গিয়া বলিলেন "বৎস! আমি অতিশয় তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছি, আমাকে এক ঘটী জল দিতে পার?" কৃষক সন্ন্যাসীর আজানুলম্বিত বাহু, দীর্ঘ জটা ও তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় দেহ দেখিয়া ভক্তিভরে তাঁহার চরণধূলি স্বীয় মস্তকে স্থাপনপূর্ব্বক অতি বিনীত-

ভাবে বলিল, "প্রভু, এ বছর বৃষ্টি না হওয়াতে এখানকার খাল বিল সব শুকিয়ে গেছে, আর আমার কাছেও ভাল খাবার জল নেই। তবে বসুন, আমি একগাছা আক মেড়ে আন্‌ছি, এতেই আপনার পিপাসা কতকটা মিটিতে পারে—আর গ্রামও এখান থেকে বেশী দূর নয়, এক পোয়া পথ বড্ড জোর—এই টুকুন কষ্ট করে গেলেই আপনি কোন ভদ্র লোকের আশ্রয় পাবেন," এই বলিয়া সেই কৃষক একগাছা পরিপক্ক ইক্ষু নিস্পেষণ করিতে লাগিল এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "আমার কি সৌভাগ্য, এই জনমানবহীন প্রান্তরে অদ্য আমি অতিথি সৎকার করিতে পাইলাম এবং অতিথি ত যে সে নয়, একজন কামিনীকাঞ্চনত্যাগী বৃদ্ধ সন্ন্যাসী!"

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, একগাছি ইক্ষুরসে দেড়সের পরিমাণ পাত্রটী পরিপূর্ণ হইয়া গেল! কৃষকও এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া সন্ন্যাসীর নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক মৃন্ময় পাত্রটী প্রদান করিল। সন্ন্যাসীও পাত্রটী গ্রহণ করিয়া মনে মনে ভাবিলেন, "মা! তোমার কাছে চাহিবার আমাদের কিছুই নাই। আমি পিপাসার্ত্ত হইয়া তোমার কাছে চাহিলাম জল, তুমি আমায় দিলে সুমিষ্ট ইক্ষুরস; যদ্দ্বারা আমার ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দুই নিবারণ হইবে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সন্ন্যাসী সেই ইক্ষুরস জগজ্জননীকে নিবেদন করিয়া নিজে প্রসাদ পান করিলেন এবং কৃষককে বলিলেন, "বৎস, আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি—এক্ষণে বিদায় হই—ভগবান তোমার মঙ্গল করিবেন।" কৃষক সন্ন্যাসীকে অতিশয় সন্তুষ্ট দেখিয়া কাকুতিমিনতি করিয়া বলিল, "ঠাকুর আপনার পায়ে পড়ি একটু দাঁড়ান, আর একগাছা আক মেড়ে আনি।" সন্ন্যাসী পূর্ব্ব হইতেই কৃষকের অতিথি সৎকারে বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহার অনুরোধ অবহেলা করিতে না পারিয়া অনুমতি দিলেন।

তখন কৃষক আনন্দচিত্তে দুই গাছি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইক্ষু হইতে রস নির্গত করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় দুই গাছি ইক্ষুরসে পূর্ব্বোক্ত পাত্রটীর চতুর্থাংশের এক অংশও পরিপূর্ণ হইল না। কৃষক এই ব্যাপার দেখিয়া ভীতচিত্তে সাধুর সমীপবর্ত্তী হইয়া করজোড়ে বলিল, "দেবতা, আপনি অন্তর্য্যামী, দয়া করে এ দাসের দোষ নেবেন না। আমি অজ্ঞান, না বুঝতে পেরে অন্যায় কাজ করেছি, তার জন্য ক্ষমা করুন।"

সন্ন্যাসী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে বলিলেন, "বৎস, আমি তোমার উপর তিলমাত্র অসন্তুষ্ট হই নাই, বরং তোমার আতিথ্যে অতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি, তুমি কি বলিতেছ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কৃষক সন্ন্যাসীর বাক্য শুনিয়া বলিল, "প্রভু, আপনি অন্তর্যামী, কেন আমার সহিত ছলনা করিতেছেন। এক গাছা আকের রসে এ ভাড়টার সব পুরে গেল, আর এবার তার চেয়েও ভাল দুগাছার রসে সিকিও পুরলো না।" এই বলিতে বলিতে কৃষকের কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল এবং তাহার মুখে আর বাক্য সরিল না। তখন সন্ন্যাসী বলিলেন, "বৎস তোমার কোন দোষ নাই, ইহার ভিতর এক নিগূঢ় রহস্য আছে বলিতেছি শ্রবণ কর—আমি তৃষ্ণায় কাতর হইয়া জলের জন্য অন্বেষণ করিতেছিলাম, ভগবান আমাকে এমন জিনিষ মিলাইয়া দিলেন, যাহার দ্বারা আমার ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দুইই দূর হইল এবং আমার যতটুকুন দরকার তার চেয়েও ঢের বেশী দিয়াছিলেন, তাই একগাছি ইক্ষু হইতে অসম্ভব রস নির্গত হইয়াছিল। কিন্তু আমি লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না দেখিয়া আবার সেই মঙ্গলময় জগদীশ্বর আমার মঙ্গলের জন্য, অর্থাৎ নিজ ধর্ম্ম হইতে যাহাতে চ্যুত না হই, সেই জন্য পুনরায় আর এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইয়া আমার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া দিলেন। একগাছি নিকৃষ্ট ইক্ষু হইতে যে পরিমাণে রস আশা করা যায়, তাহা দুইগাছি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইক্ষু হইতেও নির্গত হইল না! ধন্য জগদীশ্বর, ধন্য তোমার লীলা! তোমার লীলা কে বুঝে—তুমি যাকে বুঝাও, সেইই বুঝিতে পারে!

কৃষক এই সমস্ত শুনিয়া বিস্মিতনেত্রে সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিবামাত্র দেখিল যে, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে এবং দুই গণ্ড বহিয়া দরদর বেগে আনন্দাশ্রু বহিয়া পড়িতেছে। সন্ন্যাসী কিয়ৎ কাল পরে আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন, "বৎস, এ জন্য তুমি কিছুমাত্র দুঃখিত হইও না, আমি তোমার অতিথি সৎকারে যারপর নাই সুখী হইয়াছি এবং আশীর্ব্বাদ করি, ধর্ম্মে তোমার মতি থাকুক। আরও একটা কথা বলে যাচ্ছি মনে রেখো— যথার্থ অভাবে চাহিলে জগদীশ্বর আমাদের সেই অভাব তৎক্ষণাৎ মোচন করেন, কেবল বিলাসিতা ও লোভের বশীভূত হইয়াই আমরা এত দুঃখ ভোগ করি। এই বলিয়া সন্ন্যাসী গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন।"

শিষ্য—প্রভু, আপনার গল্প শুনিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি যথার্থ অভাব মোচন করেন, কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর ত আমি এখনও পাই নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ।

স্মৃতি।

—:০:—

১

শত যাতনার বৃশ্চিক দংশনে
জ্বলিয়া পুড়িয়া হায়।
পেয়েছি শরণ অনাথ শরণ
দিয়াছ চরণাশ্রয়॥

২

কত যে যন্ত্রণা সহিয়াছি প্রভু
আসিয়া অবনীতলে।
সে সব স্মরিলে পরাণ শিহরে
ভাসি শুধু আঁখি জলে॥

৩

এই ক্ষিতিতলে লভিয়া জনম
দুঃখ ছিল মোর সাথী।
পলে পলে শুধু পাইয়াছি দাগা
সংসারের ঝাঁটা লাথি॥

৪

সংসার আমড়া আকণ্ঠ খাইয়া
দেখিয়াছি নানা মতে।
নাহি সুখ লেশ জ্বলে হায় শেষ
শূলের বেদনা তাতে॥

৫

আপাত মধুর মায়ার মোহন
সাজান বাগান দেখে।
ভুলেছিনু নাথ ভুলেছিনু তোমা
এখন শিখেছি ঠেকে॥

৬

ছায়াবাজী প্রায় সকলি শুকায়
এই আছে আর নাই।
চপলার মত আলেয়ার আলো
আঁধারের নাহি থাই॥

৭

পুনঃ পুনঃ প্রভু তাহাতে ভুলিয়া
ছুটিয়াছি তারি পানে।
কাঞ্চন কিনিতে কাচে দিছি গেরো
প্রাণপণে সযতনে॥

৮

জমা খরচের নিকাশ করিতে
প্রাণে হল মহাভয়।
ডরে কাঁপে প্রাণ কারে বা শুধাই
জগতে নাহি আশ্রয়॥

৯

মহা বিভীষিকা দেখি চারিভিতে
চরণ ধরিয়া সাধি।
সকলেই বলে কি হ'বে উপায়
শিবের অসাধ্য ব্যাধি॥

১০

এ হেন সময়ে কেহ কা'র নহে
নিজ লয়ে মত্ত সবে।
আমার যাতনা কেহত বুঝে না
কেবা মোর এই ভবে?

১১

বিনিদ্র রজনী কত যে কাটা'নু
পলে পলে জ্বলে মরি।
শুষ্ক প্রাণ হায় যেতে নাহি চায়
কি উপায় বল করি?

১২

ভাবিনু তখন এ জগত মাঝে
কভু কার কেহ নয়।
তাঁহারই প্রেম অপাত্রে সঁপেছি
তিনি মাত্র দয়াময়॥

১৩

এতেক যখন বুঝালেন প্রভু
কৃপা তবে হ'ল তাঁর।
ধীরে ধীরে ধীরে সব গেনু ভুলে
প্রেম পূর্ণ পারাবার॥

১৪

শুষ্ক তরু হায় মুঞ্জরি উঠিল
পাষাণে ঝরিল বারি।
আবার জগৎ নূতন দেখিনু
গুরুপদ হৃদে ধরি—
(আহা গুরুকৃপা লাভ করি॥)

১৫

প্রত্যক্ষ বুঝিনু আমার মতন
ছিল না অভাগা কেহ।
প্রেমময় তিনি নিশ্চয় কহিনু
নহিলে আমারে স্নেহ?

১৬

শ্রীচরণে তব কাতর মিনতি
শুন ওহে দয়াময়।
আর ভুলা'ওনা দোহাই তোমার
ডুবাও হে রাঙ্গা পায়॥

"কাঙ্গাল।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সমাধি-মন্দির ফাণ্ড।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, বিগত ১লা মার্চ্চ হইতে ৩০শে এপ্রেল অবধি নিম্নলিখিত সহৃদয় ভদ্র মহোদয়গণের নিকট হইতে, কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমাধি স্থানে যে নূতন মন্দির নির্ম্মিত হইবে, তাহার জন্য সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

মিষ্টার বি, এল, চ্যাটার্জ্জি, বোম্বাই ... ... ২৲
শ্রীযুক্ত বাবু বিভূতিভূষণ মৈত্র, পুঁটিয়া রাজবাটী, বেনারস ... ১৲
" " হরপ্রসন্ন মজুমদার, ঢাকা ... ... ৫৲
শ্রীমতী সুষমা বাণী বসু, কলিকাতা ... ... ১৲
শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র ঘটক, রাঁচি ... ... ১৲
তত্ত্ব-মঞ্জরীর জনৈক গ্রাহক, ময়মনসিংহ ... ... ১৲
ডাক্তার প্রকাশনাথ হালদার, বেনারস সিটি ১৵০
শ্রীযুক্ত বাবু জীবিতনাথ দাস, দিনাজপুর ... ... ১০৲
শ্রীমতী শরৎকুমারী মিত্র, কলিকাতা ... ... ১৲
মারফৎ তত্ত্ব-মঞ্জরীর জনৈক গ্রাহক, সাকৃচি, সিংহভূম ... ১৲
মারফৎ শ্রীযুক্ত বাবু শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, দত্তপাড়া, নোয়াখালী ... ৩৮৵০

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন গুহ রায় ... ১০৲
" " কালীনাথ গুহ রায় ... ৫৲
" " যদুনাথ গুহ রায় ... ৪৲
" " শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ... ২৲
" " সুধাংশুকুমার বসু ... ১৷০
" " সীতানাথ গুহ রায় ... ১৲
" " জানকীনাথ গুহ রায় ... ১৲
" " প্রিয়নাথ গুহ রায় ... ১৲
" " যতীন্দ্রনাথ গুহ রায় ... ১৲
শ্রীমতী সুলতা সুন্দরী চৌধুরাণী ... ১৲

শ্রীমতী প্রেমলতা গুহ রায় ... ১৲
শ্রীযুক্ত বাবু হরলাল গাঙ্গুলী ... ১৲
" " রাধানাথ চক্রবর্ত্তী ... ১৲
" " বরদাকৃষ্ণ মজুমদার ... ১৲
" " শশীকুমার বসু ... ১৲
" " জ্যোতিশচন্দ্র রায় ... ১৲
" " কৈলাসচন্দ্র দে ... ॥০
" " কৈলাসচন্দ্র ভরদ্বাজ ... ॥০
" " দেবেন্দ্রকুমার গুহ ... ॥০
" " নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ... ॥০
" " যোগেন্দ্রনারায়ণ সুর ... ॥০
" " গিরীশচন্দ্র বসু ... ॥০
" " সুররাজ বসু ... ॥০
রামরতন হাই স্কুলের ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর ছাত্রগণ ৮/০
খুচরা আদায় ... ১৲

মোট ——— ৬২৸/০

১৩২১ সালের তত্ত্ব-মঞ্জরীতে প্রাপ্তি স্বীকার
করা হইয়াছে ১৯৪৫॥৶০

মোট———২০০৮॥৵০

উপরোক্ত মন্দির নির্ম্মাণের জন্য উৎসাহান্বিত হইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যিনি যাহা কিছু সাহায্য করিবেন, তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে।

যোগবিনোদ
শ্রীরামকৃষ্ণ-সমাধি-মন্দির মঠ।
যোগোদ্যান—কাঁকুড়গাছী, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীচরণ ভরসা।

জয় গুরুদেব !!

তত্ত্ব-মঞ্জরী

ঊনবিংশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা।

আষাঢ়, সন ১৩২২ সাল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত।

তিলোকামদ—যৎ।

দেবাদিদেবং শরণং ব্রজামি।
শ্রীরামকৃষ্ণং সমাশ্রয়ামি ॥
নরদেবমূর্ত্তিং চিদ্‌ঘনরূপং,
জ্যোতির্ম্ময়ং ব্রহ্মস্বরূপ-অরূপং,
জগতামতীতং জগদেকবন্দ্যং,
শ্রীরামকৃষ্ণং শ্রীগুরুং নমামি ॥
চিদম্বরং দেবং স্ববোধ-স্বরূপং,
শিবাত্মকং শান্তং দ্বৈতাদ্বৈতহীনং,
সত্যং নিরালম্বং সমাধি-গম্যং,
শ্রীরামকৃষ্ণং শ্রীগুরুং ধ্যায়ামি ॥
অপার-সচ্চিদ্-নীরাধি-হংসং,
যতীশ-মানসে সমুদং রমন্তং,
অঘোঘ-বারকং ত্রিতাপ-হারকং,
শ্রীরামকৃষ্ণং শ্রীগুরুং ভজামি ॥
ধর্ম্ম-সমন্বয়মুদ্‌ঘোষয়ন্তং,
তত্ত্বস্য সারং পরিপ্রকাশয়ন্তং,
শাস্ত্র-বিবাদং ইহ খণ্ডয়ন্তং,
শ্রীরামকৃষ্ণং শ্রীগুরুং স্মরামি ॥
কুরু কৃপা-লেশং ময়ি দীনহীনে,
নিষীদ [illegible]কমলে হৃদ্-পদ্মাসনে,
চরণ-[illegible]কং দেহি মে সুখদং,
ভ[illegible]িং ভীমং [illegible]

প্রেমময়ের আহ্বান।

—০ঃ *-ঃ০—

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই প্রেমময়ী জননীর স্তনযুগলে দুগ্ধস্বরূপ প্রেমপীযূষ-ধারার আবির্ভাব হয়, প্রাতঃস্মরণীয়া পতিতা অহল্যার উদ্ধারের জন্য পতিত-পাবন শরীর ধারণ করিয়াছিলেন, ঘোরা অন্ধকারময়ী রজনীর তিমিররাশি নিমেষে দূরীভূত করিবার জন্যই, জবাকুসুমসঙ্কাশ মহাদ্যুতির প্রতিমূর্ত্তি দিবাকরের দিব্য দরশন। ভক্তাবতার মহাত্মা রামচন্দ্র তাঁহার অমিয় বক্তৃতা-বলীতে আশ্বাসিত করিয়াছেন যে, "অন্ধকারের জন্যই আলোক, আলোকের জন্য আলোক নহে," পতিত ও পতিতার জন্যই পতিতপাবন, দীনের জন্যই দীননাথ, অনাথের জন্যই অনাথনাথ, অধমের জন্যই অধমতারণ, বিপদের জন্যই বিপদবারণ, জীবের জন্য বার বার শরীর ধারণ করিয়া থাকেন। ভগবান যীশুখৃষ্ট—বালক যীশুখৃষ্ট—তাঁহার মধুর বাল্য জীবনে একদিন জীবের উদ্ধারের জন্য, পতিতার নিস্তারের জন্য যে প্রেম ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা কোন অপবিত্রার হৃদয়ে শান্তিধারা প্রবাহিত না করিবে? তিনি নিজেই জারজপুত্র নামে অভিহিত হইয়া কলঙ্কিনী মাতার কলঙ্ক মোচন করিয়াছিলেন। একদিন সমাজ শাসিত কোন কলঙ্কিনীকে ইষ্টক আঘাতে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন; সেই দেশে এই নিয়ম ছিল যে, যদি কোন রমণী কপাল দোষে কুলটা হইত, তাহা হইলে তাহাকে সকলে ইট মারিয়া প্রকাশ্য স্থানে হত্যা করিত। করুণাময় যীশু সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, "তোমরা উহাকে ঐরূপে নিগৃহিত করিতেছ কেন?" উত্তর হইল, "অসতী রমণীর ইহাই পরিণাম।" তখন প্রেমময় তাহাদের "ভাবের ঘরে চুরি" ভাঙ্গিবার জন্য বলিলেন, "ভাই সকল, সকলে বুকে হাত দিয়া বল দেখি, তোমাদের কাহারও হৃদয়ে কখনও কামের উদ্দীপনা হইয়াছিল কি না? যদি কেহ এমন থাক, এখনই ঐ মাতৃমূর্ত্তির শ্রীঅঙ্গে অনায়াসে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে পার।" প্রেমময়ের এই প্রেমবাণী সকলের অন্তস্থল স্পর্শ করিল। নিমেষে সকলের আঁতে ঘা পড়িল, বুঝিল তাইত আমরা কি করিতেছি এই অমূল্য জীবন লইবার আমরা কে? কে উহার কর্ত্তা? সকলের মোহান্ধকার বিদূরিত হইল। বালক যীশু তখন

জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে ঐ মাতৃক্রোড়ে স্থান পাইলেন, কলঙ্কিনী কণককিরণে প্রতিভাতা হইলেন। এই বিশ্বরঙ্গমঞ্চে একটী কীটাণু সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা নাই, কোন সাহসে কাহারও প্রাণে আঘাত করিতে যাই? সমাজ পরিত্যক্ত মাতাল গিরিশ ঘোষকে সকলে ঘৃণা করিত, প্রেমময় তাঁহাকে শ্রীচরণাশ্রয় দেওয়াতে কত আপত্তি! কত লোকে কত কথা বলিত, একদিন প্রেমময় বলিলেন, "তোরা, তোদের ভাব্না ভাবনা—উহার যিনি কর্ত্তা, তিনি উহার ভাবনা ভাবিতেছেন।"

শ্রীগুরুকৃপায় জানিয়াছি, কোন সময়ে এক দীনা হীনা পূর্ণ অশান্তিক্লিষ্টা কাঙ্গালিনী বড় জ্বালায় জ্বলিয়া তাঁহার শ্রীচরণ প্রান্তে উপনীত হইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "প্রভু! আমার ত জগতে কেহ নাই, কোন ভরসা নাই, কোন পুণ্য নাই, বরং অনন্ত অকর্ম্মরাশি অসীম অশান্তি সাগরে ডুবাইয়া রাখিয়াছে, আমার গতি কি হইবে?" প্রেমময় তৎক্ষণাৎ অভয় দিয়া বলিলেন, "তোমায় ভয় কি মা? যার কেউ নাই তা'র আমি আছি।" জয় প্রভু! এ জগতে যা'র কেহ নাই, তা'র জন্যই তোমার অভয় অঙ্ক চির উন্মুক্ত! অন্ধকারের জন্যই আলোক, অশান্তি পূর্ণপ্রাণে শান্তি ধারা ঢালিবার জন্যই—শান্তিনাথ! কাঙ্গালের জন্যই কাঙ্গালের ঠাকুর, ক্ষুৎপিপাসার্ত্তের জন্যই অন্নজল।

কৃষ্ণপ্রেম উন্মাদিনী শ্যাম কলঙ্কিনী শ্রীশ্রীরাধারাণীর কলঙ্ক মোচনের জন্য সতীগর্ব্বে গর্ব্বিতা গোকুল কুলনারীগণের গর্ব্ব চূর্ণ করিবার জন্য ভগবান্ বৈদ্য-বেশে যে খেলা খেলিয়াছিলেন, প্রাণে প্রাণে তাহা ভাব দেখি? "তোমার কলঙ্কে কলঙ্কিনী আমি, কলঙ্ক ঘুচাও হরি" বলিয়া শ্রীশ্রীরাধারাণী শত ছিদ্র কলসীতে বারি আনিলেন! কৈ, দাম্ভিক পরছিদ্রান্বেষী সতীগণ ত তাহা পারিলেন না! পরনিন্দা এমনই হেয়! কাহার নিন্দা করিব? শতছিদ্র যে আমারই রহিয়াছে। তাই ঠাকুর বলিয়াছেন, "কুলা আর চালুনী" কুলোর স্বভাব মন্দ ফেলিয়া ভাল রাখা এবং চালুনীর স্বভাব ভাল ফেলিয়া মন্দ রাখা" আমাদের অনেকের এমনই স্বভাব—জগতের গুণ লইব না, কেবল আবর্জ্জনা কুড়াইয়াই মরিতেছি। ভগবান তোমার সকল দোষ ফেলিয়া কেবল তোমা[র] গুণটুকু লইতেছেন, তোমার প্রাণ দেখিতেছেন, ইহাই তাঁহার করুণা, তুমি যেমনই হও না কেন, তোমার প্রাণটী সরল হইলেই হইল। শ্রীশ্রীগুরুদেব

বার বার বলিয়াছেন, তিনি তোমার ধন দৌলত কিছুই চা'ছেন না—দেখেন কেবল মনটা। তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু, তোমার মন যা চায়, তিনি তাহাই পূরণ করেন। তুমি প্রেম খুঁজিতেছ;—অসার অনিত্য চিটে গুড়ে প্রাণ হারাইতেছ, একবার প্রেমের খনির দিকে চাহিয়া দেখ দেখি? প্রেমময় তোমায় প্রাণ ভরিয়া আকুল প্রাণে ডাকিতেছেন, 'তোরা কে কোথায় আছিস আয়, তোরা কে কোথায় আছিস শীঘ্র আয়"—জয় প্রভু রামকৃষ্ণ। জীবগণ, শীঘ্র এস! ঐ দেখ প্রেমময় তোমায় ক্রোড়ে লইবার জন্য যাচিতেছেন, ঐ দেখ শ্রীদক্ষিণেশ্বরের নহবৎখানায় উঠিয়া প্রতি সন্ধ্যার আরতি কালে তোমাদের জন্য কেবল পতিত কাঙ্গালের জন্য কেবল অভাগিনীদের জন্য আকুল প্রাণে উচ্চরায় ডাকিতেছেন, "তোরা—শীঘ্র আয়,—আমি আর থাকিতে পারিতেছিনা, তোরা শীঘ্র আয়"—ঐ দেখ ভক্তগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন, আর গাহিতেছেন :—

এসেছে কাঙ্গালের ঠাকুর কাঙ্গালের তরে।
তোরা আয় ভিখারী, ত্বরা করি প্রেম নিবি আয় প্রাণ ভরে॥
দীনের মাঝে দীননাথ দীনে নাম বিলায়,
দীনের ব্যথা প্রাণে প্রাণে মুখের পানে চায়,
(বলে) পাপী তাপী কে আছিসরে আয়,
(তোদের) ভয়—কিরে আর আমারি ভার, বকল্‌মা দে আমারে॥

জীবগণ! তোমরাও মাতৃ ক্রোড়াশ্রিত সরল শিশুর ন্যায়,—প্রেমময়ের শ্রীঅঙ্কাশ্রিত পরমস্নেহপালিত বালক গিরিশচন্দ্রের বাল্যভাব লইয়া—আপনাকে "জগৎপতির—জগৎ ছাড়া নয়" জ্ঞান করিয়া প্রাণ ভরিয়া গাহিতে থাক :—

"ডাক্‌লে তুমি অমনি শোন, অমনি তুমি কাছে আস।
আমি তোমায় দেখে হাসি, তুমি আমায় দেখে হাস॥
শুনেছি দুনিয়া তোমার, তুমি বল তুমি আমার—
আমি তোমায় ভালবাসি, তুমি আমায় ভালবাস॥

"কাঙ্গাল।

শান্তি।

—•-:০:-০—

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণরূপে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া জগতে চিরশান্তি প্রদান করিতেছেন। কত পথহারা পথিকগণ রামকৃষ্ণ নাম অবলম্বন করিয়া শান্তি-ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতেছেন। কত মহাপাপী নাস্তিক আস্তিক হইয়া চির-জীবনের মত শান্তি-সাগরে ভাসিতেছেন। তাই বলি ভাই—এই সংসার মরুভূমি মাঝে যদি কেহ ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলিয়া থাক, তাহা হইলে আইস, পুণ্যভূমি যোগোদ্যানে প্রভু বাহু প্রসারণ করিয়া, পাপী-তাপীদিগের নিস্তারের জন্য মুক্তহস্তে অভয় প্রদান করিতেছেন। এই নব-যুগে নব ভাবের সৃষ্টি করিয়া অযাচিত ভাবে প্রেম বিলাইতেছেন। যদি কাহার লভিবার ইচ্ছা থাকে, তবে একবার প্রভুকে স্মরণ কর; প্রাণ ভরিয়া রামকৃষ্ণ নাম বল; দেখিবে যে, প্রাণে প্রাণে বিমলানন্দ ভোগ করিতেছ। কথার কথা নয়, সত্য, প্রত্যক্ষ, হয় না হয়, বলিয়া দেখ। প্রভু আপনি শ্রীমুখে বলিয়াছেন যে, আমার জন্য যে এক পা অগ্রসর হয়, আমি তাহার জন্য দশ পা অগ্রসর হইয়া যাই। তবে, আর ভাবনা কি? জয় রামকৃষ্ণ বলিয়া প্রভুর পাদপদ্মে আত্ম সমর্পণ কর। তোমার এই অশান্তিপূর্ণ বিষময় সংসার অমৃতময় হইবে, প্রাণে প্রাণে শান্তি অনুভব করিবে। এই সুখের বাজারে বসিয়া আনন্দে বেচা কেনা করিতে পারিবে, প্রাণের জ্বালা মিটিবে, কোন অভাব থাকিবে না। তাহার সাক্ষী মহাত্মা রামচন্দ্র। স্বয়ং ধন্য হইয়া জগতকে ধন্য করিবার জন্য বসিয়া আছেন। আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে, যে একবার রামকৃষ্ণ নাম বলিতেন, দয়াল রামচন্দ্র তাঁহার জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি পথে পথে যাচিয়া নাম বিলাইতেন, ও পথে যাঁহাকে পাইতেন, তাঁহাকে ধরিয়া প্রভুর সম্মুখে আনিতেন ও তাঁহার নিস্তারের জন্য কত অনুনয় বিনয় করিতেন—অদ্যাবধি ঠিক সেইরূপই হইতেছে। যদি কাহারও বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে ভক্তবীর গিরিশচন্দ্র ঘোষের "রাম-দাদা" প্রবন্ধটী পাঠ করিলে অবগত হইতে পারিবেন। যতই পাপী হউক না কেন, দয়াল গুরু তাঁহার হাত

ধরিয়া, ঠাকুরের নিকট লইয়া গিয়া, নাম মদিরা পানে বিভোর করিয়া দিতেছেন ও সকলে কৃপা লাভ করিতেছেন। এমন কি, ছাড়িলেও নিস্তার নাই, আর কাহার ছাড়িবারও শক্তি নাই; ছাড়িতে গেলেই প্রাণ ছটফট করিতে থাকে। এমনই নেশার আকর্ষণ যে, তখনই রামকৃষ্ণ-মদিরা পান না করিলে প্রাণ বাঁচে না, অমনই নাম-মদিরা পানে বিভোর হইতে হয়। কি আশ্চর্য্য, এমন ভাব দেখি নাই, কিম্বা শুনি নাই। আমি কোন সময় মনের দুঃখে বলিয়াছিলাম যে, আর যোগোদ্যানে যাইব না; কিন্তু পারি না, বুক ফাটিয়া যায় ও প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। থাকিতে না পারিয়া ছুটিয়া যাই, অমনই প্রাণে শান্তি পাই। জয় প্রভু রামচন্দ্র, আজ তোমার ঠাকুরকে আনিয়া তুমি জগতের মঙ্গলের জন্য নিত্য আবির্ভাবে পুণ্য যোগোদ্যানে বিরাজ করিতেছ।

যোগীন।

একটী স্বপ্ন।

—*-:*:-*—

সারাদিন অবিরলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। কখনও বা টিপ্‌টিপ্ করিয়া, আবার কখনও বা মুষলধারে এইরূপ ক্রমান্বয়ে চারি দিন ব্যাপিয়া বসুন্ধরা স্নিগ্ধ হইতেছেন। মা যে আমাদের জন্য কত দুঃখ সহ্য করেন, তাহা বর্ণনাতীত। পাপের ভরে কখনও মস্তক ঈষৎ হেলাইয়া লন, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপে তাপিত হইয়া মধ্যে মধ্যে এইরূপ শীতলতা লাভ করেন। কিন্তু মানব মাত্রেরই তখন মহা অসুবিধার কারণ ঘটে। তাহারা এতই স্বার্থপর যে, নিয়মিত সময়ে সূর্য্যদেব দেখা না দিলে ও যথাকালে যথাকার্য্য না হইলে ভগবানের রাজ্যে একটা বিশৃঙ্খলা হইল বলিয়া তাঁহাকে নিন্দাবাদ করে। তাহারা ভ্রমেও ভাবে না যে, প্রত্যেক কার্য্যের ভিতর তাঁহার একটী সৎ ও গুপ্ত উদ্দেশ্য নিহিত আছে।

আজ এই কয়দিন বৃষ্টিতে সকলেরই বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। রাস্তায় বাহির হইলেই কর্দ্দম চর্চ্চিত হইবার অধিক সম্ভাবনা।

হতভাগ্য কেরাণী ভিন্ন আর সকলেই গৃহমধ্যে কূপমণ্ডূকবৎ অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছে। আমিও এই কয়দিন গৃহ ত্যাগ করিতে পারি নাই। রাত দিন এক রকম জীবন নিয়ে যেন ত্যক্ত হয়ে পড়েছি। কিছুই ভাল লাগে না, সব যেন বিষবৎ বোধ হইতেছে। রাত্রে ঘুমাইবার বিলক্ষণ চেষ্টা করিতেছি। বহু আরাধনার পর নিদ্রাদেবী দয়া করিয়া দেখা দিলেন।

কিছুক্ষণ বাদে মনে হইল, যেন আমি ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছি। এই স্থান যেন আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, তত্রাপি আমার ভ্রমণ স্পৃহা ত্যাগ করিতে পারিলাম না। নূতন দেশ দর্শন হেতু আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলাম। ক্রমেই অগ্রসর হইতেছি, কে যেন আমাকে বলপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া যাইতেছে, আর আমি যেন মায়ামন্ত্রমুগ্ধবৎ উহার অনুসরণ করিতেছি। ক্ষণিক পরে দেখিলাম যে, পথটী ক্রমশঃই সংকীর্ণতর ও দুর্গম হইতেছে, উহা আর পূর্ব্বের ন্যায় শোভাসম্পন্ন ও আরামদায়ক নয়। তথন কণ্টক বৃক্ষরাজি উহার উভয় পার্শ্বে বর্ত্তমান আছে। গতির বেগ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে, আমার সর্ব্ব শরীর অবশ ও ক্ষত বিক্ষত হইতেছে, কিন্তু উপায় নাই। কতবার মনে মনে ঠিক করিলাম যে, যেরূপে পারি গৃহে ফিরি, কিন্তু সাধ্য কি আমার?

এইরূপে যাইতে যাইতে এক নদীর সম্মুখে আসিলাম, উহার যেন আদি নাই, অন্ত নাই। উহার পর্ব্বত প্রমাণ উর্ম্মিমালা দেখিয়া ও বজ্রগভীর শব্দ শুনিয়া শরীর আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। পশ্চাতে কে যেন উচ্চহাস্যে কহিল, "*অবিলম্বে তোমাকে ইহা পার হইতে হইবে।*" *সঙ্গে সঙ্গে উহার মধ্যে* পড়িলাম। আতঙ্কে আত্মবিস্মৃত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম যে, একটী বৃহৎ সর্প মুখব্যাদানপূর্ব্বক আমার দিকে আসিতেছে। ভগবান্! রক্ষা কর রক্ষা কর বলিয়া চীৎকার করিয়া প্রাণ ভয়ে সন্তরণ দিতে লাগিলাম। পুনরায় চাহিয়া দেখি, উভয় পার্শ্ব হইতে বৃহদাকার দুইটী হাঙ্গর ও কুম্ভীর বিশাল দশনপংক্তি ব্যক্ত করিয়া আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে।" পুনরায় কাতরকণ্ঠে বলিলাম, "দয়াময়! বাঁচাও!" আবার নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলাম, সম্মুখে বৃহদাকার এক তিমি মৎস্য আমায় লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছে। স্থির সিদ্ধান্ত করিলাম যে, এ যাত্রা আর নিস্তার নাই। প্রাণ ভয়ে

কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলাম, "ভক্তবৎসল! তোমার পবিত্র নামে কলঙ্ক দিও না।" দেখিলাম, এক প্রকাণ্ড তুফান বেগে আসিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার সংজ্ঞা লুপ্ত হইল। বহুক্ষণ পরে অল্পে অল্পে জ্ঞান সঞ্চার হইতে লাগিল। চাহিয়া দেখিলাম, আমি সেই নদীর তীরে। কখন ও কিরূপে আসিলাম তাহা জানি না। আশু বিপদ হইতে মুক্তিলাভ হইল। ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইলাম।

কিছু পরে মনে হইল আবার আমায় কে যেন বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছে, আমিও পূর্ব্বের ন্যায় বাধা দিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কোনরূপে স্থির থাকিতে পারিলাম না। অগ্রসর হইতে হইতে দেখিলাম, যেন আমি একটী নিবিড় বন মধ্যে আনীত হইয়াছি। চতুর্দ্দিকে ভীষণ বন্যজন্তুর ভয়ানক রব শ্রবণ করিয়া ভয়ে মৃতপ্রায় হইলাম। পশ্চাতে এক ভীষণাকার ব্যাঘ্র, পার্শ্বে এক ভল্লুক ও বরাহ দেখিয়া, প্রাণের মায়া সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া শ্রীহরির স্মরণপূর্ব্বক ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিলাম। যেন আরও গভীর কানন মধ্যে আসিয়া পড়িলাম এবং দেখিলাম যে, আমার শত্রু সংখ্যাও প্রতি পলে পলে বৃদ্ধি পাইতেছে। পা যেন আর চলিতেছে না, শরীর যেন ক্রমশঃ অবশ হইতেছে, মন যেন হতাশ হইতেছে। আমার বোধ হইল যে, এইখানেই আমার ভবলীলা সাঙ্গ হইল। মধ্যে মধ্যে আমার পশ্চাৎধাবনকারীদিগের উষ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস অনুভব করিতে লাগিলাম। প্রাণ ভয়ে পলায়ন ও আহার অন্বেষণের গতির বিশেষ তারতম্য আছে। ক্ষীণকণ্ঠে মধ্যে মধ্যে ভগবানের নিকট প্রাণ ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিলাম। কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষলতাদিতে আমার শরীর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। ক্ষতবিক্ষতাঙ্গে অবশ শরীরে চলিতে লাগিলাম। ক্ষণিক পরে সম্মুখে একটী ক্ষীণ আলোকরশ্মি দেখিতে পাইয়া উৎসাহান্বিত অন্তরে দৌড়াইতে লাগিলাম। এইরূপে অল্পক্ষণ মধ্যে একটী পর্ব্বত নয়নপথে পতিত হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় উহার তলদেশে উপনীত হইবামাত্র আর আমার কোন ভয়ের কারণ রহিল না। কারণ ঐ সকল হিংস্রজন্তুগণ গহন প্রান্তদেশে অবস্থানপূর্ব্বক আমার প্রতি রোষকষায়িতলোচনে ও লোলুপদৃষ্টিতে অবলোকন করিতে লাগিল। আমি স্থির বুঝিলাম যে, ইহাদের হস্তে উপস্থিত আর আমার কোন ভয় নাই। তাহা না

হইলে এতক্ষণে আমি উহাদের ভক্ষ্যবস্তু রূপে পরিণত হইতাম। এইরূপ পুনরায় একটী বিপদে মুক্তিলাভে ভগবানকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্ব্বক বিশ্রামার্থ অবস্থান করিলাম।

কিন্তু ও হরি! অল্প বিশ্রাম লাভেই মনে হইল, যেন সেই অপরিচিত শক্তিটি আমাকে শনৈঃ শনৈঃ আক্রমণ করিতেছে। আমি যেন ক্রমশঃই ইহার অধীন হইয়া পড়িতেছি। অবশেষে পূর্ব্ববৎ কে যেন অনিচ্ছাসত্বে বলপূর্ব্বক আমাকে অগ্রসর করাইয়া লইয়া চলিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার শরীরে বল একতিলও নাই—নড়িবার শক্তি নাই, কিন্তু সে কথা কে শুনে! পূর্ব্বের ন্যায় আমাকে চলিতে হইল, বাধা বিঘ্ন—সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া আমায় প্রাণপণ দৌড়াইতে হইল। কতবার কাতরস্বরে আমি আমার অদৃষ্টদেবকে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভাশায় কাতরস্বরে ডাকিলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। কভু পর্ব্বত গাত্র হইতে পতিত হইয়া দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া, কভু প্রাত্রাস্থিত গহ্বর মধ্যে পদদ্বয় নিষ্পেষিত করিয়া, কভু উত্থান পতনে অবসন্ন হইয়া, অবিরাম চলিতে লাগিলাম। সকরুণ আর্ত্তনাদে বলিলাম, "দয়াময়! জানিনা কোন্ ভীষণ পাপে আমার এইরূপ শাস্তি। আর আমি সহ্য করিতে পারি না। এইরূপ তুষানলে দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু আমার নিকট শতগুণে প্রার্থনীয়। আর আমি প্রাণের মায়া রাখি না। আমার কেবলমাত্র প্রার্থনা যে, তুমি আমায় অবকাশ দেও।" বোধ হয় এ করুণ ক্রন্দন তাঁহার কোমল প্রাণে আঘাত করিল। সঙ্গে সঙ্গে গতির বেগ মন্দীভূত হইল। আমিও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। শারীরিক ও মানসিক দারুণ কষ্টে মৃতপ্রায় হইয়া ঐ পর্ব্বত গাত্রে অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমিতে শয়ন করিলাম। কিয়ৎক্ষণ প্রাণ ভরিয়া বিশ্রাম লাভের পর যেন পুনর্জ্জীবন লাভ হইল। ভয় হইতে লাগিল যে, এইবার বুঝি পূর্ব্বের ন্যায় ছুটিতে হইবে। কিন্তু অনেকক্ষণ গত হইলেও, যখন কোনরূপ অঘটন হইল না, তখন বুঝিলাম যে এইবার আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল।

এমন সময়ে বীণা মধুর নিক্কণধ্বনি আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। নয়ন উন্মীলনপূর্ব্বক দেখিলাম যে, সমতল ভূমি হইতে দুইটী পথ দুইটী শিখর দেশে নীত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে একটী শৃঙ্গ দেশে লোকললামভূতা, অপ্সরীসদৃশা, নানালঙ্কারভূষিতা, একদল যুবতী নৃত্য-গীত দ্বারা আমাকে

নানা প্রলোভন করিয়া তাহাদের নিকট আসিতে ইঙ্গিত করিতেছে। তাহাদের মুণিজনমনলোভা আকর্ষণে আমার মনপ্রাণ হরণ করিল। চরণ আমার অজ্ঞাতসারে তাহাদের দিকে অগ্রসর হইল।

এমন সময়ে অপর শৃঙ্গদেশে একটী দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। দেখিলাম, গৈরিকবসনশোভিত শান্ত ও সৌম্যমূর্ত্তি, প্রেমের আধার, সহাস্যবদন, কতকগুলি পুরুষ ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তারস্বরে ভক্তিমূলক গান গাহিতে লাগিলেন। আমি বিভোর হইয়া শুনিতে লাগিলাম। ধীরে ধীরে নিকটস্থ হইয়া, উঁহাদের চরণে মস্তক লুণ্ঠিত করিলাম। তাঁহারাও আমাকে স্নেহাশীষ পূর্ব্বক কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। অপর পার্শ্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম যে, জনমানবেরও চিহ্ন নাই!

সাধুদিগের সহিত গমনকালে পথিমধ্যে যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনা হইয়াছিল, তাহাদিগের অর্থ জানিবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল। আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া উঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "তুমি কোন কোন বিষয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছ।" আমি সাগ্রহে উত্তর দিলাম, আপনি যথার্থই বলিয়াছেন। যদি দয়া করিয়া ঐ সকলের ব্যাখ্যা করিয়া দেন, তাহা হইলে অত্যন্ত সুখী হই।" পুনরায় তিনি বলিতে লাগিলেন, "প্রথমে একটী সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া যাইতে যাইতে একটী সাগরে তোমার পতন হইল। পরে একটী নিবিড় কানন মধ্যে প্রবেশ করিলে ও উহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াই এই পর্ব্বত শৃঙ্গে আমাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল।" আমি সোৎসুকে বলিলাম, "আপনি কিরূপে ঐ কথা জানিতে পারিলেন?" তিনি মৃদু হাস্যে কহিতে লাগিলেন, "বৎস! উহা আমাদিগের গুরুদেবের কৃপায় ও আশীর্ব্বাদে। তিনি আমাদের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন, তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। প্রথমে তুমি অতি সঙ্কীর্ণ স্থান দিয়া সংসারে প্রবেশ লাভ করিয়া মায়াসাগরে পতিত হইলে। তৎপরে বিপদ সঙ্কুল সংসারারণ্যে উপনীত হইয়া দেখিলে, যে সকলেই স্বার্থপর—প্রকৃত ব্যথার ব্যথী পাওয়া দুষ্কর। তখন তুমি মুক্তিপর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলে। এখানে আসিয়াও দেখিলে যে, তুমি যাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, তাহারাই আবার তোমাকে দলভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। যে স্তন্যপানে তুমি জীবন ধারণ করিয়াছ, তাহাই আবার তোমাকে

প্রলোভিত করিয়া মৃত্যু মুখে ডালি দিতেছে। যদি তুমি আমাদের দেখা সত্ত্বেও ঐ সকল মায়াবিনীদের হস্তে বন্দী হইতে, তাহা হইলে আমরাও বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতাম। কিন্তু তুমি বড়ই ভাগ্যবান।” এই কথা শ্রবণান্তে আমি তাঁহাদের প্রত্যেকের চরণধূলি লইয়া বলিলাম, “আপনাদের গুরুদেবের অশেষ দয়ায় অধম এই সকল বিপদজাল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এখানে আসিয়া আমার শরীরের ক্ষত সকল নাই, মনে শান্তি পাইয়াছি, হৃদয়ে অদম্য উৎসাহ আসিয়াছে। কিন্তু একটী বিষয় আপনারা আমাকে বলিয়া দেন নাই। পুনরায় তিনি সস্নেহভাবে কহিতে লাগিলেন, “তোমার অজ্ঞাত আকর্ষণের তাৎপর্য্য কি? গত জন্মে তুমি কিছু সৎকার্য্য করিয়াছিলে, এ কারণ এ'জন্মে সংসার পথের পথিক হইয়াও তুমি ভগবানের প্রতি ভালবাসা ভুলিতে পার নাই। তাই আমাদের দয়াল ঠাকুর তোমাকে টেনে এনেছেন। আর এই রকম ভাবদীপ্ত সংসারতাপক্লিষ্ট হতভাগ্য মানব সন্তানদিগকে তাঁহার শ্রীচরণে স্থান দিয়া প্রকৃত শান্তি দিবার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিতেছেন। তুমি এই সকল বিপদরাশি হইতে মুক্তি-লাভ করিতে পারিতে না, যদি তুমি এইরূপ একান্তভাবে তাঁহার স্মরণ না লইতে। কারণ তিনি বলেন যে, “যে লোক সংসারে কুলটার মত অবস্থান করে, পরে তাহারা আমার নিকট আসিতে পারে। সংসারের অন্তকার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও যাহারা কামিনী ও কাঞ্চনে ততোধিক আকৃষ্ট না হয়, পরে তাহারা আমার প্রিয়পাত্র হয়। ফলকথা, যাহারা কর্ত্তব্যের খাতিরে অনাসক্তভাবে সংসারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহারাই ধন্য।” ঐ মহাপুরুষদিগের এইরূপ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া আমি তাঁহাদের চরণে পতিত হইয়া ব্যাকুলচিত্তে কহিলাম, “দয়া করিয়া আমাকে শীঘ্র ঐ ঠাকুরের নিকট লইয়া চলুন। যাঁহার কৃপায় প্রাণে এইরূপ বিমল শান্তি উপভোগ করিতে পারা যায়, যাঁহার নাম স্মরণে মাত্র পাপী তাপীর সকল ক্লেশ দূর হয়, যাঁহার অশেষ দয়ায় মানবগণ ভীষণ সংসারসাগরে পতিত হইয়া শান্তিময়ী বেলাভূমি দেখিতে পায়, সেই পতিত পাবন ভক্তবৎসল দয়াময় প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিতে বড়ই বাসনা হইয়াছে।” তাঁহারা বলিলেন, “সম্মুখে দেখ। উহাই আমাদের প্রভুর আবাসস্থল, উহাকে আমরা শান্তি-কুটীর বলি।”

দেখিলাম যে, সহাস্যবদন বালকস্বভাব এক সৌম্যমূর্ত্তি বসিয়া আছেন। কত বালক বালিকা, কত যুবক যুবতী, কত বৃদ্ধ বৃদ্ধা তাঁহার চতুর্দ্দিকে বসিয়া মধুময়ী বাক্যাবলী শ্রবণ করিতেছে। যেন শুকদেব তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী লইয়া সুখে কালাতিপাত করিতেছেন। কখন তাহারা তাঁহার মধুর রহস্যালাপে আনন্দে মাতোয়ারা হইতেছে, আবার কখন বা তাঁহার সুন্দর সদুপদেশে রোমাঞ্চিত কলেবর লাভে কৃতার্থ হইতেছে। ক্রমশঃই দলসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনিও দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁহার সন্তানদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কাহাকেও তিনি বলিতেছেন, "সচ্চিদানন্দ সাগরে সর্ব্বদা থাকিতে পারিলে প্রকৃত সুখের মর্ম্ম বুঝিতে পারা যায়।" আবার কখনও তিনি কহিতেছেন, "সংসারটা যেন আমড়া আঁটী ও চামড়াই সার।" আবার কাহাকেও বলিতেছেন, "মায়ার আবরণ সরাইয়া না দিলে তাঁকে জানতে পারা যায় না।" এরূপ কতশত উপদেশাবলী অনর্গলভাবে বলিতেছেন। আমিও উঁহার নিকটস্থ হইয়া শ্রোতৃবর্গের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিয়া মনে মনে বার বার প্রণাম করিতে লাগিলাম। পরে চিন্তা করিতে লাগিলাম, যে কবিবর যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য—

"(আমার) মাথা নত করে পাতহে তোমার
চরণ ধূলার তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার
ঘুচাও চক্ষের জলে॥
নিজেরে করিতে গৌরব দান,
নিজেরে কেবলি করি অপমান;
আপনারে শুধু ঘিরিয়া ঘিরিয়া,
ঘুরে মরি পলে পলে॥
নিজেরে না যেন করি হে প্রচার,
নিজের আপন কাজে;
তোমারি ইচ্ছা কর হে পূর্ণ,
আমার জীবন মাঝে॥
যাচিয়ে তোমার চরমশান্তি,

পরাণে তোমার পরম কান্তি ;
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও,
হৃদয় পদ্মদলে ॥"

হঠাৎ আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। দেখিলাম, দৃষ্টি সেইভাবে পড়িতেছে। মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গেল। কোথায় বা সেই শান্তি-কুটীর, আর কোথায় বা আমার অশান্তির আগার। আমার মত পাপী আর নাই। তাঁহার অভয়পদে আমার স্থান হইল না। শান্তির আধার তিনিই। যদি কণামাত্র ভোগ করিতে পারি, তাহা হইলে ধন্য হইব। এ স্বপ্ন কি আমার সত্য হইবে? সবই তাঁহার ইচ্ছা।

দীনসেবক—
শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।

নূতন মানুষ।

—•:-*-:•—

ঘোরা যামিনী স্তব্ধ নিশিথিনী
নিরব নিথর হিয়া।
বসিয়া একাকী আকাশের তলে
পাশরিয়া মোহ মায়া ॥

কেহ ত জাগ্রত নাহি ত এখন
সুপ্ত সবে, সব ভুলি।
জাগিয়া আছেন প্রাণের দেবতা
মুখে শুধু মা মা বুলি ॥

জাহ্নবীর তটে পঞ্চবটী মূলে
নূতন মানুষ তিনি।
না জানি কেমন অজানা প্রদেশে
বহে প্রেম মন্দাকিনী ॥

সেই প্রেম স্রোতে জগত ভাসাতে
চিন্তামগ্ন চিন্তামণি।
জীবের দুর্গতি নাশিবার তরে
অবতরি গুণমণি ॥

করুণা গঠিত প্রেমময় তনু
উজলিত সে আঁধারে।
জগতের হিতে আপনা পাশরি
ডাকিছেন সকাতরে ॥

আছ কে কোথায় এস গো ত্বরায়
সময় বহিয়া যায়।
প্রেমভাণ্ড আর বহিতে যে নারি
ত্বরায় ভাঙ্গিব হায় ॥

যতেক সাধনা তোমাদের তরে
সকলি সেধেছি আমি।
কিছুই যে আর হবেনা করিতে
আমি যে গো অন্তর্যামী॥

যে ভাবে যে জন ডাকিবে আমারে
পাবে মোরে সেই ভাবে।
ধর্ম্মলাভ তরে যে জন আসিবে
মনোরথ পূর্ণ হবে॥

সব মত পথ সকলি সুপথ
কোরোনাক দ্বেষাদ্বেষী।
যার যাতে রুচি তাই তার ভাল
ডাক তাঁরে ভালবাসি॥

ভালবাসা বিনা তাঁরে ত পাবেনা
রেখো মনে এই কথা।
ভালবাস তাঁরে সদা প্রাণ ভরে
ঘুচিবে প্রাণের ব্যথা॥

নামের তুলনা কি আছে বলনা
নাম সার এই ভবে।
কর নাম সার সকলি অসার
নাম বলে মুক্ত হবে॥

(যদি) তাও নাহি পার দেহ মোরে ভার
এ যে গো আমারি দায়।
কেহ নাই যার আমি আছি তার
ভুলোনাক অসময়
(জেনো ইহা সুনিশ্চয়॥)

"কাঙ্গাল।

—:•:—

উত্তরাখণ্ডে ভ্রমণ ও স্থিতি।

"উঠরে অলসমন আমার
প্রণতি কররে শ্রীরামকৃষ্ণ চরণে
হল নিশি অবসান বিভুগুণ গান
কররে মনরে অতি যতনে।
নিদ্রায় অচেতন ছিলে যে কালে
রাখিলেন যিনি অতি কুশলে
এখন তারে ভুল্‌বে কি বোলে।
তোমায় উঠাতে কূলে এ মহিমণ্ডলে
আর কেহ নাই সে বিভু বিনে।

ওরে যত সব অচেতন গণ
গাও বিভুগুণ হোয়ে সচেতন,
তুমি হোয়ে সচেতন র'লে অচেতন
চেতনে চেতনে ডাক সঘনে।"

কম্বল হইতে মুখ খুলিতে দেখি, যাত্রী সবাই আগ্রহপূর্ব্বক ঠাকুরের নাম শুন্‌ছে। ঠাকুরের জয়ধ্বনি পূর্ব্বক ৪ঠা বৈশাখ ভোরে খাক্‌রাচটিতে জাগরিত হইয়া সবাইকে জাগাইলাম। পরে পাণ্ডাজী ও দলবল সমেত আমরা যষ্টিবন্ধুর সাহায্যে "জয় বদ্‌রী বিশাল কী জয় কেদারনাথ কী জয় গড়ুর ভগবান্ কী জয়, গঙ্গামায়ী কী জয় গুরুগোবিন্দ রামকৃষ্ণ কী জয়" দিয়া বাহির হইলাম। আমার নিকট পাণ্ডাজী শুনে শুনে রামকৃষ্ণ কী জয় দিতেন। আমাদের বড়ই শ্রুতি-মধুর হৃদয় তৃপ্ত হইত। পাণ্ডাজীর সঙ্গে কথা হোয়ে আছে তিনি উত্তমরূপে বদ্‌রীনাথ না দেখাতে পারেন ত অলকনন্দায় ডুবিয়া মরিব, আর বেশ করিয়া নারায়ণ দেখান ত আমি—দক্ষিণেশ্বর বেলুড় যোগেস্থান দেখাইব। পাণ্ডাজী বলিতেন, দেখে মা নারায়ণ কি করেন কি বল্‌বো মা, আনন্দে চলো মা নারায়ণ দর্শন দেবেন, আমি কে আছে গো, বিলকুল বোকা পাগল আছে গো।" আমরা ৭ মাইল হাঁটিয়া রুদ্রপ্রয়াগে আসিলাম।

রুদ্রপ্রয়াগে জনতায় চটিভরা। একটি দোকানের উপর ঘর—ছোট পাওয়া-গেল। খুব নিচু চাল। মাথা ফাটিবার একটি। আমরা আসিলাম। সেদিন পথে খুব চড়াই উৎরাই করিতে হইয়াছিল। গাণ্ডিওয়ালা অনেকক্ষণ পরে আসিল। যারা স্নান কোর্ত্তে গেল, অনেকক্ষণ পরে এসে বল্লে, ভয়ঙ্কর সিঁড়ি, দাঁড়াও জিরুই। আমরাও গেলাম, ভয়ঙ্কর সিঁড়ির বহর। কাল পাথরের খুব মজবুত। গুণ্‌তে গুণ্‌তে নাম্‌লাম, ৩৭টি পর্য্যন্ত হোয়ে গুলিয়ে গেল, আর গোণা হ'ল না। এস্থানটিও দেবপ্রয়াগের মত অতি মনমুগ্ধকর। শ্রীশ্রী৺বদ্‌রীকাশ্রম পুরী হইতে অলকনন্দা, শ্রীশ্রী৺কেদারনাথ পুরী হইতে বহির্গতা মন্দাকিনীর সঙ্গমস্থলে রুদ্রপ্রয়াগ অবস্থিত। সঙ্গমস্থলের উপরে সিঁড়ির উপরে ঘাটে, শ্রী৺রুদ্রনাথ নারদেশ্বর, গোপালেশ্বর, সোমেশ্বর মহাদেবের ও শ্রী৺অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দির আছে। শ্রীমৎ মোহান্ত রামানন্দজীউ মহারাজ এখানে অধ্যক্ষ স্বরূপে থাকিয়া আপন সাধন ভজনে কালাতিপাত করেন। পাণ্ডাজী বলিলেন,

মাগো এখানে ভগবান ত্রিপুরারী ভক্তচূড়ামণি দেবর্ষি নারদ মুনিকে সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা দিয়া ছিলেন। এখানে সরকারী ডাকবাংলা পোষ্টাফিস কালীকম্বলী বাবার ধর্ম্মশালা অথিতি অভ্যাগতের জন্য সদাব্রত সর্ব্বপ্রকার সুবিধা আছে। আমরা চৈত্রের শেষে বাহির হইয়াছি, এখনও ৺কেদারবদ্রী পুরীর পট খোলা হয় নাই। শুনিতেছি ঠাকুর সব বরফে ঢাকাই আছেন, এজন্য চটিতেও কোনওরূপ খাদ্য মিঠাই পাওয়া যায় না। পরে নাকি পাওয়া যায়। এখানে আমরা তুসঙ্গিনীতে ৩ সের দুধ কিনিলাম। সাধুছেলেরাও এক ঘটি দুধ নিজেদের রেখে গেলেন। আমার সঙ্গিনী ব্রহ্মচারী দুধ মোটেই ভালবাসে না। কি জানি এই পাহাড় পথে তারও দুধে প্রীতি হইতে দেখিলাম। মধ্যাহ্ন আহারের পর বৈকালে সঙ্গম ঘাটে দলবল সকলে বেড়াইয়া আসিয়া দেখি, বুড়দিদির অবস্থা শোচনীয়। পেট খুব খারাপ জ্বরও খুব। কম্বল ৩ খানা মুড়ি দিয়া শয়ন করিলেন। অত্যন্তই ভয় হইল। কি করিব নিস্তব্ধ হইয়া তাঁর শয্যা পাশে বসিয়া দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইলাম। ভাবিতে লাগিলাম, "ঠাকুর তোমার নামই আমাদের ভরসা, যা হবার হউক, সহ্য করিতেই হইবে।"

গৃহ হইতে প্রস্তুত হইয়া গেরুয়া পরিয়াছি এক তোমার অনিমিষ দৃষ্টির উপর অদৃষ্ট নির্ভর করিয়া চলিয়াছি, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। প্রার্থনা তুমি প্রসন্ন হও। পাণ্ডাজী ঔষধ দিলেন। রাত্রে মন্দাকিনীর উপরের ঘরে সঙ্গিনী ও বুড়াদিদি ও আমার ঝি ও আমি শয়ন করিলাম। সমস্ত রাত্রি ভয়ঙ্কর শীত ও কানে তালা ধোরে যায় মন্দাকিনীর হরহরধ্বনী। সম্মুখে রাস্তা, পাণ্ডাজী আমাদের মাথার কাছে একটু দূরেই শয়ন করিলেন। ছোট ছোট ঘর সব স্বতন্ত্র, সম্মুখে চলন রাস্তা বুড়ীদিদির তেমনি অসুখ দেখেই সেদিন পাণ্ডাজীকে না বলিতেও অনেক ভরসা দিয়া স্বয়ং আগলাইয়া রহিলেন। তুসঙ্গিনীতেই ঘোর চিন্তামগ্ন নির্ব্বাক, ঝিও ভীত, দিদির অবস্থা অত্যন্তই খারাপ। ঔষধ খেয়ে রাত্রে একটু পেট ধরিল। কিন্তু জ্বর খুব। অনিদ্রায় সেই একমাত্র দয়াল ঠাকুরকে স্মরণপূর্ব্বক তুবোনেই বসিয়া কখনও বা শুইয়া রহিলাম। ঘোর রাত্রে অল্প অল্প বৃষ্টি হইল, বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল, ঘোর অন্ধকার নিশি, অতি বিকট, অতি ভীষণ। জীবনে এমন ভীষণ স্থলে এমন রাত্রি ও এমন মুমুর্ষুপ্রায় রোগী লইয়া বিপন্ন হই নাই, উপন্যাসের অধ্যায়েই পড়িয়াছিলাম। সঙ্গিনী অত্যন্ত

ভীত হইয়া আমাকে ধরিয়া নীরবে ভয়ে ও শীতে কাঁপিতেছে। ঠিক সেই সময় আমাদের চটিতে নারায়ণ প্রসাদ পাণ্ডার যাত্রী একটী বুড়ী মরিয়া গেল। সেই ভীষণ রাত্রে একজন যাত্রী সাধু অতি কঠোর কণ্ঠে আমাদের পাণ্ডাজীর লোকদের বলিতে লাগিলেন, এই যে একজন বাঙ্গালী মা মরে গেল, পরমেশ্বর ওকে টেনে নিয়েছে, ওর খুব ভাগ্য কিন্তু বাঙ্গালী যাত্রী কি রকম যে ওকে একটু দেখ্ছে না, ওকে কাঠ দেবে না। আমি ওকে দেখ্বো। আমাদের পাণ্ডাজীর লোকেরা বল্লে, "চুপ্ চুপ্, মায়িলোক সব ভয় পাবে।" পাণ্ডাজী তখন খুব গভীর নিদ্রাগত। আমি ও সঙ্গিনী কাঁপিতে লাগিলাম। শেষে দুজনেরই অত্যন্ত গরম বোধ হইল, অত্যন্তই ভয় হইল। ভীষণ রবে কুক্কুর ডাকিতে লাগিল। অতি ভীষণ রজনী। ভাবিতে লাগিলাম, আমরা কোথায়? বাড়ী কোথায়?

আসিবার সময় বারাণসীধামে পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ বার বার বলিয়াছিলেন, "এই বুড় লোকটির জন্যই ভয়।" আমি বুড়দিদির মুখ খুলিয়া বলিলাম, দিদি কেমন আছেন, অমন গোঁ গোঁ করিতেছেন কেন? কি কষ্ট হোচ্ছে? দিদি বল্লেন, ভয় পেও না ও আমার অসুখ সেরে যাবে। তোমরা ভয় পেও না। নীরবে কাঁদিতে লাগিলাম। তার পর আরো রাত্রে বুড়দিদি উঠ্বেন বল্লেন; কি করি, দুজনে উঠিলাম, পাণ্ডাজীকে ডাকিলাম, ক্ষণেক পরে এনে আবার শোয়াইলাম। তাঁকে কম্বল ঢাকা দিয়া বলিলাম, "বাবা আপ্নিই পিতা পুত্র, আমাদের সহায় ভরসা; দুজনে এই বৃদ্ধা গৃহিণীকে লইয়া বাহির হইয়াছি, বুড়দিদি ভাল হবে ত?"

পাণ্ডাজী বলিলেন, মাগো আমি তোমার ছেলে আছে, আমার কথা শোন মা, বল্ কি করব বল্? এত বল্ছি ভয় কোর না গো, মহানন্দজীর কাছে খুব ভাল দাওয়াই আছে, সকল ভাল হোয়ে যাবে, কোন ভাবনা কোর না, কেমন? লক্ষ্মী মা ঘুম যা মা, আমি বল্ছে নারায়ণ সকল ঠিক রাখ্বেন। কি জানি এই ছেলেমানুষ পাণ্ডাজীর কথায় যেন সমস্ত ভয় দূর হইল, দুজনে ভরসা পেয়ে শয়ন করিলাম। আমার মনে হোতে লাগল, ঠাকুর পাণ্ডাজীর মধ্যে প্রবেশ কোরে আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন। বাকি রাত্রটুকু দু বোনেই নিদ্রিত হইলাম। সকালে দিদির অল্প অল্প জ্বর। পেটটা ধোরে গেল। সেখানে ঝাম্পান গাড়ি মিলল

না, পাণ্ডাজীর লোকেরা দিদিকে নিয়ে চল্‌ল। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে আমরা প্রায় ৭টার সময় বাহির হই। বেলা ১২টার সময় অত্যন্ত চড়াই ভাঙ্গিয়া "অগস্ত আশ্রমে" আসিয়া শয়ন করিলাম। সে দিন একাদশী, তৃষ্ণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়, দারুণ কষ্টই হইল। প্রায় ২ ঘণ্টা শয়ন অন্তে নিকটস্থ অলকনন্দায় স্নান করিতে দেহ শীতল হইল। দিদিরও জ্বর ছাড়িয়া গেল।

মধ্যাহ্নে সাধুছেলেরা পাণ্ডাজী ও আমরা একত্রে ঠাকুরের নানা প্রসঙ্গ করিয়া, পত্রাদি লেখা করিলাম। সে দিন সেই চটিতেই রহিলাম। মধ্যাহ্নে গায়ক গায়িকা পাহাড়ী স্ত্রী পুরুষ দুজন সুন্দর ডুম্বুরু বাজাইয়া ঢোল বাজাইয়া গান শোনাতে লাগিল। পাহাড়ী মেয়েটির গলা অতি মধুর মিষ্ট—গাহিল

"হে প্রভু কেদারনাথ পাঁও দরশন তেরা
ডিমি ডিমি তেরি ডম্বুরি বাজে
গলে হাড় মালা,
জটামে গঙ্গামায়ী করে সদা খেলা
কটিমে শোভে প্রভু তেরি বাঘছালা
হে প্রভু কেদারনাথ পাও দরশন তেরা
হে প্রভু বদ্রীনাথ পাও দরশন তেরা ॥"

এইটুকুই এমন সুন্দর ভাবে বার বার গাহিতে লাগিল যে, মন মোহিত হইয়া চোখে জল আসিল। বৈকালে ঐ আশ্রমে শিব ঠাকুর দেখিলাম। বেশ মন্দির প্রশস্ত, প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাঙ্গণ সংলগ্ন। মন্দির পার্শ্বে ফুলের গাছ—রাঙা করবী মত। পাড়িবার জন্য হাত পাইলাম না, দুবার এদিক ওদিক চাহিয়া লম্ফ দিলাম, তবুও হাত পাইলাম না। পাণ্ডাজী সূর্য্যবাবা হাস্‌তে লাগ্‌লেন, "মাকে আমি ফুল পেড়ে দেবে" বলিয়া পাতা শুদ্ধ ফুল পেড়ে দিলেন। শিবঠাকুরকে দিয়া প্রণামপূর্ব্বক একটু বসিতে ইচ্ছা হইল, সন্ধ্যাও হইল। পাণ্ডাজী সকলকে লইয়া ঘরে গেলেন, শঙ্কর মন্দিরের দ্বারে রইল, আমি মন্দির মধ্যে কতকটুকু বসিলাম। বড় শান্তি পাইলাম। উঠিবার সময় দেখিলাম সাধু ছেলেদের একজন আসিয়া প্রণামপূর্ব্বক স্তোত্র উচ্চারণ করিল। আমি শঙ্করের সঙ্গে গৃহে আসিলাম। সকলে বোসে পাণ্ডাজীর সঙ্গে গল্পকথা হোচ্ছে, কবে পট খুল্‌বে বল্‌ছে শুন্‌ছে। আমরাও একটু শুনিয়া বুড়দিদিকে ঔষধ খাওয়াইয়া শয়ন করিলাম। সে

দিন একাদশী, বুড়দিদি অত্যন্ত বুড় ও যে রকম দাঁড়াল কাজেই ঔষধে দোষ নাই মনে করিয়া তাঁহাকে খাওয়াতে বাধ্য হইলাম। পাণ্ডাজী বহুবার বলিলেন, "মাগো আপনারা একটু দুধ খাবে অলকনন্দার জল খাবে।" সাধুছেলে বলিলেন, না মহারাজ আমাদের ঘরে সব দেখেছি মরবার সময় একাদশী হোলে কাণে জল দেবে মুখে দেবে না।"

(ক্রমশঃ)

মন-বুল্‌বুল্‌ রচয়িত্রী।

গুপ্ত-মহারাজ।

—০:-*-:০—

(শ্রীমৎ স্বামী সদানন্দ।)

"মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ।"

ভাবকে ধারণার গণ্ডীর ভিতরে আনা যত সহজ, কথায় খুলিয়া মেলিয়া সেই ভাবটীকে প্রকাশ করা তত সহজ নহে। আমি অন্ততঃ উহাতে তেমন পারদর্শী নহি। তত্ত্বমঞ্জরী ভাবুকের কাগজ, ভাবুক উহার পাঠক; তাই ভরসা, আমি আমার প্রাণের কথাটীকে, আমার মনের মত করিয়া গুছাইয়া বলিতে না পারিলেও ভাবগ্রাহী পাঠকের আমার প্রাণের কথাটী বুঝিয়া লইতে বিলম্ব হইবে না।

আদর্শ-গুরুভক্ত, গুরু-অন্ত-প্রাণ গুপ্ত মহারাজ (স্বামী সদানন্দ) দেহ রাখিয়াছেন। এই সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষের জীবনী কোন পত্রিকায় বাহির হইয়াছে কি না আমি জ্ঞাত নহি। সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্রবুদ্ধিসম্পন্ন আমার ন্যায় লোকের, তাঁহার সম্বন্ধে লিখিতে যাওয়া ধৃষ্টতা অথবা হাস্যাস্পদ ব্যাপার। সে ক্ষমতা এবং সে সাহস আমার নাই। ভগ্নী নিবেদিতা আজ বাঁচিয়া থাকিলে, খুব সম্ভব তিনিই এই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতেন; আশা করি সোদরপ্রতিম পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ বশীশ্বর সেন, আমাদিগকে স্বামী সদানন্দ মহারাজের শেষ জীবনের অর্থাৎ উক্ত শ্রীমান্ বতদিন তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন তৎকালের মনোমুগ্ধকর আশ্চর্য্য ঘটনাবলীর বিবরণ উপহার দিয়া স্নেহ ও প্রীতির বন্ধন বর্দ্ধিত করিবেন। স্বর্গ কেমন জানিনা, মনে হয় উহা শান্তির আকর। স্বর্গে শান্তির পরিমাণ কতটুকু, আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধির

মাপকাঠীতে তার ওজন চলে না। মাপিবার ইচ্ছাও নাই। আমার স্বর্গ গুপ্ত মহারাজের ন্যায় মহাপুরুষের দুর্ল্লভ সঙ্গ ও পদসেবা, সে শান্তির তুলনা নাই এবং অনেক সময়ে উহা গায়ে মাখিয়া উপলব্ধি করিতে গিয়া আমি নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছি। সে আজ পাঁচ ছয় বৎসরের কথা ; শ্রীমান্ বশীশ্বরের ভক্তির ডোর ছিন্ন করিতে না পারিয়া গুপ্ত প্রেমিক গুপ্ত মহারাজ, বশীশ্বরের ভ্রাতার কল্যাণ কামনায় দিনাজপুর জেলাস্থ পীরগঞ্জ ষ্টেসনে শুভাগমন করিয়াছিলেন। আমি তখন সরকারী কার্য্য ব্যপদেশে কালিয়াগঞ্জে (দিনাজপুর) ছিলাম। কালিয়াগঞ্জ পীরগঞ্জ হইতে অনুমান দশ ক্রোশ ব্যবধান। শ্রীমান্ বশীশ্বরের ভ্রাতা আমাকে জানাইলেন, "একটী সাধু আসিয়াছেন, তিনি তোমায় দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, যদি আসিতে পার, তবে সত্বর আসিও।" কি জানি কেন এই মহাপুরুষকে দেখিবার জন্য বড়ই আকুল হইলাম, প্রাণটা আই ঢাই করিতে লাগিল। পুলিসের চাকরী কেমন করিয়া যাইব চিন্তা হইল। তিনি যখন ডাকিয়াছেন যাইতেই হইবে, এই স্থির করিয়া বিপদ আপদ তাঁহারই পায়ে অর্পণ করিয়া রওনা হইলাম। কোন দিন তাঁহাকে দেখি নাই, কোন দিন তাঁহার নাম শুনি নাই, তবুও কেন তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনে আমার এরূপ প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না।

পীরগঞ্জ পৌছিলাম। স্বামীজী ডাকবাঙ্গলায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, শরীর অসুস্থ, ডাকবাঙ্গলায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি "এস বাবা এস" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহার হাতের তালুটী জবা ফুলের ন্যায় লাল, ইজি চেয়ারে (Easy chair) বসিয়া থাকায় পায়ের তলাটীও দেখিতে পাইলাম, উহাও হাতের তালুর ন্যায় লাল। পূর্ব্বে ঐরূপ দেখি নাই, ভাবিলাম আল্‌তা মাখিয়াছেন, ইহাতে কেহ আমাকে ন্যাকা বা মূর্খ মনে করিতে পারেন, কিন্তু আমি সত্য সত্য তখন ঐরূপই ভাবিয়াছিলাম।

গুপ্ত মহারাজের শ্রীচরণ সমীপে প্রথম যখন উপস্থিত হই, তখন ডাক-বাঙ্গলায় আরও কয়েকটী ভদ্রলোক ছিলেন, বিশেষ কোন কথা হইল না। তাঁহার মুখ পানে অনেকবার তাকাইলাম, দেখিলাম তিনিও আমার দিকে চাহিয়া আছেন। বেয়াদবির ভয়ে বেশী তাকাইতে সাহস হইল না। আমায় বলিলেন, "আহা ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়া তোমার মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে,

স্নান করিয়া আহারাদি কর।" আমি তাঁহার আদেশ উপেক্ষা করিতে সাহস পাইলাম না, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও শ্রীমান্ বশীশ্বরের ভ্রাতার বাসায় আসিলাম। বশী আমার মাথায় খানিকটা তেল ঢালিয়া দিল, আমি বাধ্য হইয়া জামা চাদর, খুলিয়া স্নান করিলাম। কিন্তু মনটা সুস্থ ছিল না, কি জানি কেন আবার স্বামীজীকে দেখিতে ইচ্ছা হইল, তাই আহারের পূর্ব্বেই ডাকবাঙ্গলায় ছুটিয়া গেলাম, স্বামীজী তখন একখানি চৌকীতে চোখ মুদিয়া শুইয়া ছিলেন। আমি ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই উঠিয়া বসিলেন এবং গর্জ্জিয়া বলিলেন, "ঘর থেকে বেরিয়ে যা, যত ব্যাটা বদ্‌মাইসের, লাঙ্গল কাঁধে লইয়া আমার প্রাণটা ওষ্ঠাগত হইয়াছে।" আমার ন্যায় উদ্ধত প্রকৃতির লোক এইরূপ ব্যবহার পাইয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারে না, হয় প্রতিবাদ করে, না হয় সে স্থান ত্যাগ করে, কিন্তু আমি এই উভয় পন্থার কোনটাই তাঁহার করুণায় অবলম্বন করিতে পারি নাই। "ন যযৌ ন তস্থৌ" ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিলাম, ভাবিলাম এখন কি করি? দয়ার সাগর স্বামীজী আমাকে বেশী-ক্ষণ এই পরীক্ষায় রাখিলেন না, বলিয়া উঠিলেন, "আয় আয় কাছে আয়, আহা এমন আধারটাকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিস্? কাকে ঠাকুরান ফল— পূজায় তোকে কেমন করিয়া চড়াই।" আমাকে আরও কাছে যাইতে বলি-লেন এবং হাতখানি পিঠে বুলাইতে লাগিলেন, আমার কিন্তু পাপদগ্ধ জীবনের চোখের জল তখনও নির্গত হইল না। সোজা কথায় আমার তখন ভ্যাবাচ্যাকা লাগিয়াছিল, বলিলেন "তোর আর বিশেষ কিছু করিতে হইবে না, পর দার দর্শনেই মায়ের স্নেহ মনে করিস্, কাঞ্চনে তোর বিশেষ আকাঙ্ক্ষা নাই, ইহা আমি জানি, তার জন্য তোর ভাবিতে হইবে না।" আমি বলিলাম মহারাজ, কাঞ্চনে আমার আকাঙ্ক্ষা ত বেশ আছে, তিনি উত্তর করিলেন "গরু অনেক ব্যাটাই মারে, তা মারুক্ কিন্তু জুতা দানের বেলা দর্‌কোচা মারিয়া যায়, তুই গরু মারিস্ বটে তবে জুতা দানে অভ্যস্থ আছিস্। Peterকে Rob করা অভ্যাস থাকিলে, Paulকে pay করায়, অভ্যস্থ না হইলে Robbery ছাড়া কঠিন (পিটারের দ্রব্য অপহরণ করিয়া পলকে দান না করিলে, অপহরণের অভ্যাস ছাড়িতে পারে না) দস্যুবৃত্তি তোমায় থাকিবে না। ঠাকুরের এ নিয়ম অলঙ্ঘনীয়, তাই তিনি অনেক জগাই

মাধাইকে পার করিয়াছেন, দস্যুবৃত্তি কতদিন করিবে? দানের মাত্রা যত বাড়াইবে, দস্যুবৃত্তি ততই ক্ষীণ হইয়া আসিবে।" আমি ভাবিলাম এ কেমন হইল? তাঁহার কথার ভাবে বুঝিলাম, তিনি যেন বলিলেন, "যাহা করিতেছ করিয়া যাও।"

গুপ্ত মহারাজের দর্শনের পূর্ব্বে আরও যে দুই একজন সাধু সন্ন্যাসী না দেখিয়াছিলাম এমন নহে, কিন্তু তাঁহাদের নিকট এখন করুণা মাখা কথা শুনিয়াছিলাম মনে হয় না, অধিকন্তু তাঁহাদের কঠোর উপদেশের ধারণা করিতে না পারিয়া বরং দুঃখিত হইয়া ঘরে ফিরিতাম। তাঁহাদের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইলেই তাঁহারা আমাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন, বলিতেন "ও বাবা! তুমি পুলিস, তোমার অনেক গুণ, কি মতলবে আসিয়াছ কে জানে।" দয়া-পরবশ হইয়া কেহ তদ্রূপ বিশেষণে বিভূষিত না করিলেও বলিতেন, "পন্থা কঠোর, ত্যাগ চাই" এবং আরও কত কি বলিতেন। আমার উপরোক্ত কথাগুলিতে কেহ যেন আবার মনে না ভাবেন যে, আমার পন্থা যথেচ্ছা-চারিতা। স্বামীজীর কথায় আমি এই বুঝিয়াছিলাম যে, কুভাবগুলি মানুষের প্রকৃতিগত নহে। জীবনের অনেক কার্য্য মানুষ খারাপ বুঝিতে পারিয়াও করিয়া ফেলে, মানুষ মাত্রেই ইহার সাক্ষ্য দিবে। অনুতাপ সাময়িক হইলেও উহা এবং সৎ কার্য্যে প্রাণের আকাজ্ক্ষা, প্রকৃতির সত্যধর্ম্ম বলিয়া আমার প্রতীতি হয়, সুতরাং মানুষ সংস্কার বশতঃই হো'ক অথবা যে কারণেই হো'ক কুকাজ করে বটে, কিন্তু পরে অনুতপ্ত হয়। বারো বৎসর যাবৎ পুলিসের চাকরী করিয়াছিলাম, অতি দুর্ব্বৃত্ত, দস্যু ও নরহত্যাকারীকেও অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে দেখিয়াছি। কেহ কেহ বলেন, অত্যন্ত পাপাসক্ত ব্যক্তির বিবেক নিভিয়া যায়, আমি তাঁহাদের সহিত একমতাবলম্বী নহি, বিবেক ভগবদ্দত্ত বাড়বানল—উহা নিভিবার বস্তু নহে। লোকে বারম্বার অসৎ কার্য্যে লিপ্ত হইতে পারে বটে, বিবেকহীনতা উহার কারণ নহে। অভ্যাস প্রকৃতিকে ছাড়াইয়া উঠে কিন্তু ডুবাইতে পারে না। তাই প্রকৃতি দুদিন আগে হোক আর পরে হোক, আপনার মহিমায় মহিয়সী হইয়া জাগিয়া উঠে, তাই পাপী, পুণ্যাত্মা বলিয়া অভিহিত হয়। এই জন্যই বোধ হয় ঠাকুর বলিতেন, পাপী কি রে? আমি মুক্ত, আমি মুক্ত, ইহাই ধারণা করিতে হইবে; তত্ত্ব-মঞ্জরীর পাঠক বোধ হয় এই কথাটী হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন।

পূর্ব্বোক্ত কারণে গুপ্ত মহারাজের দর্শনের পূর্ব্বে, সাধু সন্ন্যাসীর সান্নিধ্যে উপস্থিত হইলেও, তাহাদের দণ্ডবিধি ও কার্য্যবিধির প্রণালীর বিশ্লেষণে প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিত। গুপ্ত মহারাজ আমাকে এই সকল নিয়মের বাহিরে দাঁড়াইতে বলিয়াছিলেন; আবার বলি, যথেচ্ছাচারিতা আমার মত নহে। আমার এই কথা খণ্ডন করিবার অনেক তর্কযুক্তি থাকিতে পারে বটে, কিন্তু উহা আমার প্রাণের কথা, যাহার ইচ্ছা হয় পাগলের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিবেন।

স্বামীজীর নিকট বেশীক্ষণ থাকিতে পারিলাম না, আসিবার সময় বলিলেন, "ওরে পুলিসের চাক্‌রীটা ছাড়িয়া দিতে পারিস্?" আমি বলিলাম, ইচ্ছা নাই। তিনি বলিলেন, "আমিই ছাড়াইয়া দিব।" আমি বলিলাম, স্বামীজী, তবে আমি আপনার নামও করিব না; স্বামিজী বলিলেন, "তুই স্বেচ্ছায় সানন্দে ছাড়িয়া দিবি।" আমি দেখা যাইবে বলিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। আসিবার সময় বশীশ্বর-ভায়া আমাকে শ্রীম-কথিত "কথামৃত" পাঠ করিবার উপদেশ দিলেন এবং ঐ পুস্তক পাইবার ঠিকানা লিখিয়া দিলেন। তাঁহার উপদেশ অনুযায়ী আমি কালিয়াগঞ্জে ফেরৎ আসিয়া কথামৃত আনাইয়াছিলাম।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে গুপ্ত মহারাজ কলিকাতা ফিরিয়া যাওয়া কালে আমার কার্য্যস্থল কালিয়াগঞ্জে আসিয়াছিলেন, তিনি যে কৃপা করিয়া আমাকে পুনরায় দর্শন দিয়া যাইবেন, আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। স্বামীজী কালিয়াগঞ্জ পৌছিয়া বলিলেন, "জীবিত, আমার বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে, তোমার বাড়ীতে যা রান্না হয়েছে নিয়ে এস।" তিনি ডাকবাঙ্গলায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, আমি তাঁহার সেবার জন্য যাহা প্রস্তুত ছিল লইয়া গেলাম, তিনি আহারান্তে বলিলেন, "বড়ই পরিতৃপ্ত হইয়াছি, আমি আসিব, ইহা কি তুই জানিতে পারিয়াছিলি?" আমি বলিলাম, মহারাজ, ঠিক আপনি আসিবেন ইহা উপলব্ধি করিতে পারি নাই, তবে আমার কল্যাণ কামনায় আজ কেহ আসিতেছেন, এরূপ বুঝিয়াছিলাম।

কালিয়াগঞ্জে আমার জনৈক প্রবীণ বন্ধু ছিলেন, তিনি মধ্যে মধ্যে আমার নিকট হইতে কথামৃত লইয়া পড়িতেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে আমার মত মিলিত না। স্বামীজীর আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তিনি তাঁহাকে দেখিবার জন্য বড়ই

উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিলেন, আমিও সরল মনে তাঁহাকে সঙ্গে লইলাম, স্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি দর-বিগলিত-ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। আমি আপনাকে তখন বড়ই ধিক্কার দিতেছিলাম, ভাবিলাম, আমার মনটী ছোট ও নিচু, তাই এই প্রবীণ ধর্ম্মপ্রাণ বন্ধুবরকে অগ্রে চিনিতে পারি নাই। আহা! ইঁহার কি কোমল প্রাণ; সাধু দর্শনেই ইঁহার মন গলিয়া গিয়াছে, তাই কাঁদিতেছেন, কিন্তু স্বামীজীর তাঁহার প্রতি ব্যবহার দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম, তিনি বলিলেন, "ওগো তুমি কাঁদছ কি? ও তো তোমার nervous debility (স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য), ভাণও বলা যাইতে পারে। তুমি যখন তোমার আফিস হইতে রওনা হইয়াছিলে, তখন মনে করিয়াছিলে, কেমন সাধু আসিয়াছে পরীক্ষা করিয়া দেখা যা'ক। অভিমানী তুমি, গর্ব্বিত তুমি, আমার কি পরীক্ষা করিবে? চিরকুমার আমি, জীবনে কখন স্ত্রীসঙ্গ করি নাই, উহা ভোগ করিলে কেমন হয় তাহাও কল্পনায় ভাবিয়া দেখি নাই, সন্ন্যাসী আমি—আমার পরীক্ষা তুহি কি করিবে? কোন দ্রব্যের প্রার্থী নহি, শ্রীগুরু কৃপায় জগতের সকলি আমার; আমার কিসের অভাব?" ইহার পর উক্ত বন্ধুবর জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধর্ম্ম কি আমায় বুঝাইয়া দিন, স্বামীজী হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন, পরে বলিলেন, "বাবা, দুঃখ করিও না, ধর্ম্ম কি ইহা আমি তোমায় কেমন করিয়া বুঝাইব, ঠাকুরের করুণা হইলে বুঝিতে পারিবে। রসগোল্লা কেমন, ইহা না খাইলে কথা দ্বারা বুঝিতে পারা কঠিন, এমন কি তুমি ছানা ও চিনি খাইয়া থাকিতে পার, কিন্তু চিনির রসে ছানা পাক হইলে এবং উহা ঠাণ্ডা হইলে জিহ্বা ও টাক্‌রার মধ্যস্থলে রাখিয়া, আস্তে আস্তে উহার রস গলাধঃকরণ করিয়া রসগোল্লাটী বেশ চিবাইয়া খাইলে, উহা কেমন, বুঝিতে পারা যায়। উহা বড়ই মধুর, বড়ই রসনা-তৃপ্তিকর এরূপ বলিলে কতকগুলি শব্দের যোজনা করা হইল মাত্র কিন্তু উহা কেমন বুঝিতে পারিলে কি? যদি খাইয়া থাক তবেই বুঝিয়াছ, নতুবা নহে। তোমার পুত্রশোক হইয়াছে কি? কাহারও পুত্রের মৃত্যু হইলে, পুত্রের পিতাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতে পারেন—বন্দুকের গুলি আমার পাঁজরায় ঢুকিয়া ভিতরের অস্থি মজ্জা ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গেলে যেমন্‌টী বোধ হয়, আমার তাহাপেক্ষাও অধিক-কষ্ট হইতেছে।

ইহাতে তুমি কি বুঝিলে? তোমার ছেলেও মরে নাই—বন্দুকের গুলিও কোন দিন খাও নাই; পার কি পুত্রহারা পিতার শোক উপলব্ধি করিতে? জীবনে পুত্রহারা জননীকে দেখিয়াছ, পতিহারা অনাথিনী পত্নীকে দেখিয়াছ, তাঁহাদের অন্তর্দাহী জ্বালা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছ কি? দেখিয়া তোমার কষ্ট হইতে পারে, দু এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলিতে পার; কিন্তু তোমার তাঁহাদের ন্যায় উন্মাদ অবস্থা হয় কি? সুতরাং এই অনুভূতি, ঠিক সেই স্থান অধিকার না করিলে জন্মিতে পারে না। প্রথম সোপান—মনটী সফেদ্ (সাদা) হওয়া চাই।" স্বামীজী সেই রাত্রে কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

তাঁহার এই কথাগুলিতে আমার বন্ধুবরের অনেক উপকার হইল বটে, কিন্তু আমার পক্ষে "উল্টা বুঝ্‌লি রাম" হইয়া গেল। আমি গুপ্ত-মহারাজের পীরগঞ্জে প্রদত্ত উপদেশগুলি ভুলিয়া গেলাম এবং রাত্রে ভাবিলাম, ছুটী লইয়া তীর্থ-ভ্রমণে যাই। আমি যদি পুলিসের কার্য্যে নিযুক্ত থাকি, তবে মন সাদা কেমন করিয়া হইবে? ইহার অল্প দিন পরেই আমার ইটাহার থানায় (দিনাজপুর) বদলী হইল এবং আমি ছুটী লইয়া প্রথমতঃ গয়াধাম, তথা হইতে বারাণসী এবং পরে হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লছ্‌মনঝোলা ঘুরিয়া আসিলাম।

হৃষীকেশে মহাত্মা কালা কম্বলীওয়ালা বাবাজীর ধর্ম্মশালায় এক রাত্র অবস্থিতি করিয়াছিলাম। রাত্রে ভাবিলাম, স্বামিজীর আদেশের পর তাঁহার কৃপায় আমার সকল পরস্ত্রীতেই মাতৃভাব জাগ্রত হইয়াছে; মনে মনে বেশ একটু তমঃ-ভাব জাগিয়া উঠিল। ভাবিলাম, শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী অতি দুর্ব্বল-চেতা লোক ছিলেন, নতুবা ধর্ম্মপ্রচার-কালীন রেবা নদীর তীরে (পঞ্জাব) আসিয়া স্ত্রীলোকগণকে নগ্নাবস্থায় স্নান করিতে দেখিয়া তাঁহার কামের ভাব উদ্দীপ্ত হইবে কেন? পরদিন মনের গরবে লছ্‌মন্ ঝোলায় চলিলাম, সেখানে বিখ্যাত সুরজমল্ ঝুনঝুনওয়ালার পোলের নিকট চানা (ছোলা) কিনিয়া বানরগুলিকে ছিটাইয়া দিয়া বেশ একটু আমোদ উপভোগ করিতেছিলাম। ঐ দিন একটী পাঞ্জাবী যুবক তাহার পরমা সুন্দরী বিধবা ভ্রাতৃবধূকে তীর্থ দর্শন জন্য লছমনঝোলায় আনিয়াছিলেন। পরে শুনিয়াছিলাম উক্ত মহিলার স্বামী উহার কিছুদিন পূর্ব্বে পরলোক গমন করিয়াছিলেন, তাই পতিবিয়োগ-বিধুরা পতিপ্রাণা পত্নী তীর্থ দর্শনে মনের জ্বালা নিভাইতে আসিয়াছিলেন।

তিনি ও তাঁহার দেবর ইতোপূর্ব্বে নিকটবর্ত্তী মন্দিরের বিগ্রহ দর্শন করিতে-ছিলেন। পতিগতপ্রাণা হিন্দু ললনার, পতি বিয়োগে যে কি দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, পুরুষ আমি কেমন করিয়া বুঝাইব? গুপ্ত-মহারাজের কথায় "সতী স্ত্রী হইয়া বিধবা হইলে বুঝিতে পারিতাম;" তাই ঐ রমণীরও বুঝি দেব বিগ্রহ দর্শনে, আপন জীবন-সর্ব্বস্ব পতি-দেবতার অভাব সহ্য করিতে না পারিয়া, হৃদয়কে অন্য দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য বানরগণের খেলা দেখিয়া কথঞ্চিৎ তৃপ্তা হইতেছিলেন। ইতোমধ্যে একটী বানর তাঁহার হস্তস্থিত কাপড়ের পুঁটলীতে কোন খাদ্য দ্রব্য আছে মনে করিয়া পুঁটলীটী কাড়িয়া লয় এবং তিনি উহার উদ্ধার মানসে ঐ বানরটীর পশ্চাদ্ধাবন করায় আরও কতকগুলি বানর তাঁহাকে আক্রমণ করে, তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া এবং তাঁহার দেবর আমাপেক্ষা দূরে মন্দিরের নিকট থাকায় আমার নিকট দৌড়িয়া আসেন এবং ভীতি-বিহ্বলা হইয়া আমার সাহায্য প্রার্থনা করেন; আমি তাঁহাকে অভয় দিয়া প্রাণপণে বানরগুলিকে তাড়াইতে লাগিলাম এবং তাঁহার দেবর ইতোমধ্যে উপস্থিত হওয়ায়, তাঁহাকে সাবধানে লইয়া যাইতে বলিলাম। স্ত্রীলোকটী কৃতজ্ঞতাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে আমার দিকে একবার তাকাইয়া, আমাকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন। কি জানি কেন তাঁহারা চলিয়া যাওয়ার পরেও আমি চিত্রার্পিতের ন্যায় সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম এবং স্ত্রীলোকটী যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার দৃষ্টির বহির্ভূত না হইয়াছিলেন, ততক্ষণ আমি তাঁহার দিকে নির্নিমেষনয়নে চাহিয়া রহিলাম। চক্ষুকে সংযত করিতে চাহিলাম—হইল না; স্থানান্তরে যাইতে চেষ্টা করিলাম—চরণ চলিল না। ভাবিলাম ইহার মূলে কি আছে? প্রাণের ঠাকুর দেখাইলেন, বড় বড় কাল অক্ষরে হৃদয়াভ্যন্তরে লেখা আছে "কাম।" মনে বড়ই ধিক্কার জন্মিল, পূর্ব্ব রাত্রের কথা স্মরণ হইল—আমার দর্প চূর্ণ হইয়া গেল। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ন্যায় মহা-পুরুষের চরিত্রের দুর্ব্বলতা আলোচনা করিয়া গুরুতর অন্যায় করিয়াছি, তাই এমন হইল। ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন, নাহংকারাৎ পরো রিপুঃ—অহংকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শত্রু আর নাই।

তখনই ভাবিলাম সম্মুখস্থ গঙ্গা-গর্ভে ডুবিয়া মরিব। জলে নামিয়া একটা পা হঠাৎ পিছলাইয়া গেল, অমনি দুর্ব্বলতা আসিয়া অধিকার করিল।

নিকটে একখানি বড় প্রস্তরখণ্ড ছিল আঁকড়াইয়া ধরিলাম; বোধ হইল গুপ্ত-মহারাজ যেন বড একগাছা লাঠি হাতে করিয়া ঐ পাথরখানির উপর দাঁড়াইয়া আছেন, বলিলেন, "উঠে আয়", আমি কাঁদিয়া পা দুটী জড়াইয়া ধরিতে গেলাম, দেখিলাম কিছু নাই। অন্যমনস্কভাবে পথ চলিতে লাগিলাম এবং একটী জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অদূরে একটী কুটীর দেখিতে পাইলাম। কুটীরের নিকটে গিয়া একজন সন্ন্যাসীকে দেখিলাম, তাঁহার বয়স কত বলিতে পারি না, চক্ষু দু'টী হাঁসের ডিমে তা দেওয়ার মত দেখিলাম। জ্যোতিঃ যেন শরীর দিয়া ভস্মের অভ্যন্তর হইতেও ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। আমাকে অধিকক্ষণ বসিতে হয় নাই, তিনি বলিলেন, "আও বাচ্চা, আও পেয়ারে, ভিতরমে আও, তোহরা গুরুবল্ সব্‌সে আচ্ছা হ্যায়, আউর্ পুছোগে কেয়া, আপ্‌না গুরু কৃপাসে সব সমঝমে আওয়েগা।" আমি বলিলাম, বাবা তবু আমার একটা আরজ্ আছে, তিনি বলিলেন, "ক্যা আরজ্।" জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, মন কখন আকাশ অপেক্ষাও উর্দ্ধে উঠিয়া যায়—আবার অধঃস্তন সিঁড়িতে নামিয়া যায় কেন? উত্তর করিলেন, উ শালা এইসাই হ্যায়, উতো পহেলা বালককা মাফিক্ চঞ্চল রয়্‌তা হ্যায়, যব্ উস্‌কা জ্ঞান পঁহুচ্ যায়গা, তব্ শান্ত হোগা। আগ্‌কা উপর যব্ দুধ্ রহ্‌তা হ্যায়, তব্‌তক্ উস্‌কা আওল্ (ওৎলায়) হোতা, আউর্ পিছে যব্ আগ্‌সে ক্ষীর বন্ যাতা, তব্ আউর্ নেহি আওল্‌তা। তোম্ তো আবি সুরু কিয়া হ্যায়। তোম্ পহেলা যব্ পড়্‌নে সুরু কিয়া থা, উস্‌ঘড়ি তোমারা বাপ কি মাতারি আকে বোল্‌তা থা, পড়্‌হো বাচ্চা পড়্‌হো, লেকিন্ উস্ ঘড়ি তোমারা দিল্ নেহি বৈঠ্‌তা থা, পিছে যব্ উস্‌কা রস্ তোম্ পায়ো, উস্‌ঘড়ি খানা পিনেকা বখৎ হোনেসে ভি, বহি ছোড়্‌কে যানেকো তোমারা দিল্ নেহি চাহ্‌তা থা, বাপ মাতারি আকে বোলানেসে ভি, উঠ্‌নেকো নেহি চাহ্‌তা রহা; এইসা গুরু কৃপাসে যব্ রস্ লাগ্ যায় গা, তব্ আউর্ কুছ্ নেহি টুটেগা, লেকিন্ গুরুকা আদেশ তামিল কর্‌না চাহিয়ে। পহিলে তিত্ মালুম হোগা, বিশ্বাস নেহি আওয়েগা, পিছে দিল্ বৈঠ্ যানেসে সব্ মিঠা লাগেগা, লেকিন্ গুরু ছোড়্‌কে আপ্‌না মৎলব্ কা মাফিক্ কুছ্ নেহি কর্‌না।" এই দেবোপম সন্ন্যাসী সেদিন-কার ঘটনা অন্তর্দৃষ্টিতে বুঝিয়াছিলেন কি না জানিনা, কিন্তু উল্লিখিত শিলা

খণ্ডের উপর স্বামীজী দাঁড়াইয়া আছেন প্রতীত হওয়ায় এবং এই সাধুর উপদেশগুলির মধ্যে "গুরু ছাড়িয়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইলে কোন ফল হইবে না" বুঝিতে পারিয়া, ইটাহারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

ইহার পর বড়দিনের সময় কয়েক দিনের ছুটী লইয়া কলিকাতায় যাই। সদানন্দ মহারাজ তখন ৮ নং বসুপাড়া লেনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার পীড়া তখন বৃদ্ধি হইয়াছিল, আমি যাইবা মাত্র প্রিয়তম বশীশ্বর ভায়া মহারাজকে বলিল, "জীবিৎ দাদা আসিয়াছেন।" তিনি কষ্টে উঠিয়া বসিলেন এবং "জীবিৎ আসিয়াছিস্, আমার বুকে মাথাটা রাখ্ দেখি" বলিয়া আমার মাথাটী তাঁহার শ্রীবক্ষে চাপিয়া ধরিলেন, আমার মায়ের বুকে মাথা রাখিয়া যেমন শান্তি পাইতাম এখানেও আমার ঠিক তেমনই বোধ হইল, অনেক রাস্তা হাঁটিয়া তৃষ্ণায় কাতর হইলে এক গ্লাস জল যেমন মধুময় বোধ হয়, প্রাণটী তেমনই জুড়াইয়া গেল। স্বামীজী বলিলেন, "হ্যাঁরে, হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লছমনঝোলা গিয়ে কি হবে? এই ত ঘুরে এলি, নূতন কিছু পাইয়াছিস্ কি?" আমি চুপ্ করিয়া রহিলাম। ইহার কিছুদিন পরে স্বামীজী বসু পাড়ার উক্ত বাটীতে মহাসমাধি লাভ করেন। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে আমি তখন ইটাহারে ছিলাম।

গুপ্তমহারাজ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের প্রধানতম ও প্রাণপ্রিয় শিষ্য ছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি, স্বামীজী নিবেদিতাকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ইহাকে তুমি ভগ্নির ন্যায় যত্ন করিও ও শিক্ষা দিও। তদবধি গুপ্তমহারাজ তাঁহাকে সিষ্টার (ভগ্নি) বলিয়া সম্বোধন করিতেন, তাই দেবী নিবেদিতা—সিষ্টার নিবেদিতা নামে জগতে পরিচিতা।

দুঃখের বিষয়, নিবেদিতার জীবনীতে আমরা গুপ্তমহারাজের কোনও উল্লেখ দেখিতে পাই নাই। গুপ্তমহারাজ পীরগঞ্জে পীড়িত আছেন শুনিয়া দেবী নিবেদিতা কি প্রাণের আবেগে সুদূর ইংলণ্ড হইতে তাঁহার জননীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই পীরগঞ্জে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন! যাঁহারা তাঁহাকে সেই সময়ে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারাই গুপ্তমহারাজের প্রতি দেবীর প্রাণের টান সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছেন।

আমার মনে হয়, যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তাগ্রগণ্য রামচন্দ্র ও জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ যেমন দুই বাহু ছিলেন, তদ্রূপ

স্বামী সদানন্দ মহারাজ ও সিষ্টার নিবেদিতা স্বামীজীর জ্ঞান ও ভক্তির প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপ দুই বাহু ছিলেন।

গুপ্তমহারাজ স্বামিজীর গ্রন্থাবলীর শতমুখে প্রশংসা করিতেন, আমিও তাই স্বামিজীর গ্রন্থাবলী, গুপ্তমহারাজের মহাসমাধি লাভের পর পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম, ইহাতেও আমার গোড়ায় গলদ্ হইয়া গেল। গুপ্তমহারাজের আদেশ উপেক্ষা করিয়া আমি স্বামিজীর রাজযোগ ও একখানি পাতঞ্জল দর্শন আনাইয়া যোগাভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলাম এবং পদ্মাসন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ফলে আমার গুহ্যদেশে একটী স্ফোটকের আবির্ভাব হইল এবং দক্ষিণ পদ বিষম স্ফীত হইল। ইটাহারে নানারূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা সত্বেও কোন ফলোদয় হইল না। পায়ের ফুলা কিছু কমিল বটে, কিন্তু স্ফোটকটী আরোগ্য হইতে চাহিল না। ভাল চিকিৎসা হইবে বলিয়া কলিকাতায় আসিলাম। প্রাতে ১০॥০টার সময় বসুপাড়ার উক্ত ৮নং বাটীতে আসিলাম। শ্রীমান্ বশীশ্বর তখন বাসায় ছিল না, আমি উপরে যে গৃহে গুপ্তমহারাজ থাকিতেন ও দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই ঘরে একটী জাপানী মোড়ায় বসিয়া আমার কেন এমন রোগ হইল, ভাবিতেছিলাম। পূর্ব্বরাত্রে গাড়িতে নিদ্রা না হওয়ায় আমার তন্দ্রা আসিল; স্বপ্নে দেখিলাম, গুপ্তমহারাজ যেন আমায় গলাধাক্কা দিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিতেছেন ও বলিতেছেন "দেহের চিকিৎসা করাইতে আসিয়াছিস্ কেন? উহার সঙ্গে তোর কোন সম্বন্ধ নাই।" আমি তবুও যেন কি জন্য কোনও বিশিষ্ট ডাক্তারকে দেখাইয়া তাঁহার ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ সেবন করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই। শ্রীশ্রীগুরু-কৃপায় আপনা আপনিই সারিয়া গিয়াছিল এবং তৎপরে তাঁহার অসীম করুণাবলে স্বেচ্ছায় পুলিসের চাকুরীতে ইস্তফা দিলাম। এক্ষণে তাঁহারই ইচ্ছানুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত রাখিয়াছেন।

গুপ্তমহারাজের বিষয় কিছু লিপিবদ্ধ করিবার মানসে অনেক নিজের কথা বলিয়া ফেলিলাম। আমি জনশ্রুতি হইতে তাঁহার বিষয় কিছু লিখি নাই। তাঁহার শ্রীচরণ কৃপায় এবং তাঁহার অসীম স্নেহের অচ্ছেদ্য বন্ধনে, ঘটনাচক্রে নিজের জীবনে যাহা প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধি করিয়াছি এবং একমাত্র শ্রীগুরুকৃপায় এ জীবনে শ্রীশ্রীঠাকুরের ও তাঁহার ভক্তগণের অহেতুক কৃপা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে পাইয়া প্রাণের সকল জ্বালা জুড়াইয়াছি বলিয়াই, অবান্তর ঘটনাবলী সন্নিবেশিত

করিতে সাহসী হইলাম। আশা, সহৃদয় ভক্তগণ দীনের এ অশেষ ত্রুটী নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন।

ভক্তশ্রীচরণাশ্রিত সেবক
শ্রীজীবিতনাথ দাস।

"মা।"

মা শব্দটী শব্দভাণ্ডারের এক অমূল্য নিধি। মা নামটী অমৃতনির্ঝর। শব্দটী উচ্চারণ করা মাত্রেই হৃদয়ে কি এক অমিয়-মাখা স্বর্গীয় ভাবের উদয় হইয়া অন্তরকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলে। শব্দভাণ্ডারে এমন মধুমাখা, এমন হৃদয় ভরা, এমন পবিত্র, এমন স্বভাব-সুন্দর, এমন হৃদয়োন্মাদক শব্দ আর একটীও নাই। আমরা জন্মের পরমুহূর্ত্ত হইতেই গর্ভধারিণীকে মা বলিয়া ডাকিতে অভ্যাস করি। অতি বাল্যকালে যদি আমরা একবার মা বলিয়া ডাকি, অমনি জননী সমূহ কার্য্য ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে বুকে তুলিয়া লইয়া স্তন দানে পরিতৃপ্ত করেন। তাঁহাদের এই নিঃস্বার্থ ভালবাসা দেখিয়াই বোধ হয় আমরা মাতৃ নামে এত আকৃষ্ট হইয়া পড়ি এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই যেখান হইতে কিছু পাই, যিনি আমাদিগকে নিঃস্বার্থভাবে কিছু দেন, আমরা তাঁহাকেই মা নামে অভিহিত করি। যেমন গো-মাতা, জননী, জন্মভূমি ইত্যাদি। জ্ঞান বৃদ্ধি হইলে, যিনি আমাদিগকে সদা বুকের উপর রাখিয়া জীবন ধারণোপযোগী সমূহ জিনীষ আমাদের সম্মুখে সজ্জিত রাখিয়াছেন, যখন যাহাই চাহিতেছি তাহাই অকাতরে দান করিতেছেন, সেই বিশ্বকর্ত্তা পরমাত্মাকে আমরা মা বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছা করি; ইহা স্বভাবসিদ্ধ এবং প্রত্যেক মানবের হৃদয়ে প্রায়ই এ ভাবের উদয় হইয়া থাকে। আবার ভাবুক সাধকেরা এই বিশ্ব জননীর ভাবে বিভোর হইয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতঃ তাঁহাকে পাইবার আশায় উন্মত্ত হইয়া পড়েন এবং সাধন পথে অগ্রসর হইয়া জগতের প্রত্যেক স্ত্রী মূর্ত্তিতে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হয়েন। ইহাই মাতৃ-ভাব সাধনার চরম ফল এবং ইহাকেই ব্রহ্মানন্দের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তাঁহারা প্রত্যেক স্ত্রী-মূর্ত্তিকে মা বলিয়া যে কি আনন্দানুভব করেন, তাহা একমাত্র তাঁহারা ভিন্ন অন্য কাহারও বুঝিবার নহে। বোধ

হয় তাহা জানাইবার নহে, অনুভবের জিনীস। এই ভাব-সাধনা মানবের স্বভাবসিদ্ধ হইলেও ইহার প্রধান প্রতিবন্ধক কাম। যদি কাম রিপুটী না থাকিত, তবে প্রত্যেক মানবই এই মাতৃ-ভাব সাধনার চরম স্থলে উত্তোলিত হইতে পারিতেন। কাম-বৃত্তিটীকে সমূলে উন্মূলিত না করিলে এ সাধনার পূর্ণ বা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সিদ্ধিলাভ ঘটে না। কামবৃত্তিটীকে সমূলে উন্মূলিত না করিয়া যদি কেহ এ সাধনার পথে অগ্রসর হন, তবে তিনি জগতস্থ যাবতীয় স্ত্রী-মূর্ত্তিগুলিকে "মা মা" ডাকিতে সমর্থ হইলেও, নিজ জায়াতে তাঁহার স্ত্রী-বুদ্ধি থাকিয়া যায়। সুতরাং ইহাকে পূর্ণ বা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সিদ্ধি বলা যাইতে পারে না। কামজয়ী কামিনী-ত্যাগী ব্যক্তিরাই অচিরে এ সাধনার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সিদ্ধি-লাভে সমর্থ হন। কিন্তু, তাহা বলিয়া যে কামিনীযুক্ত ব্যক্তিরা ইহা হইতে বঞ্চিত হইবেন, এই ব্রহ্মানন্দের ন্যায় নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন না, তাহা নহে। প্রাচীন যুগের মাতৃ-সাধকেরা নিজ জায়া ব্যতীত জগতের প্রত্যেক স্ত্রী-মূর্ত্তিকে পবিত্র দৃষ্টিতে দেখিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু নিজ স্ত্রীকে মাতৃ-সম্বোধনে আহ্বান করিতে ইচ্ছুক হইতেন না। তাই অনেকে বলেন, কামিনী-ত্যাগী না হইলে এ সাধনার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সিদ্ধিলাভ করা যায় না। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের যুগাবতার রামকৃষ্ণদেব এই আনন্দে সকলেরই পূর্ণাধিকার এবং কি বিবাহিত, কি অবিবাহিত প্রত্যেক ব্যক্তিই এই সাধনায় অগ্রসর হইয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সিদ্ধিলাভে সক্ষম হইতে পারেন, ইহা দেখাইবার জন্য নিজে আদর্শ সাজিয়া কামবৃত্তিটীকে সমূলে উন্মূলিত করতঃ, দার পরিগ্রহ করিয়া নিজ জায়ার মধ্যে সাক্ষাৎ জগদম্বার বিকাশ দেখিতে দেখিতে সকলকেই এই আনন্দ উপভোগের জন্য আহ্বান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই আহ্বান-বাণী শুনিয়াই আমি জগতস্থ মাতৃ-সাধক সংযমক্ষম বিবাহিত যুবক-দিগকে বলিতেছি, মহোদয়গণ! আপনারা তাঁহারই পদানুসরণ করিয়া এই নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করুন। ইহা হইতে বঞ্চিত থাকা সংযমক্ষম ব্যক্তি-গণের মধ্যে কাহারও কর্ত্তব্য নহে। প্রাচীন কালের যোগী ঋষিরা সহস্র বৎসর সাধনা করিয়া যে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতেন, আপনারা যদি স্বভাব-সিদ্ধ মাতৃ-ভাবটীকে আশ্রয় করিয়া মাত্র একটু কঠোর সংযমের দ্বারা, সেই আনন্দের অনুরূপ এই নির্ম্মল আনন্দটী উপভোগ করিতে সমর্থ হয়েন, তবে সমর্থ ব্যক্তিগণের ইহা হইতে বঞ্চিত থাকা উচিত হয় কি? সাধক যখন এই

ভাব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন, জগত তখন তাঁহার নিকট পবিত্রময় 'বোধ হয়। এইরূপ সাধকগণের নিকটই এই পূতিগন্ধময় অসার সংসারাশ্রম তপোবন-তুল্য অনুমিত হয়। তাঁহারা যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন সর্ব্বত্রেই মাতৃমূর্ত্তি দেখিতে পান। তাঁহাদের হৃদয়, মর্ম, অন্তর, বাহির সর্ব্বত্রেই মাতৃমূর্ত্তি বিরাজ করে। সুন্দর বেশ ভূষায় সজ্জিতা ষোড়শী যুবতী, যাঁহাকে দেখিলে কামুকের চিত্ত-বিকার উপস্থিত হয়, তাঁহার সেই বেশ ভূষা ও রূপ যৌবন দেখিয়া তিনি তাঁহার ভিতর সাক্ষাৎ জগদম্বার বিকাশ দেখিতে দেখিতে মাতৃভাবে বিভোর হইয়া পড়েন এবং পবিত্র দৃষ্টিতে দর্শনজনিত অপার আনন্দে আপ্লুত হয়েন। এই আনন্দের সহিত বোধ হয় জগতের কোন আনন্দেরই তুলনা হইতে পারে না। এই অতুলনীয় আনন্দ উপভোগের ইচ্ছা কি মানব মাত্রেরই হৃদয়ে স্বতঃই উদয় হয় না? অসাধারণ অধ্যবসায় ও সংযমশক্তি সহায়ে প্রত্যেক মানবই ইহা লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারেন। যদি ইহা মানব মাত্রেরই লোভনীয় হয়, তবে প্রত্যেক সংযমক্ষম ব্যক্তিগণ স্বীয় ইচ্ছা-শক্তি প্রসার করিয়া এ পথে অগ্রসর হইতে সচেষ্ট হউন। এ স্থলে হয় ত কেহ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন, যদি কোন সংযমক্ষম বিবাহিত পুরুষের স্ত্রী বিদ্যারূপিণী না হয়েন, তবে তিনি ত এ সাধনায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইতে পারিবেন না। তাঁহার উত্তরে আমার বলিবার এই:—অনেক স্থলেও দেখিতে পাওয়া যায়, যদি কেহ ভগবৎ পথে গমন করিতে ইচ্ছুক হয়েন, আর প্রথমতঃ তাঁহার স্ত্রী তাঁহার সে পথের বিরোধী হন, তিনি যদি তাহা গ্রাহ্য না করিয়া নিজ অভীষ্ট পথে অগ্রসর হন, তবে তাঁহার স্ত্রী ক্রমে তাঁহার ছায়ানুসরণ করিয়া থাকেন। এই সমূহ প্রত্যক্ষ দৃষ্টির উপর বিশ্বাস রাখিয়া অবিদ্যা-হস্তে পতিত সংযমক্ষম ব্যক্তিগণ কিছুদিন ধরিয়া তাঁহাদের জায়ারূপিণী মা আনন্দময়ীদিগকে সদুপদেশ দানের সহিত নিজ অভীষ্টপথে লইতে ইচ্ছা করেন, তবে বোধ হয় তাঁহারা অচিরে সংযমপথে অগ্রসর হইয়া প্রকৃত জগজ্জননী স্থানীয় হইতে পারিবেন। যে দিন তাঁহারা জগতস্থ মনুষ্য, পশু, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি যাবতীয় জীবকে সন্তানরূপে ভাবিতে সমর্থ হইবেন, সেই দিনই তাঁহারা প্রকৃত স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইবেন। ইহা দ্বারা তাঁহারাও যে নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিবেন, তাহাও ঠিক ব্রহ্মানন্দের অনুরূপ ও তাহাপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। সুতরাং কিছুদিনের জন্য সৎ উপদেশ দানের সহিত জায়ারূপিণী মা আনন্দময়ী-দিগকে যদি নিজের মাতৃভাব সাধনায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সিদ্ধি লাভে সমর্থ করিয়া লইতে পারা যায় এবং মা আনন্দময়ীদিগকেও নির্ম্মল স্থায়ী আনন্দের মধ্যে রাখিয়া জগজ্জননী স্থানীয় করিতে পারা যায়, তাহা হইলে কি সংযমক্ষম বিবাহিত যুবকগণের ইহা অবলম্বন করা উচিত নহে?

জগজ্জননীর কৃপাপ্রার্থী
জনৈক হতভাগ্য অধম।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীচরণ ভরসা।

জয় গুরুদেব !!

তত্ত্ব-মঞ্জরী

ঊনবিংশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা।

শ্রাবণ, সন ১৩২২ সাল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-স্তব।

নম নম রামকৃষ্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম অবতার
তুমি জগতের নাথ তুমি জগতের সার
মানব রূপেতে এলে
কত লীলা প্রকাশিলে
জানাইলে ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানহীন মানবে
এখনো ধর্ম্মের জয় প্রচারিত এ ভবে॥

২

কি শান্ত মহান মূর্ত্তি ধরেছ জগৎ স্বামী
একি লীলা দেখাইতে এসেছ জগতে তুমি
একি হেরি সব তুমি
জল ব্যোম স্থল ভূমি
পূর্ণকায় রামকৃষ্ণ বিরাট মূরতি ধরি
একি লীলা দেখাইছ লীলাময় ওগো হরি॥

৩

করুণায় মাখা প্রাণ দয়ায় হৃদয় ভরা
দীনের নয়নে অশ্রু দেখে নিজে আত্মহারা
সম বেদনায় প্রাণ
অশ্রু দেয় প্রতিদান
দরিদ্রের দুঃখ হেরি দিতে নিজ প্রাণ ঢেলে
এমন হৃদয় কার আছে এ অবনীতলে?

৪

সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিলে হে মহা ঋষী
সাধক প্রাণে ত সিদ্ধি দিলেন মা নিজে আসি
জনে জনে শিখাইলে
দিলে পরে প্রাণ ঢেলে
কামনা বাসনা আদি দিলে সব বিসর্জ্জন
অনায়াসে লভে জীব মহা সাধনার ধন॥

৫

জয় জয় মহাপ্রভু ত্রিলোক ঈশ্বর তুমি
তব আগমনে ধন্য হয়েছে ভারত ভূমি
পৃথিবী চরণ তব
হৃদয়ে ধরিয়া দেব
গর্ব্ব ভরা হৃদয়েতে ডাকিতেছে পুনঃ হায়
আবার কি পরমেশ আসিবে গো এ ধরায়?

৬

যখন আবার পৃথ্বি হবে পাপে কলুষিত
পলাইবে ধর্ম্ম বৃত্তি মহা ভয়ে হয়ে ভীত
তখন কি দেবতার
হবে পুনঃ অবতার
আবার কি সে চরণ, পরশ করিবে ভূমি
আবার কি ধন্য হব সে পদ পরশে আমি?

৭

শিখাইলে ধর্ম্মজ্ঞান, দিলে প্রাণ দান প্রভু
কেহ কি সে দেববাণী বিস্মরণ হবে কভু
যে শুনেছে সেই বাণী
যে পূজেছে পা দুখানি
কি পুণ্য তাদের আহা কে বলিতে পারে
সার্থক জনম—তাঁর ধন্য এ সংসারে॥

৮

দেখাইলে দেব তুমি পাপ কিবা ভয়ঙ্কর
মুগ্ধ করে বদ্ধ জীবে—দেখিতে কি মনোহর
তাই প্রভু বুঝাইলে,
পাপে প্রাণ সমর্পিলে—
নষ্ট ইহ পরকাল, তাই বলি বৎসগণ
পাপের—চরণ তলে সঁপিও না প্রাণমন।

৯

কত পাপী সাধু হল অমিয় সে বাণী শুণে
পাপ রাশী পলাইল তোমারে দেবতা জেনে
হে দেব ত্রিদিবেশ্বর
আশীর্ব্বাদ নিরন্তর—
করিতেছে মহাভাগ ঊর্দ্ধাকাশ হতে হায়—
মহা আশীর্ব্বাদ স্রোত বহিতেছে এ ধরায়।

১০

হে দেবতা তব দ্বারে তোমার সন্তান আজি
এনেছে সাজায়ে অর্ঘ্য এনেছে কুসুমরাজি
ভক্তি অর্ঘ্য অশ্রুধারা
সচন্দন শ্রদ্ধা মালা
এনেছে তোমার পদে দিতে দেব উপহার
কর শুধু আশীর্ব্বাদ আশীর্ব্বাদ মাত্র সার॥

শ্রীচরণাশ্রিতা—
সেবিকা শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী

ফকীর।

—০:-*-:০—

সুখের স্বপন যার ভেঙ্গেছে, সে আসে ফকীরের ঘরে।
ফকীরী নয়কো তারি, মন নহে যার আপন করে।

গিরিশচন্দ্র।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সুখ প্রত্যাশায় জলাঞ্জলি দিয়া যে প্রেমিকপ্রবর পরম প্রেমময়ের প্রেমসুধাপানে বিভোর হইয়া কেবলমাত্র তাঁহারই শ্রীচরণোদ্দেশে জগৎ ভুলিয়া যায়, সেই ফকীর। যে মহান্ তেজস্বী বীর-হৃদয় করামনকবৎ স্বীয় মনরূপ পরম ইন্দ্রিয় রত্নকে করায়ত্ব করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে একদিকে রাখিয়া, শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম মস্তকে ধারণ করতঃ মাভৈঃ রবে দিক্‌দিগন্ত কম্পিত করিয়া স্বয়ং ভগবৎ প্রদত্ত অভয় লাভান্তে প্রেমে মগ্ন হইয়া জগতের সকলকে সেই প্রেমে মগ্ন রাখিতে ও অভয় দান করিতে প্রস্তুত হয় এবং আপনার আমিত্বকে প্রেমময়ের শ্রীশ্রীচরণকমলে জীবনের মত সঁপিয়া দেয়, সেই ফকীর। চকোর যেমন চন্দ্রসুধা ব্যতীত পান করে না, শিশু যেমন মা ব্যতীত কিছু জানেনা, সতীর যেমন পতি ব্যতীত জগৎ অন্ধকারময় জীবন শূন্য, ফকীর ঠিক তেমনই কিম্বা ততোধিক, শ্রীশ্রীজগৎগুরু বিশ্ববিজয়ী প্রেমে দেওয়ানা হইয়া আপনা ভুলিয়া তাঁহাতেই বিকাইয়া যায় এবং প্রেমময়ের প্রেমপীযূষ পানে অমর ও তৃপ্ত হয়। প্রেমের পুতলী ধ্রুব, প্রহ্লাদ ত্রিলোকব্যাপী প্রেমে মগ্ন হইয়া, সিংহ, শার্দ্দুল, অনল, গরল, শত্রু, মিত্র প্রভৃতি জগতের সকলকেই যেমন প্রেমময় বোধে প্রাণে প্রাণে আলিঙ্গন করতঃ প্রাণের জ্বালা মিটাইয়া ফকীরের পরম আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন এবং ভারতমাতাও সেই আদর্শে জগতের জন্য কত শত ভগবৎ প্রেমিক ফকীর সন্তান প্রসব করিয়া জগতের সকলকে আপনার ক্রোড়ে আশ্রয় দিতেছেন্ এবং অনন্তকাল আশ্রয় দিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। রত্নগর্ভা ভারতমাতাই বুঝি অবতারগণের জন্মদাত্রী, বুঝি পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ না করিলে শুদ্ধাভক্তি ও পরমাগতি লাভ হয় না, বুঝি ভারতের ভগবৎপদরজ না মাখিলে মানুষ দেবতা হয় না,

বুঝি এমন প্রেমের পবিত্র বাতাস আর কোথাও বহেনা, নচেৎ জগতের নরাধীপগণ সকল ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়াও আমার ভারতমাতার শ্রীচরণধূলীর জন্য লালায়িত কেন? নিশ্চয়—নিশ্চয় বুঝিয়াছি—ভক্তি ও মুক্তির জন্য। এ রত্ন আর কোথাও নাই,—এ রত্ন দস্যু চোরের অধিকার বহির্ভূত—কিন্তু মা আমার রাঙ্গা ফলে ভুলাইয়া দেন, যার অসীম ঐশ্বর্য্যে জীব আসল ভুলিয়া যায়, বুঝি এমন ঐশ্বর্য্যও আর কোথাও নাই, তাই বলিয়াছি মা আমার রত্নগর্ভা, মা আমার সর্ব্বত্যাগী ফকীরের রাণী-অন্নপূর্ণা মা আমার, তাই মায়ের ছেলে ফকীর—

পরিহিত সিতবেশং দীন ভাবৈক মূর্ত্তিং
বিকশিতকমলাস্যং হাস্যমাধুর্য্যপূর্ত্তিং।
দলিত-দুরিতবৃন্দং বিশ্ব সংব্যাপ্ত কীর্ত্তিং
সততসদয়চিত্তং রামকৃষ্ণং নমামি।
নিখিলজনহিতার্থং ত্যক্তবৈকুণ্ঠ বাসং
ধৃতনবনরদেহং দিব্যভাতিপ্রকাশং।
বিজীতবিষয়চেষ্টং দুঃখসৌখ্যেনিরাশং
ত্রিভুবনজনপূজ্যং রামকৃষ্ণং নমামি॥

ভাই, অন্নপূর্ণার সন্তান হইয়া সকল ক্ষুদ্রত্ব, সকল দ্বেষ, সকল স্বার্থ ভুলিয়া ফকীরের সন্তান, ঠিক ঠিক ফকীর হইয়া জগন্মাতার অনন্ত প্রেমভাণ্ডার দুই হস্তে বিতরণ কর, দেবত্ব লাভ কর; কাহাকেও এ প্রেমধনে বঞ্চিত করিও না, এ প্রেমভাণ্ডার অক্ষয় অসীম, এ প্রেমের তরঙ্গে জগৎ ভাসিয়া যাইবে, এ প্রেমের হিল্লোলে যাবতীয় পাষণ্ড দলিত হইবে—ব্রহ্মাণ্ড তলাইয়া যাইবে। আর এস ভাই এস, সজলনয়নে আমাদের প্রাণের প্রাণ, জীবনসর্ব্বস্ব, অনাথনাথ, কাঙ্গাল-শরণ পতিতপাবনের শ্রীচরণকমল বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া প্রার্থনা করি, "হে নাথ, নিজগুণে আপনার শ্রীচরণে" একনিষ্ঠ শুদ্ধাভক্তি দাও প্রভু! আমরা তোমা বই যেন আর কিছু জানি না। মঙ্গলময়! শরণাগতি ব্যতীত আর আমাদের গতি নাই, শ্রীচরণে আশ্রয় দাও দীননাথ! তোমার বড় আপনার, দুই বাহু স্বরূপ মহাত্মা শ্রীশ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীশ্রীস্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ বড় কৃপা করিয়া চিনাইয়া ও জানাইয়া দিয়াছেন,—তুমি ব্যতীত আমাদের আর গতি নাই, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক মা আমার।"

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব,
ত্বমেব বন্ধুশ্চঃ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব,
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেব দেব॥ "কাঙ্গাল।"

যুগাবতার

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও হিন্দুশাস্ত্র।

অবতার-তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ২২ পৃষ্ঠার পর।)

একদিন রাণী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীজগন্মাতার সম্মুখে বসিয়া আহ্নিক পূজা করিতে করিতে একটী মোকদ্দমার ফলাফলের বিষয় ভাবিতেছিলেন। ঠাকুর রাণীর নিকটেই বসিয়াছিলেন। তিনি রাণীর ঐরূপ অন্যমনস্ক ধ্যানের বিষয় জানিয়া 'এখানেও ঐ চিন্তা' বলিয়া রাণীর পৃষ্ঠে করাঘাত করিয়াছিলেন। তাহাতে ভক্তিমতী রাণী, নিজ অপরাধ স্মরণ করিয়া যেমন অনুতপ্ত হইলেন, তেমনই ঠাকুর, তাঁহার মনের কথা কিরূপে জানিতে পারিলেন ভাবিয়া অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

কামিনীকাঞ্চন ঈশ্বর সাধন পথের প্রধান অন্তরায়। জীবকে ইহা শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত ঠাকুর উহাদিগকে কায়মনোবাক্যে যতদূর পরিবর্জ্জন করিতে হয় করিয়া বৈরাগ্যের পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ নামক জনৈক মাড়োয়ারি ভক্ত, সাধু শান্তদিগের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ, ঠাকুরের নামে দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ লিখিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। ঠাকুর অকপট চিত্তে বলিয়াছিলেন, "আমার টাকায় কোনও আবশ্যক নাই।" লক্ষ্মীনারায়ণ নানারূপ জিদ করার পরও ঠাকুর যখন কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না, তখন লক্ষ্মীনারায়ণ এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আপনার ভাগিনা হৃদয়ের নামে লিখিয়া দিলে কোন

ক্ষতি হইবে না।" ঠাকুর কহিলেন, "তাহাকে বেনামী বলে। ইহা অপেক্ষা গুরুতর কপটতা আর কি হইতে পারে? আমি সাধু সাজিয়া জগতে কাঞ্চন ত্যাগী বলিয়া প্রকটিত হইলাম, কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমার টাকা বেনামী করিয়া রাখিলাম, ইচ্ছামত আমি তাহা খরচ করিব। তুমি পণ্ডিত হইয়া আমাকে এইরূপ ঘৃণিত কার্য্যের পরামর্শ দিতেছ, কেবল পরামর্শ নহে—প্রলোভন দেখাইতেছ? তোমায় জোড়হাত করিয়া মিনতি করিতেছি, এমন কথা আর বলিওনা।" লক্ষ্মীনারায়ণ তাহাতেও না শুনিয়া নিতান্ত জিদ করায়, ঠাকুর সিংহনাদে ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক বলিলেন—"মা! এরূপ হীন বুদ্ধির লোক আনিয়া কেন আমায় যন্ত্রণা দাও। যাহারা তোমার পাদপদ্ম হইতে পরিভ্রষ্ট করিতে চাহে, যাহারা তোমায় স্থানচ্যুত করিয়া ছায় কাঞ্চন বসাইতে চাহে, তাহাদিগকে এখনই দূর করিয়া দাও। যেন তাহাদিগকে আর আমায় দেখিতে না হয়।" লক্ষ্মীনারায়ণ এতক্ষণে ঠাকুরের চরণ তলে পতিত হইয়া অপরাধ মার্জ্জনা করিবার নিমিত্ত রোদন করিতে লাগিলেন।

রাণী রাসমণির জামাতা মথুরামোহন বিশ্বাস, পঞ্চাশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ ঠাকুরের নামে দিতে চাহিলে, তাহাও ঠাকুর এইরূপে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলেন, 'আর কখনও এমন কথা বলিওনা।'

অধিক কি, কোন ধাতুদ্রব্য ঠাকুর স্পর্শ করিলে, ঠাকুরের হাত বাঁকিয়া যাইত।

কামিনী সম্বন্ধেও, জগতের সমস্ত স্ত্রীলোকগণকে জগৎ জননী আদ্যাশক্তির অংশ বিবেচনা করিয়া, মাতৃ সম্বোধন করিতেন। এমন কি, নিজে বিবাহিতা স্ত্রীকেও ঐরূপ আদ্যাশক্তির অংশ বিবেচনা করিয়া, কায়মনোবাক্যে কখনও গ্রহণ না করিয়া ফলহারিণী কালিকা পূজার দিন. শ্রীশ্রীমাকে (ঠাকুরের বিবাহিতা স্ত্রী) ৺ষোড়শী পূজা করিয়াছিলেন।

ঠাকুর প্রথমতঃ শক্তি' উপাসক হইয়া কালী সাধনা করিয়াছিলেন। তিনি তন্ত্রাদি মতে যত প্রকার সাধন আছে, সমুদয় সাধনগুলিতে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি নেংটা তোতাপুরী নামক সাধুর দ্বারা দীক্ষিত হইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভের জন্য প্রবৃত্ত হন এবং সেই সাধনে তিনি তিন দিবসে কৃতকার্য্য হন। যে দুঃসাধ্য নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভের নিমিত্ত শ্রীমৎ তোতা চুয়াল্লিশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সেই সমাধি ঠাকুর তিন দিবসে সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে

যারপরনাই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ইহার কারণ বাহির করিবার নিমিত্ত তোতাপুরী এগার মাস দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া, ঠাকুরকে ইয়ত্তা করিতে না পারিয়া প্রস্থান করেন। বলা বাহুল্য শ্রীমৎ তোতা তিন দিবসের বেশী কোথাও থাকিতেন না, এইরূপ তাঁহার নিয়ম ছিল। জটাধারী নামক জনৈক সাধকের নিকট ঠাকুর 'রাম মন্ত্রে' দীক্ষা লাভ করেন। বৈষ্ণব তন্ত্রোক্ত পঞ্চ ভাবাশ্রিত যতপ্রকার সাধনপথ ভারতে প্রবর্ত্তিত আছে, সকলগুলিতেই যথাবিধি অনুষ্ঠানে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। এইরূপে ভারতে প্রচলিত প্রাচীন সমুদয় ধর্ম্মভাব সাধনের প্রক্রিয়ানুসারে গমন করিয়া রামাৎ, নিমাৎ, বৌদ্ধ, নানকপন্থী প্রভৃতি সম্প্রদায় বিশেষও তিনদিন করিয়া সাধন করিয়াছিলেন। অত্যাশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনদিন অতীত হইবামাত্র আর এক সম্প্রদায়ের একজন সিদ্ধপুরুষ আসিয়া অমনি উপস্থিত হইতেন। এইরূপে হিন্দু মতের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ধর্ম্মমত-গুলির নিদান নিরূপণানন্তর তিনি মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে ইচ্ছা করেন। অমনি গোবিন্দ দাস নামক জনৈক ব্যক্তি সহসা তাঁহার নিকট সমাগত হইয়া তাঁহাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষা প্রদান করিলেন। এই সাধনায়ও তিন দিবসের অধিক প্রয়োজন হয় নাই। পরে শ্রীশ্রীঈশা প্রবর্ত্তিত খ্রীষ্টধর্ম্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহাও উক্তরূপে তিন দিবসে সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

এইরূপে সর্ব্ব মতের সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া ঠাকুরের দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, সর্ব্ব ধর্ম্ম সত্য—যত মত তত পথ মাত্র। কারণ, সকল প্রকার ধর্ম্মমতের সাধনায় অগ্রসর হইয়া তিনি উহাদিগের প্রত্যেকের যথার্থ ফল জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া-ছিলেন। ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব উহা অর্থাৎ সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয় বাণী প্রচার-পূর্ব্বক পৃথিবীর ধর্ম্ম বিরোধ ও ধর্ম্মগ্লানি নিবারণের জন্যই যে আগমন করিয়াছিলেন এবং সেই হেতুই লোক শিক্ষার জন্য যে সকল প্রকার ধর্ম্ম মতের সাধনা করিয়াছিলেন, এ কথা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। এইরূপ নিজে সাধনা করিয়া জীবের উপলব্ধি করানই অবতারগণের কার্য্য এবং এই জন্যই তাঁহাদের আগমন।

আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার।
আপনে আচরি ভক্তি করেন প্রচার॥

* * * * * *

নানা ভক্ত ভাবে করেন স্বমাধুর্য্য পান।
পূর্ব্বে করিয়াছি এই সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যান॥
অবতারগণের ভক্তভাবে অধিকার।
ভক্তভাব হৈতে অধিক সুখ নাহি আর॥ (চৈঃ চঃ)

অনেকে বলিতে পারেন, শ্রীভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ দেহাবলম্বনে ভক্ত ভাবেই যদি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তবে তাঁহার সাধকোপদেষ্টার আবশ্যক হইয়াছিল কেন? তিনি লোকশিক্ষানুরোধে নিজেই ত ধর্ম্ম মত সকল সাধনা করিতে পারিতেন? এই কথার উত্তরে বলিতে পারা যায়,

তির্য্যঙ্মনুষ্যবিবুধাদিষু জীবযোনি-
ষাত্মেচ্ছয়াত্মকৃত সেতুপরীপ্সয়া যঃ।
রেমে নিরস্তবিষয়োঽপ্যবরুদ্ধ দেহ-
স্তস্মৈ নমো ভগবতে পুরুষোত্তমায়॥

(ভাঃ ৩য় স্কন্ধ, ৯ম অঃ, ১৯শ শ্লোঃ)

তোমাতে বিষয়-সুখ-সম্বন্ধ আদি নাই, তথাপি তুমি স্বীয় আনন্দ অনুভব নিমিত্ত নিজ ইচ্ছামত তির্য্যক্, মনুষ্য ও দেবাদি জীব যোনিতে শরীর গ্রহণ করিয়া নিজ কৃত ধর্ম্মমর্য্যাদা পালন কামনায় ক্রীড়া করিয়া থাক। এই জন্য তোমাতে উপাধি ও ধর্ম্ম ইত্যাদি সংস্পর্শ নাই বলিয়া, তুমি পুরুষোত্তম, তোমাকে নমস্কার করি।

ঠাকুর ভক্তগণের সহিত অবতারবাদ কথন প্রসঙ্গে, এই কথাটি সহজ-ভাবে বলিতেন। যদি বল, যার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক এই সব অনেক জীবের ধর্ম্ম আছে, তাহাকে অবতার কিরূপে বলিব? তার উত্তর এই যে, "পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম প'ড়ে কাঁদে।" অতএব, শ্রীভগবান্ মনুষ্য মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইলে, তাঁহাকেও মানবদেহের ধর্ম্মমর্য্যাদা পালন করিতে হইবে। গুরূপদিষ্ট হওয়াও যে মানব দেহের একটী ধর্ম্ম, তাহাও আমরা স্বতঃই বুঝিতে পারি। এই ধর্ম্ম রক্ষার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গদেব, শ্রীমৎ কেশব ভারতীর নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এই ধর্ম্ম রক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণ সান্দীপান নামক মুনিকে গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন এবং এই ধর্ম্ম রক্ষার জন্য শ্রীরামচন্দ্র, মহর্ষি বশিষ্ঠের নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। সুতরাং

ঠাকুরও এই ধর্ম্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্যই যখন যে ধর্ম্মমতে সাধনা করিতে মানস করিয়াছিলেন, তখন সেই ধর্ম্মমতের একজন বিশিষ্ট সাধক কর্ত্তৃক যে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। আরও প্রমাণিত হইতেছে যে, ঠাকুর মানব দেহাবলম্বনে রোগ, শোকাদি স্বাভাবিক মনুষ্যের ন্যায় যে কিছু কার্য্য করিতেন, তাহা কেবলমাত্র নিজ কৃত দেহীর ধর্ম্মমর্য্যাদা পালনের নিমিত্তই করিতেন। ঠাকুরের দেহ ত্যাগও যে এই ধর্ম্মমর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ শ্রীচৈতন্যদেবের এই দেহ ত্যাগের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না বলিয়া, মহাপ্রভুর সহিত ঠাকুরকে তুলনা করিতে চাহেন না। কিন্তু এই অমূলক সন্দেহের কোন কারণ নাই। যে হেতু শ্রীভগবানের নিয়মই এই যে, উৎপত্তিশীল ব্যক্তি বা বস্তু মাত্রেরই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী এবং এই হেতু পূর্ণাবতার পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণও ব্যাধ কর্ত্তৃক শরবিদ্ধ হইয়া স্বেচ্ছায় পার্থিব দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং শ্রীরামচন্দ্রও স্বেচ্ছায় সরযুতে মানবদেহ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। অতএব, এমত স্থলে মহাপ্রভু যে পার্থিব, নশ্বর মানব দেহ ত্যাগ না করিয়া স্বশরীরে স্বধামে প্রস্থান করিয়াছিলেন, তাহা কিরূপে বলা যাইতে পারিবে? সম্ভবতঃ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মহাত্মা ভক্তগণের ভক্তির আতিশয্যেই তাঁহার দেহাবসান লীলা বর্ণিত হয় নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর ইচ্ছা ও স্পর্শ মাত্র অপরে ধর্ম্মশক্তি জাগ্রত করিয়া দিতেন। সে সম্বন্ধে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

ঠাকুরের এই সকল অলৌকিকত্ব দর্শনেই তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলা যাইতে পারে। যে যুগে যে কালে ভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন, সেই কালের দেহীগণের ক্ষমতাতিরিক্ত কার্য্য দ্বারাই অলৌকিকত্ব প্রতীয়মান হয়। ত্রেতা যুগে মারীচ ও তাড়কাদি রাক্ষস নিধন এবং সমুদ্র বন্ধনাদি দ্বারাই শ্রীরামচন্দ্রের অলৌকিকত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছিল। দ্বাপর যুগে পূতনা ও কুবলয় পীড়াদি বধ এবং গোবর্দ্ধন-ধারণাদি দ্বারাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানকালে তাড়কা অথবা পূতনাও নাই এবং সে জন্য শ্রীভগবানের তদ্রূপ দেহ ধারণ করিয়া তাহাদিগকে নিধন অথবা সমুদ্র বন্ধন ও গিরি উত্তোলনাদি দ্বারা অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিবারও আবশ্যকতা নাই।

কলির মানবগণ সহজেই দুর্ব্বল, অল্লায়ু, অন্নগত প্রাণ, সাধন ভজনেও অবিশ্বস্তচিত্ত। সুতরাং যুগোচিত দেহ ধারণপূর্ব্বক মানবগণকে সহজে মুক্তির পথে লইয়া যাওয়াই শ্রীভগবানের অবতরণের উদ্দেশ্য। চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে এই জন্যই শ্রীভগবানের শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গাবতার। পুনরায় এই জন্যই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণাবতার। শ্রীভগবানের এই গৌরাঙ্গাবতারে ও রামকৃষ্ণাবতারে কার্য্য, কারণ ও উদ্দেশ্য অল্প বিভিন্ন হইলেও প্রায় একরূপ। গৌরাঙ্গাবতারে মহাপ্রভু দিগ্বিজয়ী, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে বিচারবুদ্ধিবলে পরাজিত করিয়া শ্রীপাদপদ্মে স্থান দিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণাবতারে বৈদান্তিক পণ্ডিত পদ্মলোচন, গৌরীকান্ত তর্কভূষণ, শ্রীযুত উৎসবানন্দ গোস্বামীর পুত্র পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ, দয়ানন্দ সরস্বতী ও নারায়ণ শাস্ত্রী প্রভৃতি তাৎকালিক প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞসাধক পণ্ডিতগণ বিনা তর্ক বিচারে নিরক্ষর ঠাকুরের আকৃতি প্রকৃতি দর্শনে, তাঁহাকে নারায়ণাবতার জ্ঞানে চিরদিনের জন্য ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গাবতারে, মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ষড়ভুজ মূর্ত্তি ও মুরারি গুপ্তকে রামচন্দ্র বেশে কৃপা করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণাবতারে ঠাকুর মথুরবাবুকে 'শিবশক্তি'রূপে ও বৈষ্ণবসাধিকা ব্রাহ্মণী অঘোরমণি দেবীকে 'বালগোপাল' মূর্ত্তিতে কৃপা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত মহাপ্রভুর শরীরে যে সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইত, ঠাকুরের শরীরে তাহার সকলগুলিই বর্ত্তমান ছিল। মহাপ্রভু কলিযুগের পক্ষে নাম সঙ্কীর্ত্তনই সহজ উপায় ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং নাম মাহাত্ম্য প্রচারের জন্যই মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ঠাকুরও কলিযুগের পক্ষে নারদীয়া ভক্তি অর্থাৎ নামগুণ গানই উত্তম উপায় বলিয়া, বারম্বার বলিয়া গিয়াছেন। অধিকন্তু কলির প্রবল তাড়নায় জীবগণ শাস্ত্রবিগর্হিত নিজ নিজ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে প্রয়াসী হইয়া অন্য ধর্ম্মের ও ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অযথা নিন্দাবাদ আদি দ্বারা পরস্পর অধর্ম্মের পরিপুষ্টি করিতেছে দেখিয়া ধর্ম্মের গ্লানি দূরীকরণ মানসে সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়-বাণী প্রচারার্থই ঠাকুর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত ক্রমশঃ কলির অলস মানবগণ সাধন ভজনে অসমর্থ হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া ঠাকুর ব্যবস্থা করেন যে, 'যাহারা সাধন ভজন বিহীন, যাহারা ধ্যান ধারণাদি করিতে অপারক, তাহারা আমাকে 'বকল্‌মা' দিলে আমি তাহাদের ভগবৎ লাভের

ভার গ্রহণ করিব।' এই হেতু আমরা তাঁহাকে শ্রীভগবান বলিতে বাধ্য। কারণ জীবের উদ্ধারের ভার, শ্রীভগবান্ ভিন্ন কোন সাধারণ গুরু অথবা সাধক অথবা সিদ্ধ লইতে পারেন না।

সাধারণতঃ একজনকে সকল কার্য্যের সম্পূর্ণ ভার দেওয়ার নাম 'বকল্‌মা।' ইংরাজীতে ইহাকে এক্‌জিকিউটর বা অছি বলে। 'আমিত্বটা' একেবারে ত্যাগ করিয়া, তাহা শ্রীভগবানের প্রতি আরোপ করাকে 'বকল্‌মা' বলে। যেমন কোনও ব্যক্তিকে বকল্‌মা দিলে, সকল বিষয়ে তাহার মতানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়, নিজের কোন বিষয়ে কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকে না, তদ্রূপ শ্রীভগবান্‌কে বকল্‌মা দিলে নিজের কোন বিষয়ে বক্তৃতাভিমান থাকিবে না। শুভাশুভ লাভালাভ, ভাল মন্দ যখন যাহা ঘটিবে, সর্ব্বতোভাবে তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহারই ইচ্ছাপ্রসূত বিবেচনা করিয়া, ধীর, স্থির ভাবে তৎসমুদয় উপভোগ করিতে হইবে। তাহা হইলেই তিনি তাহার মুক্তির ভার লইবেন। নচেৎ 'ভাবের ঘরে চুরি' অর্থাৎ মনের জুয়াচুরি থাকিলে কোন ফল হইবে না। এই বকল্‌মার কথা আমাদের হিন্দু শাস্ত্র,—গীতা ও ভাগবতাদিতেও উক্ত আছে।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

(গীতা ১৮শ অঃ, ৬৬শ শ্লোক)

'সমুদয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকে আশ্রয় কর, আমি তোমার সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব; শোক করিও না।'

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥

(ভাঃ ২য় স্ক, ৭ম অঃ, ৪২শ শ্লোঃ)

'যাঁহাদিগের প্রতি ভগবানের করুণা আছে, তাঁহারা অকপটে ও একাগ্রমনে তাঁহার চরণে শরণ লইলে অতি দুস্তর দেব মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন। কুক্কুর ও শৃগালগণের আহারভূত এই অনিত্য দেহে আমি ও আমার বলিয়া তাঁহাদিগের আর অভিমান থাকে না।'

কেহ কেহ বলিতে পারেন, ভগবান্ শরণ লইতে বলিয়াছেন, সকল কার্য্যের ভার দিতে ত বলেন না? কিন্তু বুঝিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধ হইবে যে, 'শরণ লওয়া' ও 'ভার দেওয়া' এই দুইটী শব্দ প্রতিশব্দ মাত্র। মনে কর, একজন নাবালকের বিষয় কর্ম্মোপযুক্ত অভিভাবকের অভাব হইলে, নাবালকটী যদি একজন উপযুক্ত ব্যক্তির শরণ লইয়া তাঁহাকে এক্‌জিকিউটর বা অছি নিযুক্ত করে, তাহা হইলে সেই অছিকে বিষয় কর্ম্মের সম্পূর্ণ ভার অর্থাৎ ক্ষমতা দিতে হইবে। নাবালকের কোন বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না। এইরূপভাবে অছির সম্পূর্ণরূপে কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিয়া তাঁহারই মতানুবর্ত্তী হইয়া চলিলে, অছিও সম্পূর্ণ ভার লইয়া নাবালকের শুভাশুভ বিচার করিয়া কার্য্য করিবেন এবং মঙ্গলামঙ্গলের দায়ী হইবেন। আবার, কোন সম্পত্তিশালী ব্যক্তি যখন নানাপ্রকার ঋণজালে জড়িত হইয়া জগৎ অন্ধকার দেখিতে থাকে, কিছুই কুল কিনারা পায় না, তখন সে গভর্ণমেণ্টের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, গভর্ণমেণ্টও তাহার সকল সম্পত্তির ভার লইয়া, সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া তাহার সম্পত্তিকে ঋণ মুক্ত করেন এবং তাহাকে আর্থিক উন্নতির পথে অগ্রসর করাইয়া দেন। ভগবানেরও সেইরূপ একান্ত শরণ লইয়া, 'ভাবের ঘরে চুরি' না করিয়া অকপটে তাঁহাকে বকল্‌মা দিলে, তিনিও উদ্ধারের ভার লইবেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে শরণ লওয়ার কথা বলিয়া গিয়াছিলেন এবং তদ্ সমর্থনে শ্রীমদ্ভাগবতেও যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই যখন পুনরায় ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বারা ঘোষিত হইতেছে, তখন তিনি যে শ্রীভগবান, ইহা সুনিশ্চিত।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, অবতারগণ অলৌকিক কার্য্য করিয়া থাকেন। এক্ষণে ঠাকুরের অন্তরঙ্গ সাধক ভক্তগণের পদানুসরণ পূর্ব্বক যৎসামান্য লীলাগুণাবলী যাহা বর্ণিত হইল, তদপেক্ষা বর্ত্তমান কালে অলৌকিক কার্য্য ভগবান আসিয়া আর কি দেখাইবেন? এখনকার লোককে গিরি উত্তোলন অথবা সমুদ্র বন্ধন দেখাইবার আবশ্যক নাই। এখনকার মানবগণের পক্ষে যাহা সম্পাদন হওয়া অসম্ভব, তাহা অনায়াসে সম্পাদিত হইলেই অলৌকিকত্ব প্রতিপন্ন হয় এবং তাহা যাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাঁহাকেই অবতার বলিতে বাধ্য। মথুরবাবুকে শিব-শক্তিরূপে এবং অঘোরমণিকে বালগোপাল মূর্ত্তিতে দর্শন দান কোনও সাধক

অথবা সিদ্ধমানব দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। সুতরাং তাহা অলৌকিক কার্য্য। তাৎকালিক বৈষ্ণবচূরণ, গৌরীকান্ত প্রভৃতি বৈদান্তিক ও নৈয়ায়িক প্রসিদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ সাধক পণ্ডিতগণ এবং এতদ্ব্যতীত আরও অন্যান্য সাধক, সিদ্ধ ও সাধু বাবাজীগণ কর্ত্তৃক আকৃতি প্রকৃতি লক্ষণে, যিনি শ্রীভগবান্ বলিয়া বন্দিত ও পূজিত হইয়াছেন, তাঁহাকে মনুষ্য জ্ঞান করা নিতান্ত মূঢ়তার কার্য্য। এরূপ হওয়া মানব সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। অতএব তাহা অলৌকিক। মানবগণের কোনও এক প্রকার সাধন লইয়া আজীবন কাটিয়া যায়, তাহাতে কেহবা সিদ্ধমনোরথ হন, কেহবা তাহাও পারেন না। কিন্তু এমন একটী নহে, দুইটী নহে, পৃথিবীতে যত প্রকার সাধন প্রণালী প্রকাশ্য বা গুপ্তভাবে প্রচলিত আছে, তৎসমুদয় তিন দিবস মাত্র সাধনে যিনি সিদ্ধ হইতে পারেন, তাঁহাকে মানবাখ্যা দেওয়া বাতুলতা ভিন্ন কিছুই নহে। এরূপ কার্য্য যখন কোনও সাধারণ মানবের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না, তখন তাহা অলৌকিক। যিনি এক প্রকার শিক্ষা বিবর্জ্জিত নিরক্ষর হইয়াও সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, শুধু তাহাই নহে, যাহা বড় বড় শাস্ত্রজ্ঞ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতগণ সর্ব্বতোভাবে মীমাংসা করিয়া সর্ব্ব সাধারণের প্রীতিভাজন হইতে পারেন না; তাহাই অর্থাৎ বেদান্ত, ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি নানাবিধ কঠিন শাস্ত্রের বিবিধ জটিলতাপূর্ণ বিষয়গুলির গূঢ় মর্ম্মার্থ সকল চলিত গ্রাম্য ভাষায় সামান্য সামান্য দৃষ্টান্ত দ্বারা সুন্দরভাবে সর্ব্ব সাধারণের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া, সকলের চিত্ত বিমোহিত করিয়াছেন;—তিনি মানব বলিয়া কখনও অভিহিত হইতে পারেন না। সুতরাং এরূপ কার্য্যও অলৌকিক। ঠাকুর ইচ্ছা ও স্পর্শ মাত্র অপরে ধর্ম্মশক্তি জাগ্রত করিয়া দিতেন এবং তিনি পতিত জীবের উদ্ধারকর্ত্তা। এরূপ কার্য্য যখন শ্রীভগবান ভিন্ন কোনও সাধক অথবা সিদ্ধের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না, তখন তাঁহাকে শ্রীভগবান বলিতে বাধ্য। মনুষ্যেরা সাধু হইতে পারেন এবং সাধনবিশেষে সিদ্ধাবস্থাও লাভ করিতে পারেন। সিদ্ধ হইলে তাঁহারা অপরকে সিদ্ধাবস্থায় লইয়া যাইতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা কখন ভিন্ন ভিন্ন লোকের স্বভাবানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের সাধন দ্বারা সিদ্ধকাম করাইতে সক্ষম নহেন। কিন্তু ঠাকুর সাধকের স্বভাবানুযায়ী ধর্ম্মের সাধনে, সহায়তা দ্বারা কাহাকেও বৈষ্ণব, কাহাকেও শাক্ত, কাহাকেও শৈব, কাহাকেও কর্ত্তাভজা, কাহাকেও নবরসিক, কাহাকেও বাউল, কাহাকেও শিখ, কাহাকেও

মুসলমান, কাহাকেও খ্রীষ্ট এবং কাহাকেও আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানের ভাবে নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কাহাকেও স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলেন নাই। এই হেতু এবং পূর্ব্বোক্ত ও অন্য নানাবিধ অলৌকিক কার্য্যাদি দর্শন ও শ্রবণ করিয়া সকল ধর্ম্মাবলম্বীগণ তাঁহাকে শ্রীভগবান্ জ্ঞানে হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও পূজা অর্পণ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, এ দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর হইতে যে সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের ভাব মানব মনে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছিল, তাহা ঠাকুরের আবির্ভাবের পর হইতে পুনরায় কেমন ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করিতেছে এবং শুধু হিন্দুদের মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া, ভারতের সকল প্রকার জাতি ও সম্প্রদায়কেও ছাড়াইয়া সুদূর পাশ্চাত্যদেশে পর্য্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করিয়া সনাতন ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে। অতএব শাস্ত্র মর্ম্মার্থ হইতে অবতারগণের প্রধানতঃ যে দ্বিবিধ লক্ষণ পাওয়া গিয়াছিল, তাহা ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবে বিশেষরূপে লক্ষিত হইতেছে।

(১) পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্মের নিন্দাবাদ আদি দ্বারা যখন সনাতন ধর্ম্মের হানি হইতে আরম্ভ হইল এবং তজ্জন্য অধর্ম্মের আধিক্য হওয়ায়, শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণরূপ মানবদেহে অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বধর্ম্মের সামঞ্জস্য ভাব রক্ষার দ্বারা জীবের মঙ্গলসাধন জন্য যে সকল অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা মানবের পক্ষে অসম্ভব জানিয়া এবং শাস্ত্রোক্ত লক্ষণাদি দ্বারা শাস্ত্রজ্ঞ সাধকগণ তাঁহাকে অবতার বলিয়া প্রচারিত করিয়াছিলেন।

(২) তাঁহার উক্তরূপ অলৌকিক কার্য্যাদি দর্শন ও শ্রবণ করিয়া ভক্তজনের কথা কি—ভক্তাতিরিক্ত অর্থাৎ জড়বাদী, নাস্তিক, যবন, ম্লেচ্ছাদি পর্য্যন্ত জনগণও এবং এমন কি, আমাদের বিপরীত দিকস্থ (আমরা যাহাকে পাতাল বলি) আমেরিকাবাসী জনগণও তাঁহার প্রতি ভক্তিমান হইয়াছেন এবং অদ্যাপি কেবলমাত্র তাঁহার উপদেশাবলী পাঠে অনেকেই তাঁহার অভয়চরণে আশ্রয়লাভ করিয়া চিরশান্তির অধিকারী হইতেছেন!

অতএব, মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মকালীন, বিপ্রবেশী সাধু মহাপ্রভুকে শ্রীভগবান্ নির্দ্দেশে যে সকল গুণাবলী বর্ণনা করিয়াছিলেন, (যাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে) তাহার সকলগুলিই ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবে বর্ত্তমান

দেখিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গদেবেরই পুনরাবির্ভাব অবগত হওয়া যায়। আরও ভবিষ্যতে আবশ্যক বিবেচনায়, মহাপ্রভু শ্রীশচীমাতা ও অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকট পুনরাবির্ভাব সম্বন্ধে যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহা রামকৃষ্ণাবতার দ্বারা যে পূর্ণ হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারা যায়। মহাপ্রভু ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন,—

যুগে যুগে অনেক অবতার আমার।
সে সকলে সঙ্গী সবে হয়েছ আমার॥
এইমত আরো আছে দুই অবতার।
কীর্ত্তন আনন্দরূপ হইবে আমার॥
তাহাতেও তুমি সব এইমত রঙ্গে।
কীর্ত্তন করিয়া মহাসুখে আমা সঙ্গে॥ (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীশচীমাতাকে বলিয়াছিলেন ;—

* * * * * *

তথাও আমার তুমি আছিলা জননী।
তুমি সেই দেবকী তোমার পুত্র আমি॥
আর দুই জন্ম এই সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥
এইমত তুমি আমার মাতা জন্মে জন্মে।
তোমার আমার কভু ত্যাগ নহে মর্ম্মে॥ (চৈঃ ভাঃ)

মহাপ্রভু যে দুইবার অবতীর্ণ হওয়ার কথা বলিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রামকৃষ্ণাবতার প্রথম। পুনরায় যে দ্বিতীয়বার অবতীর্ণ হইবেন, তাহা ঠাকুরও তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকট বলিয়াছিলেন, "পুনরায় উত্তর পশ্চিম কোণে অবতীর্ণ হইব।" অতএব শাস্ত্রোক্ত কার্য্য, কারণ, উদ্দেশ্য এবং লক্ষণাদি বিচার করিয়া দেখিলে, স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং পূর্ণাবতার পূর্ণব্রহ্ম শ্রীশ্রীকৃষ্ণ অথবা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব। জয় রামকৃষ্ণ!

এস প্রভো, রামকৃষ্ণ হৃদয় রতন।
ইষ্টমূর্ত্তিরূপে মোরে দাও দরশন॥ (ক্রমশঃ)

শ্রীহরিপদ নন্দী।

আত্মসমর্পণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কালরাত্রি।

"নিস্তারিণি, ও নিস্তারিণি—"

"কি গো"

"একবার ওঠ্ না—"

"কি কর্ত্তে হবে বল্ না"

"দ্যাখ্ দিকিন্ ক'টা বাজলো"

"কেন এখনোও কি দাদাবাবু আসেন্ নি ?"

"না, তুই একবার বাইরে বেরিয়ে দ্যাখ্ দিকিন্ তিনি আসছেন্ কি না।"

"এত রাত্রে কোথায় দেখ্‌বো বাপু, তুমি ঘুমাও আজকে আর তিনি আস্‌বেন না।"

এই বলিয়া নিস্তারিণি পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল। চাঁপা তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া দুই তিনবার ডাকিল, কিন্তু কোন সাড়া পাইল না। সে তখন নিজেই ঘড়ির নিকট গিয়া দেখিল, রাত্রি ১১টা বাজিয়া গিয়াছে এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "তবে কি তিনি আজ আর আসিবেন না ? কাল সপ্তমী পূজা, আজ আফিস স্কুল সমস্তই বন্ধ হইয়াছে, তিনি ত আজই আসিবেন বলিয়া লিখিয়াছিলেন। প্রতি বৎসরেই ষষ্ঠীর দিনে তিনি বাটী আসেন, এবার আসিলেন না কেন ? তবে কি তাঁ'র কোন অসুখ হইয়াছে ?" এই চিন্তা তাহার মনের মধ্যে উদয় হওয়ায় সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। বাহিরে আসিয়া সদর দরজা খুলিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। চতুর্দ্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন, সামনের লোক পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। পল্লীগ্রামের রাস্তা এক্ষণে জনমানবশূন্য—কেবল ঝিল্লির ঝিঁ ঝিঁ রব, শিবাগণের অশিব চীৎকার ও কাল-পেচকের কর্কশ স্বর রজনীর গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। কিয়ৎকাল দাঁড়াইবার পর সে একটা খট্ খট্ শব্দ শুনিতে পাইয়া উদগ্রীব চিত্তে অপেক্ষা করিতে লাগিল এবং মনে মনে করিল. "ঐ বঝি তিনি আসছেন।" ক্রমে শব্দ

নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল এবং সে দেখিল একটী গাভী রাস্তা দিয়া চলিয়া গেল। সে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া দরজা বন্ধ করতঃ হতাশ অন্তরে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ঘড়িতে দেখিল রাত্রি ১২টা বাজিয়া গিয়াছে। তাহার মনে নানাবিধ দুশ্চিন্তা আসিতে লাগিল এবং প্রাণে কি রকম একটা যন্ত্রণা বোধ করিতে লাগিল। সে তখন বাক্স হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল—একবার, দুইবার, তিনবার পাঠ করিল—তাহার পর পুনরায় বাক্সে তুলিয়া রাখিয়া নিজে নিজে বলিতে লাগিল, "তিনি ত বেশ স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে ষষ্ঠীর দিন বাড়ীতে আসিবেন, তবে এলেন না কেন? তা হ'লে নিশ্চয়ই তাঁর অসুখ হ'য়েছে,—যদি তাই হয় তা হ'লে কে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিবে? বিদেশে কার কাছে তিনি থাকিবেন?" এইরূপ চিন্তায় সে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া করযোড়ে বলিতে লাগিল, "মা আনন্দময়ী, তোমার আগমনে গরীব দুঃখী আজ সকলেই আনন্দ ক'রছে; এমন আনন্দের দিনে আমায় নিরানন্দ ক'রো না। তিনি শুভালাভালি বাড়ী আসুন, আমি অষ্টমীর দিনে তোমায় ডাব, চিনি দিয়ে পূজা দেবো।" এমন সময় বাহিরে ৪।৫ জনের কোলাহল তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল—সে তৎক্ষণাৎ নিস্তারিণীকে ডাকিতে লাগিল!

নিস্তারিণী চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া বসিয়া বলিল, "হ্যাঁ গা বউদিদি, তোমার কি চোখে ঘুম নেই? নিজে ত ঘুমুবে না, পরকেও ঘুমুতে দেবে না? এত রাত্রে কোথায় যাবো—সকাল হোক্, কাল যা হয় করা যাবে।" নিস্তারিণীর বাক্য সমাপ্ত হইতে না হইতেই দরজায় করাঘাতের শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। তাহা শুনিয়া সে সদর দরজা খুলিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। চারিজন পাল্কীবাহক নীলরতনকে কোলে করিয়া গৃহে আনিয়া শয়ন করাইয়া দিল। চাঁপা স্বামীর শয্যাপার্শ্বে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দেখিয়া গাত্র স্পর্শ করিল এবং দেখিল তাঁহার অত্যন্ত জ্বর হইয়াছে।

নিস্তারিণী পাল্কীবাহকদিগকে বিদায় করিয়া দিয়া গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক কহিল, "বৌদিদি, তুমি এখনও ভাত খাওনি, দালানে সমস্তই পড়ে আছে দেখ্‌লুম, যাও খাওগে, আমি দাদাবাবুর কাছে বস্‌ছি।"

চাঁপা—না, আমি আজ কিছু খাবনা।

নিস্তারিণী—ওমা, সেকি কথা, কোলের ছেলেটা যে মারা পড়বে। তা এত রাত্রে ভাত খেয়ে কাজ নেই, যাও কেবল দুধটুকুন্ খাওগে।

চাঁপা—না, কিছুই খাবো না, তুই শুগে—

নিস্তারিণী—জ্বরটা বড্ড বেশী হ'য়েছে, তাই অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছেন। জ্বর ছাড়লেই কথা কহিবেন এখন। তা যদি তুমি কিছু না খাও, শোওগে— আমি দাদাবাবুর কাছে বস্থছি। সমস্ত রাত্রি ত চোখের পাতা বুজোওনি। চাঁপা কোন উত্তর না করিয়া স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া রহিল। তখন তাহার মনে নানা রকম দুশ্চিন্তা উদ্রেক হইতে লাগিল। সে তাহার স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে, আজ যদি ওঁর কিছু ভাল মন্দ হয়—সে কার কাছে গিয়ে দাঁড়াইবে? তাহার পিতৃকুলে বা শ্বশুরকুলে যে কেহই নাই। সে পৃথিবীর মধ্যে এমন কাহাকেও দেখিতে পাইল না যে, তাহার নিজের একলার ভার নিতে পারে, তাহার উপর তার একটী দুগ্ধ-পোষ্য শিশু, তাহাকেই বা কে দেখিবে? সে আবার ভাবিতে লাগিল, "কেন আমি এই সমস্ত অমঙ্গল চিন্তা করিতেছি? ঈশ্বর কি এমনই করিবেন? নিস্তারিণী ত বল্লে যে, জ্বর ছাড়লেই তিনি কথা কহিবেন, তবে কেন আমি তাঁর অমঙ্গল করি!" কিন্তু কিছুতেই তাহার প্রবোধ মানিল না এবং অনতিবিলম্বে তাহার নয়নদ্বয় হইতে গণ্ডদেশ বহিয়া দর দর ধারে অশ্রুবিগলিত হইতে লাগিল। নিস্তারিণী তাহাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার তন্দ্রা আসিয়াছিল এবং সে শীঘ্রই গাঢ় নিদ্রাভিভূতা হইল। চাঁপা স্বামীর শয্যাপার্শ্বে অশান্তিপূর্ণ হৃদয়ে একাকিনী বিনিদ্র-রজনী অতিবাহিত করিতে লাগিল।

পাঠক, পাঠিকাগণ! আপনারা সম্ভবতঃ এই দম্পতীর পরিচয়ের নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছেন, বলিতেছি শ্রবণ করুণ:—নীলরতন মুখোপাধ্যায় কামদেব-পুরের একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ব্রাহ্মণ। সংসারের মধ্যে তাঁহার উনবিংশতি বর্ষীয়া যুবতী স্ত্রী চাঁপাসুন্দরী ও দুই বৎসরের একটী শিশু সন্তান, দুলাল। কলিকাতায় ব্রাউন সাহেবের অফিসে তিনি ৪০৲ টাকার বেতনে একটী কর্ম্ম করিতেন। পূজায় ছুটী হওয়াতে বাটী আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে তাঁহার হঠাৎ জ্বর হইল। ষ্টেশনে নামিলে জ্বর এত বৃদ্ধি হইল যে, তিনি উত্থান-শক্তি রহিত হইয়া পড়িলেন। ষ্টেশন্ হইতে তাঁহার বাটী প্রায় এক ক্রোশ হইবে।

অনন্যোপায় দেখিয়া তিনি ষ্টেশনের "বিশ্রামাগারে" গিয়া শয়ন করিলেন। ষ্টেশনে কত লোক আসিতেছে যাইতেছে, কে কাহার সন্ধান করে? সুতরাং নীলরতন যে সংজ্ঞাবিহীন অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন, তাহা কাহারও নজরে আসিল না। কিয়ৎকাল পরে একজন সাহেব গাড়ী আসিতে বিলম্ব দেখিয়া "বিশ্রামাগারে" অপেক্ষা করিতে আসিলে, নীলরতনকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। তিনি ষ্টেশন মাষ্টারকে ডাকিয়া তাহার বাটী পৌছিয়া দিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে একজন নীলরতনকে চিনিত, সে পাল্কী আনাইয়া নীলরতনকে তন্মধ্যে শয়ন করাইয়া নিজে পাল্কীর সহিত গিয়াছিল এবং দূর হইতে পাল্কীবাহক দিগকে নীলরতনের বাটী দেখাইয়া দিয়া ষ্টেশনাভিমুখে প্রত্যাগমন করিল। তাঁহার পর যাহা ঘটিয়াছে, তাহা আপনারা অবগত আছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ।

মানবের শ্রেষ্ঠত্ব।

অনন্ত বিশ্বে মানবই বিশ্বপিতার একমাত্র সৃষ্ট পদার্থ নয়। বহুবিধ সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে মানব অন্যতম। পশু, পক্ষী তরু লতা ইহাদের সকলেরই প্রাণ আছে। ইহাদের অধিকাংশই মানবের ন্যায় নানাবিধ কার্য্য করিতে সক্ষম। প্রধান প্রভেদ ইহাদের বাক্‌শক্তি নাই, মানবের আছে। এতদ্ভিন্ন উচ্চতম প্রভেদ—মানবের বিবেক শক্তি আছে, কিন্তু ইহাদের নাই। বিশ্বপিতার এই দুইটী প্রধান ও মহামূল্যবান্ দান সত্ত্বেও মানবমাত্রই যে অন্যান্য জীবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবেই, তাহার কোন বিশেষ বিধান নাই। দান সর্ব্বত্রই দাতার মহিমা প্রচার করে। মহাপ্রাণ দাতার নিকট বিন্দুমাত্রও ইতর বিশেষ হইবার উপায় নাই। তাঁহার পক্ষে সকলেই সমান অধিকারী। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, দান গ্রহণকারী দানের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া দানের অপব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাতে দাতার মহত্ত্বে বিন্দুমাত্রও কালিমা প্রকাশ পায় না, কিন্তু অপব্যবহারকারী ক্রমশঃ অবনতির নিম্নস্তরে অবরোহণ করিতে থাকে।

মানবের বাক্‌শক্তি আছে কিন্তু শক্তির যথাযথ ব্যবহার না করিলে দাতার

অবমাননা করা হয় ও আপনাকে তাহার প্রকৃত অধিকারী বলিয়া পরিচয় দিতে মস্তক স্বতঃই অবনত হয়। অতএব যাহারা শক্তিমান্, তাহারা যদি শক্তির প্রকৃত ব্যবহার না করেন, তাহা হইলে অধিকারী হইলেও কখনই তজ্জন্য উন্নত ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া গৌরব অনুভব করিতে সক্ষম হইতে পারেন না। যাহারা এই দানের প্রকৃত সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা যথার্থই দাতার মহিমা জগতে ঘোষণা করিয়া থাকেন; তাঁহারাই প্রকৃত মানব নামের উপযুক্ত পাত্র ও তাঁহারাই যথার্থ মহান্ ও সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। বাক্‌শক্তি লাভ করিয়া মানব যদি শুধু মিথ্যা, পরনিন্দা, পরকুৎসা, দ্বেষ ও হিংসারই উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত থাকে, তবে কোন নিয়মে ও কোন যুক্তিতে সে আপনাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অনুভব করিতে সক্ষম? শ্রেষ্ঠ কে?—যে সত্য বলিতে, অন্যের প্রশংসা করিতে, দীন, দুঃখীকে বিনম্র বচনে পরিতুষ্ট করিতে ও শোকভারাক্রান্তকে অমীয় বাক্যে শান্তি-সলিলে সিক্ত করিতে কদাচ বিমুখ নহে।

বিশ্বপিতার শ্রেষ্ঠ দান, মানবের বিবেক। যে শক্তিপ্রভাবে মানব আপনাকে অনায়াসে সয়তানের কবল হইতে মুক্ত করিতে ও পাপ, পুণ্যের প্রকৃত মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া স্বকর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে পারে। যাহার সাহায্যে মানব সহজে বিনা বাধায় জ্ঞান ও ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইয়া সংসারে শান্তির শুভ্র-পতাকা উড্ডীয়মান করিতে পারে। যাহারা বিবেকের বাক্যে পরিচালিত হইয়া আপনার জীবনের গতি ন্যায় ও সত্যের পথে চালিত করিয়া দেয়, তাহারাই দানের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিয়াছে। তাহারা যে শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে? যাহারা বিবেকের অনুশাসন পদদলিত করিয়া সয়তানের আপাতমনোহর সৌন্দর্য্য-মদিরায় অভিভূত হইয়া সমস্ত শ্রেষ্ঠ প্রবৃত্তিকে জলাঞ্জলি দেয়, তাহারা প্রকৃতই সহানুভূতির পাত্র। তাহারা যে আপনাকে মনুষ্য নামে অভিহিত করিতে সঙ্কুচিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? সারা জীবন যদি শুধু স্বার্থের পশ্চাদ্ধাবনে ও ভোগ বাসনার পরিতৃপ্তিতে অতিবাহিত হইল, তবে এই শ্রেষ্ঠ মানব-জন্ম লাভ করিয়া কি ফল হইল? দিনের পর দিন আমরা স্বার্থে এতই অন্ধ হইয়া উঠিতেছি, ভোগে এতই চঞ্চল হইয়া উঠিতেছি যে, পিতামাতার অশোধনীয় ঋণ ও ভ্রাতাভগ্নির পবিত্র সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়াছি ও প্রবৃত্তির তাড়নে হীন-মতি মন পশু পক্ষীকেও পরাজয় স্বীকার করাইয়াছে।

যে সোনার ভারত একদিন আর্য্য ঋষিগণের অভ্রভেদী সামগানে নিরত মুখরিত থাকিত, আজ "উঠিল যেথানে বুদ্ধ-আত্মা" সেই দেশ মোহাচ্ছন্ন প্রকৃতি-তাড়িত দেশবাসীর চঞ্চল আচরণে মহাশশ্মানে পরিণত হইতে বসিয়াছে। জানিনা, ভারতের ভবিষ্যৎ গর্ভে কি নিহিত আছে? জানিনা, এই তমসাচ্ছন্ন নভোমণ্ডল আবার নির্ম্মুক্ত হইয়া প্রাতঃ-সূর্য্যের কনক-কিরণে উদ্ভাসিত হইবে কি না?

প্রকৃত মানব-নামের অধিকারী হইতে হইলে বিশ্বপিতার এই দুইটী শ্রেষ্ঠ দানের প্রকৃত সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। কাহারা ইহার সম্পাদনে সক্ষম?————চরিত্রবান পুরুষ। অনেকের বিশ্বাস, চরিত্রবান পুরুষ শুধু শিক্ষিতের মধ্যেই প্রাপ্য। ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, দীনের পর্ণ কুটীরে, নগ্ন দেহে, পল্লীর অশিক্ষিতের মধ্যেও মহা-চরিত্রবান পুরুষের আবির্ভাব হইয়া থাকে। প্রকৃত শিক্ষা যে মানবকে চরিত্রবান করিয়া তুলে সত্য, কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির ফলাফল দেখিয়া অনুমান হয় যে, ইহা আমাদের জাতীয় চরিত্রে বিশেষ সুফল প্রসব করে নাই; কাজেই ইহাকে প্রকৃত শিক্ষা নামে অভিহিত করা যায় না। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষিত মণ্ডলীর অভ্যন্তরে, কার্য্যকলাপ, আচার ব্যবহার, সংযম ও নিষ্ঠার এতই অভাব যে, তাঁহারা শিক্ষিত নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য। না আছে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস, না আছে আদর্শ। বাত্যা-বিতাড়িত শুষ্ক পত্রের ন্যায় ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হইতেছে। হৃদয়ে শক্তি নাই, বিশ্বাস নাই—অনেক সময় মুখে শুনা যায়, 'ভগবান যাহা করেন, তার উপর নির্ভর করেই আছি।' নির্ভরতার শক্তি নাই, বিপদে না পড়িলে ভগবানের নাম মুখে আসে না—সৌভাগ্যোদয়ে 'Eat, drink and be merry', তাহারাই আবার ভগবদ্ভক্তির ভান করিয়া থাকে। এরা জোর ক'রে বলতেও পারে না যে, না—আমরা ধর্ম্মাধর্ম্ম মানি না—ভগবান্‌কে চাই না; আবার হৃদয় দিয়ে ভালবাসতেও পারে না, প্রাণ ভরে ডাকতেও পারে না। এরা কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরুলে পাজি। যখন দরকার পড়ে তখনই ভগবান্‌কে ডাকে, আবার দরকার মিটে গেলে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দেয়। যাহাতে আপনাকে প্রকৃত চরিত্রবান করিয়া গঠিত করিতে পারা যায়, যাহাতে বিশ্ব-পিতার বিপুল দানের সম্যক্ ব্যবহার করিতে পারা যায়. তৎসম্বন্ধেই যৎকিঞ্চিৎ নিম্নে বিবৃত হইবে।

প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তিই শক্তিশালী। যাহার এই মহান্ শক্তি আছে, সেই আপনাকে সর্ব্বপ্রকার প্রলোভনের মুখ হইতে উদ্ধার করিতে সক্ষম। আভ্যন্তরীণ পবিত্রতাই মানবের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। আমাদের বাহ্য চরিত্রই আমাদের আভ্যন্তরীণ পবিত্রতাকে বিকাশ করে। বৈদ্যুতিক আলোকের কাঁচ খণ্ড যদি স্তরে স্তরে বস্ত্রাচ্ছাদিত থাকে, তাহা হইলে অন্তরস্থ আলোক সহজে প্রকাশ পায় না। কাঁচ খণ্ডের উপরিস্থিত প্রথম কয়েক স্তরের বস্ত্র অতি সূক্ষ্ম, কিন্তু ক্রমশঃই ইহা স্থূলে পরিণত। অতএব উপরের স্থূল স্তর অপসারিত হইলে সূক্ষ্ম স্তরের মধ্য দিয়াও ইহার আলোক কথঞ্চিৎ প্রকাশ পাইতে পারে। আলোক যদি আত্মা হয় ও কাঁচখণ্ড (Electric bulb) যদি আত্মার চতুপার্শ্বস্থ পবিত্র মন হয় ও নানাবিধ কুপ্রবৃত্তি প্রভৃতি ইহার উপরের আবরণ, আর শেষ আবরণ আমাদের পাঞ্চভৌতিক দেহ। যতই অপবিত্রতার পূতিগন্ধময় নরক হইতে আমরা মুক্ত হইতে থাকিব, ততই আমাদের উপরকার আচ্ছাদন দূরিভূত হইবে ও পরিশেষে মহাপবিত্র মনের ভিতর দিয়া আত্মার বিমল কিরণ প্রকাশ পাইবে। ইহা হইতেই দেহ ও আত্মার সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট করিয়া তদনুযায়ী কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক অগ্রসর হও।

অভ্যাস ও চিন্তা-স্রোত আমাদের জীবনের গতি নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়। জীবনরূপ বৃক্ষের ইহাই মূল-স্বরূপ। মূলের পরিপুষ্টি সাধন না হইলে বৃক্ষের জীবনীশক্তি সহজেই লোপ পাইয়া থাকে। নিয়মিত জল-সেচন ও নানাবিধ সার দানে ইহাকে যত্ন করিতে থাকিলে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া পত্র পুষ্পে শোভা বর্দ্ধন করিবে ও সুমিষ্ট ফল প্রদান করিবে। চরিত্র গঠনের মূল ভিত্তি—অভ্যাস, চিন্তা ও আত্মদমন। আত্মার আবরণ যখন খসিয়া পড়ে, যখন ইহার স্নিগ্ধ কিরণে শত শত পাপতাপ-দগ্ধ মানব প্রাণে শান্তিবারি প্রাপ্ত হয়, তখনই প্রকৃত আত্ম-দমনের পূর্ণ বিকাশ। যিনি প্রকৃত আত্মজয়ী, জগতের নানাবিধ বাধা, বিঘ্ন, সুখ দুঃখ, হাসি কান্না কিছুই তাঁহার চিত্তে চঞ্চলতা আনয়ন করিতে পারে না। তাঁহাদের সম্বন্ধে এ ধারণাই হাস্যাস্পদ। দুর্ব্বল মানব যখন বিপদে কাতর হইয়া আত্মহারা হইয়া উঠে, সংসারের বিচিত্র আচরণে ভগ্ন হৃদয়ে শুধু হাহাকার করিতে থাকে,—প্রকৃত আত্মজয়ী পুরুষ তখন ধীর, প্রশান্ত হৃদয়ে সংসার-কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হন। নানাদিক হইতে নানাবিধ কলুষিত চিন্তা-

স্রোত আসিয়া তাঁহার উন্নত মনের নিকট বাধা প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে। মনকে অস্থির করিয়া তুলিতে পারে না এবং তাঁহার অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা শুধু শান্তির কণাই বিকীরণ করে। চতুর্দ্দিকের বিপদজালে আবদ্ধ হইয়াও তিনি ক্রন্দনে দিক্‌মণ্ডল কম্পিত করিয়া তুলেন না, ধীরভাবে আপনাকে তাহা হইতে মুক্ত করিতে প্রয়াস পান। চতুর্দ্দিক হইতে নানাবিধ ঘটনাবলী তাঁহার চিত্তকে চঞ্চল করিতে সচেষ্ট হয়; তিনি অন্ধের ন্যায় তাহাতে আপনাকে হারাইয়া ফেলেন না, দৃঢ়রূপে আপনাকে সংযত করিয়া অনাবিল শান্ত প্রকৃতিতে প্রকাশ পান।

পুরাকালে ভারতে ব্যাসদেব নামে এক মহাযোগী ছিলেন। তিনি ও তাঁহার ঊর্দ্ধতন বংশীয়গণ সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্যক্ সফলতা লাভে সমর্থ হন্ নাই। তাঁহাদের এই দীর্ঘকালস্থায়ী উদ্যম ও আগ্রহতা ব্যর্থ হইবার নহে। তাঁহাদের এই পবিত্র সাধনার ফল-স্বরূপ ব্যাসদেবের এক মহাপুরুষ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন! তিনিই শুক নামে অভিহিত। তিনি অতীব উন্নত, ধর্ম্মাত্মা ও মহাযোগী ছিলেন। বিনা বাধায় তিনি মহাজ্ঞানের অধিকারী হইয়া জগতে শান্তিধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

তৎকালে জনক নামে একজন ভারতবিখ্যাত নৃপতি ছিলেন। তাঁহাকে বিদেহ নামে অভিহিত করা হইত। তিনি এতদূর উন্নত ছিলেন যে, তাঁহার জড় দেহের অস্তিত্বই ছিল না। ব্যাসদেব তাঁহার সন্তানের পরীক্ষার জন্য, শুকদেবকে মহর্ষি জনকের রাজসভায় প্রেরণ করিলেন। আত্মজ্ঞানসম্পন্ন জনকরাজ ইহা বুঝিতে পারিলেন। মহাজ্ঞানী, মহাযোগীদের নিকট জগতের কোন কার্য্যই অসম্ভব নয়। তাঁহারা মহাশক্তির আধার। তিনি তদ্রূপ বন্দোবস্ত করিলেন। শুকদেব উপস্থিত হইয়া কোন্ প্রকার অভ্যর্থনা লাভ করিলেন না। কেবলমাত্র রক্ষীগণ তাঁহাকে বসিবার আসন প্রদান করিল। এতদ্ভিন্ন যেন তাহারা তাঁহার অস্তিত্বই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে, এই প্রকারই ভাব দেখাইল। সে সময়ে ব্যাসদেব এক জন খ্যাতনাম মহাযোগী ছিলেন। সকলেই তাঁহার চরণে মস্তক অবনত করিত। রাজপ্রাসাদ হইতে দরিদ্রের পর্ণকুটীরে তাঁহার সমান প্রতিপত্তি ছিল। শুকদেব পরম পণ্ডিত ছিলেন। এপ্রকার বিসদৃশ ব্যবহার সত্বেও তাঁহার মন বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। তাঁহার বিচলিত হইবার

যথেষ্ট কারণও বর্তমান ছিল। ইচ্ছা করিলে তিনি মহারাজ জনককে অভিসম্পাত করিতে পারিতেন। কিন্তু তিন দিবস তিনি সমভাবেই অতিবাহিত করিলেন। ধীর, প্রশান্ত বদনে বিন্দুমাত্রও চঞ্চলতা প্রকাশ পাইল না। তৎপরে তাঁহাকে একটি মনোরম সুসজ্জিত কক্ষে লইয়া যাওয়া হইল। নানাবিধ বিলাসসম্ভার মনোমুগ্ধকর দ্রব্যাদি ও বিশেষ সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার চিন্তাকে বিক্ষেপ করিবার জন্য আয়োজন হইল। তাঁহার শরীরের একটি শিরাও সঙ্কুচিত হয় নাই। তিনি প্রফুল্ল বদনে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন। অতঃপর তাঁহাকে মহারাজের বিশ্ববিখ্যাত রাজসভায় লইয়া যাওয়া হইল। নর্ত্তকীগণের বিনাবিনিন্দিত কণ্ঠের সঙ্গীত বাঁশী ও নৃত্যে রাজ সভা মুখরিত। নবযৌবনসম্পন্না রূপসীগণের সুমধুর কলকণ্ঠ ও লাজনয়নের নানাবিধ হাবভাব স্বভাবতঃই মানবের চিত্তচাঞ্চল্য আনয়ন করে। চতুর্দ্দিকের হাস্য পরিহাস ও সঙ্গীতের মধ্যে মহারাজ জনক তাঁহাকে আহ্বান পূর্ব্বক এক পাত্র পরিপূর্ণ দুগ্ধ দান করিলেন। তাঁহার প্রতি আদেশ হইল যে, সাতবার তোমাকে এই রাজ সভা প্রদক্ষিণ করিতে হইবে; সাবধান! যেন হস্তস্থিত দুগ্ধ একবিন্দুও নিপতিত না হয়। সুকদেব নীরবে মস্তক অবনত পূর্ব্বক সেই পাত্র গ্রহণ করিলেন ও ধীরে ধীরে রাজসভা প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র দর্শক ও সভাসদ্‌বর্গের নয়ন তাঁহার উপর নিপতিত হইল। যুবতীগণের মোহন মূরতি, মধুর কলকণ্ঠ ও চতুর্দ্দিকে হাস্য ও বিদ্রূপ তাঁহার অচঞ্চল চিত্তকে চঞ্চল করিবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস পাইল। কিন্তু সুকদেব বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন পূর্ব্বক নৃপতিকে পাত্র প্রত্যর্পণ করিলেন। নৃপতি, সভাসদ্‌গণ ও দর্শকমণ্ডলী বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। ইহাই আত্মজয়ী পুরুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। হৃদয়ে চিরদিন উচ্চ আদর্শই পোষণ করা উচিত। তাহা হইলে সম্যক্ উপলব্ধি না হইলেও তাহার কথঞ্চিৎ লাভেও জীবন ধন্য হইবে। জগতের কিছুই তাঁহার চিত্তে উত্তেজনা আনয়ন করিতে সক্ষম হয় নাই। জগতের নানান্ কার্য্যের মধ্যে তিনিই যেন আমাদের আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। যখন যে, অবস্থার মধ্য দিয়াই আমরা অগ্রসর হই না কেন, সতত যেন আদর্শেই আমাদের প্রধান লক্ষ্য থাকে। এইরূপ আদর্শজীবনই মানবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন। যখনই কর্ম্মজগতের কোলাহল হইতে বিন্দুমাত্র অবসর

প্রাপ্ত হইব, তখনই যেন মহাপ্রাণ. মহাপুরুষগণের প্রবর্ত্তিত উন্নত জীবনেরই চিন্তায় নিমগ্ন থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র বিশ্বাস।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্রের প্রতিবাদ।

বিগত আষাঢ় মাসের উদ্বোধনে ৩৪৬ পৃষ্ঠায়—৺প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত বলিয়া স্বামী বিবেকানন্দের এক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে; ইহা পাঠ করিয়া আমরা অতি বিস্ময়ান্বিত হইয়াছি। ইহার একস্থানে লেখা আছে—"নানা কারণে ভগবান রামকৃষ্ণের শরীর অগ্নি-সমর্পণ করা হইয়াছিল; এই কার্য্য যে অতি গর্হিত, তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণে তাঁহার ভস্মাবশেষ অস্থি সঞ্চিত আছে; উহা গঙ্গাতীরে সমাহিত করিয়া দিতে পারিলে উক্ত মহাপাপ হইতে কথঞ্চিত বোধ হয় মুক্ত হইব। উক্ত অবশেষ এবং তাঁহার গদি এবং প্রতিকৃতি যথা নিয়মে আমাদের মঠে প্রত্যহ পূজা হইয়া থাকে এবং আমার এক ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব গুরুভ্রাতা উক্ত কার্য্যে দিবারাত্র লাগিয়া আছেন, ইহা আপনার অজ্ঞাত নহে।"

আর একস্থানে লিখিত আছে—"এক্ষণে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার এই গদি ও অস্থি লইয়া কোথায় যায়, কিছুই স্থিরতা নাই—(বঙ্গদেশের লোকের কথা অনেক, কাজে এগোয় না, আপনি জানেন।) * * * * * * **ভগবান্ রামকৃষ্ণের অস্থি সমাহিত করিবার জন্য একটু স্থান হইল না,** ইহা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।"

"আপনি এক্ষণে রামকৃষ্ণের শিষ্যদিগের একমাত্র বন্ধু এবং আশ্রয় আছেন। পশ্চিম দেশে আপনার মান এবং সম্ভ্রম এবং আলাপও যথেষ্ট। যদি অভিরুচি হয়, উক্ত প্রদেশের আপনার আলাপী ধার্ম্মিক ধনবানদিগের নিকট চাঁদা করিয়া এই কার্য্য নির্ব্বাহ করা অপনার উচিত কিনা বিবেচনা করিবেন। যদি ভগবান্ রামকৃষ্ণের সমাধি এবং তাঁহার শিষ্যদিগের বঙ্গদেশে গঙ্গাতটে আশ্রয়স্থান হওয়া উচিত বিবেচনা করেন, আমি আপনার অনুমতি পাইলেই ভবৎসকাশে উপস্থিত হইব।

* * * *" * * * * "তাঁহার শিষ্যগণের সাধনের অনুমাত্র সহায়তা করিতে যদি আমাকে চুরি ও ডাকাইতি করিতে হয়, আমি তাহাতেও রাজী।"

উদ্বোধনের সম্পাদকের এই পত্র ছাপাইবার উদ্দেশ্য কি, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। কেননা, উল্লিখিত কথাগুলি ভিত্তিশূন্য বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

এই পত্র পাঠ করিয়া আমরা মর্ম্মান্তিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছি এবং আমাদের মনে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; আমরা এই পত্র স্বামীজীর লেখা বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। কেননা, উহাতে কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে অস্থি-সমাধির কথা বিন্দুমাত্র উল্লেখ নাই। আমাদের মনে হয়, কাঁকুড়গাছীতে অস্থি-সমাধি নহে—ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দের নাম দিয়া এই পত্র ছাপা হইয়াছে, অথবা স্বামী বিবেকানন্দকে ঘোর মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সম্পাদক কি উদ্দেশ্যে এই মিথ্যা প্রচার করিয়াছেন, আমরা জানিতে উৎসুক রহিলাম।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "সত্য সুমেরু পর্ব্বত চাপা দিলেও লুকাইত থাকে না, ইহা পর্ব্বত ভেদ করিয়া উঠে।" বিবেকানন্দ স্বামীর উপরোক্ত পত্র—২৬শে মে ১৮৯০ সাল বলিয়া ছাপা হইয়াছে। কিন্তু ইহার বহু পূর্ব্বে ১৮৮৬ সালের আগষ্ট মাসে জন্মাষ্টমীর দিন, ঠাকুরের দেহ-ত্যাগের সাত দিবস পরে, ঠাকুরের অস্থি কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসী শিষ্যগণ এবং প্রায় সকল গৃহী ভক্তগণই মিলিত হইয়া সমাহিত করিয়াছিলেন। সমাধি দেওয়ার পরে স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসীগণ নিজ নিজ পূর্ব্ব নাম স্বাক্ষর করিয়া এবং গৃহী ভক্তগণও নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া লিখিয়াছেন যে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই অস্থি-সমাধি কস্মিন্‌কালে কেহ কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যান হইতে উত্তোলিত করিতে পারিবে না। সে কাগজ পত্র এখনও আমাদের নিকট বর্ত্তমান। তত্ত্ব-মঞ্জরীর আগামী সংখ্যায় ইহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয়তম শিষ্য ভক্তচূড়ামণি প্রেমিক মহাত্মা রামচন্দ্র এ বিষয়ে তত্ত্ব-মঞ্জরী ১৩০৪ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ২২৯ পৃষ্ঠায় "সমাধি-মন্দির" নামক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত হইল।

সমাধি-মন্দির।

"কাঁকুড়গাছীর অন্তঃপাতী ১৫ নং যোগোদ্যান লেনে, যোগোদ্যানের মধ্যে এই পরম পবিত্র রামকৃষ্ণদেবের সমাধি-মন্দির ১৮০৮ শকের ৮ই ভাদ্র জন্মাষ্টমীর দিন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৩১শে শ্রাবণ রবিবার রাত্রে, পূর্ণিমা তিথির ত্যাগ এবং প্রতিপদ সঞ্চারের সন্ধিকালে, ভবভয়হারী অনাথনাথ পতিতপাবন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব মানবলীলা-রঙ্গমঞ্চের যবনিকা নিপতিত করেন। পরদিবস অপরাহ্নে, হিন্দু রীত্যনুসারে তাঁহার দেহের অন্ত্যেষ্টিকার্য্য সমাপ্ত করিয়া, ভস্মাবশিষ্ট অস্থিপুঞ্জ একটী সুবৃহৎ তাম্র কলসীতে সংস্থাপনপূর্ব্বক, কাশীপুরের উদ্যানে আনীত হইয়া, প্রভু যে গৃহের যে স্থানে অবস্থিতি করিতেন, সেই স্থানে স্থাপিত হয়। এইরূপাবস্থায় উহা সপ্তমী তিথি পর্য্যন্ত থাকে। অস্থিপূর্ণ কলসীটির কোথায় এবং কিরূপে সমাধি দেওয়া যাইবে, তদ্বিষয় লইয়া নানাবিধ বাদবিসম্বাদ উপস্থিত হওয়ায়, সেবকমণ্ডলী দুই মতে বিভক্ত হইয়া যাইলেন। এক পক্ষের অভিপ্রায় হইল যে, জাহ্নবী-তীরে মনোমত স্থানে অস্থিগুলি সমাহিত হওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহাদের মতে যদিও কাহারও আপত্তি ছিল না, কিন্তু সেবকদিগের অবস্থায় গঙ্গাতীরে স্থান ক্রয় করা একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠিল। যদিও কেহ কেহ প্রকাশ্য সভা করিয়া সাধারণের নিকটে "চাঁদা" করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু চাঁদা করিয়া রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধীয় কোন কার্য্য সম্পন্ন করা হয়, ইহা সকলের অভিমত হইল না। * * * *

সেবকদিগের মধ্যে যদিও বিশেষ ধনী ব্যক্তি কেহ ছিলেন না, তাহা বলিয়া একেবারে যে সকলেই দরিদ্র ছিলেন, তাহাও নহে। তাঁহার তখন এমনও কেহ কেহ সেবক ছিলেন যে, তাঁহারা হৃদয়বিহীন এবং কর্ত্তব্য-জ্ঞান-পরিশূন্য না হইলে, একজনেই গঙ্গার কূলে সমাধির স্থল ক্রয় করিয়া দিতে পারিতেন। সে পরিতাপের বিষয় এখন মনে করিলে হৃদয় শতধা হইয়া যায় এবং রামকৃষ্ণের সেবক বলিয়া পরিচয় দিতেও লজ্জাবোধ হইয়া থাকে। তাঁহারা সে সময়ে একেবারে পৃষ্ঠদেশ দেখাইতে লজ্জাবোধ করেন নাই। কোন ব্যক্তি প্রভুর চিতানলের সমক্ষে, গঙ্গার সন্নিহিত কাশীপুরের প্রশস্ত রাজপথের পূর্ব্বপার্শ্বে, তাঁহার নিজ ভদ্রাসনের সন্নিহিত বাগানের পাঁচ কাটা জমি সমাধির জন্য এবং

আর একটী ভক্ত সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিবার জন্য এক সহস্র এক টাকা দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। কিন্তু, যে সময়ে সমাধি দিবার প্রস্তাব হইল, সে সময়ে যিনি জমি দিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি একেবারে অদৃশ্য হইয়া যাইলেন এবং যিনি হাজার এক টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, তিনিও অসম্মত হইলেন। অবশিষ্ট সেবকগণের মধ্যে সকলেই অতি সামান্য অবস্থার গৃহী ব্যক্তি। তাঁহাদের দ্বারা বিশেষ ব্যয়-বাহুল্য কার্য্য হওয়া একেবারেই সাধ্যাতীত কথা। সুতরাং তাঁহাদের নিজ নিজ অবস্থাসঙ্গত সমাধির স্থান অন্বেষণ করিতে তাঁহারা যত্নবান হইলেন। কিন্তু অর্থাভাবের নিমিত্ত সুবিধামত কোন স্থানেই তাহা সম্ভাবনা হইল না। ক্রমে একদিন দুইদিন করিয়া পাঁচ ছয় দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। অতঃপর শ্রদ্ধাস্পদ গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের দ্বারা কাঁকুড়গাছীর যোগোদ্যানে সমাধি-কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার প্রস্তাব হইলে, সর্ব্বপ্রথমে অনেকেরই তাহাতে আপত্তি হইল বটে, কিন্তু উপায়ান্তর না দেখিয়া পরিশেষে সকলেই তাহাতে সম্মত হইলেন।

৮ই ভাদ্র জন্মাষ্টমীর দিন প্রাতঃকালে কাশীপুরের উদ্যান হইতে অস্থিপুঞ্জ-পূর্ণ কলসীটি ভক্ত চূড়ামণি শশী এবং সুশীল ভক্ত বাবুরাম, উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতির সহিত অশ্বজানে প্রভুর জনৈক হতভাগ্য দাসানুদাসের কুটীরে সযতনে আনয়ন করিতে বাধ্য হন। তথায় মনের সাধে সেই কলসীটি পুষ্পমাল্যের দ্বারা বিমণ্ডিত করিয়া, প্রভু যে গৃহে মধ্যে মধ্যে চরণধূলি দিতেন, সেই গৃহে সংগৃহীত হইল। বেলা আট ঘটিকার সময় কীর্ত্তনের দল সকল আসিয়া উপস্থিত হইল। ষ্টার থিয়েটার হইতে শ্রদ্ধাস্পদ অমৃতলাল বসু মহাশয় সবান্ধবে সংকীর্ত্তন করিয়া সমাধিকার্য্য সম্পাদনে যোগদান করিয়াছিলেন। বীরভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের বাটীর সম্মুখ হইতে উক্ত কলসীটি লইয়া, প্রভুর প্রিয় সেবক নরেন্দ্রনাথ, রাখাল, যোগেন, শারদা, নিরঞ্জন, গিরিশ, হরিশ, অতুল, মন্মোহন, মহিম, বলরাম, দেবেন, অক্ষয় ও কৈলাশ প্রভৃতি সকলেই যোগোদ্যানের যে স্থানে পূর্ব্বে তুলসী-কানন সৃষ্টি করা হইয়াছিল, সেই স্থানের ভূমি খননপূর্ব্বক অস্থিপূর্ণ কলসীটি সংস্থাপন করেন। তদনন্তর প্রভুর শেষ দিনের আজ্ঞামত "হাঁড়ি হাঁড়ি দাল ভাত (খিচুড়ী)" ভোগ দিয়া, যোগোদ্যানের সন্নিহিত সুরেন্দ্রের বাগানে সকলে মহাপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া, অপরাহ্ণের সময়ে ভগ্নপ্রাণে স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। * * *

সেবকগণ যদিও যোগোদ্যানে প্রভুকে সমাধি দিলেন বটে, কিন্তু সমাধি-স্থান অনাবৃতাবস্থায় রহিল। কেবল কতিপয় নারিকেল পত্রের আচ্ছাদনের দ্বারা ভাদ্র মাসের কখন প্রবল রৌদ্রের উত্তাপ এবং কখন মুসলধারে বৃষ্টির আর্দ্রতা হইতে উহা সংরক্ষিত হইত। সুতরাং যাহাতে একটী ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মিত হয়, তজ্জন্য আয়োজন করা হইল। এই সময়ে কোন কোন ভক্ত ভীষণ মূর্ত্তি-ধারণপূর্ব্বক সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিবার সহায়তা করা দূরে থাকুক, অস্থিগুলি পুনরায় উত্তোলন করিয়া স্থানান্তরে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবে অনেকেই সহানুভূতি করিলেন। যে হতভাগ্যের ভাগ্যে কার্য্যবিপাকে এই সমাধির ভার নিপতিত হয়, তাহার লাঞ্ছনার আর পরিসমাপ্তি রহিল না। প্রভুর সমধিক কৃপা কাঙ্গালের প্রতি ছিল বলিয়া, সে যাত্রায় সে প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছিল। ঠনঠনিয়া নিবাসী পূজনীয় ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই বিভীষিকার কথা শ্রবণ পূর্ব্বক, উক্ত হতভাগ্যকে ডাকাইয়া কহিলেন যে, শরীর হউক কিম্বা অস্থিই হউক, একবার সমাহিত হইলে তাহা পুনরায় স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া দূরে থাকুক, যে একথা মনে করে তাহার যে কি মহাপাতক হয়, তাহা বলিয়া প্রকাশ করা যায় না। অতএব, এরূপ প্রস্তাব হওয়াই নিতান্ত অন্যায় এবং মহাপাপের কথা। তাঁহার এই প্রস্তাবটী সেবকমণ্ডলীর দ্বারা পুনরায় বিবেচিত হইবার নিমিত্ত তাঁহারই অভিপ্রায়ানুসারে ৯ই আশ্বিন তারিখে ১১ নং মধুরায়ের গলিস্থিত বাটীতে এক সভা আহূত হয়। তাহাতে সমাধিস্থ অস্থিপূর্ণ কলসীটি কস্মিন্‌কালে কেহ কোন স্থানে স্থানান্তরিত করিতে পারিবে না, বলিয়া সকলে স্থির করিয়া অন্যূন ত্রিশজন সেবক স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করেন।" * * *

অতএব, স্বামীজীর পত্রে যে লেখা হইয়াছে—ভস্মাবশেষ অস্থি সঞ্চিত আছে, উহা গঙ্গাতীরে সমাহিত করিয়া দিতে পারিলে উক্ত মহাপাপ হইতে কথঞ্চিৎ বোধ হয় মুক্ত হইব,—ইহার অর্থ কি, আমরা জানিতে চাই। "ভগবান্ রামকৃষ্ণের অস্থি সমাহিত করিবার জন্য একটু স্থান হইল না," এ কথারই বা অর্থ কি?

ঠাকুরের শরীর অগ্নি-সংস্কার করিবার পর তাম্রকলসীস্থিত অস্থি যাহা উত্তমরূপে গঙ্গামৃত্তিকা দ্বারা অবরুদ্ধ ছিল এবং যাহা সমাহিত করিবার জন্য সকলেই অস্থি-সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে সমাহিত করিয়া আসিয়া একথা

বলার অর্থ বুঝিতে আমরা সম্পূর্ণ অক্ষম। অস্থি গঙ্গাতীরে সমাহিত করিবার জন্য স্বামীজীর একান্ত ইচ্ছা ছিল, তাহা মহাত্মা রামচন্দ্রের প্রবন্ধে বিশেষ ভাবে বুঝা যায় এবং সেই জন্যই স্বামীজী যোগোদ্যান হইতে সমাধি উত্তোলন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা যখন হয় নাই, তখন সমাধির চারি বৎসর পরে, "সমাধির জন্য কোথাও একটু স্থান হইল না" বলিয়া দুঃখ-প্রকাশের পত্র বাহির করিবার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। সুতরাং, জগৎপূজ্য স্বামী বিবেকানন্দজী যে এইরূপ অসত্য ও ভিত্তিহীন পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা কি কেহ বিশ্বাস করিতে পারিবেন?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব।

গত ১লা জ্যৈষ্ঠ শনিবার, কলিকাতার সন্নিকট ঢাকুরিয়া (২৪ পরগণা) গ্রামে শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় চৌধুরী মহাশয়ের আবাসে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব হইয়াছিল। উক্ত গ্রামের দুইটী যুবক এই উৎসবের প্রধান উদ্যোগী। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা হইতে রাত্রি প্রায় ১ ঘটিকা পর্য্যন্ত ঠাকুরের পূজা, স্তুতি-গীতি, বক্তৃতা এবং সঙ্গীত সংকীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। স্থানীয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন দাস বি, এ, মহোদয় তাঁহার "রামকৃষ্ণকে পূজা করি কেন" নামক সুললিত ভাবপূর্ণ বক্তৃতায় সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। সাধারণের অনুরোধে যোগো-দ্যানস্থ শ্রীমৎ স্বামী যোগবিনোদ মহারাজজী রামকৃষ্ণদেবের সার্ব্বজনীন ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ সেন গুপ্ত মহাশয় "প্রাণের দেবতা রামকৃষ্ণ" শীর্ষক বক্তৃতায় রামকৃষ্ণ যে সর্ব্বজনের হৃদয়ের জিনীস এবং একমাত্র আদর্শ, তাহা সকলকে বিধিমতে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। যোগোদ্যানস্থ অনেকগুলি সেবক এ উৎসবে উপস্থিত হইয়া ঠাকুরের নাম-গুণ-গানে সকলকে বিমোহিত করেন। গ্রামস্থ একটী সংকীর্ত্তন সম্প্রদায় ও শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ঘোষাল মহাশয় তাঁহাদের সংগীতে উৎসবস্থল মুখরিত করিয়াছিলেন। পরিশেষে হরির লুট এবং প্রসাদ বিতরণ করিয়া উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়।

২রা জ্যৈষ্ঠ রবিবার, ভবানীপুর চক্রবেড়িয়া রোডে স্বর্গীয় ভক্ত নফরচন্দ্রের স্মৃতি উপলক্ষে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব হইয়াছিল। অনেক ভক্ত এই উৎসবে সমবেত হইয়া ঠাকুরের পূজা এবং কীর্ত্তনাদি করিয়াছিলেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত সহস্র দরিদ্রনারায়ণকে পরিতোষরূপে ঠাকুরের প্রসাদ খাওয়ান হইয়াছিল। ভবানীপুরস্থ ভক্তমণ্ডলী এই উৎসবের প্রধান উদ্যোগী।

শ্রীবিজয়নাথ মজুমদার।

সমালোচনা।

"বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত। প্রকাশক শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়, ৫০ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—মূল্য তিন টাকা।

এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। বঙ্গের বাহিরে উত্তর ভারতে বাঙ্গালীগণ যে অপূর্ব্ব প্রতিভা ও কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, এই পুস্তক পাঠ করিলে তাহা অবগত হওয়া যায়। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এই পুস্তক শোভা পাইবার উপযুক্ত। প্রত্যেক বাঙ্গালী ইহা পাঠ করিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিবেন। বহু দিনের এক প্রবাদ আছে যে, বাঙ্গালী ঘরের বাহির হয় না। এ প্রবাদ যে সত্য নহে, বাঙ্গালী ঘরের বাহির হইয়াও উচ্চ উচ্চ কর্ম্ম করিয়া কিরূপে বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, তাহারই ইতিহাস এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের নিকট আমরা সকলেই ইহার নিমিত্ত ঋণী। প্রকাশক মহাশয় বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশে যে মহৎ কার্য্য করিয়াছেন, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার পরিশ্রম সফল হউক, ইহাই ভগবানের নিকট আমাদের প্রার্থনা। আশা করি, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এবং ভারতের বাহিরে বঙ্গের কৃতীসন্তানগণের বিবরণও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীচরণ ভরসা।

জয় গুরুদেব !!

তত্ত্ব-মঞ্জরী

ঊনবিংশ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা।

ভাদ্র, সন ১৩২২ সাল।

রামকৃষ্ণ-নাম।

রামকৃষ্ণ নাম সুধা অবিরাম
পিও জীব প্রাণ ভরে।
রামকৃষ্ণ নাম প্রেমপূর্ণ কাম
সর্ব্ব পাপ তাপ হরে॥
রামকৃষ্ণ নাম বড় প্রাণারাম
পাইয়া পাতকী নরে।
আপনা ভুলিল মোহ পাশ গ্রিল
অমৃত লভিল করে॥
রামকৃষ্ণ নাম নিত্য অভিরাম
জগতে আনিল কে?
স্বরগের ধন অমূল্য রতন
ধন্য মরতে সে॥
রামকৃষ্ণ ধন পাইয়া যে জন
জগতে ডাকিয়া বলে।
তোরা আয় আয়, পায়ে ধরি আয়
হৃদয় রেখেছি খুলে॥
পেয়েছি যে ধনে, একা কোন প্রাণে
করিব রে উপভোগ।
জনে জনে তাই, ডাকিয়া বেড়াই
বয়ে যায় এ সুযোগ॥
কেবা সেই জন মরতে সুজন
শ্রীচরণে নমঃ নমঃ।
হেন কোথা পাই তুলনা যে নাই
ভক্ত রামচন্দ্র সম॥
বল দেখি নাম হবে পূর্ণকাম
সত্য সত্য কহে প্রভু।
যদি নাহি হয় মোর দিব্য রয়
আমি যে জগৎ বিভু॥
যেবা রাম যেবা কৃষ্ণ সেই এবে রামকৃষ্ণ
মনে প্রাণে ধর ঐক্য করি।
হেলায় তরিয়া যাবে, নিমেষে চৈতন্য পাবে
গুরুকৃপা রাখ হৃদে ধরি॥

"কাঙ্গাল।"

যুগাবতার

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও হিন্দুশাস্ত্র।

ষষ্ঠ উপদেশ।

সুখ-দুঃখ।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, "সুখ-দুঃখ দেহ ধারণের ধর্ম্ম। দেহ ধারণ ক'রলেই সুখ-দুঃখ ভোগ আছে। প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ। যে ক'দিন ভোগ আছে, দেহ ধারণ ক'রতে হয়। দেহের সুখ দুঃখ যাই হোক, ভক্তের জ্ঞান ও ভক্তির ঐশ্বর্য্য থাকে; সে ঐশ্বর্য্য কখনও যাবার নয়।"

শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধে ব্রহ্মা প্রিয়ব্রতকে বলিতেছেন, "পরমেশ্বর জীব সমূহকে যে যে দেহ দান করেন, তাহারা উৎপত্তি, নাশ, শোক, মোহ, ভয় এবং সুখ ও দুঃখের জন্য কর্ম্ম কারবার নিমিত্ত সেই সেই দেহ ধারণ করে। বৎস! কর্ম্মানুষ্ঠানে কাহারও স্বাতন্ত্র্য নাই। যেরূপ বলীবর্দ্দ প্রভৃতি চতুষ্পদ জন্তু সকল রজ্জুদ্বারা নাসিকাবদ্ধ হইয়া দ্বিপদ জন্তুগণের ইচ্ছায় কর্ম্ম করে, সেই রূপ আমরা সত্ত্বাদি গুণদ্বারা যে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকি, তাহা পরমেশ্বরের বাক্য রূপ রজ্জুতে ব্রাহ্মণাদি শব্দ দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়া তাঁহারই পূজোপহার আহরণ করি। যে সকল ব্যক্তির চক্ষু আছে, তাহারা যেমন স্বেচ্ছায় অন্ধদিগকে ছায়া বা রৌদ্রে লইয়া যায়, সেইরূপ আমাদিগের প্রভু পরমেশ্বর স্বীয় ইচ্ছানুসারে, আমাদিগকে পশু পক্ষী ইত্যাদি যে কোন দেহ দান করেন। আমরা তাহাই গ্রহণ করিয়া তজ্জন্ত সুখ বা দুঃখ ভোগ করি। আমরা গুণও কর্ম্মের সহিত লিপ্ত আছি বলিয়াই, তিনি আমাদিগকে ঐ সুখ দুঃখ দান করেন। মনুষ্য যেরূপ নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া স্বপ্নানুভূত বিষয় সকল স্মরণ করে, সেইরূপ মুক্ত পুরুষও দেহ ধারণ পূর্ব্বক নিরহঙ্কার হইয়া প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ করেন।" এইজন্য পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভক্ত হইয়াও অশেষ দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্ত শ্রীশ্রীভগবতীর প্রিয় ভক্ত। কিন্তু তাঁহাকেও কত বিপদ ভোগ করিতে হইয়াছিল। 'সুখ-দুঃখ দেহ ধারণের ধর্ম্ম। দেহ ধারণ ক'রলেই সুখ দুঃখ ভোগ আছে।' এই উক্তির সমর্থনে, এমন কি স্বয়ং ভগবান শ্রীরাম-

চন্দ্রেরও এই আইনের হাত হইতে নিষ্কৃতি হয় নাই। তাঁহাকে রাজ্য নাশ, বনবাস, সীতার হরণ ও পিতার মরণ এককালীন এতগুলি কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। অনেকে বলিতে পারেন, সর্ব্বদুঃখহারী শ্রীভগবানের আশ্রিত ভক্তগণকেও দুঃখ বিপদাদি ভোগ করিতে হয় কেন? তদুত্তরে বলা যায় যে, তাঁহার আশ্রিত ও কৃপাপ্রার্থী ভক্তকে দৈহিক সামান্য মাত্র কষ্ট দানে, তাঁহার আত্মাকে চিরদিনের জন্য অশেষ ভব যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি করিয়া থাকেন। বাস্তবিক ইহা তাঁহার কৃপা ভিন্ন পীড়ন নহে। এই জন্যই কুন্তীদেবী নারায়ণের নিকট 'নিয়ত বিপদের প্রার্থনাই' করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টম স্কন্ধে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "আমি যাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করি, তাঁহার অর্থ অপহরণ করিয়া থাকি। পুরুষ অর্থ গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া লোককে এবং আমাকে অবজ্ঞা করে। জীবাত্মা আপন কর্ম্ম হেতু পরাধীন হইয়া নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া অবশেষে যখন নরযোনি প্রাপ্ত হয়, তখন যদি জন্ম, কর্ম্ম, যৌবন, রূপ, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য বা ধনাদি জন্য গর্ব্বিত না হয়, তাহা হইলে নিশ্চিত জানিবে, তাঁহার প্রতি আমার অনুগ্রহ হইয়াছে। অহো অভিমানই চারিদিকে যাবতীয় মঙ্গলেরই ব্যাঘাত করে। আমার সেবকেরা ইহা দ্বারা মোহিত হন না। এই দৈত্যকুলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও কীর্ত্তিবর্দ্ধন বলি অজয়া মায়াকে জয় করিয়াছেন, কষ্ট পাইয়াও মুগ্ধ হন নাই। ইনি বিত্তহীন হইয়াছেন, স্থানচ্যুত হইয়া ক্ষিপ্ত হইয়াছেন, শত্রু কর্ত্তৃক বদ্ধ হইয়াছেন, জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক ত্যক্ত হইয়াছেন, মহত্ত যাতনা ভোগ করিতেছেন, গুরু কর্ত্তৃক তিরস্কৃত ও অভিশপ্ত হইয়াছেন, তথাপি সত্য প্রতিপালন করিয়াছেন। অতএব ইনি সত্যবাদী। যে স্থান দেবতাদিগেরও দুষ্প্রাপ্য, আমি ইহাকে সেই স্থান দান করিয়াছি।" আবার দশম স্কন্ধে বলিয়াছেন, "আমি যাহাকে অনুগ্রহ করিব, অল্পে অল্পে তাহার ধন হরণ করিব। তাহাকে দুঃখের উপর দুঃখিত দেখিয়া স্বজনগণ তাহাকে ত্যাগ করিবে। তদনন্তর সে যখন ধনের চেষ্টায় বিফলোদ্যম হইয়া নির্ব্বিন্ন হইবে এবং মৎপরায়ণ ব্যক্তিদিগের সহিত মিলিত হইবে, আমি তখনই তাহার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিব।" শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন ;—

ইন্দ্রিয় সংযোগ হয় বিষয়ে যখন,
শীততাপ—সুখ দুঃখ উদয় তখন ;

সুখ দুঃখ আসে সত্য থাকে না আবার,
তাই সুখ দুঃখ বোধ অনিত্য অসার!
সহ্য কর অস্থায়ী সে উল্লাস বিষাদ,
তাহাদের বশীভূত হইলে প্রমাদ।
সমভাবে সুখ দুঃখ করিয়া বহন,
হে অর্জ্জুন যেইজন ব্যথিত না হন,
অমরত্ব লাভ তিনি করেন নিশ্চয়—
ইহলোকে পরলোকে নিত্যানন্দময়!

(গীতা ২য় অঃ ১৪।১৫ শ্লোক)

পুনরায় বলিতেছেন,—

অর্জ্জুন পীড়িত যারা, আর যাহাদের
ধর্ম্মতত্ত্ব জানিবারে বাসনা মনের;
ইহপরলোক ভোগে যাহাদের মন
সাধনে করিতে চায় কামনা পূরণ;
আর যাহাদের হয় জ্ঞানের উদয়,—
বুঝিয়াছে কেমন সে বিভু বিশ্বময়—
এই চারি প্রকারের নরনারীগণ
সুকৃতির ফলে করে আমার ভজন।

(গীতা ৭ম অঃ ১৬ শ্লোক)

অতএব ভগবান পীড়িত ব্যক্তিকে সুকৃতিশালী বলিয়াছেন। যেরূপ পুত্রের প্রতি পিতার শাসন দ্বারা পিতার সমধিক স্নেহত্বই সূচিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ আমাদের ন্যায় ঘোর পাষণ্ডগণের দুঃখ কষ্টের দ্বারা ভগবানের অনুকম্পাই সূচিত হইয়া থাকে। দুঃখ শোকে জর্জ্জরিত না হইলে আমাদের ন্যায় পাষণ্ডগণ কি সহজে তাঁহার শরণ লইতে ইচ্ছা করে? সুখ ও দুঃখ দুইটী দৈহিক পদার্থ মাত্র। একের অস্তিত্বে অন্যটীর অভাব আমরা বিশেষরূপে অনুভব করিয়া থাকি। যখন দুঃখ উপস্থিত হয় তখন পুরুষকার দ্বারা সুখ লাভের আশায় আমরা নানাবিধ উপায় অনুসন্ধান করিয়াও প্রারব্ধ বশতঃ যখন তাহাতে সফল মনোরথ না হই, তখন বুঝিতে পারি যে ভগবদিচ্ছা না হইলে কেবল মাত্র পুরুষকারের

দ্বারা কোন ফল হইবে না। এই ভাবিয়া তাঁহাকে বিপদ পাথারের কর্ণধার স্থির জানিয়া উপস্থিত বিপদোদ্ধারের জন্যই তাঁহার শরণ গ্রহণ করি। কিন্তু ঐশী শক্তির এমনই একটী আকর্ষণী ক্ষমতা আছে যে, একবার তদভিমুখীন হইলে চুম্বকের ন্যায় ক্রমশঃ আকর্ষণ করিয়া এক জন্মেই হউক অথবা বহু জন্মেই হউক বিশুদ্ধ ভগবৎপ্রেম লাভ করায়। তখন জীব দুঃখ বা কষ্টের কথা অর্থাৎ যে জন্য সে প্রথমে ভগবদুপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা ভুলিয়া গিয়া একমাত্র ভগবান লাভের জন্যই ব্যাকুলিত হইয়া উঠে। এই হেতু পঞ্চম বর্ষীয় বালক মহাত্মা ধ্রুব বিমাতার কটুবাক্যে জর্জ্জরিত হইয়া তৎপ্রতিকার মানসে ও রাজ্য-প্রাপ্তি বাসনায় বনে গিয়া কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু যখন নারায়ণ বালকের তপস্যাতে সন্তুষ্ট হইয়া ধ্রুবের সমীপাগত হইলেন, তখন বালক তাঁহার মনোহর মূর্ত্তিদর্শনে যে জন্য বনে আসিয়াছিলেন তাহা ভুলিয়া গিয়া, তাঁহার প্রেমে একেবারে বিহ্বল হইয়া স্তব করিয়াছিলেন, "হে দীনবন্ধো! আপনি জীবগণকে জন্ম ও মৃত্যু হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন। যাহারা কল্পতরু স্বরূপ আপনাকে মুক্তি ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যে পূজা করে, তাহা-দিগের বুদ্ধি নিশ্চয়ই মায়া দ্বারা বিমোহিত হইয়াছে। কারণ শবতুল্য এই দেহ দ্বারা যাহা কিছু উপভোগ করা যায়, তাহারা তাহাই প্রার্থনা করিতেছে। বিষয়ভোগ দ্বারা যে সুখানুভব হয়, মনুষ্য তাহা নরকেও অনুভব করিতে পারে। কিন্তু নাথ! আপনার পাদপদ্ম চিন্তা কিংবা আপনার ভক্তদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া যে সুখ হয়, স্বরূপানন্দরূপ পরব্রহ্মেও সে সুখের সম্ভাবনা নাই। অতএব দেবতা হইয়া আর অধিক কি সুখ হইবে? কালবশে বিমান ভগ্ন হওয়ায় দেবগণও পতিত হন। হে অনন্ত! প্রার্থনা করি, আমার ভক্তি নিয়তই আপনার প্রতিই উন্মুখী হউক এবং নির্ম্মল চিত্ত সাধুদিগের সাহচর্য্য করুক, তাহা হইলে আমি আপনার গুণ কথারূপ অমৃত পানে মত্ত হইয়া অনায়াসেই এই দুঃসহ দুঃখভূয়িষ্ঠ ভয়ানক সংসার-সমুদ্রের পার প্রাপ্ত হইব। হে পদ্মনাভ! যে সকল সাধুদিগের চিত্ত আপনার পদারবিন্দের সৌগন্ধই লোভ করে, যাঁহারা সেই সাধুদিগের সাহচার্য্য লাভ করেন, তাঁহারা নিতান্ত প্রিয় এই দেহকে এবং দেহানুবন্ধী পুত্র, কলত্র, গৃহ, ধন, জনাদিকে গ্রাহ্য করেন না।" এক্ষণে ধ্রুব সমস্ত তুচ্ছ করিয়া নিরন্তর ভক্তিই প্রার্থনা করিতেছেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব এই জন্য বলিতেন, "ওলা মিছরির পানা পেলে, চিটে গুড়ের পানা কে খেতে চায়?" এইরূপে ভক্ত যতই ভগবচ্চরণ সরোজের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকেন, ভগবানও কৃপা করিয়া ততই তাঁহার ভগবল্লাভের প্রধান অন্তরায়গুলি অর্থাৎ স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ধন, জন ও ঐশ্বর্য্যাদি ধীরে ধীরে অপসারিত করিয়া তাঁহাকে চিরমুক্তির অধিকারী করেন। তখন মায়ামুগ্ধ জীব তাঁহার গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া ঐগুলিকেই দুঃখ, কষ্ট বা বিপদ ভাবিয়া থাকেন। এই জন্যই লোকে বলিয়া থাকে, "যখন যা করেন, জগদীশ্বর মঙ্গলের জন্যই করেন।" প্রবাদ আছে যে, ভগবান বলেন, "যে করে আমার আশ, করি তার সর্ব্বনাশ।" সর্ব্বনাশ অর্থাৎ সমস্তই নষ্ট করি, অর্থাৎ যে আমাকেই চায়, তাহার মায়া, মোহরূপ কণ্টক বৃক্ষের মূলগুলি নষ্ট করি। তবে বলিতে পারা যায়, ভগবান তাঁহার আশ্রিত ভক্তগণকে কষ্ট দেন কেন? যেমন স্বর্ণকার সোণার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি এবং উহার উৎকৃষ্ট অপকৃষ্টতা অবধারণ জন্য সোণাকে পোড়াইয়া থাকে। তদ্রূপ ভগবানও রোগ, শোক, বিপদাপদাদি দ্বারা পরীক্ষান্তে প্রকৃত ভক্তের গৌরব বৃদ্ধিই করিয়া থাকেন।

শ্রীমন্ত, প্রহ্লাদ ও পঞ্চপাণ্ডব প্রভৃতি ভক্তপ্রবরগণ অশেষ দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাহাতে তাঁহাদেরই ভগবদ্ভক্তির গুরুত্ব প্রমাণিত হইয়া বিমল যশঃ সৌরভে দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত হইয়াছে। এক্ষণে যদি সংসারে দুঃখই ভগবানের কৃপার জিনিষ হয়, তবে যাহারা পার্থিব সুখে সুখী, তাহাদের উপায় কি হইবে? তাহাদিগের কি কোনকালে উদ্ধার হইবে না? যেমন মায়ের কয়েকটী ছেলে আছে। তাহার মধ্যে যে ছেলেটী কোন প্রকার কষ্ট অনুভব করিয়া "মা" "মা" বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকে, তখন মা প্রথমতঃ তাহাকে খেলানা দিয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করেন কিন্তু তাহা না লইয়া মাকে দেখিয়া তাঁহার কোলে যাইবার জন্য যখন উৎসুক হয়, তখন মা সর্ব্বাগ্রে তাহাকেই কোলে তুলিয়া লয়েন। যে ছেলে-টীকে 'চুসি' দিয়া ভুলাইয়া রাখিয়াছেন, সে যতক্ষণ 'চুসির' সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া খেলিতে থাকে, ততক্ষণ মা সে ছেলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া বাড়ীর অন্যান্য কার্য্য করিতে থাকেন। যখন সে আর উহার আপাত সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ না হইয়া বিরক্তি বশতঃ মায়ের কোলে যাইবার জন্য কাঁদিতে থাকিবে,

তখনই মা সব কাজ ফেলে রেখে, দৌড়ে এসে কোলে তুলে লইবেন। সেইরূপ মানব কর্ম্মফল বা সম্বন্ধ সূত্রে যতক্ষণ ধন, জন, ঐশ্বর্য্যাদির নশ্বর সুখে বিমুগ্ধ হইয়া থাকে, ততক্ষণ সে ভগবানের দয়ার অধিকারী হয় না। কিন্তু যখন তাহার উক্ত প্রকার পার্থিব সুখকে নশ্বর সুখ বলিয়া জ্ঞান হয় এবং উক্ত অবস্থায় ভগবৎ পদ লাভের জন্য প্রাণ ব্যাকুলিত হয়, তখনই সে তাঁহার কৃপালাভের অধিকারী হয়। যেমন এক প্রকার খাদ্য ক্রমাগত বহু দিন ধরিয়া খাইলে তাহাতে অরুচি জন্মিয়া থাকে। তদ্রূপ এক জন্মেই হউক অথবা বহু যোনি ভ্রমণ করিয়া হউক জীবের এমন এক সময় আসিবে, যে সে বিষয় উপভোগ করিতে করিতে আর তাহাতে পূর্ব্ববৎ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবে না। এইরূপে যখন নশ্বর সুখ ভোগে বিরক্তি জন্মিবে, তখনই সে তত্ত্বজ্ঞান লাভে শান্তি সোপানে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিবে। ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত মহাত্মা রামচন্দ্র তাঁহার প্রথম বক্তৃতাতে এক স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন, "তিনি (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব) মাতালকে কখন মদ ত্যাগ করিতে বলেন নাই, লম্পটকে বেশ্যা ত্যাগ করিতে বলেন নাই, বরং এ কথা বলিতেন যে, যতদিন বাসনা থাকে সম্ভোগ করিয়া লও। এ কথা দ্বারা এরূপ কেহ বুঝিবেন না যে, তিনি পাপ কার্য্যের প্রশ্রয় দিতেন।" বাস্তবিক এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সম্ভোগ করিতে করিতে বাসনার ক্ষয় হইলে, স্বতঃই উহাতে তাহার বিরক্তি জন্মিয়া নিবৃত্তি হইবে। এই জন্য ভগবান গীতাতে ৭ম অঃ ১৬ শ্লোকে "জ্ঞানী"কে সুকৃতিশালী বলিয়াছেন। ফলতঃ জীব যদি বিপদে অধৈর্য্য বা সম্পদে প্রমত্ত না হইয়া অকপট প্রাণে দয়াল ঠাকুর পূর্ণব্রহ্ম শ্রীভগবানে আত্ম সমর্পণ করিতে পারে, তাহা হইলে তাঁহাকে আর এই নশ্বর সুখ দুঃখের নিদারুণ ঘাত প্রতিঘাতে আচ্ছন্ন হইতে হয় না। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন ;—

যে জন দেখেন এই অনিত্য ধরায়,
সর্ব্ব জীবে সমভাব আত্ম তুলনায়
সংসারের সুখ দুঃখে সমদর্শী যিনি,
হে ফাল্গুনি, জানি আমি যোগী শ্রেষ্ঠ তিনি।

(গীতা ষষ্ঠ অঃ ৩২ শ্লোক)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই জন্যই বলিয়াছেন, "দেহের সুখ দুঃখ যাই হোক, ভক্তের জ্ঞান ও ভক্তির ঐশ্বর্য্য থাকে; সে ঐশ্বর্য্য কখনও যাবার নয়।" ঠাকুরের ভক্তকেশরী মহাত্মা বিবেকানন্দ স্বামীজী, ঐ শুন, মেঘমন্দ্র স্বরে বলিতেছেন;—

ভেবনা দেহের হয় কিবা গতি,
থাকে কিম্বা যায়—অনন্ত নিয়তি—
কার্য্য অবশেষ হয়েছে উহার,
এবে ওতে প্রারব্ধের অধিকার;
কেহ বা উহারে মালা পরাইবে,
কেহ বা উহারে পদ প্রহারিবে;
কিছুতেই চিত্ত প্রশান্তি ভেঙ্গনা,
সদাই আনন্দে রহিবে মগনা;
কোথা অপযশ—কোথা বা সুখ্যাতি?
স্তাবক স্তাব্যের একত্ব প্রতীতি,
অথবা নিন্দুক নিন্দ্যের যেমতি।
জানি এ একত্ব আনন্দ অন্তরে—
গাও হে সন্ন্যাসী নির্ভীক অন্তরে—
ওঁ তৎসৎ ওঁ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিপদ নন্দী।

আত্মসমর্পণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চিকিৎসা।

দেখিতে দেখিতে কালরাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। উষা সমাগমে বিহঙ্গিনীগণ নিজ নিজ কণ্ঠস্বরে পল্লীবাসীকে জাগরিত করিল। পদ্মিনী তাহার নববধুকে

আসিতে দেখিয়া প্রফুল্লচিত্তে সরসীবক্ষে নৃত্য করিতে লাগিল। আজ সপ্তমী, মা আনন্দময়ীর আজ প্রথম পূজার দিন। পূজাবাড়ীতে নবপত্রিকা স্নান করাইবার নিমিত্ত সকলেই ব্যস্ত। পথে ঘাটে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা নব বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া সহাস্যবদনে ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। কামদেবপুর গ্রামটী ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু অনেক সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তির বাস থাকায় গ্রামে অনেক বাড়ীতেই মায়ের আগমন হইয়াছে। ক্ষুদ্র গ্রামখানি আজি নানাবিধ বাদ্যধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া আনন্দে ভাসিতেছে। আজ সকলেই আনন্দিত কিন্তু আমাদের চাঁপার হৃদয় তমসাচ্ছন্ন। সে তাহার বিষাদমাখা মুখখানি লইয়া রুগ্নশয্যায় শায়িত স্বামীর মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় অঞ্চল দ্বারা চক্ষুদ্বয় মার্জ্জন করিতেছে। পক্ষী-কলরব শুনিয়া তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে ত্বরায় নিস্তারিণীর নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া তথাকার একমাত্র সুবিজ্ঞ যোগীন ডাক্তারকে আনিতে পাঠাইল। ইতিমধ্যে দুলালের নিদ্রাভঙ্গ হইল, পার্শ্বে পিতাকে দেখিয়া সে আধ আধ স্বরে "মা, বাবা—মা, বাবা" বলিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক নীলরতনের দিকে বার বার দেখাইতে লাগিল।

চাঁপা দুলালকে উঠিতে দেখিয়া তাহার সম্মুখে চারিটী মুড়কি ছড়াইয়া দিয়া বলিল, "দুলাল! খা", এবং নিজে প্রাঙ্গনে আসিয়া সদর দরজায় ছড়া দিয়া পুনরায় স্বামীর নিকট গিয়া বসিল। নীলরতনের অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায়, এখনও পর্য্যন্ত তাহার সংজ্ঞা হয় নাই। একটু বেলা হইতেই হ'রেমুদি, পাঁচি গোয়ালিনী, রামা ধোপা প্রভৃতি আসিয়া নীলরতনকে ডাকিতে লাগিল। পাঁচি গোয়ালিনী বাটীর মধ্যে আসিয়া নীলরতনের অবস্থা দেখিয়া বাহিরে গিয়া বলিল, "দাদাবাবুর বড় ব্যারাম জ্ঞান চৈতন্য নেই, বৌদিদি একলা বসে বসে কাঁদছে, চল আজকে আমরা যাই, এ অবস্থায় ত আর তাগাদা করতে পারা যায় না" এই কথা শুনিয়া সকলেই প্রস্থান করিল। কেবল পাঁচি গোয়ালিনী পুনরায় বাড়ীর মধ্যে গিয়া চাঁপাকে বলিল—বৌদিদি সংসারের কাজকর্ম্ম ত কিছুই হয়নি দেখতে পাচ্ছি—নিস্তারিণী কোথায়?

চাঁপা—সে ডাক্তার আনতে গেছে।

পাঁচি—তবে আমিই তোমার কাজ কর্ম্মগুলো সেরে দি। ভয় নেই দাদাবাবু শীঘ্রই সেরে উঠবেন। তুমি মা দুর্গার কাছে বুক চিরে রক্ত দেবে বলে মানসিক

করো। এই বলিয়া সে উঠানে গিয়া ঝাট্‌পাট্‌ দিতে লাগিল। এখন চলুন, আমরা নিস্তারিণী কি কচ্ছে দেখিগে।

যোগীন ডাক্তারের বাড়ী নীলরতনের বাড়ী থেকে প্রায় আড়াই ক্রোশ দূরে। জেলার মধ্যে যোগীন ডাক্তারই একমাত্র সুবিজ্ঞ ডাক্তার, হাতযশও বিলক্ষণ ছিল। কাহারও বাড়ীতে কঠিন ব্যায়রাম হইলেই যোগীন ডাক্তারকে আনিতে ছুটিত, কিন্তু অত্যন্ত বিপন্ন না হইলে লোকে তাহার কাছে যাইত না—পাড়ার যে অমৃত ডাক্তার ছিল তাহাকেই দেখাইত এমন কি কেহ কেহ ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া অনেক কঠিন কঠিন ব্যায়রামও তাহার দ্বারা চিকিৎসা করাইত। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, যোগীন একটু অর্থলোলুপ ছিল। সে গরীব দুঃখী বলিয়া কিছুমাত্র বিবেচনা করিত না। কেহ তাহাকে ঔষধের মূল্য কিংবা দর্শনী সম্বন্ধে কোন অনুরোধ করিলে সে তাহা গ্রাহ্য করিত না, এমন কি সে তাহার অন্তরঙ্গবন্ধুর নিকটও দর্শনী লইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইত না। সে বলিত ব্যবসা করিতে গেলে, চক্ষুলজ্জা বা কৃপাপরবশ হইলে ব্যবসায় কিছুতেই উন্নতি করিতে পারা যায় না। এই সমস্ত কারণে গ্রামবাসীরা তাহাকে গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত এম্, বি, উপাধি ভিন্ন আর একটী উপাধি দিয়াছিল। সেটী আপনারা জনিতে ইচ্ছা করেন যদি—"অর্থপিশাচ।"

নিস্তারিণী বাটী হইতে বহির্গত হইয়াই সম্মুখে একখানি ভাড়াটীয়া গাড়ী দেখিতে পাইল এবং সে দৌড়িয়া গাড়োয়ানের অজ্ঞাতসারে পিছনে বসিল। গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল এবং অনতিবিলম্বে গন্তব্যস্থানে পৌছিল। নিস্তারিণীও গাড়ী হইতে নামিয়া পদব্রজে চলিতে লাগিল, সেখান হইতে যোগীন ডাক্তারের বাড়ী বেশী দূর নয়। প্রায় পনের মিনিট পরে সে ডাক্তারের বাটীতে পৌছিল। যোগীন তখন নিজের বৈঠকখানায় বসিয়া ধূমপান করিতেছিল, সম্মুখে নিস্তারিণীকে দেখিয়া বলিল, "কি গাঁ, কি চাও ?"

নিস্তারিণী—হাত যোড় করিয়া বলিল, "বাবু আমাদের বড় বিপদ, আপনি একবার আসুন।"

যোগীন—তুমি কোত্থেকে আস্‌ছ ?

নিস্তারিণী—কামদেবপুর থেকে। বাবু একটু শীগ্‌গির করে চলুন—

যোগীন—শুনেছ, আজকাল আমি দর্শনী চারটাকা করেছি, দু'টাকা আর লইনা।

নিস্তারিণী—বাবু, আমরা গরীব দুঃখী লোক, আমাদের প্রতি একটু বিবেচনা করিবেন।

যোগীন—আমার কাছে ওসব একচোখোমী নেই। আমি সকলকে সমান চোখে দেখি—বড়লোক দেখ্‌লে তার কাছে দু'টাকা বেশীও লই না, গরীব বলে এক টাকা কমও করি না।

নিস্তারিণী—তা বাবু আপনাদের ঋণ ত পরিশোধ হ'বার নয়—যা ভাল বিবেচনা হয় করিবেন। আপনার চাকরকে শীগ্‌গির্ করে গাড়ী ডাকতে বলুন।

যোগীন—আমি ঘোড়ায় চড়ে যাই। তা তুমি যখন বল্‌ছ, আমি গাড়ী আন্‌তে পাঠাচ্ছি, ভাড়া বোধ হয় ২৲ টাকা লইবে তা তোমাকেই দিতে হ'বে।

নিস্তারিণী ভাড়া দিতে স্বীকৃত হইলে গাড়ী ডাকা হইল এবং গাড়ী এক ঘণ্টার মধ্যে নীলরতনের বাড়ীতে পৌছিল। ডাক্তার আসিলে চাঁপা তাহার পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "শৈশবেই আমি পিতৃহীন, জ্ঞানে আমি পিতাকে দেখি নাই। আপনি আমার পিতা, যাহাতে আমার স্বামীর প্রাণ রক্ষা হয়, তাই করুন, আমাদের আর কেহ নাই।"

যোগীন—আমি ত আর নারায়ণ নহি যে, তোমার স্বামীর প্রাণদান কর্‌বো।

চাঁপা—আপনি আমার কাছে নারায়ণতুল্য। আপনি যাকে দেখেন তারই প্রাণ রক্ষা হয়, আপনি সেবার বোসেদের ছোট কর্ত্তাকে যমের হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন।

যোগীন—আচ্ছা চল ত রোগীকে আগে দেখি। এই বলিয়া ডাক্তার রোগীর রোগ পরীক্ষা করিলেন। চাঁপা ডাক্তারের মুখ পানে এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। ডাক্তার রোগ পরীক্ষান্তে ঔষধের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন এবং চাঁপা নিস্তারিণীকে নীলরতনের পকেট হইতে দর্শনীর টাকা আনিতে বলিল। নিস্তারিণী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বৌদিদি পকেটে একটাও পয়সা নেই," এই কথা শুনিয়া চাঁপা বলিল, "ভাল করে দেখেছিস্।"

নিস্তারিণী—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তা তুমি অমন কচ্চ কেন? ডাক্তারবাবুকে ত আবার ওবেলা আসতে হ'বে, তখন না হয় দুবারকার একেবারে নিয়ে যাবেন—

যোগীন এই কথা শ্রবণ মাত্র রাগান্বিত ভাবে বলিল, "তোমরা কি রকম লোক, দর্শনীর টাকার যোগাড় না করে ডাক্তার ডাক্‌তে গিয়েছিলে?

চাঁপা তাঁহার পদদ্বয় ধরিয়া বলিলেন—"আপনি আমার পিতা। আমাকে রক্ষা করুন, যদি আপনার বিশ্বাস না হয় আমার এই একগাছি বালা নিন্— আমার স্বামীকে রক্ষা করুন। এই বলিয়া চাঁপা একগাছি বালা হাত থেকে খুলিয়া ডাক্তারের হাতে দিল। ডাক্তার বালাটী গ্রহণ করিয়া বলিল, "তা বাপু আমাদের অত চক্ষুলজ্জা কল্লে চলে না—আমি ওবেলা বালাটী লইয়া আসিব— তুমি টাকার জোগাড় করে রেখো, টাকা পেলেই বালা ফেরত দেবো।" এই কথা বলিয়া ডাক্তার বালা পকেটে রাখিবা মাত্র পাঁচি গোয়ালিনী বলিল, "তুমি কি রকম ভদ্রলোক গা, তোমাকে আমার বৌদিদি বাপ্ বল্লে, আর তুমি তার সঙ্গে যে রকম ব্যবহার কচ্ছ, চামারে তা পারে না। তুমি কোন আক্কেলে বালা পকেটে ফেল্লে—তোমার ক'টাকা ভিজিট্ বল—আমি দিচ্ছি, এই বলিয়া সে আঁচলের খুঁট হইতে ছয়টী টাকা ডাক্তারের সম্মুখে ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিল। চাঁপা একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তৎপরে আত্মসংবরণ করিয়া পুনরায় ডাক্তারকে বলিল, "আপনি কিছু মনে করিবেন না, আমি আপনার কন্যা, ওবেলা আবার আসিবেন। মনে রাখিবেন, আমাদের আর কেহ নাই। যোগীন বলিল, "না আমি কিছু মনে করিনি। সকলেই কি ভদ্রলোক? আবার অনেকে ডাক্তার বৈদ্যকে ফাঁকি দেয় সেই জন্য ঐরূপ বলিয়াছিলাম, আমি কিছু মনে করিনি মা, ওবেলা আমি নিজেই আসিব, তোমায় আর লোক পাঠাতে হবে না।" এই বলিয়া ডাক্তার যেই গাড়ীতে উঠিবে অমনি পাড়ার আরও ২।৪ জন লোক নীলরতনের অসুখ শুনিয়া দেখিতে আসিতেছিল। তন্মধ্যে বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ডাক্তারকে ডাকিয়া চুপি চুপি অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল। প্রায় দশ মিনিট কথাবার্ত্তার পর ডাক্তার গাড়ীতে উঠিয়া চলিয়া গেল এবং বেণীমাধব ও অন্যান্য ভদ্রলোকগুলি নীলরতনকে দেখিবার জন্য বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ।

উত্তরাখণ্ডে ভ্রমণ ও স্থিতি।

(১৩)

হীম শীতল রজনী অন্তে রাঙা রবি ফুটিয়া উঠিল। যাত্রীগণ জাগিল। সে দিন দ্বাদশী প্রভাত। সে দিন প্রাতঃকালে আর অগস্ত্য চটি ত্যাগ করা হইল না। কেননা যাত্রীরা সব উপবাসী। মধ্যাহ্নে স্নান অন্তে আনন্দময় শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্ত্তিকে পূজা করিয়া আহারাদি সারিয়া গল্প করা হইতে লাগিল। আন্দাজ বেলা ৩৷৹টার সময় চটি ত্যাগ করিয়া নামের জয়ধ্বনী দিয়া উঠিলাম। যষ্ঠী বন্ধুর সাহায্যে চলিতে আরম্ভ করিলাম। পথে মাঝে মাঝে চড়াই ঠেকিল। সে দিন রসময় ঠাকুর প্রাণে এত হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই পথ মধ্যে হাসি ছড়াইতে ছড়াইতে চলিলাম। সন্ধ্যার সময় "চন্দ্রাপুরী". নামে চটিতে আসিয়া পড়িলাম। সে রাত্রি সেই চটিতেই থাকার বন্দোবস্ত হইল। চটিটি দ্বিতল। বেশ পাথরের গাঁথনি ও লম্বা লম্বা ঘর অনেকগুলি আনন্দময়ী সুসজ্জিনীতে আসিয়া বসিলাম। জুতা টকিন খুলিয়া ভৌতিক দেহের সেবা আরম্ভ করিলাম। যাক, আমার পা সঙ্গিনী ব্রহ্মচারিণী টিপিতে বসিল, তার পা আমি টিপিতে বসিলাম। অন্যান্য সঙ্গি মাতৃগণ তৎদৃষ্টে হাসিতে লাগিলেন ও আমাদের বন্ধুত্বটা খুব গভীর ভালবাসায় অচ্ছেদ্য, বার বার তাহাই শোনাইতে লাগিলেন।

সেই সময় অদ্বিতীয় এক জীবন বন্ধুকে স্মরণ হইয়া উঠিল। শ্যামকে স্মরণ হলেই প্রাণের স্থিরতা থাকে না, সব কি হইয়া যায়। আপন মনে মনোমোহনের উদ্দেশে বলিতে লাগিলাম—

কোথায় তুমি কোথায় তুমি
(আমার) কোন সুদূরের বন্ধু তুমি
আমার প্রাণারাম প্রিয়তম
আঁধার গৃহে নিধি সম
আমি তোমা ছাড়া থাক্‌বো না আর—

সে রাত্রে সেই চটিতেই থাকা গেল।

(১৪)

পর দিন শেষ রজনীতে কাণ্ডিওলার ডাকাডাকিতে নিদ্রা ভঙ্গ হইল। শীতে কম্বলশয্যা পরিত্যাগ করাও একটা বীরত্ব। সকলেই শ্রীশ্রীঠাকুরের অনন্ত শক্তিবিশিষ্ট নামেই উঠিয়া পড়িলাম। যষ্টিবন্ধুকে সাদরে লইয়া "জয় বদরী-বিশালকী জয়" দিয়া পাহাড়-পথে চলিতে আরম্ভ করিলাম। রাস্তায় চড়াই উৎরাই কিছু কিছু ঠেকিল। উপর্য্যুপরি কয় দিনেই চড়াই উৎরাই অভ্যস্ত হইয়া উঠিল, আর তত কষ্ট ঠেকিল না। আন্দাজ বেলা ১০টার সময় গুপ্ত-কাশীতে আসিলাম। গুপ্তকাশী বা গোপকেশীটী একটি ছোট্ট রকম পল্লি। পিতলের হাঁড়ী, ঘটি, ছোট থালা ইত্যাদির দোকানও ২।১টি রহিয়াছে। একটি দ্বিতল স্থান পাওয়া গেল। কেদারনাথের পাণ্ডাজী আমাদের সঙ্গেই আসিতেছেন। এ গুপ্তকাশীতে তিনিই সমস্ত থাকার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কেদারনাথের পাণ্ডাদের বাড়ী এই স্থানে। এখান হইতে বৎসর বৎসর বরফ গলিলে কেদারনাথের মন্দিরের দরজা খুলিলে যাত্রীদের লইয়া দর্শন করাইয়া আনেন। আমরা সে দিন সমস্ত দিনরাত্রিই গুপ্তকাশীতে রহিলাম। মধ্যাহ্নে তথায় তীর্থকার্য্য সম্পন্ন হইল। একটি কুণ্ডতে স্নান করিয়া এক মহাদেবের পূজা করিলাম। আহারাদির পর সাধু সন্তানদ্বয় ও সমস্ত সঙ্গিনীগণ মিলিয়া খুব গান ও ঠাকুরের গুণানুকীর্ত্তন স্বামিজী মহারাজের বিষয় আলো-চনায় কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় শিব ঠাকুরের আরতি দেখিয়া আসিলাম। রাত্রে আমাদের সুনিদ্রা হইল। পর দিন প্রত্যূষে নামের জয়ধ্বনী দিয়া উঠিলাম। আনন্দপূর্ণ মনে পাহাড়পথে গাহিতে গাহিতে চলিলাম—

"তটিনীর তটে পথে ঘাটে মাঠে
বল্‌রে হরি বল।
মুখে হরি হরি বলিতে বলিতে
হরষে সকলে চল ॥"

আন্দাজ বেলা ১১টার সময় ফাটা চটিতে আসিয়া তথায় সকলে মধ্যাহ্নে রহিলাম। চটিতে খড়ের ঘর খানকতক রহিয়াছে। একটা বেশ ভাল ঝরণা নিকটেই রহিয়াছে। মধ্যাহ্নে সঙ্গীদের একটা বিরাট ঝকড়া শোনা গেল। তাহা আনন্দপূর্ণ হাস্যময়। বৈকালে আবার পাহাড়পথে চলিতে আরম্ভ করি-

লাম। এ পথের মধ্যে সুরম্য বন দেখিলাম। এমন সুন্দর বন জীবনে দেখি নাই। যেন পরীদের রম্য স্থল। পথে যেতে যেতে সায়াহ্ন সময় সুন্দর বন দৃষ্টে প্রাণ পুলকে পূরিয়া উঠিয়া যেন আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। যষ্টিবন্ধুকে সেই বনে ফেলিয়া একবার সেই বনে শয়ন করিলাম। দীর্ঘ দীর্ঘ সারি বাঁধা তরু সকল দাঁড়াইয়া আছে, তাহা হইতে শিকড় সকল ঝুলিয়া পড়িয়াছে, নির্জ্জন নিস্তব্ধ মধুর। ঝিল্লি রবে কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল। সেই বনে এসে শয়নপূর্ব্বক প্রেমিক বালক ধ্রুবকেই স্মরণ হইল। এমনি রমণীয় বনে ধ্রুব রমণীয় মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। "হা মধুসূদন হা মধুসূদন" করিয়া ছুটিয়াছিলেন। গভীর তপস্যা করিয়াছিলেন। এমনি মধুর নির্জ্জনতা ভাবিতে লাগিলাম, নির্জ্জনতাই সুন্দর। কোলাহলে কোলাহল বাড়ে। নির্জ্জনেই নীরবতা আসে। বনটা দেখে বনমালীর জন্য বড়ই মনটা কেমন করিতে লাগিল, মনে হইল হেসে হেসে এসে যদি একবার তাঁর মধুর বাঁশীটি বাজান, তা হলেই বুঝি সব তন্ময় হোয়ে যাবে। কিন্তু বনমালী আর এলেন না, প্রাণে প্রাণে কি একটা মধুর আনন্দ দিলেন, আবার ওঠা গেল। কখনও বালকের মত বকিতে বকিতে হাসিতে হাসিতে সব ত চলিলাম। সন্ধ্যার সময় জঙ্গল মধ্যে একটা চটি পাওয়া গেল। চটিটি ক্ষুদ্র। খানকতক খড়ের ঘর আছে। নাম "রামাপুর চটি।" রাত্রে এসে স্থানাভাবে আমার ঝি ও আর একটি বুড়ীতে বিষম গোলোযোগ বাধাইল। মাত্রা অধিক বাড়াবাড়ি দেখে পাণ্ডাজী মধুর ভাষে উভয়কেই ঠাণ্ডা করিলেন। তাঁহার সে গুণ খুব ছিল। আহারও করাইলেন, শেষে সকলকে শয়নের স্থান নির্ণয় করিয়া দিয়া গেলেন। আমার সঙ্গিনী ব্রহ্মচারিণী বেশ গৃহিণীত্বপূর্ব্বক অনেককে বোঝাইয়া আসিল। শেষে একজনের স্থানেই নারায়ণ রামকৃষ্ণ নাম স্মরণপূর্ব্বক আমি ও ব্রহ্মচারিণী সে রাত্রে শয়ন করিলাম। সে দিন একখানা কম্বল কম লাগিল। প্রাতে সামান্য গাত্র বেদনা অনুভব হইল। আনন্দে সূর্য্য তাপে ও পথ হাটায় কতক কমিল। সে দিন পথে ভীষণ চড়াই ঠেকিল। তপ্ত সূর্য্য মস্তকের উপর উঠিলেন! তপ্ত পাথরও পায়ে। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পথে আমরা ত্রিযুগী নারায়ণ দেখিতে চলিলাম। সমগ্র দল ত্রাহি ত্রাহি করিয়া উঠিতে বসিতে ও মাঝে মাঝে শয়ন করিতে করিতে নামের বলে নাম ধ্বনীপূর্ব্বক বেলা

১৷৹টার সময় ত্রিযুগী নারায়ণের স্থানে চটিতে আসিয়া পড়িল। ত্রিযুগী নারায়ণ স্বর্ণ মূর্ত্তি, সাম্‌নে কুণ্ডতে স্নান হইল।

সে দিন কাঠ আর ধরে না। বহু কষ্টে কোন প্রকারে অন্ন পাক হইল।

(১৫)

মধ্যাহ্নে আহার সারা হইলেই, সে দিন তথা হইতে ফিরিতে হইল। বেলা ৪টার সময় রৌদ্রে আবার সেই পথে নামিতে একটা স্মরণীয় কষ্ট পাওয়া গেল। কিন্তু সে কষ্টে বিরক্তি নাই, সে কষ্টটাও কেমন মধুর। পথে ব্রহ্মচারিণী বমি করিল, অত্যন্তই অবসন্ন হোয়ে পড়ায় প্রাণটায় দারুণ ব্যথা লাগিল। ঝরণার জল আনিয়া তাঁহার মুখে চোখে দিয়া, অঞ্চলের বাতাস করিয়া একটু সুস্থ করিয়া আবার চলিলাম। আর একটু গিয়া বুড়িয়া একেবারে শয়ন করিল। সে আর উঠিতে পারে না, তৎসঙ্গে সে গাণ্ডি প্রার্থনা করিল "এ বাবুয়া এ পাণ্ডা একট গাণ্ডি বোলা" বলিয়া বুড়িয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সেই পথে গাণ্ডি মেলা অসম্ভব। সুধু ধূম্র পাহাড় আর খরস্রোতে বহু নিম্নে অলকানন্দা চলিয়াছে। এক এক স্থানে এক হাত প্রসার পথ, কোনও স্থানে সুধু একখানি পাথর দশ বারো আঙ্গুল স্থান, পা সরিল ত, অলকানন্দায় চলিয়া যাও।

পাণ্ডাজী বুড়িয়াকে লইয়া অতি সন্তর্পণে চলিলেন। আমাদেরও তাঁহার লোকেরা লইয়া চলিলেন। ঠাকুর আমাকে একটি সুন্দর নির্ব্বোধ শিশুর মত সরল শঙ্কর নামে সন্তান দিলেন। অতি যত্নে হাত ধরিয়া ধরিয়া লইয়া চলিল। সন্ধ্যার সময় আমরা গৌরীকুণ্ড নামে এক চটিতে আসিলাম। উঃ কি শীত জীবনটা বুঝি যায়, দেহটা বুঝি জমে বরফ হোয়ে যায়। আগুন আগুন চারিদিকে অগ্নি কাণ্ড কাঠ জ্বলিতে লাগিল। গরম জলের গৌরী-কুণ্ডটী সুন্দর স্থান। চটির পার্শ্বে হরহরধ্বনীপূর্ব্বক নদী বহিতেছে। চটির মধ্যে অনেক দেবদেবী মূর্ত্তি। পাথরের বাঁধান মস্ত প্রাঙ্গন। দুটি কুণ্ড রহিয়াছে। একটি সাদা রং গরম জল ফুটন্ত জল। আর একটি হলুদে রং ঠাণ্ডা জল। গরম জলের কুণ্ডুর ধারে বসিয়া একটু গরম হইয়া চটির মধ্যে আসিতে প্রাণ যায়। কোনও প্রকারে কম্বল শয্যার মধ্যে

শ্রীঠাকুর স্মরিয়া যৎকিঞ্চিৎ আহার অন্তে পাঁচ সাতখানা কম্বল আলোয়ান মুড়ি দিয়া সব পড়িলাম। ভীষণ শীতে আর নিদ্রা হয় না, হৃদ্‌কম্প হইতে লাগিল। প্রাতে রৌদ্র উঠিতে তবে সমস্ত যাত্রীগণকে জাগাইয়া পাণ্ডাজী সূর্য্যবাবা সকলকে একত্রিত করিয়া পথে বাহির হইলেন। বেলা ১২॥টার সময় পাহাড়ের গায়ে একটি ক্ষুদ্র খড়ের ছাউনী চটিতে আসিয়া পড়িলাম। সে দিন খুব রৌদ্র হইল। চটিটির নাম "রামবাড়া।" রামবাড়া হইতেই আমরা বরফ পাইলাম। তথা হইতে কেদারনাথ যাইতে হইবে। চটিতে মহা গোলোযোগ বাধিল। কেননা ২।৩টী সাধু কেদারনাথ দেখিতে যাইবার মানসে গিয়া অর্দ্ধেক পথে বরফের জন্য ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাদের দেখে সমস্ত যাত্রীদেরই হৃদ্‌কম্প আরম্ভ হইল। সঙ্গিনী ও আমিও খুব ভাবিতে লাগিলাম, পাণ্ডাজী আসিয়া বসিয়া পড়িলেন।

(ক্রমশঃ)

"ভক্তকিঙ্করী।"

আশা।

অনন্ত বাসনা লয়ে আছি পথে দাঁড়াইয়ে
এ আশা কি পূরণ হবে না?
উদিয়া মুহূর্ত্ত তরে, আবার মিলাবে কিরে
মোর পানে ফিরে চাহিবে না?
কতই বাসনা সহ এনেছি এ ফুল সহ
হে নিঠুর এ ফুল লবে না?
এসেছি তোমার দ্বারে, দিবে কি ফিরায়ে মোরে
পুরাবে না হৃদয় বাসনা?
হৃদয়ে কতই সাধ ঘটাওনা পরমাদ
ওহে নাথ চাও মোর প্রতি।
না জানি তোমার পূজা হে মোর হৃদয় রাজা
আমি যে গো অতি হীন মতি॥

নাহি আছে ফুল দল, নাহি আছে গঙ্গাজল,
নাহি আছে সুরভি চন্দন।
নাহি আছে বিল্বপত্র না আছে গো হেমছত্র
আমি পিতা অতি হীন মন॥
কি দিব তোমার পদে রক্তোৎপল কোকোনদে
তনয়া কি সঁপিবে বলনা?
বল গো বল গো কথা তবে কি হে বিশ্বপাতা
বাসনা কি সফল হবে না?
গঙ্গাজল বিনিময়ে নয়নের জল দিয়ে
ধোয়াব ও রাজীব চরণ।
সুগন্ধি কুসুমরাশি কোথায় পাইবে দাসী
লহ ভক্তি-পুষ্প সচন্দন॥
হে পিতঃ করুণাসিন্ধু অনাথজনের বন্ধু
অনাথের তুমি চিরকাল।
অনাথারে দয়া কর কোরোনা বঞ্চনা আর
কোথা ওহে পরম দয়াল॥
না জানি ভকতি স্তুতি আমি অতি হীন মতি
আশা মম করহ পূরণ।
দেখাও হে সত্য পথ, পূর্ণ কর মনোরথ
দয়া কর বিপদ তারণ॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণাশ্রিতা
দাসী শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্রের প্রতিবাদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১২৭ পৃষ্ঠার পর)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহাবসানের পর তাঁহার ভস্মাবশিষ্ট অস্থিপুঞ্জ যাহা একটী সুবৃহৎ তাম্র কলসীতে সংস্থাপন করা হইয়াছিল, তাহা লইয়া

পরে ভক্তগণ মধ্যে যে বিবাদ বিসম্বাদ হইয়াছিল, যাহার নিমিত্ত সিমুলিয়া মথুরায়ের গলিস্থিত মহাত্মা রামচন্দ্রের বাটীতে একটী সভা, আহূত হইয়া মীমাংসিত হইয়াছিল, তাহা এই স্থানে বিশদভাবে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

সভার জন্য মহাত্মা রামচন্দ্রের নিমন্ত্রণ পত্র।

শ্রীশ্রীহরি সহায়।

শ্রদ্ধাস্পদ ভক্তমণ্ডলী

শ্রীচরণেষু—

সবিনয় নিবেদন—

গত ৮ই ভাদ্র তারিখে আপনাদের অভিমতে আমার কাঁকুড়গাছীস্থিত ৮৮এ সংখ্যাক উদ্যানে আমাদের পূজনীয় গুরুদেবের অস্থি সমাহিত হইয়াছে। তদনন্তর যে সকল ভক্তেরা ইতিপূর্ব্বে বিবিধ আকারে সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে পৃষ্ঠদেশ দেখাইয়া নানাপ্রকার স্বেচ্ছাচারী ভাব প্রকাশ করিতেছেন। এমন কি কেহ কেহ এ প্রকার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছেন যে, **সমাধিস্থ অস্থি পুনর্ব্বার বাহির করিয়া লইতে হইবে** এবং তজ্জন্য বিবিধ প্রকার উপায় অবলম্বন করা হইতেছে। কেহ বা অন্য স্থানে অন্য প্রকার স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। এইরূপ পরস্পর মহা কলহ এবং মনান্তর উপস্থিত হইবার উপক্রম হইতেছে এবং তজ্জন্য বিবাদের উপর বিবাদ উৎপত্তি হইবার হেতু হইতেছে।

It will be an act of deservation to say the least to ezhume the bones from the spot where they have been interred. If the Kankur gachee bagan does not suit the taste of all the followers and admirers of the late revered Paramhansa a memorial building may be erected on some other site that may be approved by all and some other relics of the great departed spirit deposited there I shall go out of town on the afternoon of Friday next and am exceedingly sorry that I shall not be able to attend the meeting to be held for the discussion of this important question.

I. C. Mukerjee.

যে দিন হইতে আমার উদ্যানে গুরুদেবের অস্থি সমাধি হইয়াছে, সেই দিন হইতে আমি উহার স্বত্ব গুরুদেবের সেবায় অর্পণ করিয়াছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দুই চারিজন ভক্ত ব্যতীত কেহই আন্তরিক হৃদয় খুলিয়া

গুরুদেবের কার্য্য করিতেছেন না। কোন বিষয়ের তত্ত্বাবধারণও লইতেছেন না সুতরাং যখনি গুরুদেব আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়াছেন তখন আমাকেই হিন্দু রিত্যনুসারে দৈনিক সেবা করিবার সমুদয় ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।

সমাধি স্থানে একটি মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে। উহা প্রায় সমাপ্ত হইয়া আসিল।. এই সময়ে যাহা আপনাদের স্থির হয় অবশ্যই করিতেই হইবে। যত্তপি অস্থি উত্তোলন করাই স্থির হয় তাহা হইলে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে অথবা অন্য প্রকার মত হইলে সেইরূপ কার্য্য হওয়া আবশ্যক। এই নিমিত্ত আমি বিনীতভাবে নিম্নলিখিত ভক্তমহোদয়দিগকে একত্রিত হইয়া সুপরামর্শ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি। দয়া করিয়া সিমুলিয়া ১১ নং মধুরায়ের গলিতে ৯ই আশ্বিন, ইং ২৪শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার অপরাহ্ন বেলা ৬টার সময় সকলে উপস্থিত হইয়া যাহা বিবেচনা যোগ্য হয় তাহা পালন করিবার জন্য আমি প্রার্থী রহিলাম, ইতি ৬ই আশ্বিন মঙ্গলবার ইং ২১শে সেপ্টেম্বর ১৮৮৬।

সেবক শ্রীরামচন্দ্র দত্ত।

Rd. স্বাক্ষর

শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ মিত্র।
„ „ গিরীন্দ্রনাথ মিত্র G. M.
„ „ নরেন্দ্রনাথ দত্ত Seen N. N. Dutt.
„ „ মনমোহন মিত্র।
„ „ দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার Seen D. M.
„ „ নবগোপাল ঘোষ।
„ „ উপেন্দ্রনাথ মজুমদার U. N. M.
„ „ নৃত্যগোপাল বসু N. G. B.
„ „ বলরাম বসু B. B.
„ „ চুণীলাল বসু C. B.
„ „ ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় I. M.
„ „ মণিমোহন মল্লিক।
„ „ গিরিশচন্দ্র ঘোষ G. C. Ghose.

শ্রীযুক্ত বাবু অতুলকৃষ্ণ ঘোষ A. K. G.
" " গোপালচন্দ্র সেন G. C. Sen.
" " রাখালচন্দ্র ঘোষ R. G.
" " বাবুরাম ঘোষ B. Bose.
" " গোপালচন্দ্র ঘোষ G. Ghose.
" " শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী S. C. Chakrabartty.
" " শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী Sosee Bhusan Chakarbatty.
" " মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
" " ধিরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
" " কালীদাস মুখোপাধ্যায় K. D. M.
" " কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়।
" " হরমোহন মিত্র Seen H. M. M.
" " উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" " নিরঞ্জন ঘোষ।
" " তারকনাথ ঘোষাল।
" " গঙ্গাধর ঘটক।
" " ভূপতিনাথ চট্টোপাধ্যায়।

২য়। ৬ই আশ্বিন মঙ্গলবার আহ্বান পত্রানুযায়ী নিম্নলিখিত ভক্তবৃন্দের মধ্যে স্বাক্ষর কারীদিগের অনুমোদনে সাব্যস্ত হইয়াছে যে কাঁকুড়গাছীর উদ্যানস্থিত পূজনীয় পরমহংসদেবের অস্থি-সমাধি কস্মিনকালে কেহ কোন প্রকারে পুনর্ব্বার উত্তোলন করিতে পারিবে না।

শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ মিত্র।
" " গিরীন্দ্রনাথ মিত্র।
" " নরেন্দ্রনাথ দত্ত Narendra Nath Dutta.
" " মনমোহন মিত্র মনমোহন মিত্র।
" " দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার Dabendra Nath Mazumder.
" " উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
" " উপেন্দ্রনাথ মজুমদার Upendra Nath Mazumder.

শ্রীযুক্ত বাবু বলরাম বসু B. R. Bose.

" " চুনীলাল বসু।

" " ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় By letter.

" " গিরিশচন্দ্র ঘোষ Girish Chandra Ghose.

" " অতুলকৃষ্ণ ঘোষ By letter.

" " গোপালচন্দ্র সেন।

" " রাখালচন্দ্র ঘোষ By Boloram Babu.

" " বাবুরাম ঘোষ By Boloram Babu.

" " গোপালচন্দ্র ঘোষ Gopal Chandra Ghose.

" " শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী Sarat Chandra Chakravarti.

S. C. C. for

" " শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী Sasi Bhusan Chakravarti.

" " মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

" " কালীদাস মুখোপাধ্যায় K. D. Mukerji.

" " কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়।

" " হরমোহন মিত্র Hara Mohan Mittra.

" " ভূপতিনাথ চট্টোপাধ্যায় Bhupati Nath Mukopadhya.

" " নৃত্যগোপাল বসু Nritya Gopal Bose.

" " হারাণচন্দ্র চৌধুরী Haran Chandra Chowdhury.

" " বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়।

" " রামচন্দ্র দত্ত রামচন্দ্র দত্ত।

শ্রাবণের উদ্বোধনে অস্থি সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এক স্থানে দেখিলাম, "শ্রীগুরুর পবিত্র দেহভস্মাবশেষ যথা ইচ্ছা সমাহিত করিতে সন্ন্যাসী ও গৃহী উভয় শ্রেণীর ভক্তদিগের সমানাধিকার আছে, ঐরূপ উদারভাব প্রণোদিত হইয়া তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত তাম্র কলস কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে সমাহিত করিতে ঠাকুরের গৃহী ভক্তদিগকে যথাসাধ্য সহায়তা প্রদান করিয়াছিলেন।" আর এক স্থানে লিখিত আছে, "তাঁহাদিগের ঐরূপ মত পরিবর্ত্তন ঠাকুরের সন্ন্যাসী ভক্তদিগের মনঃপূত না হওয়ায় তাঁহারা

পূর্ব্বোক্ত তাম্র কলস হইতে অর্দ্ধেকের উপর ভস্মাবশেষ ও অস্থিনিচয় বাহির করিয়া লইয়া ভিন্ন এক পাত্রে উহা রক্ষাপূর্ব্বক তাঁহাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ গুরুভ্রাতা বাগবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয়ের ভবনে নিত্য পূজাদির জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।" এ কথার মূলে যে আদৌ সত্য নিহিত নাই, তাহা পাঠকগণের কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। কেন না, তাহা হইলে অস্থি উত্তোলন করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইত না, ইহা ব্যতীত শ্রদ্ধাস্পদ ঈশান বাবুর পত্রে সে কথার বিন্দুমাত্র উল্লেখ নাই এবং কোন ভক্তই সভায় সে কথার লেশমাত্রও বলেন নাই। ইহা ব্যতীত কলসীর ভিতর হইতে অস্থি বাহির করিয়া লওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। মহাত্মা রামচন্দ্র বলিয়াছেন যে, অস্থিপূর্ণ করিয়া কলসীতে গঙ্গা মৃত্তিকা বেশ করিয়া ঠাসিয়া ঠাসিয়া কলসীর গলা পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছিল। ইহা প্রস্তরের ন্যায় শক্ত হইয়া গিয়াছিল। কলসী হইতে পুনরায় অস্থি বাহির করিতে হইলে লোহার ডাণ্ডা বা সাবল দিয়া শতবার আঘাত না করিলে গঙ্গা মৃত্তিকা পূরিত কলসী হইতে অস্থি বাহির করিবার সম্ভাবনা নাই। কোন ভক্তই ইহা করিতে পারেন না, কেন না ঠাকুরের গাত্রে লোহার ডাণ্ডার আঘাত করা কোন্ ভক্তের প্রাণে সহ্য হইতে পারে?

স্বামী বিবেকানন্দজীর জীবন-চরিতে লেখা আছে। "At Baranagore, these householders headed by Rama Baboo redoubled their efforts to secure the precious relics and came in a body to take possession of them. The monks Soshi and Niranjan constituted themselves the guardians and protectors of the Master's relics and they were giants, one in resolution and and the other in appearance. These two were ready to stand their ground at any cost. In this dilemma Norendra appealed to the monks and taking them aside said, "Brothers! Let us be men! Let us mould our lives according to our Master's teaching, which was man-making! Let them have the ashes! If we can not prove our devotion to the Master

by following his precepts and preinciples, embracing the Sannyasin life, what will it matter how much we worship the relics! Let it not be said that the disciples of Sri Ramakrishna fought over his ashes! If we are true to his ideals, if we make ourselves the living examples of our master's teachings, the whole world will fall at our feet!" What more was to be done! The Leader had spoken irresistible words of wisdom. The monks quietly accepted his decision, seeing the fitness of it. Accordingly a day was fixed, and Soshi, carrying the ashes of the Master on his head, went with other disciples to the Kankurgachi garden of Ram Chandra Dutta, where it had been arranged that the Master's relics should permanently repose beneath an altar, aud a temple be erected over them. Henceforth this garden became known as the Yogodyan, or garden of Yoga, and every year an anniversary celebration is held here in honour of Sri Ramakrishna. Worship and ceremonies were performed with due solemnity, and Soshi's eyes were filled with tears as he saw the ground beaten down over the Master's ashes.

When they had returned to the Monastery, both Soshi and Niranjan coming to the Leader said, "Noren, we have *given the ashos! but,"*

ইহার মর্ম্মার্থ:—বরাহনগরের রামবাবু প্রমুখ গৃহী ভক্তগণ ঠাকুরের অস্থি লইবার জন্য গিয়াছিলেন। সাধু শশী এবং নিরঞ্জন কোন মতেই দিতে রাজা ছিলেন না। নরেন্দ্র সাধুদের ডাকিয়া বলিলেন, "ভ্রাতৃগণ! মানুষ হও, গুরুদেবের উপদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিতে পারিলে মানুষ হইবে। ভস্মাবশেষ উহাদের দিয়া দাও। যদ্যপি আমরা সন্ন্যাসী হইয়া তাঁহার উপদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিয়া গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিতে না পারি, তাহা

হইলে তাঁহার ভস্মাবশেষ অস্থি পূজা করিয়া কি লাভ হইবে? এ কথা কেউ না বলে যে, শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তগণ তাঁহার ভস্মাবশেষ লইয়া বিবাদ করিয়াছিল। যদ্যপি আমরা তাঁহার আদর্শ অনুযায়ী ঠিক ঠিক জীবন গঠন করিতে পারি, তাহা হইলে সমগ্র জগৎ আমাদের পদতলে অবনত হইবে। সাধুদের দলপতি কি জ্ঞানগর্ভ কথাই বলিয়াছেন, সাধুগণ তাঁহার কথানুযায়ী কার্য্য করিলেন এবং শশী নির্দ্দিষ্ট দিনে গুরুদেবের ভস্মাবশেষ অস্থি মস্তকে ধারণ করিয়া তাঁহার অন্যান্য শিষ্যগণের সহিত রামচন্দ্রের কাঁকুড়গাছীর বাগানে দিয়া আসিলেন। এই স্থানেই চিরস্থায়ীভাবে ঠাকুরের অস্থি থাকিবে এবং একটী মন্দির নির্ম্মিত হইবে এইরূপ পূর্ব্বে বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। এই সময় হইতেই ঐ উদ্যানকে যোগোদ্যান বলা হয় এবং প্রতি বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণের একটী মহোৎসব হয়। সমাধির দিনে পূজা উৎসবাদি যথারীতি হইয়াছিল এবং ঠাকুরের অস্থির উপর মাটী চাপাইতে শশীর চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রুধারা বহির্গত হইয়াছিল।"

"যখন সাধুগণ তাঁহাদের মঠে ফিরিয়া আসিলেন, শশী এবং নিরঞ্জন উভয়ে দলপতিকে বলিলেন, নরেন! আমরা ভস্মাবশেষ অস্থি দিয়া আসিয়াছি, কিন্তু।"

স্বামিজীর জীবন-চরিত যাঁহারা লিখিয়াছেন তাঁহারা সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা না লিখিয়া আংশিক সত্য লিখিয়াছেন। প্রথমতঃ—বরাহনগরে তখন কেহই থাকিতেন না, কাশীপুরের উদ্যান হইতে অস্থি আনয়ন করা হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ—স্বামিজী নিজে সমাধির দিন যোগোদ্যানে গিয়া যে সমাধি দিয়া আসিয়াছিলেন সে কথার উল্লেখ না করিয়া যে ভাবে লিখিয়াছেন তাহাতে বুঝায় যে স্বামিজী যোগোদ্যানে যান নাই। তারপরে 'কিন্তু' কাটিয়া লিখিয়াছেন, যে তাঁহারা সমস্ত না দিয়া কিছু রাখিয়াছেন, এটী বিশ্বাসের যোগ্য নহে, কেন না পূর্ব্বে লিখিয়াছেন, যে স্বামিজীর মতানুযায়ী তাঁহারা কার্য্য করিলেন, স্বামিজী তাঁহাদের কিছু রাখিতে বলেন নাই, বা যখন তাঁহারা কলসীটি লইয়া গিয়াছিলেন তখন মহাত্মা রামচন্দ্র বিশেষ ভাবে দেখিয়া লইয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ ভাবে গুল্গুল-মৃত্তিকা দ্বারা আবদ্ধ আছে কি না, একথারও উল্লেখ করেন নাই। তবে একটী কথা যে লিখিয়াছেন, যে, সমাধির সময় তাম্র কলসের উপর মৃত্তিকা চাপাইতে শশীর চক্ষুদ্বয় হইতে যে অশ্রুধারা বিগলিত হইয়াছিল ইহা হইতেই পাঠকগণ

by following his prcepts and preinciples, embracing the Sannyasin life, what will it matter how much we worship the relics ! Let it not be said that the disciples of Sri Ramakrishna fought over his ashes ! If we are true to his ideals, if we make ourselves the living examples of our master's teachings, the whole world will fall at our feet !" What more was to be done ! The Leader had spoken irresistible words of wisdom. The monks quietly accepted his decision, seeing the fitness of it. Accordingly a day was fixed, and Soshi, carrying the ashes of the Master on his head, went with other disciples to the Kankurgachi garden of Ram Chandra Dutta, where it had been arranged that the Master's relics should permanently repose beneath an altar, aud a temple be erected over them. Henceforth this garden became known as the Yogodyan, or garden of Yoga, and every year an anniversary celebration is held here in honour of Sri Ramakrishna. Worship and ceremonies were performed with due solemnity, and Soshi's eyes were filled with tears as he saw the ground beaten down over the Master's ashes.

When they had returned to the Monastery, both Soshi and Niranjan coming to the Leader said, "Noren, we have given the ashes ! but,"

ইহার মর্ম্মার্থ:—বরাহনগরে রামবাবু প্রমুখ গৃহী ভক্তগণ ঠাকুরের অস্থি লইবার জন্য গিয়াছিলেন। সাধু শশী এবং নিরঞ্জন কোন মতেই দিতে রাজী ছিলেন না। নরেন্দ্র সাধুদের ডাকিয়া বলিলেন, "ভ্রাতৃগণ! মানুষ হও, গুরুদেবের উপদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিতে পারিলে মানুষ হইবে। ভস্মাবশেষ উহাদের দিয়া দাও। যদ্যপি আমরা সন্ন্যাসী হইয়া তাঁহার উপদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিয়া গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিতে না পারি, তাহা

হইলে তাঁহার ভস্মাবশেষ অস্থি পূজা করিয়া কি লাভ হইবে? এ কথা কেউ না বলে যে, শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তগণ তাঁহার ভস্মাবশেষ লইয়া বিবাদ করিয়াছিল। যদ্যপি আমরা তাঁহার আদর্শ অনুযায়ী ঠিক ঠিক জীবন গঠন করিতে পারি, তাহা হইলে সমগ্র জগৎ আমাদের পদতলে অবনত হইবে। সাধুদের দলপতি কি জ্ঞানগর্ভ কথাই বলিয়াছেন, সাধুগণ তাঁহার কথানুযায়ী কার্য্য করিলেন এবং শশী নির্দ্দিষ্ট দিনে গুরুদেবের ভস্মাবশেষ অস্থি মস্তকে ধারণ করিয়া তাঁহার অন্যান্য শিষ্যগণের সহিত রামচন্দ্রের কাঁকুড়গাছীর বাগানে দিয়া আসিলেন। এই স্থানেই চিরস্থায়ীভাবে ঠাকুরের অস্থি থাকিবে এবং একটী মন্দির নির্ম্মিত হইবে এইরূপ পূর্ব্বে বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। এই সময় হইতেই ঐ উদ্যানকে যোগোদ্যান বলা হয় এবং প্রতি বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণের একটী মহোৎসব হয়। সমাধির দিনে পূজা উৎসবাদি যথারীতি হইয়াছিল এবং ঠাকুরের অস্থির উপর মাটী চাপাইতে শশীর চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রুধারা বহির্গত হইয়াছিল।"

"যখন সাধুগণ তাঁহাদের মঠে ফিরিয়া আসিলেন, শশী এবং নিরঞ্জন উভয়ে দলপতিকে বলিলেন, নরেন! আমরা ভস্মাবশেষ অস্থি দিয়া আসিয়াছি, কিন্তু।"

স্বামিজীর জীবন-চরিত যাঁহারা লিখিয়াছেন তাঁহারা সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা না লিখিয়া আংশিক সত্য লিখিয়াছেন। প্রথমতঃ—বরাহনগরে তখন কেহই থাকিতেন না, কাশীপুরের উদ্যান হইতে অস্থি আনয়ন করা হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ—স্বামিজী নিজে সমাধির দিন যোগোদ্যানে গিয়া যে সমাধি দিয়া আসিয়াছিলেন সে কথার উল্লেখ না করিয়া যে ভাবে লিখিয়াছেন তাহাতে বুঝায় যে স্বামিজী যোগোদ্যানে যান নাই। তারপরে 'কিন্তু' কাটিয়া লিখিয়াছেন, যে তাঁহারা সমস্ত না দিয়া কিছু রাখিয়াছেন, এটী বিশ্বাসের যোগ্য নহে, কেন না পূর্ব্বে লিখিয়াছেন, যে স্বামিজীর মতানুযায়ী তাঁহারা কার্য্য করিলেন, স্বামিজী তাঁহাদের কিছু রাখিতে বলেন নাই, বা যখন তাঁহারা কলসীটি লইয়া গিয়াছিলেন তখন মহাত্মা রামচন্দ্র বিশেষ ভাবে দেখিয়া লইয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ ভাবে গঙ্গা-মৃত্তিকা দ্বারা আবদ্ধ আছে কি না, একথারও উল্লেখ করেন নাই। তবে একটী কথা যে লিখিয়াছেন, যে, সমাধির সময় তাম্র কলসের উপর মৃত্তিকা চাপাইতে শশীর চক্ষুদ্বয় হইতে যে অশ্রুধারা বিগলিত হইয়াছিল ইহা হইতেই পাঠকগণ

বুঝিতে পারিবেন যে, তাম্র কলসী হইতে বিশেষরূপে আঘাত করিয়া অস্থি বাহির করা কতদূর সম্ভব।

স্বামী বিবেকানন্দজী যথার্থই উদারভাবে বলিয়াছিলেন যে, ভস্মাবশেষ অস্থি উঁহাদেরই দাও, আমরা মানুষ হই, তাহা হইলেই তাঁহার নাম ও কীর্ত্তি থাকিবে। এবং সেই মতানুসারেই কার্য্য হইয়াছিল। বোধহয়, তাহার পর সেই উদারভাব সকলের মনোমত না হওয়ায় অস্থি পুনরায় উত্তোলন করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। স্বামিজীরই মতানুসারে সকলে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন যে অস্থি কস্মিনকালে কাঁকুড়গাছী হইতে উত্তোলন করা হইবে না। সুতরাং কলসী হইতে অস্থি বাহির করিয়া লইবার কথা সম্পূর্ণ অবিশ্বাসযোগ্য। তবে স্বামীজী যাহাকে "আত্মারামের কৌটা" বলিতেন আমাদের বোধহয়, ঠাকুরের ভস্মাবশেষ অস্থি তাম্র কলসীতে পূর্ণ করিবার পর, কোন কোন ভক্ত একটু একটু চিহ্নস্বরূপ আপনার কাছে রাখিবার জন্য সেই দিবস শ্মশানভূমী হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি যে স্বামিজীর খুল্লতাত ভ্রাতা বাবু অমৃতলাল দত্ত (বিখ্যাত ৺হাবু বাবু) একটু সংগ্রহ করিয়া মাদুলিতে সংস্থাপনপূর্ব্বক আজীবন নিজ গলায় রাখিয়াছিলেন। সেইরূপ হয় ত ৺বলরাম বাবুও একটু সংগ্রহ করিয়া কৌটাতে রাখিয়াছিলেন। ইহাই বরাহনগরের মঠে লইয়া গিয়া আত্মারামের কৌটা বলিয়া খ্যাত হইয়া থাকিতে পারে। তাহা না হইলে স্বামিজী আবার তাহার পরীক্ষা করিবেন কেন? সেই কৌটায় যথার্থ ঠাকুর আছেন কি না, কোন ঘটনার দ্বারা পরীক্ষা করিয়া লইয়াছেন।

যদ্যপি প্রকৃতই তাম্রকলসী হইতে অস্থি অর্দ্ধেকেরও উপর বাহির করিয়া লইয়া থাকিবেন তাহা হইলে পরীক্ষা করিবারও প্রয়োজন হইত না, অস্থি উত্তোলন করিবারও প্রস্তাব হইত না এবং স্বামিজী দেহাবসানের পূর্ব্বেই এত দিনে অস্থি বেলুড় মঠে সমাহিত না করিয়া তিনি থাকিতে পারিতেন না। যিনি গঙ্গাতীরে অস্থি সমাহিত করিবার জন্য কতই ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তিনি বেলুড়ে গঙ্গার পশ্চিম কূলে ২২ বিঘা জমি ক্রয় করিয়া মঠ স্থাপনা করিয়াও যে, অস্থি সমাহিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন না, ইহা আমরা কোনমতেই বিশ্বাস করিতে পারি না।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে শ্রাবণ সংখ্যায় উদ্বোধনে যে লিখিত হইয়াছে যে অস্থিপূর্ণ তাম্র কলসী হইতে অর্দ্ধেকের উপর অস্থি বাহির করিয়া লইয়া ঐ কলসী

কাঁকুড়গাছীতে সমাহিত করা হইয়াছে। তবে আষাঢ় সংখ্যায় কেমন করিয়া তাঁহারা প্রকাশ করিলেন যে অস্থি সমাহিত করিবার কোথাও একটু স্থান হইলনা বলিয়া স্বামিজী দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। উঁহারা বলিয়াছেন যে উঁহাদের নিকট যে অস্থি ছিল, সেই কথাই স্বামিজী বলিয়াছেন কিন্তু পত্রে সে কথার বিন্দুমাত্রও উল্লেখ নাই। পত্র পাঠ করিলে ইহাই বুঝায় যে ঠাকুরের দেহের অগ্নিসংস্কারের পর অস্থি সংগৃহীত আছে, সেই অস্থি সমাহিত করিবার জন্য বাঙ্গালা দেশে কেহই কোথাও স্থান দিলেন না, আপনি অনুগ্রহ করিয়া টাকা দিয়া ইহার ব্যবস্থা করিয়া দিন।

এরূপ মিথ্যা কথা বলিয়া স্বামিজী টাকা চাহিয়াছেন, ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। একটী মিথ্যা বলিলে তাহাকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে আরও পাঁচটী মিথ্যা বলিতে হয়। এই পত্রের কথা সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে গিয়া শ্রাবণ সংখ্যায় উদ্বোধনে আরও কতকগুলি মিথ্যা রচনা করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

আদর্শ-চরিত্র।

ইংরাজীতে একটী কথা বলে, "The crown and glory of life is character." চরিত্রই মানব জীবনের রাজমুকুট ও বিজয়-নিশান। চরিত্রই মনুষ্যত্ব, চরিত্রের বিকাশেই মানুষ—মানুষ বলিয়া পরিগণিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমুখে বলিয়াছেন যে, যাহার হুঁস আছে সেই মানুষ। চরিত্রবলেই মানব-জাতি ধরাধামে স্বর্গসুখ উপভোগ করেন, চরিত্রবলেই জগতে শান্তির রাজ্য সংস্থাপিত হয়; চরিত্রই মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র লক্ষ্য। যে ভারতবর্ষ আজ নিজ মহিয়সী মহিমায় সকল সভ্য জাতীর দৃষ্টি আকর্ষিত করিতেছে, যে ভারতবর্ষ অনাদিকাল হইতে সভ্য-জগতের শীর্ষস্থানীয়, যে ভারতবর্ষ আদর্শ-পুরুষ-প্রধান-গণের শ্রীচরণরজে চিরপবিত্র, যে ভারতবর্ষ ধনলোলুপ নৃপতিবর্গের শ্যেণদৃষ্টি অতিক্রম করিতে না পারিয়া হৃতসর্ব্বস্বা, যে প্রেমভূমী ভারতবর্ষ অপ্রেমিকের অত্যাচারে চির-জর্জ্জরিত হইয়াও আপনার সর্ব্বস্বধন সনাতন

ধর্ম্মধনে বঞ্চিত হন নাই—নিত্য মহত্ত্বের কণককিরণে চির উদ্ভাসিত, বল দেখি ভাই তাঁরে মূল কি? এখনও কি বলিতে হইবে আদর্শ-চরিত্রই ইহার মূল ধার। মহাপ্রাণ প্রশান্ত-উদার আপনহারা বিশ্বপ্রেমিকগণের প্রাণই ইঁহার মেরুদণ্ড। বল দেখি ভাই! কত বড় প্রেমিক হইলে ত্যাগেই শান্তি পরের মঙ্গলমন্দিরে আত্ম বলিদানেই চরম তৃপ্তি, অভয় লাভ করিবার, নির্ভয় হইবার একমাত্র উপায়ই বৈরাগ্য—এই মহাবাণী ভারতমাতার চিরপ্রশান্ত হৃদয়ে নিজ নিজ নিঃস্বার্থ জীবনের স্বর্ণাক্ষরে চির-অঙ্কিত রাখিতে পারেন? বল দেখি ভাই কত বড় মহাপ্রাণ হইলে এই অমিয় বাণী দিকদিগন্ত স্তম্ভিত করিয়া আপনা বিলাইয়া জীমূত মন্দ্রে বলিতে পারেন?—

"ভিক্ষুকের কবে বল সুখ? কৃপা পাত্র হয়ে কিবা ফল?
দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল—
অনন্তের তুমি অধিকারী—প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান।
দাও—দাও, যেবা ফিরে চায়, তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান॥
ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্ব্ব ভূতে সেই প্রেমময়।
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায়॥
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন—সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

স্বামী বিবেকানন্দ।

* * * * * *

ত্যাগের জ্বলন্ত আদর্শ—নিষ্কাম ধর্ম্মের বৈজয়ন্তধাম, সমানুভূতীর প্রেম মন্দাকিনী, আত্ম বলিদানের আদর্শমূর্ত্তি ভারত সন্তান না হইলে কে প্রাণে প্রাণে অনুভূতী করিতে পারে, ত্যাগেই জীবন, প্রেমেই মনুষ্যত্ব—স্বার্থপরতাই মৃত্যু! চিরআস্তিক ঈশ্বরবিশ্বাসী প্রেম-অন্ত-প্রাণ—ভারত সন্তানই গাহিতে পারেন—

* * * * প্রেম—প্রেম মাত্র ধন। * * * *
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়, তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা॥

হে ভারত, ভাবিও না তুমি জীবন সংগ্রামে বার বার পরাজিত ও বিধ্বস্ত

হইতেছ, ভাবিও না তুমি নিস্তেজ হইয়াছ, ভাবিও না তুমি রিপুর বশীভূত হইয়া মোহ মদিরায় উন্মত্ত আত্মহারা হইয়া দশদিক শূন্যময় দেখিতেছ—ভাবিও না আর তোমার কিছুই নাই—তুমি নিরাশার সাগরে মগ্ন হইয়াছ এ সকল তোমার মঙ্গলের জন্য, The deeper you dive the higher you rise.—তুমি যতই কেন অতল তলে ডুবিয়া যাও নিশ্চয় জানিও তোমাকে ততোধিক উচ্চে উঠিতেই হইবে। তুমি ত প্রাণ হারা হও নাই—তুমি ত তোমার সনাতন ধর্ম্মচ্যুত হইতে পারিবে না, তুমি ছাড়িলেও তোমার পরাপ্রকৃতি—তোমার ধর্ম্ম ত তোমাকে কখনই ত্যাগ করিবেন না। তুমি ত জান,—যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত, অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্, পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

যখনই ভারত প্রেমময়কে ভুলিয়া অশান্তির আশ্রয়িভূত হয়, তখনই তিনি শান্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য আবির্ভূত হন। তুমি ভুলিলেও তিনি তোমাকে ভুলিবেন না। প্রাণে প্রাণে বুঝিতে ত পারিতেছ—কে সেই প্রেমময়—তোমার হৃদয়ের গুপ্ত অভ্যন্তরে—কে সেই মনপ্রাণহরা—অমিয়মাখা প্রাণজুড়ান মোহনমূরতী—দীনহীন কাঙ্গালের কাঙ্গালরূপে জোর করিয়া কত আদরের অমিয়বাণী শুনাইয়া তোমায় মৃতসঞ্জীবীত করিতেছেন—কে তোমার প্রাণে প্রাণে বলিয়া দিতেছেন "Better to serve in heaven than to reign in hell" নরকের রাজা হইয়া কাজ নাই—স্বর্গের দাসত্বও সর্ব্বাংশে শ্রেয়স্কর। তাই তাঁহার কৃপায় এ কথাটি ভুলিও না—মনে রাখিও—ইহাই মনুষ্যত্ব মাঝে মূলসূত্র।

মায়ার রাঙ্গাফলে ভুলিয়া আমরা আদর্শচ্যুত হইয়াছিলাম, পাজী অহঙ্কারের ঘোর আবর্ত্তে পড়িয়া আমরা আত্মহারা—আত্মভ্রষ্ট হইয়াছিলাম তাই আমাদের এত দুর্গতি। এখন ভগবানের কৃপায় বুঝিতে পারিতেছি "তুমি" বলিলে কত সুখ, কত শান্তি। তুমি প্রভু আমি দাস—তুমি মা আমি সন্তান—মা ও সন্তান অভেদ "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"।

ভগবান যীশুখ্রীষ্ট প্রার্থনা করিয়াছিলেন—God save me form my friends—ঈশ্বর বন্ধুদিগের হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা করিও। ইহার কারণ কি? বন্ধুরা ত আমার দোষ দেখিবে না, কেবল গুণেই মুগ্ধ হইবে, প্রভু এমন বন্ধু আমি চাই না; যে আমার দোষ দেখাইয়া দিবে সেই প্রকৃত বন্ধু।

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমুখে বলিয়াছেন "বন্ধু কেহ নহে কার, বন্ধু আপনিই আপনার", তাই তাঁহার প্রাণপ্রিয় সন্তান, চিরপবিত্র আদর্শ-চরিত্র সত্যনিষ্ঠার পূর্ণমূর্ত্তি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীচরণাশ্রিত-সেবক মহাত্মা রামচন্দ্র আপনাকে কত দীন হীন বিবেচনা করিতেন, তাঁহার প্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুস্তকাবলীতে তিনি আপনাকে কত পাষণ্ড হীনচরিত্র ও হীনের হীন করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তিনি জগতের পাষণ্ডশ্রেষ্ঠ বলিয়া আপনাকে প্রচারিত করিয়াছেন! তাঁহার প্রাণেরপ্রাণ শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেব যেমন জগন্মাতার কাছে জীব শিক্ষার জন্য প্রার্থনা করিতেন—"মা আমার অহং নাশ করিয়া দাও। আমার আমি বিলুপ্ত করিয়া তথায় তুমিই বর্ত্তমান থাক। আমি হীনের হীন, দীনের দীন, এ বোধ যেন আমার সর্ব্বক্ষণ থাকে, ব্রাহ্মণ হউক, কিম্বা ক্ষত্রিয় হউক, বৈশ্য হউক, কিম্বা শূদ্র হউক, অথবা সমাজগণিত নীচ ব্যক্তি, যাহারা হাড়ি মুচী বলিয়া উল্লিখিত, তাহারাই হউক, কিম্বা পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি হউক, সকলেই মা আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই জ্ঞান, এই বোধ, এই ধারণা হইয়া যাক্।" (মহাত্মা রামচন্দ্র প্রণীত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন-বৃত্তান্ত)। আদর্শশ্রেষ্ঠ মহাত্মা রামচন্দ্রও ঠিক তেমনই আপনার জীবনসর্ব্বস্বের পদাঙ্কে আপনার জীবন গঠিত করিয়াছিলেন। তিনি সাধারণ মনুষ্য যতদূর হীনচেতা হইতে পারে তাহার পরাকাষ্ঠা নিজের জীবনে আরোপ করিয়া জগতকে অভয় দিয়া আপনার প্রভু-পদে টানিয়াছেন—ধন্য প্রেম! ধন্য মহাত্মা রামচন্দ্র! তোমার কৃপায় ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপালাভ হয়, পশু মানুষ হয়, মহা পাষণ্ডও মহা সাধু রূপে পরিগণিত হয়—ইহা এক বিন্দুও অতিরঞ্জিত নহে, স্বয়ং ধর্ম্মবীর স্বামী বিবেকানন্দই ইহার মহোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, অন্য পরে কা কথা। যে সৌভাগ্যবান এক দিনের তরেও মহাত্মার দুর্লভসঙ্গ লাভ করিয়াছেন, যে ক্ষণজন্মা ভক্ত-শ্রেষ্ঠ তাঁহার ক্ষণেকের দর্শন লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা রামকৃষ্ণময় রামচন্দ্রকে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তাঁহার ইষ্টের মহিমা প্রচার করিতে শুনিয়াছেন তাঁহারাই তাঁহার জ্বলন্ত বিশ্বাস ও প্রেমপূর্ণ প্রাণের—বিশ্বপ্রেমিকতার পরিচয় পাইয়াছেন। আমরা তাঁহার কৃপাশ্রিত কত কত মহাত্মাগণের মুখে শুনিয়াছি যে 'রাম বাবুর তুলনা নাই, তাঁহার নৈষ্ঠিক ভক্তি, জ্বলন্ত বিশ্বাস, সাধারণ জীবকে ভগবচ্চরণে সমর্পণ করিবার প্রাণের অলৌকিক উদ্দাম ব্যাকুলতা, ইহা বাক্যা-

তীত বিষয়, সাধারণ মনুষ্যের অনন্নুভবনীয়, যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন তাঁহারাই কথঞ্চিৎ মাত্র অনুভব করিয়া আত্মহারা হইয়া যান। তাঁহার জীবনী পাঠে তাঁহার অমানুষীক দেবদুর্লভ জীবনের এক কণাও উপলব্ধি করিতে পারিবে না।" ভারতের দুর্ভাগ্য—তাই আমরা এ রত্ন হেলায় হারাইয়াছি, আদর করি নাই, প্রাণ দিয়া এক দিনের জন্যও ভালবাসিতে পারি নাই, স্বার্থান্ধ আমরা—কেবল স্বার্থের জন্যই তাঁহাকে উৎপীড়িত করিয়াছি—তাঁহার সোণার অঙ্গে নিজ পাপ-কালীমা ঢালিয়া দিয়া—কত জ্বালাতন করিয়াছি। তুষানলেও বুঝি ইহার প্রায়শ্চিত্ত হয় না। প্রভু প্রেমময়—এস দেব, একবার এস, তোমার গুণের কথা এ পাষণ্ড আর কি বলিবে? কৃপা করিয়া আমার ন্যায় শত শত অভাগার হৃদয়াসনে অধিষ্ঠিত হও—প্রেমাশ্রুজলে তোমার অভিষেক করি, জয় রাম—জয় রামকৃষ্ণনামে ভুবন পরিপূরিত হউক—রাম রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইয়া যাক—ওঁ রামকৃষ্ণ। কাঙ্গাল।

ত্রিংশ বার্ষিক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব।

আগামী ১৫ই ভাদ্র ইংরাজী ১লা সেপ্টেম্বর, বুধবার জন্মাষ্টমীর দিন কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যান শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব হইবে।

এতদুপলক্ষে ৭ই ভাদ্র মঙ্গলবার হইতে ১৪ই ভাদ্র মঙ্গলবার অবধি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা ও ভোগরাগাদি হইবে এবং ১৫ই ভাদ্র বুধবার জন্মাষ্টমীর দিন সিমুলিয়া ২৬ নং মধুরায়ের গলি হইতে দলে দলে সঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায় যোগোদ্যানে যাইবে ও ঐ দিবস তথায় মহোৎসব হইবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সমাধি-মন্দির ফাণ্ড।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, বিগত ১লা মে হইতে ৯ই আগষ্ট অবধি নিম্নলিখিত সহৃদয় ভদ্রমহোদয়গণের নিকট হইতে, কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমাধিস্থানে যে নূতন মন্দির নির্ম্মিত হইবে, তাহার জন্য সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার দাস, চাঁদসীর ডাক্তার, কলিকাতা।	১৲
জনৈক ভক্ত, নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা,	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ সাসমল, কাঁথি	১০৲
" " ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিক্সন্ লেন, কলিঃ, ৩য় দফে	৩।০
মারফৎ শ্রীযুক্ত বগলাজিৎ দাস, দিনাজপুর,	
(সেবকানুসেবক ॥০, শ্রীশ্যামপদ পাল।০, শ্রীবিজয়চন্দ্র পাল।০)	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরামপুর	১৲
" " ভবানন্দ সরকার, ফরিদপুর, রাধিকাপুর, দিনাজপুর,	১৲
" " সুশীলেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গণেশতলা, দিনাজপুর,	২৲
শ্রীমতী নবনলিনী দাসী c/o J. N. Das Esq. দিনাজপুর	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু অন্তর্য্যামী মহান্তি, শালিখা, হাওড়া,	।০
" " বাউল চন্দ্র মিস্ত্রী " "	১৲
" " অতুলচন্দ্র ঘোষ " "	২৲
" " বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মুন্সীপাড়া, দিনাজপুর,	১৲
" " অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়, ৫০ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিঃ,	১৲
জনৈক সেবক, কুষ্টিয়া,	॥০
শ্রীযুক্ত বাবু হরিপদ নন্দী, মেদিনীপুর,	।০
" " প্রবোধকুমার ঘোষ, রাজগ্রাম, বাঁকুড়া,	২৲
" " পূর্ণচন্দ্র পাল, মাধিপুরা, ভগলপুর,	॥০
" " মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যরত্নাকর, মেদিনীপুর,	৩৲
জনৈক ভক্ত মারফৎ শ্রীযুক্ত বাবু ত্রিলোচন পাত্র, ত্রিবেণী,	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু ভূতনাথ ঘোষ, সিমলা, কলিকাতা,	১০৲
শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ বসু, হাজারীবাগ,	॥০
মারফৎ শ্রীযুক্ত বাবু সাতকড়ী মুখোপাধ্যায়, খুচরা আদায়,	১৶০
পূর্ব্ব প্রাপ্ত	২০০৮॥৶০
মোট	২০৫৪৲

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমাধিস্থানে মন্দির নির্ম্মাণের জন্য উৎসাহান্বিত হইয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যিনি যাহা কিছু সাহায্য করিবেন, তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে।

যোগবিনোদ
শ্রীরামকৃষ্ণ-সমাধি-মন্দির মঠ,
যোগোদ্যান, কাঁকুড়গাছী, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীচরণ ভরসা।

জয় গুরুদেব !!

তত্ত্ব-মঞ্জরী

উনবিংশ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা।

আশ্বিন, সন ১৩২২ সাল।

আত্মসমাধি।

জগমঙ্গল নামের জয় হউক, অনন্ত শক্তিবিশিষ্ট ভগবান রামকৃষ্ণ নামের জয় হউক। নাম সত্য—নাম ব্রহ্ম, নামই নামী। প্রিয়তম রামকৃষ্ণ জীবনবন্ধু অস্তিমের ধন, এস নামের সার্থকতা কর। তোমারি বিশ্বধামে আবার এসেছে "শ্রীগুরু পূর্ণিমা।" সেই মন্দির, সেই তুমি, সেই আমি। ভুবনমোহন প্রাণের প্রাণ, জীবনের বন্ধু, তাত হবেনা। নামে কলঙ্ক হবে, দীনার প্রার্থনা নিষ্ফল হবে, তাত হবেনা, তা হবেনা। এস আমার ভক্তিমন্দির আজ নূতন কর, আমাতে এস। সত্য সনাতন, সমাধি কি? আমাতে সমাধি হবে, যদি তোমার নাম সত্য হয়, তবে আমার প্রার্থনা মিথ্যা হবে নাত। মিথ্যা হোলে কাঁদবো? জানিনা বুঝিনা বোল্‌তে পারিনা এস ডুবিয়ে নাও। আমাকেই নাও। আমাকে নাও। হে অনন্তশক্তিধর ইচ্ছাময় বিশ্বসুন্দর তোমার ইচ্ছায় কিনা হয়। তোমার ইচ্ছায় আজ আমার দেহ সমাধি হউক, নাম, নাম, তোমার নামের জয় হউক। আমি জানিনা, আমি ভাবিনা, আমি বুঝিনা তুমি কি, কত বড়। আমি জানি তোমার আমি। তোমার নাম নিয়েছি আমি, তোমার নাম—যে নামে অনন্ত মোক্ষ, যে নামে জীবের মহাশক্তি—সেই নাম, সেই নাম দিয়েছ, আর কি আমি আমি আছি?

তোমার জগৎ তোমার মাঝে
তুমি আমি একি খেলা,
আর চলেনা প্রাণের সখা
ঘুচিয়ে দাও নাপ এই বেলা।

আর খেলা, আর খেলা নয়। সাধ মিটে গেছে। এস নামের জয় কর। ঠাকুর তোমায় ভাই বল্‌বো? সাধ হয়েছে যে। এস ভাই এস বন্ধু এস দোসর, এস একটি হই। দুটি দুটি আর না। নামের সার্থকতা হউক। সমাধি সে কি? সে কেমন? আমার দেহই তোমার সমাধি মন্দির কর, না হোলে তোমার প্রসাদ পেয়ে, তোমার কাছে বোসে তোমার সমাধি মন্দিরের জন্য যে প্রার্থনা কোরেছি, সব বৃথা—বৃথা হোয়ে যাবে? তাত হবে না, জীবনবন্ধু তাত হবে না, তোমার নামের মহিমা কমে যাবে, তাত হবে না, তোমার নামে মগ্না এ ক্ষুদ্রা কীট, কিন্তু তোমার নামে যে দীক্ষিত, জীবনবন্ধু ভাই আমার প্রিয় আমার সব আমার এস, সার্থকতা কর আজ আমার ভাঙ্গা দেহ মন্দিরই সমাধি-মন্দির কর। না হোলে এ খেদে কেঁদে কেঁদে মোরে যাব, মরে যাব, মরে যাবই। যদি মরে যাই, সে যে মরণ হবে, প্রিয়তম জীবনবন্ধু অনিন্দ্যসুন্দর অদ্বিতীয় একজন গেলে দয়াল তোমার বড় কষ্ট হবে, হবে ঠাকুর। তুমি যে করুণার পাথার, এস নামের জয় কর। চালাকী ঘুচে যাক, বাতুলতা ঘুচে যাক, নামের জয় নামের সত্যতা, প্রার্থনার সার্থকতা কর।

বিশ্বেশ্বর বিশ্বভরা তুমি। চাঁদ, সূয্যি, জল, বায়ু, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, তুমি। শত্রু, মিত্র, খল, সরল, লক্ষ্মী, দুষ্টু, সব তুমি। তোমার আমি। আমি কৈ? আমার যদি শক্তি নেই, সাধের পূর্ণতা নেই, আমি কৈ? কেবল ভুল হোচ্ছে, কেবল ভুলে দুঃখ আস্‌ছে কেবল ভুল হোয়ে যাচ্ছে। ঐ দেখনা, সবাই মিলে পাগল বোল্‌ছে, ঠাকুর প্রেমের ঠাকুর সবার ঠাকুর আমার, ঠাকুর—পাগল কর। সব ভুলে যাই, সুধু ডুবে যাব, তলিয়ে যাব, খুঁজে পাবে না কেউ। খুঁজতে গিয়ে তুমি তুমি তোমার মহিমা। এস সত্য সনাতন, এস সুন্দর, এস আমার আনন্দ হউক, এস নামের জয় কর। যে নামের ধ্বনিতে ধরা শান্তি রসে ভেসে যায়, যে নামের ধ্বনিতে সাড়া পোড়ে গেছে, যে নামে ছুটে ছুটে সব আস্‌ছে, যে নামে মানুষ তুমি হোয়ে যাচ্ছে, যে নামে কৃপা কৃপা কৃপাই ঝোর্‌ছে, এস আবার

সেই নামের সার্থকতা কর। জয় রামকৃষ্ণ ব্রহ্ম বল। যে নামে জীব শীব হয়, যে নামে মাটি সোনা হয়, যে নামে পাপ পুণ্য হয়, যে নামে বিষ অমৃত হয়, বল রামকৃষ্ণ বল। বল নাম বল। আনন্দ আনন্দ চিত্তপ্রসন্নতা ধন্য ধন্য অমৃত মধুর সব সন্তোষ পরিপূর্ণ রামকৃষ্ণ বল। ভালবাসা কে দিলে নাথ? এত ভালবাসা এল কোথা থেকে? ঠাকুর আমি কই? আমি তোমার সমাধি মন্দির হোয়ে যাব। তোমার সমাধি মন্দিরত নূতন হোল না এ শ্রীগুরুপূর্ণিমা এ দিনে কি মিথ্যা মিথ্যা সাড়া উঠবে? এ লেখনী মুখে যে তোমার নাম, এযে তোমার সব, তোমার নামের জয় কর। ভক্তকিঙ্করী অনুকণা ধুলা ধুলা পথের ধুলা, আজ নাম নিয়েছে যে। নামের জয় হউক। প্রাণের ঠাকুর লক্ষ্মী ঠাকুর, সোনার ঠাকুর, প্রেমের ঠাকুর, তুমি আমার কে? তুমি আমার ব্রজরতন, তুমি আমার প্রাণের আনন্দ, জীবন মনের শান্তি, তোমাতে ডুবে যাব। ছুটো ছুটো আর ভাল না। সাজছে নাক, ভুল হোয়ে যাচ্ছে, নাম যে, নামনিয়েছি যে, নাম যে মিথ্যে মিথ্যে হবে। শক্তি, ভক্তি কিছু নেই ঠাকুর মান দর্প কিছু নেই নাথ, আর কিছু নেই এবার আর বোল্‌বেনাত? এ জগতে আর সাজবেনা নাথ, নাম নাম নাম যে মিথ্যে হবে। এস ঠাকুর ডুবিয়ে নাও। ভাই তুমি, বন্ধু তুমি, বর তুমি। বিয়ের বর তুমি। শ্রীগুরুপূর্ণিমার দিন তোমার রামকৃষ্ণ ভোগ আম গাছ থেকে "কালজাম" ফেলে দিলে খেয়েছিলাম, লিখতে লিখতে খেয়েছিলাম, প্রাণ জুড়িয়ে গেছলো। আবার শ্রীগুরুপূর্ণমাতে কি দেবে? দেবেনাক? হবেনাক? প্রাণের বন্ধু দিতে হবে নাক, নিতে হবে। নিতেই হবে, বিশ্বে নাম দাও, নামের নব নব মহিমা বাড়িয়ে দাও। আর আমার ভগ্ন মন্দির সমাধি মন্দির কর। তোমার পায়ে পড়ি ঠাকুর, তোমার নামের জয়ধ্বনি তুলে অপূর্ব্ব কৃপা—কৃপা—কৃপাই দেখাও। সব চুকিয়ে দাও। সব ঘুচে আমি ডুবে যাই, সে কি? জানিনাত। আর রূপ নয় ত ঠাকুর রূপ রূপ কোরে পাগল হোয়েত আমি শান্তি পেলামনা, ক্ষেপে গেলুম, ভুল হোয়ে যাচ্ছে, দাও চোখ বুজিয়ে দাও, দেহ জড় কোরে দাও, তুমি তুমি তুমি তোমার। জানিনা ঠাকুর বুঝতে পাচ্ছিনা বোল্‌তে পাচ্ছিনা, থাক্‌তে পাচ্ছিনা যা হয় কর। তোমার নামের জয় হউক নাম চিরজয়ী, সেই নাম নিয়েছি যে। ঠাকুর জীব জগৎ জমাট কোরে প্রাণের মধ্যে পুরেছি, এখন এস, দুটী দুটী নয় এক

তুমি, তোমাতে লুকুয়ে থাক্‌বো, তোমার সঙ্গে আর ছাড়াছাড়ি ক'রো না বড় কষ্ট হোয়েছে, বড় লেগেছে, বড় কষ্ট ঠাকুর, আমার ঠাকুর, সবার ঠাকুর এস দয়াল নামের পরিচয়ে জুড়িয়ে দাও। সব ঘুচে যাক আমার। আমি নেই হোয়ে যাই। এস এস নাও ঠাকুর পূর্ণব্রহ্ম অমৃত শীতল সিন্ধু আনন্দে আনন্দে ডুবিয়ে নাও। ধরার মঙ্গল হউক, নামের জয় হউক। শান্তি শান্তি শান্তি।

"ভক্তকিঙ্করী।"

কবে দিবে দিন!

(১)

কবে হবে সে দিন আমার!
তোমারে করিব সার তুচ্ছ হবে এ সংসার,
দেহ সুখ মায়া মোহ নাহি রবে আর।
তব প্রেমে পূর্ণহৃদি রবে অনিবার॥

(২)

কবে হবে সে দিন আমর!
তব নামে মত্ত রব, দিবানিশি গুণ গাব,
হাসিব কাঁদিব—নামে ব'বে অশ্রুধার।
রসনা সতত লবে নামসুধা তার॥

(৩)

দিবে কি সে দিন দয়াময়!
তব ও রূপমাধুরী, এ মম নয়নে হেরি,
চরণে লুটায়ে পড়ি ধরিব হিয়ায়।
শীতল করিব প্রাণ, জুড়াব জ্বালায়॥

(৪)

দিবে কি সে দিন দয়াময়!
তোমাতে মগন রব, আর সব ভুলে যাব,-

যে দিকে ফিরাই আঁখি দেখিব তোমায়।
বিশ্বনাথ! বিশ্বরূপ দেখাবে আমায়॥

(৫)

হবে নাকি দীনে কৃপা লেশ!
ওহে দেব কৃপাসিন্ধু, এ দীনে করুণা-বিন্দু,
দিবে নাকি কৃপাধার দীন-পরমেশ!
অমৃত প্রদানি কর গরল নিঃশেষ॥

(৬)

হবে নাকি দীনে কৃপা লেশ!
ওহে অনাথের নাথ, আমি যে অতি অনাথ,
আছি তব মুখ চেয়ে হে দেব দেবেশ!
নেহার কাতরচিত, হৃদি অনিমেষ॥

(৭)

চাহ দেব চাহ একবার!
মম যত অপরাধ, ক্ষম দেব, ক্ষম নাথ,
দূরে দাও অবসাদ, ওহে ক্ষমাধার!
করুণা করিতে হেন নাহি পাবে আর॥

(৮)

চাহ দেব চাহ একবার!
সহিয়ে সংসার জ্বালা, মন প্রাণ ঝালাফালা,
ত্রিতাপদহনে সব পুড়ে হ'ল ছার।
প্রেমধারা ঢালি দেব, সিঞ্চ একবার॥

(৯)

হই নাকো যত দীন হীন,
তবুত তোমার আমি, তুমি যে হৃদয়স্বামী,
কর তব অনুগামী, আমি কৃপাধীন।
টেনে লও তব কাছে, পদে কর লীন॥

(১০)

হই নাকো যত দীন হীন!
দিতে হবে পদে ঠাঁই, আর মোর কেহ নাই,
তোমাধনে চিনি নাই হায় এতদিন।
এস হে 'আমার তুমি' এস প্রেমাধীন॥

(১১)

ধর নাথ, ধর মম হাত,
লয়ে চল ইচ্ছা যথা, না কহিব কোনো কথা,
সাধ মম তুমি সদা রবে সাথে সাথ।
আর সব সাধে নাথ, করাও বিস্বাদ॥

(১২)

'তুমি নাথ, তুমি হে আমার'—
গাহিয়ে এ মধুগাথা, দূরে যাবে হৃদিব্যথা,
কবে দিবে দীননাথ সেদিন আমার।
কর দেব—"আমি তব, তুমি হে আমার॥"

সেবক শ্রীবিজয়নাথ মজুমদার।

গুরু-শিষ্য কথোপকথন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৬১ পৃষ্ঠার পর)

গুরু। সাধনা ব্যতিরেকে কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় না। অর্থ উপার্জ্জনও সাধনা সাপেক্ষ। সাধনা করিলে তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী, তবে যথোচিত সাধনা না করা নিমিত্ত আমরা অনেক সময়ে আশানুরূপ ফল পাই না। এমন কি এ জীবনেও হয় ত সেইরূপ ফল পাইলাম না, তাহা বলিয়া যে কখনও পাইব না, তাহা নহে। এ জীবনের সাধনার ফল যদি এ জীবনে না পাই, তাহা হইলে পর জনমে নিশ্চয়ই পাইব। সুতরাং যাহাদিগকে দেখিতেছ দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়াও অভিলষিত অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেছ না—বুঝিতে হইবে তাহাদিগের পূর্ব্বের সেরূপ সাধনা নাই বলিয়াই এ জীবনে আশানুরূপ ফল

পাইতেছে না, কিন্তু এ জীবনের পরিশ্রমের ফল যে নিশ্চয়ই পাইবে হয়ত এই জীবনেই পাইবে, নচেৎ পর জীবনে নিশ্চয়ই পাইবে। আর যাহাদিগকে দেখিতেছ বিনা পরিশ্রমে বা স্বল্প পরিশ্রমে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছে—বুঝিতে হইবে তাহাদিগের জন্মজন্মান্তরীণ সাধনা বা সুকৃতির ফলেই ঐরূপ হইয়াছে। ইহাতে ঈশ্বরের কোন পক্ষপাতিত্ব নাই। তিনি পরম দয়াময় এবং আমাদের সকলকে সমান স্নেহের চক্ষে দেখেন। যখন দেখিতে পাওয়া যায় জীব জন্মাইবার পূর্ব্বে তাহার প্রাণ ধারণের নিমিত্ত মাতৃ স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার হয়, তখন বেশ বুঝিতে পারা যায় যে তিনি আমাদের প্রাণ ধারণোপযোগী আহার সর্ব্বদাই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন এবং ক্ষণেক চিন্তা করিয়া দেখ—দেখিতে পাইবে যে আমাদের যথার্থ অভাব অতি অল্প এবং তাহা অতি সহজে মোচন হয়। কেবল ভোগ, বিলাসিতা ও মান সম্ভ্রম রক্ষার্থ আমরা সদা সর্ব্বদা অভাব বিবেচনা করি।

শিষ্য। প্রভু, এক্ষণে আপনার কৃপায় আমার সন্দেহ দূরীভূত হইল।

গুরু। আর ঐ যে তুমি বলিলে "অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া লোকে আনন্দে দিন যাপন করে"—এইটী তোমার ভুল ধারণা। অর্থের দ্বারা আনন্দ লাভ হয় না, সুখ হয়—

শিষ্য। সুখ এবং আনন্দের প্রভেদ কি, আমায় অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

গুরু। অভিলষিত বস্তু প্রাপ্তির নাম সুখ। সুখ মায়া কল্পনা, আনন্দ নিত্য ও সত্য বস্তু। সুখ নিজের জন্য ব্যস্ত—আনন্দ অপরের জন্য লালায়িত। সুখ দুঃখরাশীকে দেখে ভীত হয়। আনন্দ দুঃখরাশীকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া সদানন্দে থাকে। সুখ স্বার্থপর, আনন্দ নিঃস্বার্থের এক নিখুঁত চিত্র। সুখের পর দুঃখ আসে কিন্তু আনন্দ নিরবচ্ছিন্নই আনন্দ; আনন্দের পর আর অবসাদ নাই। এক কথায় সচ্চিদানন্দই একমাত্র আনন্দ।

শিষ্য। এ আনন্দ পাইতে হইলে কি করিতে হয়?

গুরু। ভগবদারাধনাই একমাত্র উপায়।

শিষ্য। এখন বুঝিতে পারিলাম যে অর্থ দ্বারা আনন্দ লাভ হয় না।

গুরু। কিছুতেই নয়—অধিকন্তু কাঞ্চন একটী প্রধান মায়ার বস্তু। ইহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া জীব হিতাহিত জ্ঞান লুপ্ত হয়। জগতে এমন কোন

অন্যায় কর্ম নাই যাহা অর্থলোলুপ ব্যক্তি করিতে পারে না; তবে অর্থের দ্বারা আমাদের বাসনার কতকটা পুরণ হইতে পারে—কিন্তু ভোগীদের মনে শান্তি নাই।

শিষ্য। কেন?

গুরু। যেমন অগ্নিতে ঘৃত নিক্ষেপ করিলে অগ্নি নির্ব্বাপিত না হইয়া বরং অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হয়, সেইরূপ বাসনাগ্নিতে ভোগরূপ ঘৃত প্রদান করিলে তদ্রূপ হয়। ভোগের দ্বারা বাসনার ক্ষয় হয় না, বরং বৃদ্ধি হয়।

শিষ্য। তবে অনেকে বলেন যে, ভোগের দ্বারা বাসনার ক্ষয় হয়।

গুরু। আমি ও কথা সমর্থন করি না তবে বিচারের সহিত ভোগ করিলে বাসনার ক্ষয় হয়, কিন্তু আমরা অধিকাংশ স্থলে ভোগের পরিবর্ত্তে উপভোগ করি সুতরাং ভোগেচ্ছা হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি হয়।

শিষ্য। "বিচারের সহিত ভোগ করা" কিরূপ, তাহা আমায় একটী উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিউন।

গুরু। মনে কর কোন একজন ব্যক্তি প্রত্যহ বেশ্যালয়ে গমন করে। নানারূপ বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও সে সেই কু অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারে না। কিন্তু হঠাৎ একদিন তাহার মনে এই চিন্তা উদয় হইল, কেন আমি প্রত্যহ বেশ্যালয়ে গমন করি এবং কেনই বা এই অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। প্রথমে সে ভাবিল, সে রূপের মোহে পতিত হইয়াই প্রত্যহ যায়—অমনি তাহার বিবেক বলিল, "রূপ কিছুই নয়—তুমি যাহাকে রূপ বলিতেছ ও রূপই নয়—ঈশ্বর ভিন্ন জগতে রূপবান আর কেহই নয়। আর যদি তোমার ঐ মুখখানি এত সুন্দর বলিয়া বোধ হইয়া থাকে তাহা হইলে তুমি বড় ভ্রমে পড়িয়াছ, কারণ উহা অতি ক্ষণস্থায়ী। যে রূপ দেখিয়া তুমি আজ উন্মত্ত হইয়াছ, কাল উহা উৎকট কুষ্ঠ বা বসন্ত রোগে এমনি কদাকার হইতে পারে যে তুমি তাহা দেখিয়া মুখ বিকৃত করিবে; এবং যদি তুমি নিদ্রিতাবস্থায় ঐ মুখ অবলোকন কর দেখিতে পাইবে উহা হইতে কত দুর্গন্ধময় লালা নিঃসরণ হয়—তাহা দেখিয়া কি তোমার ঐ অধরে অধর সংযোগ করিতে ইচ্ছা হয়! তাহার পর যে উন্নত পয়োধর দেখিয়া তুমি মুগ্ধ হইয়াছ, উহা একটী মাংসপিণ্ড ভিন্ন আর কিছুই নহে। তুমি কি

খানিকটা মাংসপিণ্ড লইয়া আনন্দ উপভোগ করিতে পার? আর তুমি একবার তোমার শৈশবের কথা মনে করিয়া দেখদিকি—যখন তুমি ভূমিষ্ঠ হইলে, কিসে তোমার প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল? ঐ স্তন না থাকিলে তুমি বাঁচিতে পারিতে না, আর আজ তুমি ঐ স্তন আনন্দ উপভোগের একটী প্রধান বস্তু মনে করিয়াছ? ইহাই কি মনুষ্যোচিত কর্ম্ম!! আর রমণীতে কি এথন সৌন্দর্য্য আছে—যাহাতে তুমি আকৃষ্ট হইয়াছ? প্রথমে রমণী কি—তাহা চিন্তা কর। উহা একটী হাড়ের খাঁচা বই ত নয়! খালি উপরে রক্তমাংস বিজড়িত, ক্ষণস্থায়ী ও মলমূত্র পরিপূর্ণ। তুমি মলমূত্র দেখিলে নাসিকা কুঞ্চিত কর, তোমার বমনোদ্গীরণ হইবার উদ্রেক হয়, আর তুমি সেই মল-মূত্রের দ্বারের নিমিত্ত এত লালায়িত!! ছি ছি, ক্ষণিক সুখের জন্য তুমি তোমার অমূল্য জীবন বিনাশ করিতেছ ও নানাবিধ কুৎসিৎ রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে যাইতেছ!" এই সমস্ত চিন্তা ও বিচার তাহার মনে উদ্রেক হইবামাত্র তাহার মোহ ভঙ্গ হইল এবং সে তখন ভাবিল, "আমি কি মোহে পতিত হইয়াছিলাম এবং এই ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন করিতে যাইতেছিলাম! আমি আর এই অনিত্য বস্তুতে মুগ্ধ হইব না, এখন হইতে নিত্য ও সত্য বস্তুর আরাধনা করিব। যে রমণীর এমন সামান্য রূপ দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম, সেই রমণীকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন আমি তাঁহার অনুসন্ধান করিব—না জানি তিনি কত রূপবান্ যাঁহার সৃজিত পদার্থ আমার নিকট এত সুন্দর লাগিয়া-ছিল!!" এই সমস্ত সৎ চিন্তা তাহার মনকে অধিকার করিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ বেশ্যালয়-গমন পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্য বস্তুর আরাধনা করিতে লাগিল। এখন বুঝিতে পারিলে, বিচারের সহিত ভোগ করিলে কিরূপে আসক্তির ক্ষয় হয়?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। ভোগীদের মনে শান্তি নাই কেন? যদি অর্থ থাকে তাহার দ্বারা বাসনার পূরণ হইতে পারে ত।

গুরু। ভোগীদের মনে তিলমাত্র শান্তি নাই। তাহারা ভোগের পরিবর্ত্তে প্রায়ই উপভোগ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিচার না করায়, বাসনার ক্ষয় না হইয়া বরং ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে। অর্থের দ্বারা বাসনার কতকটা পূরণ হইতে পারে, কিন্তু সব কামনা পূরণ হয় না এবং কামনা পূরণ না হইলেই

ক্রোধ উপস্থিত হয়। ক্রোধে আত্মহারা হইয়া লোকে অতি গর্হিত কর্ম্ম করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। তাহার পর ক্রোধ উপশম হইলে মনে অনুতাপ হয়, এমন কি হৃদয়ে এমন একটী কালিমাও পড়িতে পারে যাহার চিহ্ন সারা জীবনেও লুপ্ত হয় না। আর অর্থই সমস্ত অনর্থের মূল। অর্থ দেখিতে যেমন গোল, কাছে থাকিলে বাধায়ও তেমনি গোল। আর অর্থহীনের ভোগেচ্ছা প্রবল হইলে তাহার অশান্তির সীমা নাই। কামনা পূর্ণিত না হইলেই মনে নানাবিধ দুঃখ উপস্থিত হয় এবং কখনও কখনও বাসনার তাড়নায় মানব হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ও মনুষ্যত্ব-বিহীন হইয়া চিরজীবন অশান্তি ভোগ করিতে থাকে।

শিষ্য। যদি ভোগে সুখ নাই তবে সুখ কিসে?

গুরু। ত্যাগেই মহা সুখ। ভোগের চরম না হইলে ত্যাগ হয় না। ত্যাগীর মন সর্ব্বদাই শান্তিতে পূর্ণ। দুঃখ যে কি পদার্থ তাহা সে জানে না।

শিষ্য। "ভোগের চরম না হইলে ত্যাগ আসে না"—ইহা আমায় ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন।

গুরু। মনে কর,—আমি অর্থ চাহি না, অর্থের উপর আমার কোন আসক্তি নাই। তখন বুঝিতে হইবে, অর্থ দ্বারা যে যে সুখ হইতে পারে, তাহা আমি সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছি এবং অর্থের দ্বারা যে যে অনর্থ ঘটিয়া থাকে, তাহাও বিচার করিয়া দেখিয়াছি। যখন দেখিলাম, অর্থ দ্বারা সুখাপেক্ষা ক্লেশই বেশী অনুভব করিতে হয় এবং উহা ভগবৎ-প্রাপ্তির একটী প্রধান অন্তরায়, তখন আমি অর্থ ত্যাগ করিলাম। অতএব যখনই দেখি যে, কোন লোক একটী বস্তু ত্যাগ করিয়াছে, তখনই বুঝিতে হইবে যে, বস্তুটীর গুণাগুণ সেই ব্যক্তি বিশেষ বিচারের সহিত সম্ভোগ করিয়াছে।

শিষ্য। প্রভু! আজ আপনাকে আমি অত্যন্ত বিরক্ত করিতেছি, আপনার কত ক্লেশ হইতেছে!

গুরু। না বৎস্য, এ সমস্ত আলোচনায় তিলমাত্র ক্লেশ অনুভব হয় না, বরং মনে অপার আনন্দ হয়। এখনও সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব আছে, যদি তোমার আরও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে, তুমি অনায়াসে ব্যক্ত করিতে পার।

শিষ্য। প্রভু! আমার মনে আর একটী সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।

গুরু। তুমি কোনরূপ সঙ্কোচ বোধ না করিয়া সন্দেহের কারণ ব্যক্ত কর। আমি সাধ্যমত যথাযথ উত্তর প্রদানে তোমার সে সন্দেহ দূরীভূত করিব।

শিষ্য। প্রভু, আপনি বলেন ঈশ্বর মঙ্গলময়—তিনি যাহা করেন সমস্তই জীবের মঙ্গলের জন্য—আমি ইহা ভাল বুঝিতে পারি না এবং সময়ে সময়ে আমার এ বিষয়ে সন্দেহ হয়।

গুরু। কেন? সন্দেহ হইবার ত কোন কারণ নাই।

শিষ্য। কল্য যখনই আমি নগর-ভ্রমণে গিয়াছিলাম, দেখিলাম একটী বৃদ্ধার একমাত্র পুত্র-সন্তানের মৃত্যু হইয়াছে। অনুসন্ধানে জানিলাম যে, ঐ পুত্রটী উপার্জ্জন করিয়া যাহা পাইত, তাহাতেই মাতার এবং পুত্রের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। বৃদ্ধা একজন সচ্চরিত্রা স্ত্রীলোক এবং অধিকাংশ সময়েই ঈশ্বরারাধনায় যাপন করে, তাহা আমি দেখিয়াছি ও ভাল রকম জানি। সে নিশ্চিন্তমনে ভগবদারাধনা করিতেছিল, এক্ষণে তাহাকে উদরান্নের জন্য বিশেষ চিন্তিত হইতে হইবে এবং এই নিদারুণ পুত্র-শোকে নিশ্চয়ই তাহার ভগবদারাধনার ব্যাঘাত ঘটিবে। ভগবান্ বৃদ্ধার কি মঙ্গলের জন্য তাহার একমাত্র উপায়ক্ষম পুত্রের প্রাণ বিনাশ করিলেন—ইহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ।

মানবের শ্রেষ্ঠত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১২২ পৃষ্ঠার পর)

অভ্যাসকে কেমন করিয়া সংযত করিয়া উদ্দেশ্য সাধন করা যায়?—অভ্যাস খুব ইচ্ছা শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মানসিক অর্দ্ধ-জাগরণ অবস্থায় যে প্রকার কার্য্য হইয়া থাকে, তদ্রূপ ইহার কার্য্যও চলিয়া থাকে। মানবের মস্তিষ্কে এক প্রকার দীপক দ্রব্য (Phosphores) আছে। ইহাতেই উত্তেজনার উৎপত্তি। যতই ইহা সূক্ষ্ম হয়, ততই ইহার স্পন্দন শক্তি বর্দ্ধিত হয়। ইহা নিয়তই গমনশীল ও সর্ব্বদাই স্পন্দিত হয়।

অভ্যাসও এক প্রকার চলনশক্তি। ইহাও স্পন্দনের আকৃতি বিশেষ। ইচ্ছার কার্য্যকারী শক্তি প্রকৃতির শক্তির ন্যায়। মানব যখন কোন বিষয়ে মন নিরুদ্ধ করিয়া চিন্তা করিতে থাকে, তখন মস্তিষ্কে এক প্রকার আবর্ত্ত সৃষ্ট হয়। এই আবর্ত্তে ইচ্ছাশক্তির তরঙ্গ আসিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়। ইচ্ছাশক্তি যতই শক্তিশালী হইবে, ততই তরঙ্গরাশী দীর্ঘকাল স্থায়ী ও বিশেষ কার্য্যকারী হইবে। মানব চরিত্রে অভ্যাস বিশেষ সংযোগশীল। ইহার বিশেষ কোন কারণ বর্ত্তমান নাই। ইচ্ছাশক্তির অভাবই ইহার প্রধান কারণ। মানবের প্রবল ইচ্ছাশক্তি তাহাকে এই বন্ধন হইতে মুক্তিদান করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। তোমারই চিন্তাস্রোত আবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়া থাকে, তোমারই কার্য্য ইহার তরঙ্গ প্রবল করিয়া থাকে। তুমি তোমার বর্ত্তমান আদর্শানুযায়ী চিন্তা ও কার্য্যের দ্বারা তোমার অতীত কুঅভ্যাসকে দূরীভুত করিতে প্রবৃত্ত হও। তোমার মন তোমার আদর্শানুযায়ী গঠিত হইয়া উঠিবে।

The great American Experimentor Professor Elener Gates of Chevy Chases—তাঁহার নানাবিধ যন্ত্রাদির দ্বারা প্রমাণ করিতেছেন যে, মস্তিষ্ক ও মনকে অবনতির হস্ত হইতে উদ্ধার পূর্ব্বক সম্যক উন্নতি করা সম্ভব। কুচিন্তা ও কুপ্রবৃত্তি মস্তিষ্কের সঙ্কীর্ণ প্রকোষে ও শরীরে বিষাক্ত রসায়ানিক ক্রীড়া উৎপাদন করে এবং অতিরিক্ত পবিত্র চিন্তা ও সৎ-প্রবৃত্তির দ্বারা ও তাহা সতত জাগরিত রাখিয়া এই প্রক্রিয়া উপশম করা সম্ভব। মন শরীরকে চালিত করিয়া থাকে। শারিরীক, মানসিক ও ভাবপ্রবণ অবস্থার পরিবর্ত্তন সম্ভব। অর্দ্ধবিকশিত মনে প্রকৃত আকাঙ্খিত দ্রব্যের প্রস্ফুটিত মূর্ত্তির সংস্থাপন পূর্ব্বক ইচ্ছাশক্তির দ্বারা জাগরিত করিয়া তুলিতে হইবে। মনই সর্ব্বস্ব, মনই প্রতিষ্ঠাতা।

The tool of thought and, Shaping what he wills
Brings forth a thousand joys, a thousand ills;
He thinks in secret and it comes to pass
Environment is but his looking-glass,

Lord Budha, 'The Dharmapad.

অভ্যাস সংযত করিতে হইলে স্থিরসিদ্ধান্ত ও তদ্রূপ কার্য্য করিতে হইবে। যদি তুমি নীরোগ হইতে চাও,—নীরবে, নির্জ্জনে, একাগ্রতাসহ, হৃদয়-কন্দরে,

শরীরের প্রতিলোমকূপে অনুভব কর, উপলব্ধি কর, "আমি নীরোগ, আমার শরীরে রোগের স্থান নাই, আমি কখনও তাহাদিগকে স্থান দিব না। আমিই স্বাস্থ্যের ভ্রান্তমূর্ত্তি, আমিই প্রকৃত স্বাস্থ্যবান পুরুষ। বারংবার ইহার পুনরাবৃত্তি করিতে থাক। অবহেলার সহিত করিলে চলিবে না। ইহাতে সম্পূর্ণ একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও আত্মনিয়োগ আবশ্যক। হৃদয়ে প্রকৃত মনুষ্যত্বের তেজ ও উদ্যম লইয়া বলিতে থাক, "আমি নিশ্চয়ই জয়ী হইব,—এখনই, সুদূর ভবিষ্যতে নহে, এই মুহূর্ত্তেই। ধীর, শান্ত মূর্ত্তিতে উপবেশন কর ও বাহ্য জগতের সমস্ত কোলাহল হইতে মনকে সরাইয়া লও। ক্রমশঃ সমস্ত মন পবিত্রতার আবরণে ঢাকিয়া ফেল। শরীরের সমস্ত অংশ শিথীল করিয়া দাও। ধীরে ধীরে গভীর শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত তোমার আদর্শকে অনুভব করিতে থাক ও তাহাতেই নিমগ্ন হইয়া যাও। কোনও প্রকার শারীরিক চঞ্চলতা প্রকাশ করিও না। শরীরকে নীরবে শান্তিতে স্থাপন কর। দন্ত নিচে ধীর ভাবে সংলগ্ন রাখ, কভু পেষণ করিওনা। চক্ষু নিমিলিতপূর্ব্বক ধীরে ধীরে এই বাক্যগুলি উচ্চারণ করিয়া আদর্শকে উপলব্ধি কর।

প্রথম পদবিক্ষেপে নানাবিধ বাধা প্রাপ্ত হইবে। পদে পদে ত্রুটী ঘটিবে। হতাশ হইবার কারণ নাই। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও হৃদয় অদমনীয় হইলে শত বাধা-বিঘ্ন তাহাকে দাসত্ব করিতে সক্ষম হইবে না। অবশেষে সফলতা লাভ করিবেই করিবে। হয়ত প্রথম আরম্ভই তোমার কষ্টকর হইবে, কিন্তু হাল ছাড়িলে চলিবে না। যাহাতে দৈনিক দুইবার করিয়া ইহা অভ্যাস করিতে পার সে নিমিত্ত প্রাণপণ যত্ন করা কর্ত্তব্য। যদি হৃদয়ে উচ্চাশা থাকে, জীবনকে স্বার্থক করিবার অভিলাষ থাকে, প্রারম্ভে ব্যর্থমনোরথ হইয়া হতাশ হইও না। ধীরে, অতি ধীরে অগ্রসর হও, সফলতা সজীব মূর্ত্তিতে তোমাতে প্রকাশ

পাইবে। 'ভাবের ঘরে চুরি করিও না।' আপনাকে আপনি প্রবঞ্চিত করিও না। তাহা হইলে দুর্ব্বল-হৃদয় চিরদিন শুধু আকাশকুসুমেরই সৃজন করিবে। কভু সম্ভবে পরিণত করিতে সক্ষম হইবে না। আদর্শ করায়ত্ব করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও ও তদ্রূপ কার্য্য কর। কুচিন্তা ও কুপ্রবৃত্তির বিসর্জ্জনে দৃঢ়সংকল্প হইয়া সৎ চিন্তা ও সৎ প্রবৃত্তির দ্বারা হৃদয় পরিপূর্ণ করিতে সচেষ্ট হও। মনে রাখিও, যতটা ইচ্ছাশক্তির দ্বারা তোমার চিন্তারাশি পরিচালিত হইবে, ততই ইহার স্থায়িত্ব ও কার্য্যকারিত্ব বর্দ্ধিত হইবে। ঘন ঘন পুনরাবৃত্তিতে ইহাও পুনরায় দ্বিতীয় অভ্যাসে পরিণত হইবে। তোমার প্রাণপণ যত্ন ও পরিশ্রম স্বার্থক হইবে। তুমি চিরশান্তির অধিকারী হইবে।

যে সমস্ত উন্নত প্রবৃত্তিকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাও, তাহার প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত কর। ধীরে ধীরে মস্তিষ্কে ইহা আপন স্থান অধিকার করিয়া লইবে। যদিও প্রথমে পূর্ব সংস্কার বশতঃ কুপ্রবৃত্তিনিচয় পদে পদে বাধা প্রদান করিতে থাকিবে, কিন্তু যতই ইহা দৃঢ়রূপে নিজ স্থান অধিকার করিতে আরম্ভ করিবে, ততই কুপ্রবৃত্তির অধিকার শিথিল হইয়া আসিবে ও পরিশেষে তাহার আর মস্তক উত্তোলন করিবার শক্তিও থাকিবে না। চিরতরে দূরীভূত হইবে। অগ্রসর হও, নির্ভিক হৃদয়ে বিশ্বপিতার বিশ্ববিমোহন মূরতি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া নব মস্তিষ্কের সৃজন কর, পূর্ব্ব সংস্কার পদদলিত কর, মহাভাবের বিপুল তরঙ্গ আসিয়া নিকৃষ্ট রিপুনিচয়কে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। ইহা সময় ও সহিষ্ণুতা সাপেক্ষ। অধীর হইলে চলিবে না। ধীর ভাবে স্বকর্ত্তব্য সাধন করিতে হইবে। জীবনের ঘোর অন্ধকাররাশী দূরীভূত করিয়া প্রাতঃসূর্য্যের কণক কিরণে হৃদয় উদ্ভাসিত করিতে হইলে, ইহা তোমাকে সাধন করিতেই হইবে। বিশ্বাস চাই, অবিশ্বাসীর হৃদয় দিয়া কোন কার্য্য সম্পাদন করা যায় না। বিশ্বাসের দ্বারা জগতে অভাবনীয় ঘটনাও ঘটিয়া থাকে। হতাশ জীবনে বিশ্বাসই আনন্দ স্রোত বহাইয়া থাকে। উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য আমাদের করায়ত্ব সামান্য শক্তিরও প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। আমাদের উদ্যম, উৎসাহ যে সফলতা আনয়ন করিবে, এইটাই আমরা কল্পনায় আনিতে পারি না। আমাদের বিশেষ অসুবিধা যে, এ কার্য্যে আমরা ব্যর্থ মনোরথ হইব, ইহাই আমাদের মনে উদিত হয়।

কভু যে সফল হইব এ চিন্তা, এ ভাব আদৌ আসে না। চারিদিকের বিফলতার ক্রন্দনে আমরা আপনার হৃদয়ের উপর বিশ্বাস হারাইয়া বসি। আত্মশক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ আসিয়া পড়ে। আমরা কদাপি আমাদের প্রকৃত শক্তির বিষয় ভাবিয়া দেখি না। প্রকৃত শক্তির দ্বার কভু উদ্ঘাটন করিবার প্রয়াস পাই না। আমাদের প্রকৃত শক্তির সহিত তুলনায়, আমরা অন্ধ হইয়া বসিয়া আছি। এখনও যেন আমরা নিদ্রালস-নয়নে শয়নে নিমগ্ন,—অর্দ্ধ জাগরিত। আমাদের মোহ-তন্দ্রা দূর করিতে হইবে। অলসতা পরিহার করিতে হইবে, নিদ্রিত শক্তিকে জাগাইয়া কার্য্যকারী করিয়া তুলিতে হইবে। প্রবল উত্তেজনা, উৎসাহ, একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও আত্মবিশ্বাসের আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।

এইখানে আমার পরিচিত জনৈক শ্রদ্ধেয় সামীজি কি প্রকারে এক তরুণ চিকিৎসককে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেম, তাহার সম্বন্ধে দু একটী কথা প্রবন্ধের বিশেষ উপযোগী হইবে বলিয়া নিম্নে বিবৃত করা হইল:—এক তরুণ চিকিৎসক কয়েক সপ্তাহ যাবৎ নানাবিধ জটিল ব্যাধিতে প্রপীড়িত হইয়া আরোগ্য লাভে হতাশ হইয়া উঠিয়াছিল। সহ্য করিবার শক্তি তাহার ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া আসিতেছিল। আহারে বিন্দুমাত্রও প্রবৃত্তি ছিল না, নিদ্রায় নানা ব্যাঘাত ঘটিত—এমন কি উত্থান ও বাক্‌শক্তিরও সম্পূর্ণ হ্রাস হইয়াছিল। পূজ্যপাদ স্বামীজি তাহার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক তাহাকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাহার হৃদয়ে যতটা শক্তি আছে তাহার দ্বারা একবার বিশেষ করিয়া মন হইতে এই সমস্ত ব্যাধির চিন্তা দূর করা সম্পূর্ণ আবশ্যক। ইহাতেই যে সে ব্যাধি মুক্ত হইবে, যদিও তাহাকে সে বিশ্বাস করান শক্ত হইল, কিন্তু সে একবার প্রাণপণ যত্ন করিতে প্রতিশ্রুত হইল। তাহাকে কয়েক দিবস নানাবিধ আনন্দের মধ্যে রাখা হইল। যতই তাহার শক্তির বিকাশ হইতে লাগিল, ততই ধীরে ধীরে তাহার ব্যাধির উপশম হইতে লাগিল এবং অবশেষে তাহার আত্মশক্তি পূর্ণভাবে জাগরিত হইয়া পুনরায় তাহাকে সুস্থ ও সবল দেহ দান করিয়া মনুষ্য সমাজে প্রেরণ করিয়াছিল। ইহা যে তাহার শেষ প্রয়াসের নৈষ্ঠিক ও মানসিক একাগ্রতার সম্যক্ ফল, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

তুমি তোমার অভ্যাস দমন করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। প্রথমে বাধা পাইবে, কিন্তু পরিণামে জয় অবশ্যম্ভাবী। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও স্থিরসংকল্প প্রথম আবশ্যক ও তদনুযায়ী কার্য্য দ্বিতীয়। মানব-জীবনের প্রথম পঞ্চবিংশতি বৎসরেই নানাবিধ অভ্যাসের সৃজন হইয়া থাকে। ইহার পরও যে সমস্ত অভ্যাস থাকিয়া যায়, তাহা অনেকটা পরিমাণে দৃঢ়মূল হইয়া যায়। শৈশবেই দেহের পরিপুষ্ট হইতে থাকে ও মস্তিষ্কেরও পূর্ণ পরিণতি হয়। কোন একটা নরম পদার্থের উপর নানাবিধ দাগ অঙ্কিত করাও যেমন সহজসাধ্য, তাহাকে মুছিয়া ফেলাও তদ্রূপ। কিন্তু যখন তাহা শুকাইয়া কঠিন হয়, তখন যেমন তাহাতে পূর্ব্বাঙ্কিত দাগ মুছাইয়া দেওয়া কষ্টকর, তদ্রূপ নূতন দাগ অঙ্কিত করাও কঠিন হইয়া পড়ে। অসম্ভব নয়। হতাশার কোন কারণ নাই। তোমার হৃদয়ের আন্তরিক চেষ্টা ও যত্ন জীবনের যে কোন অবস্থায় অভ্যাসকে সংযত করিতে ও নব ভাবে গঠিত করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। প্রথম জীবনে ইহা অতীব সহজসাধ্য—কিন্তু অবশেষে ইহা একটু কষ্টকর হইয়া উঠে। বালক বা যুবক বা যে কোন অবস্থায় হউক না কেন, তোমাকে ইহা করিতেই হইবে। তোমাকে বাধ্য হইয়া করিতে হইবে না, তোমার কর্ত্তব্য-বুদ্ধিই তোমাকে ইহা সম্পাদন করাইয়া লইবে! তুমি না করিয়া শান্তি পাইবে না, কারণ ইহাই তোমার প্রবৃত্তি।

প্রথম প্রথম বাধা বিঘ্ন একটু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হৃদয় ও মানসিক শক্তি আবশ্যক করে। ক্রমশঃ ইহা সহজসাধ্য ও আনন্দদায়ক হইয়া উঠে। যদি তুমি এক দিবস আগ্রহ সহকারে অগ্রসর হও ও সেই ভাবকে জাগরিত করিয়া রাখ, তাহা হইলে কদাপি ব্যর্থ-মনোরথ হইবে না। আত্মশক্তিতে আস্থা-যুক্ত হও, হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস আনয়ন কর। তোমার প্রকৃতি তোমার সহায় হইবে, বিশ্বপিতার করুণা তোমার উপর বর্ষিত হইবে, তোমার জীবন ধন্য হইবে।

মানবের জীবনে যাহা নিয়ত ঘটিয়া থাকে, যে সমস্ত বাধা বিঘ্ন আমাদের জীবনকে চিরান্ধকারে নিমগ্ন করে—এ প্রবন্ধে সেই বিষয়েরই অবতারণা করা হইয়াছে। আমি আমার আপনার জীবনের পথে যে সমস্ত অসুবিধা, বিপদ পাইয়াছি ও যে উপায়ে তাহা হইতে মুক্ত হইতে সচেষ্ট হইয়াছি, তাহাই এই প্রবন্ধে বিবৃত করা হইয়াছে। আপনার জীবনের স্রোত ও চতুর্দ্দিকের

কার্য্যকলাপ ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিলে, বর্ত্তমান জড়বাদের বিষম কুফল দেখিয়া হৃদয় স্বতঃই বিষাদে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। যদি কেহ ইহা হইতে বিন্দুমাত্রও উপকার প্রাপ্ত হন, যদি কাহারও হৃদয়-বীণায় বিন্দুমাত্রও আঘাত করে, তাহা হইলেই অধমের সেই প্রয়াস সার্থক হইবে। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, সনাতন ভারতের যোগ-পদ্ধতি আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল-চিত্ত ও অন্ধকারা-চ্ছন্ন মানবের পক্ষে বাতুলের প্রলাপ। ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবই আমাদের একমাত্র আশা ও ভরসা। তিনিই আমাদের সর্ব্বস্ব। কলুষিত হৃদয়ে তাঁর দ্বারে যাইলে চলিবে না। তাঁকে কলুষিত হৃদয়ের সিংহাসনে কোন্ সাহসে বসাইবে? পবিত্র নির্ম্মল হৃদয়ে তাঁর সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সতত: তাঁহাকে হৃদয়ে রাখিয়া, তাঁহারই বন্দনাপূর্ব্বক ধীরভাবে অগ্রসর হও, সত্যের আলোকে হৃদয় উদ্ভাসিত হইবে, ভক্তের দুন্দুভি বাজিয়া উঠিবে, তোমার আত্মশক্তি জাগিবেই জাগিবে। আপনার জন্মসত্ত তুমি কখনই হারাইতে পার না। ওঁ শান্তি।

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র বিশ্বাস।

—:*:—

পরমার্থ ব্যাখ্যানমালা।

(গত বর্ষের ২৬৪ পৃষ্ঠার পর)

তৃতীয় অধ্যায়।

শমদমাদি ষট্ সম্পত্তি।

এক্ষণে পরমার্থ লাভের তৃতীয় সাধন ষট্ সম্পত্তির বিষয় আলোচনা করা যাউক। ইহার ছয়টি অঙ্গ—শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা ও সমাধান। এই সমস্তই মুমুক্ষুর পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়, সুতরাং ইহাদের লক্ষণ বিচার করা আবশ্যক। বিচারশীল নবীন সাধক মাত্রেই কিন্তু প্রথমেই এক আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন। এ প্রকার আপত্তির বিষয় আমরা পূর্ব্বে সামান্য ভাবে উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া আমরা পুনরায় ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। তাঁহারা হয় ত বলিবেন যে, "আমাদের যখন

ব্রহ্মজ্ঞান লাভই মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন বিবেক বৈরাগ্য ও শমদমাদি সাধনের মহত্ব বর্ণনার প্রয়োজন কি? জগতের যে কোনও বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান ত দুই প্রকারে হইতে পারে; এক তাহার সম্বন্ধে ইন্দ্রিয় সহায়তায় প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা যায়, কিম্বা যদি সেই বস্তুর জ্ঞান ইন্দ্রিয় সাহায্যে লাভ করা অসাধ্য হয়, তবে যাঁহারা সে বিষয় অবগত আছেন তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া বা তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থ পাঠ করিয়া তদ্বিষয়ে জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ সমস্ত উপায় ত্যাগ করিয়া মুমুক্ষুগণ বিবেক বৈরাগ্যাদি সাধনের জন্য ব্যস্ত হইবেন কেন?

ইহার উত্তর এই যে, বেদশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন দ্বারা সমস্ত বিষয়ে পরোক্ষ জ্ঞান অবশ্য লাভ করা যায়, এবং গুরু মুখ হইতে শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ অবগত হইয়া সংশয়-রহিত জ্ঞান অবশ্যই প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং অভ্যাস দ্বারা সেই জ্ঞান দৃঢ় করা সাধকের কর্ত্তব্যও বটে, কিন্তু এই উপায়ে পরব্রহ্মের অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ সম্ভব হইলেও, তৎ সম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞান বা প্রত্যক্ষানুভূতি হওয়া অসম্ভব। পরব্রহ্ম অন্যান্য বস্তুর ন্যায় ইন্দ্রিয়গোচর হন না, ইন্দ্রিয়গত মনও তথায় গমন করিতে অক্ষম।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
ন তৎ চক্ষুর্গচ্ছতি ন বা বাগ্ গচ্ছতি॥"

মনের সহিত বাক্য তাহাকে না পাইয়া যথা হইতে ফিরিয়া আইসে, সেখানে চক্ষু যাইতে পারে না, বাক্যও যাইতে পারে না।

ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের জন্য সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি উন্মীলিত হওয়া আবশ্যক এবং এই অন্তর্দৃষ্টি লাভের নিমিত্ত নানা উপায়ে চিত্তশুদ্ধি করিতে হইবে। *বিষয়াসক্তিতে চিত্ত মলিন থাকিলে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হওয়া অসম্ভব।*

"আশা বৈবশ্য মলিনে চিত্তে সন্তোষ বর্জ্জিতে।
ম্লানে বক্ত্রমিবা দর্পে ন জ্ঞানং প্রতিবিম্বতি॥"

যেমন মলিন দর্পণে মুখের স্পষ্ট প্রতিবিম্ব পড়ে না সেইরূপ, আশা ব্যাকুলিত মলিন চিত্তে জ্ঞানোৎপত্তি হয় না। চিত্ত হইতে বিষয়-বাসনারূপ মল বিদূরিত করিবার নিমিত্তই এত সাধনার প্রয়োজন। মানব-মন স্বভাবতঃ বিষয়ের দিকেই ধাবিত হয় ও তাহাতেই লিপ্ত হয়, তাহাকে বিষয় বাসনা

রক্ষিত করিতে হইলে বহু যত্ন ও বহু কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। এইরূপে চিত্তশুদ্ধি হইলে তবে মুমুক্ষুর জ্ঞান প্রাপ্তি হয়। যদি তাহাই হয়, তবে বিবেক ও বৈরাগ্য এই দুই সাধনাই জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য পর্য্যাপ্ত নহে কেন? এই সমস্ত জগৎ নশ্বর, কখন না কখন ইহার বিনাশ হইবে; সুখ ভোগ মাত্রেই ক্ষণস্থায়ী, কেবল এক পরমাত্মাই অবিনাশী ও শ্রেষ্ঠ, এইরূপ বিশ্বাস হইলে বিষয় সম্বন্ধে বৈরাগ্য নিশ্চয়ই উৎপন্ন হইবে এবং পরমাত্মার প্রতি নিষ্ঠা জন্মিবেই এবং তাহা হইলেই ত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে—তবে আবার শমদমাদি প্রভৃতি গোলমালের কথা কেন? ইহার উত্তর এই যে, এই জগদ্যুৎপত্তির কারণ "মায়া"কে অবগত হওয়া নিতান্ত কঠিন। ইহার যে কি মোহিনী শক্তি তাহা প্রথমতঃ কল্পনাই করা যায় না; আবার মুমুক্ষুগণ যখন তাহাকে জয় করিবার জন্য চেষ্টা করেন, তখনই তাঁহারা ইহার প্রভাব বিশেষভাবে বুঝিতে পারেন; এই মায়ার বাঁধন হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিলে উহা দৃঢ়তর ভাবে আবদ্ধ করে, উহা ছেদন করিবার চেষ্টা করিলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়, দূরে নিক্ষেপ করিলে তখনই পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হয়। যদিও সাধক মনে করেন যে, উহাকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়াছেন, তথাপি উহা অধিক প্রবল হইয়া ও নূতন রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে ক্লেশ প্রদান করে ও অবিলম্বে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করে। মায়ার মোহিনী শক্তি প্রাণি মাত্রেই অনুভব করে। বিখ্যাত মহাপুরুষগণও এই মায়ার নিকট পরাভব স্বীকার করেন। সকলেই জানেন বিশ্বামিত্রের ন্যায় ধীর ও উদ্যমশীল মনস্বী পুরুষকে যেমন অচিরাৎ বশীভূত করিয়া এবং তাঁহাকে কুক্কুরের ন্যায় সঙ্গে করিয়া দেবসভা মধ্যে লইয়া গিয়াছিল। আরও অনেকানেক মহর্ষিগণ যখন এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তখন "অন্যে পরে কা কথা।"

"বিশ্বামিত্র পরাশর প্রভৃতয়ো বাতাম্বু পর্ণাশনাঃ।
তেঽপি স্ত্রীমুখ-পঙ্কজং সুললিতং দৃষ্টৈব মোহং গতাঃ॥
শাল্যন্নং সঘৃতং পয়োদধি যুতং ভুঞ্জন্তি যে মানবাঃ।
তেষামিন্দ্রিয় নিগ্রহো যদি ভবেদ্বিন্ধ্যস্তরেৎ সাগরং॥"

বায়ু, জল পত্র মাত্র ভোজী বিশ্বামিত্র পরাশর প্রভৃতিও নারীমুখ-পদ্ম দর্শন করিয়াই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, আর যাঁহারা নিত্য ঘৃত দুগ্ধ দধিযুক্ত শালি অন্ন

ভোজন করেন তাঁহারা যদি ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিতে সমর্থ হন, তবে বিন্ধ্যাদিও সাগর লঙ্ঘন করিতে পারে, বিন্ধ্য পর্ব্বতের সাগর লঙ্ঘন যেমন অসম্ভব, তাহাদের ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করাও ততদূর অসম্ভব।

বিষয় সুখে বিমোহিত হইয়া মানুষ যে আপনার সর্ব্বনাশ করে, এ কথা প্রথমে আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়। কারণ সদসৎ বিচার বুদ্ধি ও হিতাহিত বিবেচনা শক্তি আছে ও কিসে আপনাদের দুঃখ না হইবে তাহাও বুঝিতে সক্ষম, তথাপিও সেই সদসৎ বিচার বুদ্ধির পরিচালনা আমরা করি না এবং আপাত-মধুর পাপে লিপ্ত হইয়া আমরা কষ্ট পাই। আত্মোন্নতির চেষ্টা দূরে থাক, বরং বিষয়মদে মত্ত হইয়া আমরা আপনার সর্ব্বনাশ সাধন করি। ইহা দেখিয়া মায়ার মোহিনী শক্তি বুঝা ভার, এই কথা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

"অজানন্ দাহার্ত্তিং বিশতি শলভো দীপ দহনে।
ন মীনোহপি জ্ঞাত্বাকৃত বড়িশমশ্নাতি পিশিতং॥
বিজ্ঞান স্তোহ্যেতে বয় মিহ বিপজ্জাল জটিলান্।
ন মুঞ্চামঃ কামান ইহ গহনো মোহ মহিমা॥"

দহন-দুঃখ না জানিয়া পতঙ্গ দীপ শিখায় প্রবেশ করে, এবং মৎস্যও না জানিয়াই বড়িশ সংলগ্ন মাংস গ্রাস করিয়া থাকে, কিন্তু আমরা জানিয়া শুনিয়াও বিপদ-সঙ্কুল কামনা সমূহ পরিত্যাগ করিনা। অহো! মোহের কি বিষম মহিমা! কিন্তু বস্তুতঃ ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই, কারণ মায়ার শক্তি এতই বলবতী যে ইহা মহাপুরুষগণকেও বিমোহিত করে।

"বীভৎসাঃ প্রতিভান্তি কিং ন বিষয়াঃ কিন্তু স্পৃহায়ুষ্মতী।
দেহ স্যাপচায়ো মতৌ নিবিশতে গাঢ়ো গৃহেষুগ্রহঃ॥
ব্রহ্মোপাস্যমিতি স্ফুরত্যপি হৃদি ব্যাবর্ত্তিকা বাসনা।
কানামেয় মতর্ক্য হেতু গহনা দৈবী সতাং যাতনা॥"

বিষয় সকল কষ্টদায়ক, কিন্তু তথাপি বিষয়-স্পৃহা বলবতী হয়; দেহের নাশ হইবে জানিয়াও গৃহাদির প্রতি লোভ দৃঢ় হয়, আবার ভগবৎ উপাসনা যে কর্ত্তব্য, ইহাও হৃদয়ে উদয় হয়; কিন্তু বিষয়-বাসনা তদনুষ্ঠানে বাধা প্রদান করে। দুর্দ্দৈব বশতঃ সাধুদিগকে কেন যে এই যাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

বৈরাগ্য প্রাপ্তির জন্য কত ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, এবং এই বহু আয়াস-সাধ্য বৈরাগ্য সহজে নষ্ট হইবার আশঙ্কা যে কত রহিয়াছে, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। এই হেতু বৈরাগ্য উদয় হইলে তাহাকে স্থায়ীভাবে রাখিবার উপায় উদ্ভাবন করা আবশ্যক। শমদমাদি ষট্ সম্পত্তিই এই উপায়।

মনুষ্য কেন বিষয়লুব্ধ হইয়া তাহাতে আকৃষ্ট হয়? কে তাহার অশেষ চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তাহাকে বিষয়-মদে মত্ত করিয়া রাখে? কে তাহার পারমার্থিক উন্নতির পথে বহু বিঘ্ন উৎপন্ন করিয়া তাহাকে সংসার-চক্রে আবদ্ধ রাখে? সকল প্রশ্ন যথাযথ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, মনই এই অনর্থের মূল। তজ্জন্য মুমুক্ষু প্রথমেই মনোনিগ্রহ করিবেন অর্থাৎ মনকে বশীভূত করিবেন। মন আমাদের, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমরাই মনের হইয়া দাঁড়াইয়াছি; মধু পান করিতে আসিয়া আমরা মধুদ্বারা আবদ্ধ-পক্ষ মক্ষিকার ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতেছি।

"অস্য সংসার বৃক্ষস্য সর্ব্বোপভব দায়িনঃ।
উপায় এক এবাস্তি মনসঃ স্বস্য নিগ্রহঃ॥"

এই সর্ব্বদুঃখদায়ক সংসারবৃক্ষের ধ্বংস করিবার একমাত্র উপায় স্বীয় মনোনিগ্রহ।

"সহস্রাঙ্কুর শাখাত্ম ফল পল্লব শালিনঃ।
অস্য সংসার বৃক্ষস্য মনোমূলমিতি স্থিতম্॥"

সহস্র অঙ্কুর ও শাখাবিশিষ্ট এবং ফল-পল্লব-শোভিত এই সংসারবৃক্ষের মনই মূলরূপে রহিয়াছে। বৃক্ষের শাখা প্রশাখা ছেদন করিলে নূতন শাখা প্রশাখা উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বিস্তৃত হয়। মূল ছেদন না করিলে বৃক্ষ বিনষ্ট হইবার নহে। যতক্ষণ মূল থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বৃক্ষ পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়াই থাকে। এই সংসারও সেইরূপ। ইহার একেবারে নাশ করিতে হইলে ইহার মূল মনকে প্রথমে বিনাশ করিতে হইবে।

"মনসোঽভ্যুদয়ো নাশো মনোনাশো মহোদয়ঃ।
জ্ঞমনোনাশমভ্যেতি মনোঽজ্ঞস্য হি শৃঙ্খলা॥"

মনের বিকাশই আমাদের বিনাশের কারণ এবং মনের বিনাশই আমাদের

মহা কল্যাণ। জ্ঞানী ব্যক্তির মন বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং অজ্ঞ ব্যক্তির মনই তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখে।

কিন্তু মনের নাশ করিতে হইবে বলিয়া উহার একেবারে ধ্বংস সাধন করিতে হইবে বা আত্মহত্যা করিতে হইবে এরূপ নহে; কারণ তাহা হইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইয়া বরং তাহাতে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থাই ঘটিবে। মনের নাশ অর্থাৎ উহার স্বাধীনতা নাশ। উহা আমার হইয়া আমার উপর কর্তৃত্ব করিবে, ইহা হইবে না। মনোনিগ্রহ করিলেই সুফল ফলিবে। উহাকে জয় করিয়া আপনার অধীন রাখিতে হইবে, স্বয়ং মনের অধীন হইলে চলিবে না। মন আমাদের সম্পূর্ণ বশীভূত হইলে, সে আমাদের ইষ্ট কার্য্যে অর্থাৎ পরমার্থ প্রাপ্তি বিষয়ে আর কোনও বিঘ্ন ঘটাইতে পারিবে না। কিন্তু যদি মন বশীভূত না হইয়া সাধকের উপর আধিপত্য স্থাপন করে, তাহা হইলে মোক্ষ প্রাপ্তির আশা বৃথা।

"ন ধনান্যুপকুর্ব্বন্তি ন মিত্রাণি ন বান্ধবাঃ।
ন হস্ত পাদ চলনং ন দেশান্তর সংগমঃ॥
ন কায়ক্লেশ বৈধুর্য্যং ন তীর্থায়ন জীবিতং।
কেবলং তন্মনোমাত্র জয়েনা সাদ্যতে পরং॥"

পরব্রহ্ম-প্রাপ্তি ধন দ্বারা হয় না, মিত্রের দ্বারা হয় না, আত্মীয় কুটুম্ব দ্বারাও নহে; হস্ত পদ সঞ্চালন অথবা দেশান্তর গমনে হয় না; ব্রতোপবাস দ্বারা শরীরকে ক্লেশ দিলেও হয় না, এবং তীর্থ পর্য্যটনে আয়ুঃ ক্ষয় করিলেও তাহা নিরর্থক হইবে। কেবল মনকে জয় করিলেই সেই পরম বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"হস্তং হস্তেন সংপীড্য দন্তান্দন্তৈ বিচূর্ণ চ।
অঙ্গান্যঙ্গৈঃ সমাক্রম্য জয়েদাদৌ স্বয়ং মনং॥"

হস্তে হস্ত পীড়ন করিয়া, দন্তে দন্ত সংঘর্ষণ করিয়া এবং অঙ্গের দ্বারা অঙ্গ পেষণ করিয়া প্রথমে স্বীয় মনকে জয় করিবে।

অতি দৃঢ়তা সহকারে মনকে নিগৃহীত করাই প্রথম কর্ত্তব্য। ইহারই নাম শম।

কিন্তু মনের সহায়তায় ইন্দ্রিয়গণকেও যুগপৎ নিগৃহীত করিতে হইবে।

মন ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি, সে যখন যাহাকে যে আদেশ করে, সে তখনই তাহা পালন করে।

"মনো দশেন্দ্রিয়াধ্যক্ষং হৃৎপদ্ম গোলকে স্থিতং।
তচ্চান্তঃকরণং বাহ্যেষ্ব স্বাতন্ত্র্যাদ্বিনেন্দ্রিয়ৈঃ॥
অক্ষেষ্বর্থার্পিতে ষেত্তদ্গুণ দোষ বিচারকং।"

মন দশ ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ, ইহা হৃৎপদ্মের গোলক মধ্যে অবস্থিত; বাহেন্দ্রিয়গণ ইহাকেই অবলম্বন করিয়া আছে বলিয়া ইহাকে অন্তঃকরণ বলে। ইন্দ্রিয়গণ কোনও বিষয় গ্রহণ করিলে মন তাহার গুণ দোষ বিচার করিয়া দেয়।

এই জন্যই মনকে ইন্দ্রিয়গণের রাজা বলা হয়। আবার পার্থিব রাজগণের চতুষ্পার্শ্বে যেমন চাটুবাদী অমাত্যবর্গ রাজার অনিষ্ট করিয়া আপনাদের স্বার্থ সিদ্ধি করিয়া থাকে, তদ্রূপ প্রতারণা দ্বারা ইন্দ্রিয়গণও মনকে বিষয়লুব্ধ করিয়া থাকে। ইহারা সকলেই বহির্মুখ, এজন্য বিষয়াসক্ত হওয়াই ইহাদের স্বভাব। সুতরাং ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহ আবশ্যক। ইহারই নাম দম। ইন্দ্রিয় ও মন ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ অতি নিকট; ইহারা পরস্পর সকল কার্য্যে সহায়তা করে, এই জন্য শম ও দম, মনোনিগ্রহ ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ—এই উভয় সাধনের বিচার একত্র করা আবশ্যক। (ক্রমশঃ)

শ্রীহরিপদ মিত্র।

লক্ষ্য কি?

মানব-জীবনের উদ্দেশ্য কি, কি জন্য আমরা এখানে আসিয়াছি, কিসে আমাদের পরম শান্তি লাভ হইবে, ইহা যত দিন না আমাদের স্থিরনিশ্চয় হয়, তত দিনই পথহারা পথিকের ন্যায় দিশেহারা হইয়া আমরা উদ্দেশ্য বিহীন জীবন লইয়া ঘুরিয়া বেড়াই। অশান্তি আমাদের নিত্য সহচর হয়। গুটী-পোকা যেমন আপনার নাসায় বদ্ধ হয়, আমরাও সেইরূপ সকৃত কর্ম্মে বদ্ধ হইয়া অথাহ সলিলে ডুবিয়া হাবুডুবু খাই। কর্ম্মফল-ভোগও অনিবার্য্য হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন, বিদ্যা শিক্ষায় বুদ্ধিশুদ্ধি হয়—যাহার ফলে আমরা

কোনটী সৎ এবং কোনটী অসৎ বুঝিতে পারি, এবং সেই জ্ঞান লাভ করতঃ সংসারের অশান্তি-অনলে দগ্ধ হইয়া প্রাণে প্রাণে বিচার করিতে থাকি, এ জগতে সৎ কি? এ দুর্লভ মানব জীবনের লক্ষ্য কি? কিসে আমাদের পরমানন্দ—নিত্যানন্দ লাভ হইবে? কেমন করিয়া ভবযন্ত্রণার করাল কবল হইতে মুক্তিলাভ করিব? এই চিন্তা ক্রমশঃ ঘনীভূত হইলে, প্রাণের অতৃপ্ত বাসনায় একটা বিষম অশান্তি উপস্থিত হয়—জগৎ যেন বায়ুশূন্য বোধ হয়—হৃদয় শূন্য শুষ্ক হইয়া যায়,—ইহাকেই বোধ হয় মুমুক্ষু অবস্থা বলে! হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে ধ্বনি উঠিতে থাকে, "কে কোথায় এমন মানুষ আছ এস, হাত ধর, রক্ষা কর—হৃদয়ের গাঢ় অন্ধকাররাশী ঘুচাইয়া দাও, আমাকে শান্তির স্নিগ্ধ আলোকে নিমজ্জিত কর।

প্রাণের এরূপ প্রগাঢ় ব্যাকুলতায় যখন জগতের আর কিছু ভাল লাগেনা, জীবন কণ্ঠাগত বোধ হয়, তখনই প্রাণের প্রাণ, পতিতপাবন দয়াল ঠাকুর অভয় ক্রোড়ে লইতে বাহু প্রসারণ করেন। মা যেমন সন্তানের ক্রন্দনে ব্যাকুল হইয়া কার্য্য ফেলিয়া ছুটিয়া যান, জগন্মাতাও তেমনি না আসিয়া থাকিতে পারেন না। এই জন্যই জননী, জগজ্জননীর রূপান্তর মাত্র। তাই ভগবান শ্রীমুখে বলিয়াছেন, নিজের ভরণ পোষণের জন্য পরের দাসত্ব করিও না, কিন্তু মার সেবা মোট বহিয়াও করিবে। মাতৃ-প্রেমের মহা আকর্ষণে, গঙ্গামাতার ভক্তিডোর ছিন্ন করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে ঠাকুর আমার শ্রীবৃন্দাবন হইতে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়াছিলেন; পাছে মার প্রাণে কষ্ট হয়, এই জন্যই বুঝি সন্ন্যাস লইয়া গৈরিক ত্যাগ করিয়াছিলেন। স্বামিজী শ্রীমুখে বলিয়াছেন, "স্বীয় জননীর ঠিক ঠিক সেবায় জগজ্জননী লাভ হয়"—ত্রিষুলোকেষু নাস্তি মাতৃ সমঃগুরু।

"মা যেমন সন্তানকে চুসিকাটী দিয়া ভুলাইয়া গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত হন এবং সন্তান যতক্ষণ না চুসিকাটী ফেলিয়া সকল প্রলোভন তুচ্ছ করিয়া মা মা করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকেন, ততক্ষণ কিছুতেই আসিবার প্রয়োজন বোধ করেন না—পরিশেষে আবশ্যক বুঝিয়া হাঁড়ি ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া বক্ষসুধা দানে সন্তানকে শান্ত করেন। সেইরূপ, ঠিক সেইরূপ—শ্রীভগবান শ্রীগুরুরূপে ছুটিয়া আসিয়া আমাদের সকল জ্বালা জুড়াইবার জন্য শ্রীচরণ-কমলে আশ্রয়দান

করেন। জীব তখন জানিতে পারে লক্ষ্য কি? শত প্রলোভনেও সে আর শ্রীগুরু-শ্রীপাদপদ্মের প্রেম-পীযূষের মধুরতম আস্বাদন ভুলিতে পারেন না, জগতের অন্য কোন জিনীষেই তাহার আব তৃপ্তি হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমুখে বলিয়াছেন, "মানুষে ওলা মিছরীর স্বাদ পাইলে আর কি চিটে গুড়ে লুব্ধ হয়?" শ্রীগুরু-কৃপায় জীবেরও তখন এ জগৎ-সংসার চিটে গুড়ের ন্যায় বোধ হয়,—কেবল প্রেমময়ের প্রেমামৃতপানে বিভোর হইয়া থাকিতে চাহে, এক লক্ষ্যে তাঁহারই শ্রীচরণোদ্দেশে প্রাণপণে দৌড়াইতে থাকে।

সংসারই বল, আর সন্ন্যাসই বল, সকলেরই লক্ষ্য এক,—"কিসে সত্যস্বরূপ শ্রীভগবান লাভ হইবে।" ঠাকুর বলিয়াছেন, "সংসারের বীব সাধক মাথায় মোট লইয়া শ্রীভগবানের শ্রীচরণ-পানে তাকাইয়া থাকে।" সংসারটী কেমন,—যেমন একখানি বৃহৎ জাহাজ, নানারূপ কল-কব্জা, কাপ্তেন, ইঞ্জিনিয়ার, লোক লস্কর, হৈ চৈ কত কি!! সকলেই কর্ম্মে ব্যাপৃত,—সকলেই পরস্পর সাহায্য করিতেছে,—সকলেই একমাত্র কাপ্তেনের আদেশ, ক্রমশঃ অধস্তন কর্ম্মচারী পরম্পরায় প্রেমের সহিত পালন করিয়া আসিতেছে। কেন?—মূল লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য। লক্ষ্যটি কি?—কম্পাসের গতি। ঠিক সেইরূপ মন-কম্পাস ঠিক রাখিয়া আমরা এই সংসারসমুদ্র—ভবসমুদ্র—পার হইতে আসিয়াছি,—কাপ্তেন—কাণ্ডারী—শ্রীগুরু, ও লক্ষ্য শ্রীভগবান। জয় প্রভু রামকৃষ্ণ।

"তোমারেই করিয়াছি জীবনেরই ধ্রুবতারা।
এ সংসারে আর কভু হ'বনাকো পথহারা॥'

কাঙ্গাল।

আগমনী।

আজ প্রকৃতি হাস্যময়ী, মানব উৎফুল্লময়, জগৎ উৎসবপূর্ণ—সর্ব্বত্রই সুখ-চিত্র বিদ্যমান। ধনী ও নির্ধন, পণ্ডিত ও মূর্খ, বালক ও বৃদ্ধ সকলেই প্রেম-সাগরে ভাসিতেছে। কারণ?

আজ মা আসিতেছেন। বিশ্বআনন্দিনী বিশ্বজননী উমা মা আজ বৎসরান্তে এ মর্ত্ত্যধামে সন্তানের নিকট আসিতেছেন। দুর্গতিনাশিনী শিবে দশ হস্তে সন্তানের অমঙ্গল দূর করিবার জন্য আজ এ কলুষিত স্থানে আসিতেছেন।

এতদিন সন্তানেরা মাতৃহারা ছিল, আজ তাঁহার পূজা করিবে বলিয়া কত আনন্দ করিতেছে। দেবী কখনও গজে, কখনও অশ্বে, কভু বা যানে, কভু বা নৌকায় আগমন করিয়া সন্তানের মঙ্গল সাধন করিয়া যান। পাগলকে পাগল করিয়া, মা আমার সন্তান-দুঃখে সমস্ত সুখাগার কৈলাসধাম ত্যাগ করিয়া, আজ এই কুটিলতাময় কষ্টকর পৃথিবীতে আসিতেছেন। পাষাণনন্দিনী গিরি-সুতা আজ এই ধরার ভার হরণ করিতে, এই অসার সংসারে আগমন করিয়া হতভাগ্য সন্তানদিগকে মাতৃ-মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে আসিতেছেন। কামিনী-কাঞ্চনের মায়াময় প্রলোভনে পড়িয়া হতভাগ্যগণ বিশ্বজননীকে ভুলিয়া থাকে, তাই বৎসরান্তে তারা মা আজ এই ধরাধামে অবতীর্ণা। শুভ্র আকাশপটে চন্দ্র হাসিতেছে—মানবগণ সুখসাগরে ভাসিতেছে।

এ সুখ-সময়ে কেন বিষাদ মনোমধ্যে জাগে? ঐ যে দিব্য একটা জ্যোতিঃ আসিতেছে—উহার পাত্র কোথায়। মা কি কেবলি পটে আঁকা ছবি বা ছাঁচে ঢালা মূর্ত্তি? মার উপাসক কি ধনী না তণ্ডুলপ্রার্থী দীনজন।

পুরাকালে শুনা যাইত যে, মার মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে কোন কোন সাধক প্রকৃত প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতেন। মধ্যবিৎ বা দরিদ্রের ইচ্ছা থাকিলেও মাকে স্বগৃহে আনিতে সক্ষম হয় নাই। তাই ধনবানেরা জননীকে নিজ গৃহে আনয়ন করিতে পারিয়া ধন্য হন। কারণ ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, ধনীরা মার রসদদার; এই কারণেই মা তাঁর কোষাধ্যক্ষের গৃহে আগমন করিয়া সমস্ত সন্তানকে সুখী করেন। উহাদের মধ্যে কেহ প্রকৃত ভক্তিভাবে পূজা করিয়া প্রাণে শান্তি-লাভ করেন, আবার কেহ বা মান্যের জন্য মৌখিক ভক্তি দেখান। কয়জন প্রকৃত মনে মা বলিয়া ডাকিতে পারে—কয়জনেই বা পাষাণনন্দিনীর সিংহাসন টলাইতে পারে—কয়জনেই বা ক্ষেমাঙ্করীর সহিত কথা কহিতে পারে?

জনরব এইরূপ আছে যে, কোন এক ধনীর গৃহে মা আসিয়াছেন। পুরোহিত মস্ত একটা ফর্দ্দ দিলেন, ধুমধামের সহিত যোগাড় চলিতে লাগিল। পূজা আগতপ্রায়,—হঠাৎ সংবাদ আসিল যে, কুলপুরোহিত বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া এই ধরাধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। মুহূর্ত্তেই ঐ আনন্দ-মুখরিত বাড়ীখানি নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিল। কর্ত্তা মহাশয় এই সংবাদে মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। গিন্নীমাতা তাঁহার ইহকালের সর্ব্বস্ব পূজনীয় স্বামী-

দেবতার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ-দেবতার নিকট পাগলিনীর প্রায় ছুটিয়া যাইলেন। কিছুকাল পরে পূজার দালানে মার প্রতিমার নিকট আসিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে গদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "মা এতদিন আমরা তোমার সেবা করিয়া সুখী—কখনও তো এরূপ অঘটন হয় নাই! এবার কি আমাদের পূজা নিবিনে মা? কোন পাপে এ শাস্তি মা? বৎসরান্তে তিনদিন তরে এ মর্ত্তধামে আসিয়া কত যে শান্তি বর্ষণ কর, তাহা কি জাননা? শান্তিদায়িনী, এ বিপদে রক্ষা কর। মা, মা, দুর্গে, দুর্গতিনাশিনী! রক্ষা কর মা।" ভক্তের ক্রন্দনে স্থির থাকিতে না পারিয়া, সর্ব্বার্থসাধিকে শিবে যেন এই হতভাগ্য পরিবারবর্গকে শান্তি দিতে কৃত-সংকল্পা হইলেন। কর্ত্রীও প্রশান্তহৃদয়ে স্বামী সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন যে, তাঁহার স্বামীর ললাটে চিন্তার রেখা, নয়নে অশ্রুবিন্দু, মুহুর্মুহু দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছে—যেন একটী সজীব বিষাদ-মূর্ত্তি। তখন স্বামীর নিকটে আসিয়া পদধূলি লইয়া বলিলেন, আর ভাবিবার কোন আবশ্যক নাই—যদি কায়মনবাক্যে আমি তোমায় পূজা করিয়া থাকি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই বিপদ হইতে শীঘ্র মুক্তি পাইব। মার নিকট এ ভাবে ইঙ্গিত পাইয়াছি।" সেই সময় জ্যেষ্ঠ পুত্র আসিয়া সংবাদ দিল যে, "একজন সন্ন্যাসী আসিয়া বলিতেছেন, এবার আমি মায়ের পূজা করিব। উঁহাকে দেখিলে কিন্তু কাহারও ভক্তি আসে না। আমরা উঁহাকে বারণ করিলেও শুনিতেছেন না। এখন আপনার যাহা অভিরুচি তাই করুন।"

পুত্র প্রমুখাৎ এই কথা শ্রবণান্তে মাতা বলিলেন,—দেখ, দেবলীলা অনুধাবন করা মনুষ্য-বুদ্ধির অগম্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—নিশ্চয়ই মার প্রেরিত লোক, উঁহার দ্বারাই এবার পূজা হোক। তদুত্তরে স্বামী কহিলেন, যাহা ভাল বিবেচনা হয় করিব। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, একজন অপরিচ্ছন্ন সন্ন্যাসীকে বেষ্টন করিয়া সকলে হাস্য পরিহাস করিতেছে—যেন একটা মস্ত খেলিবার সামগ্রী—একটা আনন্দের কল। সত্যই তাঁহাকে দেখিলে ভক্তি দূরে পলায়ন করে, কিন্তু তাঁহার চক্ষের মধ্য দিয়া একটা তীব্র জ্যোতিঃ খেলিতেছিল।

ইহা লক্ষ্য করিয়া ও গৃহিণীর অনুরোধ স্মরণ করিয়া, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে উঁহাকেই পৌরহিত্যে অর্পণ করিলেন। পাগলার আনন্দ দেখে কে? পরিবার-বর্গও সুখী, বালক বালিকাগণ আনন্দে খেলা করিতে লাগিল, আত্মীয়গণ

স্ব স্ব কার্য্যে ব্যস্ত হইল। অভ্যাগতজনের মুখে হাসি দেখা দিল। গৃহকর্ত্রী পূর্ণ উদ্যমে সেবায় মন দিলেন, কিন্তু কর্ত্তার মনে সন্দেহ মধ্যে মধ্যে উঁকি মারিতে লাগিল।

নবমী পূজার দিন কর্ত্তার এক বিশিষ্ট বন্ধু আসিয়া ঐরূপ একটা পাগলকে পূজা করিতে দেখিয়া ঈষৎ ব্যঙ্গের সহিত কহিলেন,—কি হে ব্যাপারখানা কি, এটাকে আবার কোথেকে আমদানী ক'রলে? এতই যদি লোকাভাব ছিল; আমাকেই বা কোন্ জানালে? আমি আমার স্বনামধন্য খান্‌সামা চাঁদমিঞাকে পাঠাতে পারতুম। এই কথা শুনিবামাত্র পাগলা একবার কেবল বক্তার প্রতি লক্ষ্য করিয়া স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। যথাসময়ে বিজয়া আসিল। পুরস্ত্রীরা মাকে বৎসরের মধ্যে পাইবে না ভাবিয়া কাঁদিতেছে। বরণ প্রভৃতি শেষ করিয়া যখন গিন্নিমাতা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া জগন্মাতার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছেন, মা আবার যেন আগামী বৎসরে তোর চরণ পূজা ক'রে মানব-জন্ম সার্থক করিতে পারি,—তখন এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল। বলিতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়—তখন ঐ পাগলা উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, মা! তুমি কাকে প্রণাম ক'রছো? কার নিকট প্রার্থনা ক'রছো? এবার যে মার পূজা হয় নাই, এই মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় নাই! এই বলিয়া বোমা দ্বারা "জয় মা তারা" রবে মার পদে আঘাত করিলেন। তারপর সমস্ত লোক অবাক, নিস্পন্দ। কারণ সকলেই দেখিতে পাইল যে, ঐ মৃন্ময়ী মূর্ত্তির আঘাত-প্রাপ্ত চরণ-কমল হইতে রক্ত বহির্গত হইতেছে। ইহা লিখিতে যত সময় অতিবাহিত হইল, কার্য্যে কিন্তু ইহার শতাংশের একাংশও হয় নাই; ততক্ষণ যেন সকলেই কোন এক যাদুকরের মন্ত্রজালে বদ্ধ ছিল! চমক ভাঙ্গিলে সকলেই পাগলার সন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু আর তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

তাই বলিতেছিলাম, এরূপ গুপ্ত সাধক পাওয়া বড়ই কঠিন। এই ভীষণ কলিকালে প্রায় নাই বলিলেই হয়।

বৎসরান্তে, এই আশ্বিন মাসে আবার মা আসিতেছেন। কত ভাবে কত লোকে তাঁর পূজা করিবেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই—তাঁর প্রকৃত পূজা হইবে কি? প্রকৃত সাধক আছে কি?

আজকাল প্রায়ই "রামকৃষ্ণ"কে সকলে পূজা করিতেছেন, কেন? তিনি প্রকৃত সাধক ছিলেন। কারণ, "রামকৃষ্ণদেব" কেবলই জগজ্জননীর চরণ-কমল ভিক্ষা করিতেন। তিনি বলিতেন, "মা এই নে আমার জ্ঞান, এই নে অজ্ঞান, এই নে অহঙ্কার, এই নে কামিনীকাঞ্চন—আমায় শুদ্ধা অচলা ভক্তি দে।" পূজা করিতে বসিলে আর শেষ হয় না, আরতি আর ফুরায় না। মার পাদপদ্মে পুষ্প নিবেদন করিতে গিয়া নিজ মস্তকে দিতেন। কেবলই আবদারে সন্তানের ন্যায় মার নিকট 'শুদ্ধা অচলা ভক্তি' প্রার্থনা করিতেন। জগতে এত প্রার্থনীয় বস্তু থাকিতে অন্য কিছুতেই মন দিতেন না। মাও ভক্তের অকপট ভাব অপূর্ণ রাখিতে পারিলেন না!

কৃপাময়ী শঙ্করী মানবকে নানা ভাবে পরীক্ষা করেন। কাহাকেও বলেন, তোমার ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা থাকিবে, আমায় ত্যাগ কর। কাহাকেও বলেন, তুমি "সরস্বতীর বরপুত্র" হইবে, আমায় লইয়া কি করিবে? অপর একজনকে বলেন, তুমি কার্ত্তিকের ন্যায় বীর হইবে—অতএব তোমার কোন ভয় নাই। আবার অপর একজনকে বলেন, তুমি গণেশের কৃপায় সর্ব্ব বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিবে। এইরূপে যাহার যেরূপ প্রার্থনা, তাহা পূর্ণ করেন। এইরূপ বরলাভ করিয়া তাহারাও সন্তুষ্ট। তাহারা ভ্রমেও ভাবেনা যে, 'এগিয়ে প'ড়লে' আরও কি হইত! তাহারা স্বপনেও ভাবেনা যে, সর্ব্ববিভূতির আধার যিনি, তিনি কত মধুর! দুরদৃষ্ট বশতঃ মায়ের কাছে পুঁইশাক চাইতে যাই, ও মহাবাক্য ভুলে থাকি!

তাই বলিতেছিলাম, যাঁহারা প্রকৃত ভক্ত, যাঁহারা প্রকৃত সাধক, তাঁহারা মায়ের সুসন্তান। তাঁহারা মায়ের নিকট মায়ের চরণকমলই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। অন্য কিছু (লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ) চাইতে ঘৃণা করেন। এইরূপ লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিলে স্নেহময়ী জননী ছুটিয়া আসিয়া সন্তানকে বক্ষে ধারণ করেন। কারণ, তখন তিনি ভাবেন—আমি ইহাকে এত দিন কত চুসিকাটি দিয়া ভুলাইয়া, আমার বিশ্বসংসারে অন্য কাজে ব্যাপৃত ছিলাম; কিন্তু এ দেখ্‌ছি আর খেলবে না, আমার কাছেই থাকতে চায়। কিন্তু কয়জন লোক এরূপ চাহিতে পারেন?

রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন—

ডাকার মত ডাক্ দেখি মন্
কেমন শ্যামা থাকতে পারে,
কেমন উমা থাক্‌তে পারে?

শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

শারদীয়া।

(১)

সুখের শরৎ এসেছে ধরায়,
প্রাবৃট রাজত্ব হয়েছে শেষ;
বিমল আকাশে নাহি মেঘরাশি
ধরেছে ধরণী সুন্দর বেশ।

(২)

প্রান্তরে কাননে কিবা দুর্ব্বাদল
ধরিয়াছে নব নীলিম শোভা;
ধরেছে গগন নীলিম বরণ
ধরেছে সলিল নীলিম আভা।

(৩)

বিমল আকাশে শারদীয় শশী
মরি কি ভাসিয়া ভাসিয়া যায়;—
আনন্দেতে মাতি মধুপ-নিকর,
ঢলিয়া পড়িছে কুসুম-পায়।

(৪)

মানব-নিচয় আনন্দে মগন
কেনরে হয়েছে বলহ মোরে;
বুঝি বা তারিণী হইয়ে সদয়
আসিছে হেথায় বৎসর পরে।

(৫)

এস মা! এস মা! জুড়াব যাতনা
বদন ঢাকিয়ে তোমারি কোলে;
আনন্দে মাতিয়া পরাণ ভরিয়া
ডাকিব সুধা-মাখা "মা" "মা" বোলে।

(৬)

আসিছ বটে মা—আনন্দিত মনে
আসিয়া কিবা দেখিবে হেথায়;
"আগেকার যত সমৃদ্ধি বৈভব
মিশেছে অনন্ত কালের গায়।

(৭)

কমল চরণ করিয়ে প্রদান
আনন্দ সাগরে ভাসাতে যারে;
সেই সে অধীন গিয়াছে চলিয়া,
আসিয়া না পুনঃ দেখিবে তারে।

(৮)

আমার এখন অতি অসময়
পারিব না আর তুষিতে তোরে;
আর যদি কভু হয় সুখময়
তুষিব তোমায় যতন ক'রে।

(৯)

ধর্ম্মপথে মতি নাহিক আমার
ডুবিতেছি সদা পাপেতে হায়!
তুমি দয়াময়ি,—ক্ষমহ আমারে,
এড়াইব কিসে ভবের দায়?

(১০)

শুভ-আশীর্ব্বাদ করহ জননী
এক বিনে মন কিছু না চায়;
'বিষয় বাসনা ভুলি নিরন্তর
মজি যেন সদা তোমারি পায়।"

শ্রীচরণাশ্রিত—
সেবক শ্রীঅদ্রীশনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব।

বিগত ১৫ই ভাদ্র বুধবার, জন্মাষ্টমীর দিন, কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানের শ্রীমন্দিরে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ত্রিংশ বার্ষিক মহোৎসব সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রাতঃকাল হইতেই ভক্তসমাগম হইতে থাকে; বেলা ৮টার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্নানান্তে নব-বস্ত্র, কুসুম-হার ও স্তবকদ্বারা সুসজ্জিত করা হইলে, বেলা ৯৷৷০ ঘটিকার সময় পূজা ও প্রার্থনা আরম্ভ হয়। তৎপরে বিবিধ ফলমূল, মিষ্টান্ন, কচুরী, লুচী, সরবৎ প্রভৃতিদ্বারা ঠাকুরকে জলপানি ভোগ দেওয়া হইলে, সমাগত ভক্তবৃন্দ সকলে প্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক "রামকৃষ্ণ-নামে" বিবিধ সঙ্গীত ও প্রার্থনাদি করিতে লাগিলেন। প্রায় শতাধিক স্বেচ্ছা-সেবকগণ মহোৎসবের প্রায় সমস্ত কার্য্যেরই সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ পূর্ব্বক অতি যত্ন-সহকারে তাহা সমাধা করিয়া সকলেরই প্রীতিভাজন হইয়াছেন। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় শ্রীশ্রীঠাকুরকে মহাসমারোহে খেচারন্ন, তরকারী, ভাজা, মিষ্টান্ন প্রভৃতি দ্বারা ভোগ দেওয়া হইলে, ঐক্যতানবাদন সহযোগে সম্মুখ, উত্তর ও দক্ষিণ দিক হইতে "জয় জয় রামকৃষ্ণ" ধ্বনিতে আরত্রিক করা হয়। কুসুম-হার ও স্তবক-শোভিত শ্রীশ্রীঠাকুর ভোগ-আরত্রিক কালীন যে কি অপূর্ব্ব নয়ন-মন-মুগ্ধকারী শোভা ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠক-পাঠিকাগণ স্ব স্ব হৃদাসনে অবলোকন করিয়া দেখিবেন। যে সকল সমাগত ভক্তবৃন্দ ভাগ্যক্রমে তাহা সন্দর্শন করিয়া চবিতার্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের হৃদয়ে সে স্বর্গীয় শোভা অবশ্যই চিরাঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। দ্বিপ্রহর হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত অন্যূন পঞ্চাশ সংখ্যক সঙ্কীর্ত্তন-সম্প্রদায় শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখীন হইয়া অবিচ্ছেদে মধুর নাম-কীর্ত্তনে শ্রোতৃবৃন্দকে পুলকিত ও স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এ বৎসর প্রায় ৩০।৩২ সহস্র ভক্ত ও দর্শকবৃন্দের সমাগম হয় ও ৫।৬ সহস্র ভক্তেরা পরিতৃপ্তিপূর্ব্বক বসিয়া খিচুড়ী আদি প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রায় ৫০।৬০ জন ভক্ত ২৬ নং মধুরায়ের গলি হইতে নিম্নলিখিত নাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে যোগোদ্যানে পৌঁছিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে উন্মত্ত ভাবে হৃদয়োচ্ছ্বাস জ্ঞাপনপূর্ব্বক দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভাবোন্মত্ততায় প্রায় সকলেই আত্মহারা হইয়াছিলেন।

গীত।

শ্রীপ্রভুর সমাধি-স্থান, পুণ্যভূমি যোগোদ্যানে।
কি এক ভাবের খেলা, প্রেমের মেলা, অপূর্ব্ব আনন্দ দানে॥
(হেথায় যে জন আসে সেই তা জানে) (উপলব্ধি করে প্রাণে প্রাণে)
পরম পবিত্র সমাধিক্ষেত্র, মহাতীর্থ এবে এই ধরায়,—
(নর-লীলার আধার শ্রীঅঙ্গ যথায়) (দরশনে যাহা ভব-জ্বালা দূরে যায়)
(পরশনে অজ্ঞানের হয় জ্ঞানোদয়) (হেথা চৈতন্য-আধার চৈতন্য বিলায়)
নিত্য-আবির্ভাব স্থান, গোলোক সমান, বিরাজিত রামচন্দ্র সনে॥
(সদা বাঁধা রামের ভক্তি-ডোরে) (প্রভু রাম ছাড়া যে থাক্‌তে নারে)
প্রভু পতিত-কারণ, করি দেহ ধারণ,—
(সহি দীনের তরে ক্লেশ অকাতরে) (ল'য়ে সবার ভার আপন শিরে)
পুনঃ আপনি বিকায়ে স্বরূপ লুকায়ে, চির অধিষ্ঠান এই স্থানে॥
এই জন্মাষ্টমীর দিনে, জীবের কল্যাণে, চির অধিষ্ঠান এই স্থানে॥
কিবা মোহন বেদী'পরে, ফুল্ল ফুল-হারে, ভুবন-ভুলান রূপ ধ'রে,—
(প্রভু অপরূপ সাজে বিরাজ করে) (জীবে অভয় দিতে বরাভয় করে)
যত সাধন-ভজন-বিহীন যে জন, লও শরণ ঐ অভয় চরণে।
জয় রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ বল সঘনে॥

রাত্রি ১০টার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের শয়ান দিয়া মহোৎসব কার্য্য সমাধা করা হয়।

বিগত ১৫ই ভাদ্র জন্মাষ্টমীর দিন দিনাজপুরের মুন্সীপাড়াস্থ ডাক্তার শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী মহাশয়েব বাস-ভবনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব হইয়া গিয়াছে। বেলা দ্বিপ্রহরের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ও ভোগরাগাদি সম্পন্ন হইলে, সমাগত ৪।৫ শত দরিদ্রদিগকে খেচরান্ন-প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। স্থানীয় রাণীগঞ্জ হরি-সভার সেবক সম্প্রদায় ও ভক্তবৃন্দ হরিনাম ও নগর-সংকীর্ত্তন দ্বারা সর্ব্বসাধারণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। দরিদ্রদিগকে চাউল, পয়সা ও কয়েকখানি কাপড় বিতরণ করা হইয়াছিল।

—:*:—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীচরণ ভরসা।

জয় গুরুদেব !!

তত্ত্ব-মঞ্জরী

ঊনবিংশ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা।
কার্ত্তিক, সন ১৩২২ সাল।

মিনতি।

—:•:—

জাহ্নবীর কূলে, বসিয়া বিরলে,
ভাবিতেছি একদিন।
প্রভু বিনা আর কে আছে আমার
তিনি জল, আমি মীন॥
প্রাণ-পতি বিনা সতীর যাতনা
কে বুঝিবে এই ভবে?
সেইরূপ হায়, হৃদি জলে যায়,
তিনি বিনা কে জিজ্ঞাবে॥
বিরহ-অনলে জ্বলিয়া পুড়িয়া
জীবন বহিয়া যায়,
দিবে নাকি নাথ! দিবে নাকি দেখা,
রাখিবে না রাঙা পায়?

কিসের লাগিয়া এ ভবে পাঠালে
কেন বা জনম তবে,
যদি তব সনে না হ'ল মিলন
বৃথা কেন এই ভবে?
তুমি ত আমার প্রাণের দেবতা
জীবন-সর্ব্বস্ব তুমি,
রামকৃষ্ণ-রূপে হৃদয়ে বসিয়া,
আছ তুমি অন্তর্যামী।
তুমি বিনা প্রভু কেহ কি গো কভু
করেছে আমারে স্নেহ?
আজীবন ধ'রে কাটায়েছি নাথ
মরম-বেদনা সহ॥

প্রাণের বেদনা তুমি বিনা আর
কে বুঝিবে বল প্রভু ?
তুমি যদি নাথ ভুলিয়া রহিবে
তব মুখ চা'ব তবু।
এস, প্রভু এস, শ্রীচরণে ধরি,
কে আর আমার আছে ?

পাতকীরে এবে, কে আর তরাবে
যাব আর কার কাছে ?
কাঙ্গালের মত যদি কেহ নাথ
থাকে এ জগত মাঝে,
দাসের মিনতি লও কোলে তুলি
(তোমার) কৃপণতা নাহি সাজে ॥

কাঙ্গাল।

জীবন-সমস্যা।

জীবনটা কি ? সত্যই এ জীবনটা যে কি, তাহা আমরা নিজেই বুঝিতে পারি না। এ জীবন কি গভীর জালে আবদ্ধ ? সে জাল ছিঁড়িবার কি আমাদের সাধ্য নাই ? সে জাল কি ?

সে জাল "মায়া"। মায়া এই জগতে সৃজিত হইয়াছে কেন ? সে ত জগতে না সৃষ্ট হইলেই পারিত। কিন্তু সেই মহামহিমাময় ঈশ্বর যে কি উদ্দেশ্যে মায়াকে জগতে প্রেরণ করিয়াছেন, ভ্রমান্ধ জীব আমরা—তাহা আর কি করিয়া জানিব ? তবে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে যাহা বিবেচনা হয় তাহাতে বলি, মায়া জগতে সৃজন না হইলে, পৃথিবী এত দিন জনশূন্য হইত। ভগবানের শক্তিরূপিণী "মায়া" একটী পরীক্ষা-কেন্দ্র। মায়ার জড়ীভূত হইয়াই জনক জননী সন্তান পালন করেন ও সৃষ্টি রক্ষা করেন। মায়ার বন্ধন যে কাটাইয়া উঠিতে পারে, সেই প্রকৃত বীর, সেই প্রকৃত ধার্ম্মিক।

জীবন কয়দিনের জন্য ? ঐ জীবন কয়দিন থাকিবে ? জগতে কি কেহ চিরজীবী হইয়া বাঁচিয়া থাকে ? বড় জোর সোত্তর কি আশী বৎসর। ইহাই বা কয় দিন ? দেখিতে দেখিতে জলের ন্যায় ইহা চলিয়া যাইবে। ভ্রমান্ধ নর ! একবার নদী-তীরে দাঁড়াও, দেখ তরঙ্গের পর তরঙ্গ চলিয়া যাইতেছে,—আর কি তাহা ফিরিয়া আসিতেছে ? না,—যাহা যায়, তাহা কি আর ফিরে ?

তবে, কেন এই জীবনে এত মায়া? এই দেহে কেন এত যত্ন? কেন এই দেহটাকে সাজাইতে বৃথা আয়াস?

দেহটা কি? দেহপিঞ্জর। মূর্খ মানব পিঞ্জরের পাখীকে দেখিয়াছ? সে পলায়নের জন্য ছটফট করে, কতবার পলায়নের অভিপ্রায়ে চঞ্চুপুটে পিঞ্জরে আঘাত করে, যদি তাহাকে ছিঁড়িয়া দেওয়া যায়, তখন সে উড়িয়া যায়। সে কি পরিত্যক্ত পিঞ্জরের পানে আর ফিরিয়া চায়? না,—ফিরিয়া চাহে না। সে কোন্ দিন কোন্ পিঞ্জরে যে আবদ্ধ ছিল, তাহা শীঘ্রই সে ভুলিয়া যায়।

সেইরূপ আমাদের দেহ-পিঞ্জরে প্রাণপক্ষী নিয়ত ছটফট্ করিতেছে; বার বার আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছে। যখন সে দেহ-পিঞ্জর ত্যাগ করে, তখন তাহার কি আনন্দ! সে আর সেই পরিত্যক্ত পিঞ্জরের পানে ফিরিয়াও চাহে না। কোন্ দিন যে সে পিঞ্জরে আবদ্ধ ছিল, তাহাও ভুলিয়া যায়।

মৃত্যু কি? মৃত্যু—মুক্তি, মৃত্যুই আমাদের পরম বান্ধব। মৃত্যুই পরমানন্দ, মৃত্যুই জীবনের পূর্ণ বিকাশ।

হে ধনী! বৃথা তোমার ধনগর্ব্ব! এ গর্ব্ব কয়দিন থাকিবে? যেদিন পরম সখা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইবে, সে দিন তোমার ধনগর্ব্ব কোথায় থাকিবে?

হে সংসারগর্ব্বী! বৃথা "আমার আমার" বলিয়া অহঙ্কার করিতেছ। কে তোমার, তুমিই বা কা'র, তাহা চিন্তা করিয়াছ কি? তোমার চক্ষে সংসার কত সুন্দর, কারণ তুমি মায়ায় আবদ্ধ! তোমার চক্ষে সংসারকে তুমি "আমার" বলিয়া দেখিতেছ, কারণ তুমি অন্ধ! কিন্তু এমন একদিন আছে, যে দিন এই আমিত্বটাকে বিসর্জ্জন দিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। এমন একদিন আসিবে, যে দিন তোমার নয়নকে অন্ধ, শ্রবণকে বধির, বদনকে মূঢ় ও দেহকে প্রাণ-হীন করিয়া ফেলিবে। তাই বলি, সব বাসনা বিসর্জ্জন দাও। যিনি সকলের আধার,—তাঁকে ডাক, সেই অভয়পদে শরণ লও।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য, যাহাদের পদতলে তুমি আত্ম-বিক্রয় করিয়াছ, যাহারা তোমাকে দাসের ন্যায় খাটাইতেছে, তাহাদের উপর তোমার প্রভুত্ব করিতে হইবে। আজ যাহারা তোমায় ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াই-

তেছে, দেখিবে তাহারাই তোমার পদানত দাস হইয়াছে। যাহারা পাপের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছে, তাহারাই ভগবানকে তোমার নিকট আনিয়া দিবে। কাম তখন মহাকাম-রূপে ঈশ্বরের কামনা করিবে; লোভ ঈশ্বরের চরণ দু'খানি পাইবার বাসনা করিবে; ক্রোধ, পাপে ক্রুদ্ধ করাইয়া দিবে। তাই বলি,—ফিরিয়া এস।

দেহ কি? এ দেহ চিরধ্বংসশীল। এই দেহে কিসের জন্য এত যত্ন! যে দেহ নরক-সদৃশ, পতনশীল, অস্থিমাংসের পিঞ্জর, যাহাকে জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড-পরিত্যাগের ন্যায় পরিত্যাগ করিতেই হইবে,—যাহা গলিত হইয়া কৃমি কীট উৎপন্ন করিবে, সেই ধ্বংসশীল দেহটাকে এত যত্ন করিবার আবশ্যক কি?

যিনি জগতের আদর্শ, যিনি চির-সত্য, যিনি জগতের হিতের জন্য অকাতরে নিজের দেহ ও প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন, সেই দেবাসুদেব মহাঋষি প্রাণের ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে মনপ্রাণ ঢালিয়া দাও। যাঁর নাম শুনিবামাত্র হৃদয়ে প্রেমের উজান বহে, যাঁর নাম শুনিলে নয়ন-কোণে আপনি আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হয়, সেই অনাদি অনন্ত বিরাটকায় পুরুষ-রূপ হৃদয়ে কল্পনা কর। মনে রাখিও—জীবন কয়দিন? সঙ্গে কিছুই যাইবে না। যাইবে কেবল ধর্ম্ম,—পাপ ও পুণ্য।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণাশ্রিতা।
সেবিকা—শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী।

আত্মসমর্পণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৪০ পৃষ্ঠার পর)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়।

নীলরতনের বাটী হইতে প্রায় অর্দ্ধেক ক্রোশ দূরে একটী দেবালয় ছিল। দেবালয়ে শ্রীশ্রী৺রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরে প্রবেশ করিবার দুইটী দ্বার, একটী পূর্ব্ব দিকে অপরটী পশ্চিমে। পশ্চিমদিকের দ্বারটী স্ত্রীলোকদিগের নিমিত্ত। মন্দিরের দুই পার্শ্বে দুইটী নহবতখানা,—প্রাতে এবং সন্ধ্যার সময়ে

সানাইয়ের সুললিত স্বর পল্লীবাসীর হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ আনয়ন করিত। মন্দিরের ভিতরে একটী বৃহৎ প্রাঙ্গণ। এইস্থানে রাস, দোল ও ঝুলনের সময়ে যাত্রা হইত। প্রাঙ্গণে একটী চণ্ডীমণ্ডপও ছিল। পূর্ব্বোল্লিখিত পর্ব্বোপলক্ষে তথায় শ্যামসুন্দরকে আনা হইত। মন্দিরে প্রবেশ করিলেই সম্মুখে শ্যামসুন্দরের ঘর এবং দুই পার্শ্বে সারি সারি ছয়টী করিয়া ১২টী ঘর। প্রত্যেক ঘরের সম্মুখে প্রশস্ত দালান। দালান এবং দালানে উঠিবার সিঁড়িগুলি মর্ম্মর-প্রস্তরে নির্ম্মিত। মন্দিরটী সদাসর্ব্বদা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হইত। ইহার এক পার্শ্বে গোলাপ, বেল, চামেলী, যূঁথি প্রভৃতি নানাবিধ ফুলের বাগান। সর্ব্বসাধারণ এই বাগানকে "শ্যামসুন্দরের বাগান" বলিত। মঙ্গল-আরতি সমাপন করিয়া মন্দিরের পুরোহিত বাসুদেব প্রত্যহ এই বাগান হইতে ফুল তুলিয়া শ্যামসুন্দরের পূজা করিত।

মন্দির-স্বামী এক জন বৃদ্ধ ব্যক্তি, তাঁহাকে দেখিতে সাধু ব্যক্তির ন্যায়। কিন্তু তাঁহার নয়নদ্বয় দেখিলে তাঁহাকে এক জন কুটীল ব্যক্তি বলিয়াই বোধ হইত। তাঁহার পরিধানে থান বস্ত্র, সর্ব্বাঙ্গে হরিনামাঙ্কিত, নাসিকায় তিলক, হস্তে হরিনামের ঝুলি এবং গাত্রে নামাবলি। তিনি হরিনামের মালা জপ করিতে করিতে ঠাকুর ঘরের সম্মুখস্থিত দরদালানে ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতেছিলেন ও মধ্যে মধ্যে শ্যামসুন্দরের দিকে তাকাইয়া, "হরি হে তোমার ইচ্ছা! হরি হে তোমার ইচ্ছা!" বলিতেছিলেন। ক্রমে বেলা হইতে লাগিল, মন্দিরে ২।১ জন করিয়া লোকের সমাগম হইতে লাগিল। কাহারও বৃক্ষ ফলবান্ হইয়াছে—সে প্রথম ফলটী শ্যামসুন্দরের জন্য আনিয়াছে, কেহ বা চারিটী ফুল তুলিয়া লইয়া আনিয়াছে, কেহ বা একগাছি মালা গাঁথিয়া আনিয়াছে, আবার কেহ বা প্রাতে শ্যামসুন্দরকে দর্শন করিতেই আসিয়াছে। তাহারা নিজ নিজ মনোসাধ মিটাইয়া ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল। তখন আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত মন্দির-স্বামী জনসমাগম দেখিয়া হস্তস্থিত মালাটী জপ করিতে করিতে শ্যামসুন্দরের দিকে তাকাইয়া বারংবার বলিতেছিলেন, "হরি হে তোমার ইচ্ছা, হরি হে তোমার ইচ্ছা!" এই সময়ে একজন যুবক আসিয়া বৃদ্ধকে প্রণামপূর্ব্বক বলিল—বাঁড়ুয্যে ম'শায়, আমার হিসেবটা দেখিয়াছেন কি? আমি বাপু দু'গাছা খা'লাস ক'রতে এসেছি।

বৃদ্ধও শ্যামসুন্দরের দিকে তাকাইয়া, "হরি হে তোমার ইচ্ছা, হরি হে তোমার ইচ্ছা" দুইবার বলিয়া আগন্তুককে বলিলেন,—তোমার সঙ্গে আর কি হিসেব ক'রবো বাবা—টাকা এনেছ, ঐখানে রাখ।

আগন্তুক বৃদ্ধকে সবিশেষ চিনিত; সেই জন্য সে বলিল—ভট্‌চায্যি ম'শয়কে বলুন না একবার হিসেবটা দেখতে—ভট্টাচার্য্য মহাশয়, ওরফে পুরোহিত ঠাকুর, লোহার সিন্দুক হইতে এক খানি লাল মলাট-বাঁধা খাতা আনিয়া বৃদ্ধের সম্মুখে রাখিলেন। বৃদ্ধ খাতার পাতা উল্টাইয়া আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি দু'গাছা বালা রাখিয়া ৬০৲ টাকা লইয়াছিলে?

আগ। আজ্ঞে না, ৫০৲ টাকা লইয়াছিলাম।

বৃদ্ধ। হাঁ হাঁ, তাই বটে, ৫টা যেন ঠিক ৬এর মত দেখাচ্ছে! আর তোমার কত সুদ পাওনা হ'য়েছে? খাতায় ৫ মাসের সুদ বাকী লেখা আছে।

আগ। সেকি ম'শায়? জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত সুদ যে চুকাইয়া দিয়াছি! কেবল আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র এই তিন মাসের সুদ পাওনা আছে।

বৃদ্ধ। তা' হতে পারে, হয়ত খাতায় তুলতে ভুল হয়ে গেছে। আচ্ছা, না হয় তোমার কথাই বিশ্বাস ক'রলুম—কিন্তু আশ্বিন মাসের সুদটা কি ফাউ নাকি?

আগ। আজ্ঞে, সেটা আপনার দয়া। আজ মাসের ১৪ দিন, সুদ দিতে বলেন দেবো।

বৃদ্ধ। দ্যাখ বাপু, আমার এই তেজারতি কারবার খালি পাঁচ জনের উপকারের জন্য—কি রকম বিপদাপন্ন হ'য়ে টাকা ধার ক'রতে এসেছিলে, মনে পড়ে কি?

আগ। মহাশয়, তিন বৎসর সুদ দিয়ে আস্‌ছি, আরও না হয় এক মাস দেবো। এখন মোট হিসাব কত হ'লো বলুন।

বৃদ্ধ। ৫০৲ টাকা আসল, আর আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন এই চার মাসের বার আনা করে ৩৲ সুদ, মোট ৫৩৲ টাকা—

আগ। মহাশয়, এই ৫২৲ টাকা লইয়া আমাকে রেহাই দিন—

বৃদ্ধ। দ্যাখ বাপু, এই একটা টাকাতে তোমার কি আসে যাবে? বরং এই টাকাতে শ্যামসুন্দরের ভোগ হ'লে তোমার ছেলেপুলে ভাল থাক্‌বে।

আগন্তুক দেখিলেন মিছামিছি বাক্যব্যয়ে লাভ নাই। তিনি ৫৩৲ টাকা দিয়া

বালা দুগাছি খালাস করিয়া লইয়া গেলেন এবং বৃদ্ধও নয়ন মুদিয়া ঘন ঘন মালা জপিতে লাগিলেন। তাহার পর সদু গোয়ালিনী আসিয়া বৃদ্ধের পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক বলিল, বাবাঠাকুর! আমার মাকড়ী দুটো দিন, টাকা এনেছি। বাসুদেব মাকড়ী দুটা আনিয়া সদুর হাতে দিল; সদুও পুরোহিতকে ১৩৵০ দিল। বৃদ্ধ টাকা দেখিয়া মালা জপিতে জপিতে বলিলেন, ও সদু! এত কম কেন?

সদু। কই না—আপনি ত সেদিন নিজে হিসেব ক'রে বলে দিলেন, তের টাকা দু আনা পাওনা!

বৃদ্ধ। সে দিন কি ব'লছো—হিসেব করেছিলুম ত ওমাসে, আর আজ হ'ল এ মাসের ১৪ দিন।

সদু। বাবাঠাকুর! গরীব লোক আমি, আমাকে দয়া ক'রে ওক'টা দিনের সুদ ছাড়িয়া দিন।

বাসুদেব ঐ কথা শুনিয়া সদুকে বলিল, সদু! তুমি এ কথা মুখে এনোনা। তোমার সুদ ছাড়লে সকলেরই সুদ ছাড়তে হ'বে। এ হচ্ছে ব্যবসা, এতে দয়া দেখালে কি চলে?

বৃদ্ধ। বাসুদেব! তুমি একটা মাকড়ী তুলে রেখে দাও। সদু ওবেলা ছয় আনা পয়সা এনে মাকড়ীটা নিয়ে যাবে এখন। এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ "হরি হে তোমার ইচ্ছা, হরি হে তোমার ইচ্ছা" বলিয়া ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতে লাগিলেন। বাসুদেবও প্রভুর আদেশানুযায়ী মাকড়ীটি তুলিয়া রাখিল। সদুও একটী মাকড়ী লইয়া ছল ছল নেত্রে বৃদ্ধকে মনে মনে বহু গালাগালি দিতে দিতে সে স্থান পরিত্যাগ করিল। তাহার পর আরও ২।৪ জন আসিল; বৃদ্ধও সুবিধামত কখনও ইচ্ছাপূর্ব্বক হিসাবে ভুল করিয়া, কখন বা সুদের পরিমাণ বাড়াইয়া, আবার সেয়ানা লোক দেখিলে ঠিক ঠিক হিসাব করিয়া, টাকা বুঝিয়া লইতে লাগিলেন। ক্রমে বেলা সাড়ে নয়টা বাজিল, পুরোহিত পূজায় বসিলেন এবং একজন পরিচারিকা আসিয়া বলিল, মা ঠাকরুণ ডাকছেন, একবার বাড়ীতে আসুন। বৃদ্ধ পরিচারিকার সহিত গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

পাঠক পাঠিকাগণ! আপনারা এই বৃদ্ধকে চেনেন? ইনি আমাদের পূর্ব্বপরিচ্ছেদের উল্লিখিত বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স আন্দাজ ৫০ বৎসর হইবে। বাহিরে দেখিতে একজন সাধুর ন্যায়, কিন্তু পাড়ার অধিকাংশ লোকই বলিত, তাঁহার

হত বদমায়েস আর গ্রামে ছুটী নাই। শুনা যায়, বেণীমাধবের অবস্থা পূর্ব্বে তত ভাল ছিল না। তাঁহার পিতা মৃত্যুকালে যৎসামান্য অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন। বেণী-মাধব নিজ বুদ্ধিবলে আজ বিপুল অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার তেজারতি কারবারই ভাগ্যোন্নতির প্রধান উপায়। তা' ছাড়া যে সমস্ত সম্পত্তি ঋণের দায়ে অতি সামান্য মূল্যে নিলাম হইয়া যাইত, বেণীমাধব তাহার সন্ধান রাখিতেন। সুবিধা পাইলেই সেই সমস্ত খরিদ করিতেন এবং সময়মত উচিত মূল্যে বিক্রয় করিতেন। তিনি এক্ষণে কামদেবপুর গ্রামের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত। লোকে তাঁহার সম্মুখে কিছু বলিতে পারিত না বটে, কিন্তু অন্তরে তাঁহাকে সুদখোর বলিয়া অত্যন্ত ঘৃণা করিত। তাঁহার জমিদারীর বার্ষিক আয় প্রায় ৩।৪ হাজার টাকা এবং তেজারতি কারবারও বেশ জোর চলিতেছিল। কাহারও ধার করিবার আবশ্যক হইলে বেণীমাধবের নিকট আসিলে নিশ্চয়ই ধার মিলিত। সচরাচর লোকে শতকরা ১৲ এক টাকা হিসাবে সুদ লইত, কিন্তু বেণীমাধব শতকরা দেড় টাকা লইতেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীক্ষীতিশচন্দ্র ঘোষ।

বিসর্জ্জন।

মানব সুখসাগরে মগ্ন থাকিলে আদৌ জানিতে পারে না,—কখন, কিরূপে তাহার সময় পূর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু মানব যখন দুঃখার্ণবে ভাসিতে থাকে, তখন ভাবে যে, উহার বুঝি আদি নাই, অন্ত নাই। এ পৃথিবীতে সুখের আস্বাদ পাওয়া বড়ই সুকঠিন, বড়ই পুণ্যের কথা। তাই হতভাগ্য মানবগণ কোন-প্রকারে সুখছবি দেখিতে পাইলে তাহাতে আপনহারা হইয়া ভাবে, যেন ইহার শেষ নাই। কিন্তু যখন উহার ভ্রম ভাঙ্গিয়া যায়, তখন প্রাণে একটা তীব্র বেদনা অনুভব করিয়া কেবলই চিন্তা করিতে থাকে, হায় রে! আমার এই সাধের সুখস্বপ্ন এত শীঘ্র যে ভাঙ্গিয়া যাইবে তাহা ত জানিতাম না।

"দিন যাবে বই রবে না,"—"চিরদিন কভু সমান না যায়"—এ মহাবাক্য মহাসত্য। বৎসরান্তে এই কয়দিনের জন্য হতভাগ্য সন্তানেরা জননীকে পাইয়া

কতই সুখী ছিল। কিন্তু তাহারা জানিত না যে, তাহাদের সুখনিশি দেখিতে দেখিতে অতিবাহিত হইবে! তাই আজ প্রাতঃকালেই নহবতের অন্য সুর উঠিয়াছে, অভিভাবকগণের ওষ্ঠে কাষ্ঠ হাসি লাগিয়াছে, সরল-হৃদয় শিশুগণও যেন প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতে পারিতেছে না। সকলেই যেন একটা অমঙ্গলাশঙ্কায় ভীত, যেন প্রত্যেকেরই মুখে একটা বিষাদ-প্রলেপ পড়িয়াছে। ইতর বিশেষ সর্ব্ব জনসাধারণেই যেন একটা অব্যক্ত তীব্র জ্বালা অনুভব করিতেছে; সারা বিশ্বটা যেন ফুকারিয়া কাঁদিতেছে। সূর্য্যদেব মাতৃচরণ দর্শন লাভাশায় যথাশীঘ্র কার্য্য সম্পাদনে ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া গৃহাভিমুখে ছুটিতেছেন। নীলাকাশে ক্ষীণজ্যোতিঃ শারদীয় চন্দ্র কর্ত্তব্যের দায়ে ভাসিতেছে, যেন ঐ কার্য্যে উহার প্রাণ নাই। পবনদেবও স্বকার্য্যে পূর্ণ মনোনিবেশ করেন নাই।

উমানাথ আজ সতীরাণীকে গৃহে লইয়া যাইবেন। কখনও নন্দী, কখনও বা ভৃঙ্গীকে বলিতেছেন, ওরে তাড়া দে, বেশী রাত করা ভাল নহে। বাড়ীর পুরস্ত্রীরা যেন ঐ কথা কর্ণে আদৌ স্থান দিতেছেন না—মাকে বরণ করিতেই ব্যস্ত। তাঁহারা নয়নজলে ভাসিতেছেন ও কাতরকণ্ঠে বলিতেছেন,—মা, আবার যেন আগামী বৎসরে তোর চরণ দর্শন করিতে বঞ্চিত না হই।" অবশেষে বিদায়-সঙ্গীত বাজিল—ধীরে ধীরে মাকে লইয়া সকলেই জাহ্নবীকূলে গমন করিল। অতঃপর "মা মা" রবে দিগন্ত কাঁপাইয়া তাঁর পবিত্র মন্ত্রপূত প্রতিমাখানি সুরেশ্বরীর গর্ভে "বিসর্জ্জন" দিল। তৎপরে ক্ষুণ্ণ মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া এক বৎসর ব্যাপিয়া জননীর আগমনী-গীত পুনরায় শুনিবার জন্য ব্যাকুলচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিল।

আশ্বিন মাসে মা তিন চারি দিনের জন্য আসিয়া আমাদের একটা Impetus দান করেন। আমাদের মধ্যে যে Potentialities আছে, সেগুলাকে একটু নাড়াচাড়া দিয়া জাগাইয়া দিবার চেষ্টা করেন। প্রত্যেক মানব-হৃদিকন্দরে একটা লুক্কাইত প্রেমের বন্যা আছে। সেইটাতে মা "মরা গাঙ্গে বাণ ডাকাবার" জন্য চেষ্টা করেন। "জ্ঞানদীপ জ্বেলে ঘরে ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখনা"—এই ভাবটাকে পুষ্ট ক'রবার জন্য আদ্যাশক্তি যথেষ্ট চেষ্টা করেন। এই কারণে আমাদের শাস্ত্রকারগণ প্রতি বৎসরে "বিসর্জ্জনের" প্রথা করিয়াছেন।

আশ্বিন মাসে দুর্গা পূজা কে সৃষ্টি করেন? নর-নারায়ণ বীর ভক্ত-চূড়ামণি

শ্রীরামচন্দ্র জগৎশত্রু নিপাতের জন্য মাব পূজা করেন। যখন রামচন্দ্র জানিতে পারিলেন যে, দুর্গতিনাশিনী জগন্মাতার সাধনা করিতে পারিলে সকল বিপদই সত্বরে দূরে পলায়ন করে, তখন তিনি প্রাণপ্রিয়া সীতার উদ্ধার মানসে তমঃ-প্রতিমূর্ত্তি রাবণ-বধে সংকল্প করিয়া পূজায় বসিলেন। মাও পরীক্ষা করিতে ছাড়িলেন না। রণক্ষেত্রে বহু আয়াসলব্ধ হনূ আনিত নির্দ্দিষ্ট ১০৮ নীলপদ্ম হইতে একটী অপসারিত করিলেন! পূজামগ্ন রামচন্দ্র ইহা কিছুই জানিতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে পূজার শেষমুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল। কিন্তু কি ভয়ানক ব্যাপার! একটী নীলপদ্ম যে নাই! বীরবর পবননন্দনকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "প্রভো! আমি আপনার জন্য বহু কষ্টে বহু স্থান অনুসন্ধান করিয়া ১০৮টী পদ্ম আনয়ন করিয়াছিলাম। আপনিও উহা গণনা করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এখন একটী পদ্ম নাই; ইহার কারণ কি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তবে কি এ পূজায় মা সন্তুষ্ট নন?" তদুত্তরে জানকীবল্লভ মৃদু হাস্যে কহিলেন, "বৎস, ইহার মধ্যে এক শুভ-রহস্য আছে—ইহা মার খেলা,—একটা পরীক্ষা। ব্রহ্মাদি যাঁরে অধিকক্ষণ ধ্যানে ধারণা করিতে পারেন না, অজ্ঞান অবোধ আমি সামান্য পূজায় স্বকার্য্য সাধনার জন্য তাকে সন্তুষ্ট করিবার ধৃষ্টতা করিতেছি। কিন্তু ইহার একটী মাত্র উপায় আছে।" জ্যেষ্ঠগত-প্রাণ নিত্য-শুভানুধ্যায়ী চিরকুমার বালযোগী লক্ষ্মণ সোৎসুকে বলিলেন, "কি উপায় দাদা"? তখন ঐ জিতেন্দ্রিয় বনচারী কহিলেন, "মানবে আমাকে পদ্ম-পলাশ-লোচন বলিয়া জানে। অতএব এখনও আমার নিকট দুইটী পদ্ম আছে, মার পূজায় একটী আঁখি পদ্মরূপে ব্যবহৃত হইবে। ইহাতে আমার ক্ষোভের কারণ কিছুই নাই। দেব কার্য্যে যদি এই মাটীর দেহের নাশ হয়, তাহা হইলে ত নরজন্ম সার্থক হয়। এই কথা শুনিয়া রক্ষকুল-প্রহ্লাদ ধর্ম্মপ্রাণ বিভীষণ কাতর কণ্ঠে বলিলেন, "আপনি এই সঙ্কল্প ভুলিয়া যান। আপনি আমাদের ত্যাগ করিলে আমাদের দশা কি হইবে? আপনার আগমন প্রতিক্ষায় জানকীদেবী আশা-পথ চাহিয়া আছেন। তিনি যে আপনাকে ভিন্ন আর কাহাকেও জানেন না। একবার আপনার গৃহচিত্রও স্মরণ করুন। সেখানে পতিবিয়োগ-বিধুরা চিন্তানলদগ্ধা পুত্র-মুখ-দর্শনপ্রার্থী স্নেহময়ী জননী কৌশল্যাদেবীর বিষাদময়ী

মুখছবি কি একবারও আপনার স্মৃতিপথে উদয় হইতেছে না? আপনি এত নির্ম্মম, এত নিষ্ঠুর, তাহা আমরা পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই। এত জনকে দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিবেন না, দয়াময়।" তখন নীরদবরণ বলিলেন, "আমি সমস্ত চিন্তা করিয়াছি। পিতা যার ইন্দ্র-সখা ছিলেন, জন্ম যার চিরপবিত্র রঘুকুলে, কেমনে সেই হতভাগ্য লোক সমাজে তার ঘৃণিত জীবন বহন করিবে? মানবে যখন ঘৃণা-বিজড়িত স্বরে বলিবে "এই না সেই ইক্ষুকুলাঙ্গার? তোমার সকল চিত্র অপেক্ষা আমি এই চিত্রে অধিক ভীত। অতএব বন্ধুগণ! তোমরা আর আমাকে বৃথা বাধা দিও না।"

এই বলিয়া যখন তিনি হাসিতে হাসিতে তাঁর প্রিয় ধনুকটীতে জ্যা রোপন করিয়া একটী তীক্ষ্ণ শর সংযোজন করিলেন, তখন সকলে "মাগো" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। সম্পূর্ণ অবিচলিত ভাবে কমললোচন স্বীয় নেত্র উৎপাটন করিবার জন্য বাণমুখ নেত্রপ্রতি লক্ষ করিয়া টানিলেন। এমন সময়ে স্বর্গে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল, ভক্তবীরের মস্তকে পুষ্প-বৃষ্টি হইল, অদূরে অভয়-বাণী হইল, "তিষ্ঠ তিষ্ঠ"। পরীক্ষার শেষ হইল। সকলেই যেন ততক্ষণ একটা মোহের আবরণে ছিল। উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে যুগপৎ আহ্লাদে ও বিস্ময়ে একেবারে মুহ্যমান হইয়া গেল! রামচন্দ্রও যাহা দেখিলেন তাহাতে রোমাঞ্চিত-কলেবর হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, মেঘকোল হইতে প্রসন্ননয়না সিংহবাহিনী বরাভয় করে ধীরে ধীরে তাঁহারই নিকট অগ্রসর হইতেছেন। নিকটে আসিয়া বলিলেন "বৎস তোমার স্তবে আমি সন্তুষ্ট। বর প্রার্থনা কর।" তিনিও অভিপ্সিত বর যাচ্ঞা করিলেন। দেবীও "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। তারপর প্রতিমার "বিসর্জ্জন" হইল। আমাদের যুগাবতার প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণদেবও "দেখা দিবি না, দেখা দিবি মা" ব'লে মার দেখা পান। তিনি বলেন "ঠিক তোমাদের সঙ্গে যেমন কথা হ'চ্ছে, সেই রকম মার সঙ্গে কথা ক'য়েছি।

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হিন্দু কখনও মাটীর প্রতিমা পূজা করে না। নিরাকারের সাহায্য পায় বলিয়াই সাকারের অবতারণা। পূজার মত পূজা হইলে ঐ মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতেই প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। নিজের আত্মাকে পবিত্র করিতে পারিলেই অভীষ্ট দেবতার সাক্ষাৎ লাভ হয়। যিনি যত পরিমাণে নিজের

আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি তত পরিমাণে মুক্তির পথে অগ্রসর হইয়াছেন। যিনি নিজের আত্মাকে পরমাত্মার অংশ বিশেষ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহার নিকটে মানব-জগতের শোক দুঃখ তত প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে না। প্রত্যেক মানবেরই হৃদয়কন্দরে ফল্গুনদীর প্রেমধারা বহিতেছে। একবার সেই লুক্কায়িত শক্তি উদ্দীপিত করিতে পারিলে নিশ্চয়ই অসাধ্য সাধন হয়।

এই জন্যই ঠাকুর শ্রীমুখে বলিয়াছেন, "প্রেমবাতাস তো চিরকালই সমভাবে বহিতেছে, পাল তুলে দিতে পারলেই হয়।" আবার কোথাও তিনি বলিতেছেন, "তোমরা এক পা এগুলে, তিনি দশ পা আসেন।" জীবের মঙ্গল তরে তাঁর প্রাণ সতত কাঁদিতেছে। উট কাঁটা ঘাস খাইয়া মুখ ছিঁড়িতেছে, তবু তাহার মায়া ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। ত্রিতাপতাপে তাপিত মানব সংসারে রাঙ্গা-ফলের আশাও ত্যাগ করিতে পারে না, সুতরাং শান্তির সুশীতল ছায়ায় বিশ্রাম করিয়া স্নিগ্ধ হইবারও অবকাশ পায় না।

এই জন্যই একজন ভক্তকবি লিখিয়াছেন—

"আমি সকল কাজের পাই হে সময়
(শুধু) তোমারে ডাকিতে পাইনে।
আমি চাহি দারা-সুত, সুখ সম্মিলন,
তব সঙ্গ-সুখ চাহিনে॥
আমি কতই যে করি বৃথা পর্য্যটন,
তোমারি কাছে ত যাইনে।
আমি কতই যে খাই, ভস্ম আর ছাই,
তব প্রেমামৃত খাইনে॥
আমি কত গান গাহি, মনেরি হরষে
তোমার মহিমা গাইনে।
আমি বাহিরের দুটো আঁখি মেলে চাই,
জ্ঞান-আঁখি মেলে চাইনে॥
আমি কার তরে দেই আপনা বিলায়ে
তব পদতলে বিকাইনে।

আমি সবারে শিখাই কত নীতিকথা,—
(নিজ) মনেরে শুধু শিখাইনে॥"

অমর কবি বড় দুঃখে বলিয়াছেন—

"যাহা পাই তাহা ঘরে লয়ে যাই,
আপনারই মন ভুলাতে।
শেষে দেখি, হায়! সব ভেঙ্গে যায়,
ধূলা হয়ে যায় ধূলাতে॥"

ভক্ত-চূড়ামণি পূজ্যপাদ শ্রীরামচন্দ্র—কামিনীকাঞ্চন, অহঙ্কার দূরে নিক্ষেপ করিয়া তবেই অনাথ-নাথ দীনবন্ধু, ভক্তবৎসল, প্রভু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় শিষ্যরূপে কৃপালাভ করিয়া নরজন্ম সার্থক করিয়াছিলেন।

তাই অনাথবন্ধু ঠাকুর শ্রীমুখে বলিয়াছেন, "যে কেহ তাঁকে পাইবার জন্য, তাঁকে বুঝিবার জন্য আমার নিকট আসিবে, তার মনোরথ পূর্ণ হইবে। কিন্তু সাবধান! বিষয়-কামনার লেশমাত্র গন্ধ থাকিলে তাঁর নিকট উপস্থিত হইয়া কি ফল ফলিবে?

জনৈক পাষণ্ড।

পরমার্থ ব্যাখ্যানমালা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৮৩ পৃষ্ঠার পর)

(১ শম, ২ দম):—বৈদ্য শাস্ত্রে রোগ উৎপন্ন হইলে ঔষধাদি দ্বারা তাহার প্রতিকার করা অপেক্ষা, রোগ যাহাতে উৎপন্ন না হয় তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া অধিক হিতকর বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। তদ্রূপ মনোবিকার উৎপন্ন হইলে তাহাকে সংশোধন ও বশীভূত করিতে যত্ন করা অপেক্ষা, যাহাতে আদৌ বিকার না জন্মিতে পারে, তাহারই চেষ্টা করা অধিক শ্রেয়স্কর সন্দেহ নাই। কোনও বস্তু হইতে মনোবিকার উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে, উহা বাহ্যেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হওয়া আবশ্যক; তদ্ভিন্ন উক্ত বস্তু দ্বারা মোহিত হওয়াই অসম্ভব। অতএব যদি সেই বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে দূরে রাখা হয় এবং তাহাতে ইন্দ্রিয়-জাত জ্ঞান উৎপন্ন হইতে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে ইন্দ্রিয় দ্বারা মানুষের

আবদ্ধ হইবার আর আশঙ্কা থাকে না। ফলতঃ সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়কে আপনার অধীন রাখিয়া তাহাদিগকে মোহপ্রদ বিষয়াভিমুখে না যাইতে দেওয়াই কর্ত্তব্য।

অকস্মাৎ কোনও কারণে কোনও বস্তু দ্বারা মনোবিকার উৎপন্ন হইলে, যদি আমরা হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়কে সেই বিষয়ে আসক্ত হইতে না দিয়া আপনাদিগের আয়ত্ত রাখি, তাহা হইলে আর আমরা মন্দ আচরণ করি না এবং ভবিষ্যতে অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনাও থাকে না। এই জন্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ন্যায় কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকেও আয়ত্ত রাখা মুমুক্ষুগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়গণকে প্রবৃত্তি মুখে ধাবমান হইতে না দেওয়াকেই দম বলে।

"বিষয়েভ্যঃ পরাবৃত্য স্থাপনং স্ব স্ব গোলকে।
উভয়েষামিন্দ্রিয়ানাং স দমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয়কেই স্ব স্ব গোলক মধ্যে আবদ্ধ রাখাকেই দম কহে। ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ের দিকে না যাইতে দেওয়াই উত্তম উপায়। কারণ সুমিষ্ট ফল বা অন্ন ভোজন না করিলে তাহার উপর আসক্তি কিরূপে জন্মিবে? সুন্দরী কামিনী অবলোকন না করিলে মোহ উৎপন্ন হয় না এবং মধুর সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণ না করিলে বা সুগন্ধ দ্রব্য আঘ্রাণ না করিলে, সাধকের তাহাতে প্রলুব্ধ হইবার অবসরই হইবে না। এই জন্য সাধক মাত্রেরই নিয়ত দম গুণ অভ্যাস করা আবশ্যক। যে বিষয় দ্বারা মানুষের সুখ হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা হইতে দূরে থাকাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

"যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

কূর্ম্ম যেমন আপন অঙ্গ সকল সংকোচ করে, সেইরূপ যিনি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহরণ করেন, তাঁহাকেই স্থিরপ্রজ্ঞ জানিবে।

কিন্তু যাঁহাকে এই সংসারে থাকিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে এবং স্ত্রী পুত্রাদি প্রতিপালন করিতে হইবে, তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাপার রুদ্ধ রাখিলে চলিবে কেন? তিনি ত আর দিবা রাত্রি চক্ষু-কর্ণ-নাসা বন্ধ রাখিতে পারেন না। "চক্ষের অন্তরাল হইলেই মনের অন্তরাল হয়" ইহা কতক অংশে সত্য বটে, কিন্তু যেখানে প্রেম বা আসক্তি অতিশয় প্রগাঢ় সেখানে এ কথা খাটে না।

"স্নেহানাহুঃ কিমপি বিরহে ধ্বংসিনস্তে ত্ব ভোগাৎ।
ইষ্টে বস্তুন্যুপচিত রসা প্রেমরাশীর্ভবন্তি॥"

বিচ্ছেদ দ্বারা স্নেহ বিনষ্ট হয় এ কথা সত্য নহে, কারণ উপভোগ করিতে না পাইলে ইষ্ট বস্তুতে আসক্তি বৃদ্ধি পায় এবং সমধিক প্রবল হইয়া উঠে।

মনের স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রবল। যতদিন পর্য্যন্ত বিষয়ভোগে বিরক্তি না জন্মে, ততদিন পর্য্যন্ত বিষয়ের অনুপস্থিতিতে স্মৃতির মনোবিকার ঘটাইয়া থাকে এবং বিষয়-বাসনা বর্দ্ধিত করে। অতএব মনের নিগ্রহ করিয়া বাসনা বর্জ্জন করাই বিধেয়। ইহাই শম।

"সদৈব বাসনা ত্যাগঃ শমোঽয়মিতি শব্দিতঃ।"

নিরন্তর বাসনা ত্যাগকেই শম কহে। কিন্তু বিষয়-বাসনাকে মন হইতে বিদূরিত করিতে হইলে, মনের উপর সম্পূর্ণ অধিকার থাকা চাই। ইহা অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। বিষয়ের প্রতি মন এতই লুব্ধ যে, উপভোগ করিতে না পাইলেও ইহা নিশ্চেষ্ট থাকে না, পরন্তু বিষয়-চিন্তাতেই রত থাকে। সেই জন্য পরমার্থ সাধনে মনকে নিগৃহীত করাই অত্যন্ত আবশ্যক বলা হয়। মন বিষয় হইতে নিবৃত্ত না হইলে মুক্তির সম্ভাবনা কোথায়?

"মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধ মোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্ত্যৈ নির্ব্বিষয়ং স্মৃতং॥"

মনই মনুষ্যের বন্ধন বা মোক্ষের কারণ। ইহা বিষয়াসক্ত হইলে মনুষ্য বদ্ধ হয় এবং বিষয়-বিমুক্ত হইলেই মোক্ষের কারণ হইয়া থাকে।

এই জন্য মনকে বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা মুমুক্ষু মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

"যতো নির্বিষয়স্যাস্য মনসো মুক্তিরিষ্যতে।
অতো নির্ব্বিষয়ং নিত্যং মনঃ কার্য্যং মুমুক্ষুণা॥"

যে হেতু মন বিষয়-বিমুখ হইলেই মুক্তি নিশ্চিত, তখন মুমুক্ষু ব্যক্তি মনকে বিষয়-বিমুক্ত করিবার জন্য নিত্য যত্ন করিবেন।

এখন মনকে কি প্রকারে বিষয়-বিমুখ করা যায়? মন ত বিষয়কে অত্যন্ত ভাল বাসে, তাহার বিষয় লোভ ত নিবারণ হইবার নহে; তবে কিরূপে তাহাকে বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায়? নিম্ন কথিত দুইটি উপায় অনেক সাধকের পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিতে পারে। প্রথমতঃ, যে বিষয় মনের অত্যন্ত প্রিয়

ও মোহজনক, তাহার সত্য স্বরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিবে। এরূপ যথারীতি বিচার করিলে দেখিতে পাইবে যে, তাহা দোষযুক্ত, অনিত্য ও পরিণামে দুঃখ-প্রদ। মুমুক্ষুগণের এই বিশ্বাস দৃঢ় ও স্থির হইলে, ক্রমে বিষয়-সুখে বিরক্তি জন্মিবে এবং মন নিশ্চয়ই বিষয়-বিমুখ হইবে। দ্বিতীয় উপায় এই:—মনকে সর্ব্বদা সৎ বস্তুর দিকে লইয়া যাইবার অভ্যাস করিবে। পরম বস্তু ঈশ্বরই নিত্য ও আনন্দময়। তাঁহার সাক্ষাৎকার হইলে জীব সংসারচক্র হইতে মুক্ত হইয়া শাশ্বত মোক্ষ সুখের অধিকারী হয়। তজ্জন্য নিয়ত ঈশ্বর-চিন্তা করিবে। তাহা হইলে অভ্যাস দ্বারা ক্রমে ক্রমে মনের স্বাভাবিক গতিই ঈশ্বরাভিমুখী হইবে। এই উভয় প্রকার অভ্যাসই শম সাধনের অঙ্গ এবং সাধকগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।

"বিরজ্য বিষয় ব্রাতাদ্দোষ দৃষ্ট্যা মুহুর্মুহুঃ।
স্বলক্ষ্যে নিয়তাবস্থা মনসঃ শম উচ্যতে॥"

বিষয়ের বারম্বার দোষ দর্শন করিয়া মন যখন স্বীয় লক্ষ্য বস্তু পরব্রহ্মে নিয়ত ভাবে অবস্থান করে, তখন তাহাকে শম বলা যায়।

শম ও দম (মনঃ সংযম ও ইন্দ্রিয় সংযম) এই উভয় উপায়েই মনকে বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। ইহাতেই যে একেবারে কৃতকার্য্য হওয়া যায়, এমন নহে। পরন্তু পুনঃ পুনঃ পরাভবের সম্ভাবনাই অধিক। তথাপি ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক এবং সত্যতা ও অধ্যবসায় সহকারে যত্ন করা কর্ত্তব্য।

"যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥"

প্রবল ইন্দ্রিয়গণ যত্নশীল বিবেকী পুরুষের চিত্তকেও বলপূর্ব্বক হরণ করে।

এত প্রবল ইন্দ্রিয়গণের সহিত দুর্ব্বল মানব কি প্রকারে যুদ্ধ করিবে? তবে কি তাহাদের নিকট পরাভূত হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে হইবে? কখনই না, সাধকের হতাশ হওয়া কোন মতেই উচিত নহে। বহুবার পরাজিত হইলেও, পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে হইবে এবং অবশেষে ঈশ্বরানুগ্রহে অবশ্যই এই সংগ্রামে জয়লাভ হইবে, সন্দেহ নাই।

"তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎ পরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥"

সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া যোগী ব্যক্তি মৎপরায়ণ হইয়া থাকিবে। যাহার ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত আছে, তাহারই স্থিরবুদ্ধি হইয়াছে জানিবে।

সেইরূপ মনকে নিগ্রহের দ্বারা ক্রমে ক্রমে সমস্ত বাসনা হইতে নিরস্ত করিতে হইবে; নতুবা মনই অনেক সময় ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়-সুখে রত করিবে। এইরূপে মুমুক্ষুগণ বহু বৎসর ব্যাপিয়া মন ও ইন্দ্রিয় সংযমে নিয়ত নিরত থাকিলে অচিরাৎ সংসার-দুঃখের অবসান হইবে, এবং পরমার্থ সাধনের পথে আর বিঘ্ন ঘটিবে না।

"বাসনা সং পরিত্যাগে যদি যত্নং করোষ্যলম্।
তাত্তে শিথিলতাং যান্তি সর্ব্বাধি ব্যাধয়ঃ ক্ষণাৎ॥"

যদি তুমি বাসনা-ত্যাগ কল্পে সম্পূর্ণ যত্ন কর, তাহা হইলে তোমার সমস্ত আধিব্যাধি মুহূর্ত্ত মধ্যে হ্রাস প্রাপ্ত হইবে।

তৃতীয় "উপরতি"—কাম ক্রোধাদি বিকার সম্বন্ধে আমরা এতক্ষণ বিচার করিলাম। কিন্তু মনের দুইটী ভাগ আছে, একটী বিকারময় অপরটি কল্পনাময়; এক্ষণে এই কল্পনাশক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। এই শক্তি অতি অদ্ভুত, ইহা ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যের অপেক্ষা করে না। বিষয় সম্মুখে না থাকিলেও, কল্পনা-শক্তিবলে মনোমধ্যে বিষয়-চিন্তা করা যায় ও তদ্দ্বারা এক প্রকার সুখও উৎপন্ন হয়। সাধকগণের কর্ত্তব্য, এই শক্তিকে নিগৃহীত করিয়া ইহাকে বিষয় হইতে ঈশ্বরাভিমুখে পরিচালিত করা ও ঈশ্বর-চিন্তায় নিযুক্ত রাখা। এইরূপ করার নাম উপরতি।

"বাহ্যানালম্বনং বৃত্তে রেষোপরতিরুত্তমা।"

মনোবৃত্তিকে বাহিরে (বিষয় কার্য্যে) যাইতে না দেওয়াই উৎকৃষ্ট উপরতি। কিন্তু মুমুর্ষুগণ কি জন্য কল্পনাশক্তিকে চাপিয়া রাখিবেন? কল্পনাময় মনোরাজ্যে সুখভোগ করায় কি অনর্থ ঘটিতে পারে? কামক্রোধাদি অহিতকর রিপুগণের নিগ্রহ আবশ্যক বটে, কিন্তু কল্পনাশক্তিপ্রসূত সৃষ্ট পদার্থের দ্বারা মনোরাজ্যে যদি সুখ সম্ভোগ করা যায়, তাহাতে হানি কি?

"ত্যজ্যতা মেবকামাদির্মনোরাজ্যেতু কা ক্ষতিঃ।
অশেষ দোষ বীজত্বাৎ ক্ষতির্ভগবতেরিতা॥"

কামাদি বিকার ত্যাগ করা আবশ্যক হইলেও মনোরাজ্য হইতে তাহাদের

বর্জ্জনের আবশ্যক কি? ইহা অশেষ দোষের বীজ-স্বরূপ, এই জন্য মহাপুরুষগণ ইহাকে ক্ষতিকারক বিবেচনা করেন।

কিন্তু ইহা সত্য কি? মনোরাজ্যে বাস্তবিক ত কিছুই নাই, কল্পনা-বলে জগৎ সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা মনে মনে সুখসম্ভোগ হয় মাত্র, সত্য সত্য ত কোনও কার্য্য করা হয় না এবং কোনও পদার্থ প্রাপ্তও হওয়া যায় না; তবে ইহা কি প্রকারে দূষণীয় হইল? ইহার উত্তর এই যে, বিষয়-চিন্তা বৃথাই হউক বা সত্যই হউক, ইহা পরিণামে দুঃখদায়ক, ইহার দ্বারা বিষয়শক্তি স্থায়ী হইয়া যায় এবং মুমুক্ষুগণ মন ও ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সমূহের মধুরতা বিস্মৃত হইতে পারেন না, সুতরাং ইহা কখন না কখন তাঁহাদিগকে বিপদে ফেলিবে।

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি-বিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

বিষয়-চিন্তা হইতে মনুষ্যের বিষয়াসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে অভিলাষ, অভিলাষ হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতি-শক্তির বিনাশ ও পরে বুদ্ধি নাশ হয়। বুদ্ধি নাশ হইলেই পুরুষের সর্ব্বনাশ বা অধোগতি হইল। অতএব মুমুক্ষুগণ বিষয়ের চিন্তা পর্য্যন্ত করিবেন না। কিন্তু প্রবল কল্পনাশক্তিকে অভ্যাস দ্বারা ত্যাগ করিয়া কিরূপে চিত্তকে বিষয় হইতে বিরক্ত করিয়া ঈশ্বর-চিন্তায় ব্যাপৃত রাখিতে হইবে, তাহাই আলোচনা করা যাউক। প্রথমতঃ এই কল্পনাশক্তিকে একেবারে নিরুদ্ধ করিয়া মনকে আপনার অধীন রাখিতে চেষ্টা করিতে হইবে। বিষয়ের দিকে মনকে যাইতেই দিবে না, প্রথম প্রথম চঞ্চল মনকে অধিকক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারা যাইবে না সত্য, তথাপি প্রত্যহ অল্প অভ্যাস করিতে করিতে সাধকের মন নিরুদ্ধ করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। ইহা একপ্রকার অভ্যাস মাত্র।

"শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃতি গৃহীতয়া।
আত্ম সংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥"

মনকে আত্মাতে নিহিত করিয়া স্থির বুদ্ধি দ্বারা অল্পে অল্পে বিরতি অভ্যাস করিবে; অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না। কিন্তু একাধিক্রমে অনেকক্ষণ মনকে

নিরুদ্ধ রাখা দুঃসাধ্য, তজ্জন্ত এক একবার অন্য দিকে মন যাইলে ক্ষতি নাই; তবে অবিলম্বেই পুনশ্চ তথা হইতে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। চঞ্চল মন আপনা হইতেই বিষয়ের দিকে ছুটিবে, কিন্তু বিষয়ী লোক যেমন স্বেচ্ছায় মনকে সংযুক্ত করে, সাধক সেই প্রকার সংযুক্ত থাকিতে দিবেন না, বরং শীঘ্র উহাকে অভ্যন্তরস্থ আত্মায় সংযুক্ত করিয়া দিবেন অর্থাৎ ঈশ্বর-চিন্তায় ব্যাপৃত রাখিবেন।

"যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চল সস্থিরং।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥"

চঞ্চল-স্বভাব মন যে যে বিষয়ে বিচরণ করিবে, সেই সেই বিষয় হইতে তাহাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আত্মায় বশীভূত করিবে।

মনোনিগ্রহ অভ্যাসের তৃতীয় উপায় এই যে, যখনই মন কোনও বিষয়াভিমুখে ধাবিত হইবে, তখনই চিন্তা করিয়া দেখিবে যে ঐ বিষয় অসার, নশ্বর ও অনেক দোষযুক্ত, উহা ত্যাগ করাই বিধেয়। এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিলে মন স্বতঃই তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবে।

এইরূপে তিন প্রকার অভ্যাস দ্বারা মন আপনার অধীন হইলে, তখন তাহাকে একেবারে নিরুদ্ধ করা সহজ হইবে। অবশ্য বলা যত সহজ, কার্য্যে করা তত সহজ নহে। মনোবৃত্তির জয় করিতে হইলে, ভগীরথ মর্ত্ত্যে গঙ্গা আনয়ন করিতে যে প্রকার যত্ন প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা অধিকতর যত্নেরও আবশ্যক। অটল ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের আবশ্যক। ইহাতে কখনও কখনও মুমুক্ষুর নিরুৎসাহ হওয়া বিচিত্র নহে, কারণ অর্জ্জুনের ন্যায় পরাক্রমশালী পুরুষও স্বীকার করিয়াছেন।

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথী বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করং॥"

মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, উপদ্রবী, বলবান ও একগুঁয়ে, বায়ু রোধ করা সহজ কিন্তু মনকে নিগৃহীত করা আরও কঠিন। দুষ্কর হউক, কিন্তু শ্রীভগবান তাহার দুইটী উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলং।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে॥"

চঞ্চল মন যে দুর্নিগ্রহ তাহাতে সংশয় নাই, তথাপি অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা তাহাকে আয়ত্ত করা যায়।

অভ্যাসই সকল সিদ্ধির মূল, ইহার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। সাংসারিক কার্য্য বল, বিদ্যা উপার্জ্জন বল, কলাকুশলতা বল, সকল বিষয়েই ইহার সহায়তা আবশ্যক। এই অভ্যাস সাধনে অবহেলা করিলে সুসাধ্য কার্য্যও দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। এমন কি :—

"অনভ্যাসেন মর্ত্ত্যস্য প্রাপ্তো যোগোঽপি নশ্যতি।"

অনভ্যাস হেতু মানবের প্রাপ্ত যোগও নষ্ট হইয়া যায়। বৈরাগ্যই মন জয় করিবার একটী সাধন। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই অনেক বিচার করা হইয়াছে। এক্ষণে মুমুক্ষুগণ ইহাদের পরস্পরের সহিত কি প্রকার সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। শম, দম ও উপরিত দ্বারা বৈরাগ্যের সহায়তা হয়, আবার বৈরাগ্য দ্বারা শমাদি সাধনের সহায়তা করে। এই সাধনাগুলি পরস্পরের সহায়তা করে, সুতরাং যে পরিমাণে অভ্যাস করা যায়, ফলও তদ্রূপ হইবে এবং সাধকের পরমার্থ সাধনে উন্নতি হইতে থাকিবে।

চতুর্থ, তিতিক্ষা—উল্লিখিত উপায়ে মনকে বিষয়াভিমুখে যাইতে না দেওয়া, উপভোগের আসক্তি ত্যাগ করা, ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত রাখা বা মনোনিগ্রহ করা, এ সাধনায় রত থাকিলেও মুমুক্ষু দুঃখ ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ পাইতেছেন কই? অনেক দুঃখ, অনেক ব্যাধি, অনেক সঙ্কট আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইবে, তখন তাঁহার উপায় কি? এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

দুঃখ ত্রিবিধ যথা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক।

"দেহেন্দ্রিয় মনঃ প্রাণৈঃ সুখং দুঃখং যদাপ্যতে।
ইমমাধ্যাত্মিকং তাপং বিজানীয়াদ্ধি দেহীনাং॥"

দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ হইতে যে সুখ দুঃখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকেই দেহীর আধ্যাত্মিক তাপ বলিয়া জানিবে।

এখানে সুখকেও দুঃখের মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে, কারণ সুখেও মানুষের বুদ্ধি চঞ্চল হইয়া ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে।

"আধ্যাত্মিকো বৈ দ্বিবিধঃ শারীরো মানসস্তথা।"

আধ্যাত্মিক তাপ দুই প্রকার, শারীরিক ও মানসিক। নানাবিধ রোগ

হইতে শারীরিক কষ্ট হয়। রস-বিকার হেতু হস্তপদাদি নষ্ট হইয়া যায়, ইন্দ্রিয় বিকৃত হয়, কিম্বা প্রাণক্রিয়া যথানিয়মে সম্পন্ন হয় না, তজ্জন্য প্রাণীগণকে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হয়। তদ্রূপ মানসিক কষ্টও অনেক। স্ত্রী পুত্রের বিয়োগ জন্য দুঃখ আছে, আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্যের অভাব হেতু দুঃখ আছে, বাঞ্ছিত প্রকার ফললাভ হইল না বলিয়া বা অন্যান্য বহুকারণে মনে কষ্ট পাইতে হয়, ইহাই মানসিক তাপ।

আধিভৌতিক তাপ এই প্রকার যথা :—

"সর্ব্ব ভূতৈ দেহ যোগাৎ সুখং দুঃখং যদাপ্যতে।
দ্বিতীয়ং তং বিজানীয়াৎ সন্তাপং চাধিভৌতিকং॥"

ভূতগণের সহিত দেহের সংযোগ বশতঃ যে সুখ দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহাই আধিভৌতিক নামে দ্বিতীয় প্রকার তাপ।

এই আধিভৌতিক তাপ দ্বিবিধ; এক আকাশাদি মহাভূত হইতে বা জড় পদার্থ সংযোগে উৎপন্ন, দ্বিতীয় জীবিত প্রাণীর উপদ্রব ঘটিত।

"মৃগ পক্ষী মনুষ্যাদ্যৈঃ পিশাচোরগ রাক্ষসৈঃ।
সরীসৃপাদ্যৈশ্চ নৃণাং জন্যতে চাধিভৌতিকঃ॥"

মৃগ, পক্ষী, মনুষ্য, পিশাচ, সর্প, রাক্ষস, নাগ প্রভৃতি হইতে মনুষ্যের যে দুঃখ হয়, তাহা আধিভৌতিক। সেইরূপ শীত, উষ্ণ, বায়ু, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ প্রভৃতি হইতে আধিভৌতিক তাপ ঘটে। কুম্ভীর ও ব্যাঘ্রাদির আক্রমণ, হস্তী-পদতলে দলন, সর্প-দংশন প্রভৃতি তাপ এবং বেত্রাঘাত, অগ্নি-সংযোগ, জলে মজ্জন, উচ্চস্থান হইতে পতন, এ গুলিও এই আধিভৌতিক তাপ শ্রেণীভুক্ত।

তৃতীয় প্রকারের তাপ আধিদৈবিক এইরূপ :—

"শুভাশুভৈঃ কর্ম্মভিস্তৈর্দেহান্তে যম যাতনা।
স্বর্নরকাদ ভোক্তব্য মিদং বিদ্ধ্যাধিদৈবিকং॥"

দেহান্তে শুভাশুভ কর্ম্মবশে যে যম-যাতনা ও স্বর্গ নরক ভোগ হয়, তাহাই আধিদৈবিক তাপ জানিবে। এই আধিদৈবিক তাপ অনেক প্রকার :—

গর্ভজন্ম জরা ব্যাধি মৃত্যুজং নারকং তথা।
দুঃখং সহস্রশো ভেদৈর্ভিদ্যতে মুনিসত্তম॥"

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! গর্ভবাস, জন্ম, জরা, রোগ মৃত্যু ও নরক-ভোগ প্রভৃতি দুঃখ সহস্র প্রকার আছে।

জ্ঞানীগণ স্বর্গ-সুখকেও দুঃখ মধ্যে পরিগণিত করেন। ইহ বা পরলোকের সুখ সত্য নহে, জ্ঞানদৃষ্টিতে উহারা উভয়েই দুঃখময়, মুমুক্ষুগণের ইহা সতত স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

এখন এই ত্রিবিধ সন্তাপে পীড়িত হইয়া মানুষ কি প্রকারে শান্ত থাকে এবং কি প্রকারেই বা সে পরমার্থ সাধনে যত্নবান হইতে পারে? দুর্ব্বল সাধককে যখন ইহারা ঘোরতর ভাবে আক্রমণ করিবে, তখন তাঁহার ধৈর্য্য বা উৎসাহ কি প্রকারে অটল থাকিবে? ইহার উত্তর এই যে, চতুর্থ সাধনা তিতিক্ষা অভ্যাস করিলেই এই সকল বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়।

"সহনং সর্ব্ব দুঃখানাম প্রতীকার পূর্ব্বকং।
চিন্তা বিলাপ রহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে॥"

প্রতীকার চেষ্টা না করিয়া, চিন্তা ও বিলাপশূন্য হইয়া সর্ব্ব দুঃখ সহনের নাম তিতিক্ষা।

প্রতীকার দুই প্রকার:—এক প্রতিশোধ অর্থাৎ কেহ অনিষ্ট করিলে তাহার অনিষ্ট করা; দ্বিতীয় যাহাতে দুঃখ না আসিতে পারে তাহার উপায় করা। ঐ উভয়বিধ প্রতীকার সাধকের ত্যাজ্য। তাঁহার সতত ক্ষমাশীল হওয়া আবশ্যক; অসাধু কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইলেও সাধু তাহার প্রতিশোধ না লইয়া বরং তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাই করিবেন। স্বীয় দুঃখের বিনাশ বা হ্রাস করিবার জন্য অন্যকে ক্লেশ দেওয়া অবিধেয়। তাই বলিয়া যে হিংস্র জন্তুর আক্রমণ হইতে আত্ম-ত্রাণের চেষ্টা করিবে না, এমন নহে। রোগে ঔষধ ও পথ্য সেবন এবং ক্ষুধার সময় ভোজন না করা মূর্খের কার্য্য। সাধুগণ আপন দুঃখা-কলার আশায় দেবতাদিগকেও কষ্ট দেন না। সাধকের আচরণ কিরূপ হওয়া আবশ্যক শ্রীকৃষ্ণ তাহা বলিয়াছেন:—

"মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ সুখ দুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাং তিতিক্ষস্ব ভারত॥"

হে অর্জ্জুন! বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগই শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ প্রভৃতির কারণ; ইহারা অনিত্য, কখনও উৎপন্ন হয়, কখনও বিনষ্ট হয়; অতএব তুমি এই অনিত্য সম্বন্ধ সকল সহ্য কর।

আপাতঃদৃষ্টিতে এই উপদেশ নিষ্ঠুর বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু ইহা

পরিণামে বস্তুতঃই হিতকর। আমরা যতই কেন খেদ করি না, অবশ্যম্ভাবী দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে; সুতরাং কাঁদিয়া ও মাথা খুঁড়িয়া ফল কি? তদ্ভিন্ন তিতিক্ষা দ্বারা সাধকের লাভও বিস্তর।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিপদ মিত্র

ভাবের ঘরে চুরি।

পরম পূজ্যপাদ ভক্তাবতার মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া তাঁহার কৃপায় তাঁহারই ব্যাখ্যাত ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীমুখ-কমল নিঃসৃত "ভাবের ঘরে চুরি" বিষয়ে বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। আশা করি—তত্ত্ব-মঞ্জরীর পাঠক-পাঠিকাবর্গের ইহা অপ্রাসঙ্গিক বোধ হইবে না। করুণাময়ের কৃপায়—তাঁহার উপদেশামৃত যতই স্মৃতিপটে সমুদিত হয়, ততই মঙ্গল ও মহা কল্যাণকর, তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বড় সৌভাগ্যে এই মহামূল্য মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়াছি,—ততোধিক সৌভাগ্য, এ জীবনে যুগাবতার পরম করুণাময় ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তগণের করুণা লাভ করিয়া, ভবভয়ের হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিয়াছি। যখন মনে হয় আমি কি ছিলাম, যখন কত প্রকার অশান্তি-অনলেই অহর্নিশ দগ্ধ হইতাম, যখন মনে হয় কি ভব-বন্ধনেই পড়িয়াছিলাম, সেই মহাভীতির ছায়া স্মরণপথে উদিত হইলে হৃদয় শুষ্ক হয়, কণ্ঠরোধ হইয়া আসে! প্রেমময় কত স্নেহ, কত দয়া করিয়া আপন অঙ্কে টানিয়া লইয়াছেন; তাহা ভাবিলে হৃদয়ে অপার আনন্দপারাবার উথলিয়া উঠে। মনে হয়, যদি কেহ আমার ন্যায় অভাগা থাক, এস সত্বর এস, ঐ আনন্দ-সাগরে ঝাঁপ দাও। তোমার প্রাণের জ্বালা জুড়াইবে, মনের সকল বাঁক নিমেষে অপহৃত হইবে। প্রাণে প্রাণে নিশ্চিত বুঝিতেছি, যে সৌভাগ্যবান "রামকৃষ্ণ" নাম পাইয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়াছে, তাহার এই শেষ জন্ম। তাহার মনের সকল বাঁকচুর ঘুচিয়া গিয়াছে, তাহার বোঝাবেচীভার ঐ নাম-সাগরে

নিমজ্জিত হইয়াছে। সে জগতকে আপন করিতে শিখিয়াছে, সে নিজেকে বুঝিতে পারিয়াছে। জগতে কেন আসিয়াছে জানিয়াছে, সদাই প্রেমের সাগরে নিমজ্জিত থাকিয়া প্রেমের ঠাকুর "রামকৃষ্ণময়-জগৎ" দেখিতেছে। "যে জন রামকৃষ্ণ বলে, সেই ত আমার প্রাণ রে" বলিয়া হৃদয়-কপাট স্বতঃই উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে ও দুই বাহু প্রসারিত করিয়া জগজ্জনকে "প্রাণের-ভাই" বলিয়া প্রেমালিঙ্গন করিতে ছুটিয়াছে। তাহার দ্বৈতভাব আর নাই. "অদ্বৈত ভাব আঁচলে বাঁধিয়া," প্রাণের পিপাসা মিটাইয়া, সঙ্কীর্ণতার সকল গণ্ডি অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিতেছে। সে আপনহারা হইয়া মাতৃক্রোড়াশ্রিত সরল শিশুর ন্যায় কতই প্রেমের খেলা খেলিতেছে। মুক্তি-রূপিণী দাসী তাহার ধাত্রী, পরিচারিকা। সে ভাবের ঘরে চুরি ভুলিয়াছে, মন-মুখ এক করিয়াছে, সমস্ত বুকের বোঝা দূরে ফেলিয়া দিয়াছে। সে রামকৃষ্ণ-দাসানুদাস হইয়া নির্ভয়ে, মাভৈঃ মাভৈঃ রবে ভ্রাতা, ভগ্নীগণকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে, মোহনিদ্রা নিমেষে ভাঙ্গিয়া দিতেছে, সত্যযুগে গা ভাসান দিয়াছে। সে বুঝিয়াছে, প্রেমময় তাহাকে জোর করিয়া কষিত-কাঞ্চনে পর্য্যবসিত করিয়াছেন, তাই সে এখন স্বভাবোজ্জ্বল আভায় উৎফুল্ল,—নিষ্কলঙ্ক।

প্রভু, প্রেমময়, নিজগুণে ত ভাবের ঘরে চুরি ভুলাইয়াছ, তোমার স্মরণ মাত্রেই চোর দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছে। হায়! কি চোরের ভয়েই অভিভূত ছিলাম! পুঁজি পাটা সমস্তই লুট করিত! ছিদ্র কুম্ভের ন্যায়, "শস্যক্ষেত্রের ভাঙ্গা আলির ন্যায়"—যতই না কেন সলিল সিঞ্চিত হইত, সমস্তই বাহির হইয়া যাইত! আপনার ঘরে আপনিই চোর হইয়া কি বিষম ফেরেই পড়িয়াছিলাম! কি ভববন্ধনেই, কি নাগপাশেই দৃঢ় আবদ্ধ থাকিয়া, জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতাম ও তাহার ফলে, অশান্তিরূপ প্রহরীর তাড়নায় কাতর প্রাণে ক্রন্দন করিতাম! হায়! হায়! ভাবের ঘরে চুরির কি ভীষণ পরিণাম! সরলতার কি ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বি! ভবকারাগারের কি জ্বালাময়ী প্রেরণা!

মন! বুঝিলে কি,—তুমি কি ছিলে? বুঝিলে কি,—ভাবের ঘরে চুরি করিয়া কত সাজাই ভোগ করিয়াছ? স্মরণ হয় কি,—আপনাকে আপনি ঠকাইয়া, আত্ম-প্রতারণা-রূপ মহাপাপের কি শোচনীয় পরিণাম! "কিল খাইয়া কিল চুরি করার"—কি মর্ম্মভেদী অব্যক্ত যন্ত্রণা!

শ্রীশ্রীঠাকুরের আব্দারে ছেলে নির্ভীক গিরিশচন্দ্র, অমৃতময় "চৈতন্য

লীলা" লিখিয়াছেন ও প্রভু তাহা দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে, নদীয়ার বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ উক্ত অভিনয় দর্শনে আনন্দ-বিহ্বল হইয়া, "আবার কি গৌর এলো" বলিয়া মহানন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন এবং গ্রন্থকারকে দর্শন-আশায় ব্যাকুল হইয়াছিলেন। কারণ, "যাঁহার হস্ত হইতে এরূপ প্রেম-প্রস্রবণ নিঃসৃত হইয়াছে, তিনি কত মহান্, কত উন্নত, কত বড় চরিত্রবান্, কি মহাভক্ত,—এই চিন্তায় বিভোর হইয়া অকপট গিরিশচন্দ্রের বসু-পাড়াস্থ বাস-ভবনে উপস্থিত হন। গিরিশচন্দ্র তখন তাঁহার দ্বিতলের বৈঠকখানায় বসিয়া বন্ধুবান্ধব লইয়া আলাপ করিতেছিলেন। যখন তিনি ব্যাপার কি বুঝিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীয় ভৃত্যকে বলিলেন, "ওরে শীঘ্র ব্রাণ্ডির বোতল ও গ্লাসটা আনিয়া আমার সম্মুখে রাখ্।" পাঠক! ইহা বুঝিতে পারিলেন কি?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীচরণাশ্রিত নির্ভীক গিরিশচন্দ্র ভাবিলেন, আমি ত মাতাল, চরিত্রহীন! ঠাকুরেরই কৃপায় যা কিছু! আমার দৌড় কতদূর, আমি বেশ জানি। পাছে পণ্ডিতগণ আমার উপর ভ্রম-ধারণা করিয়া বসেন, তাহা হইলেই ত সর্ব্বনাশ! ইহার জন্য বিব্রত হইয়া স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি করিবার বাসনায়, সত্বর মদ্যপায়ী গিরিশচন্দ্র সাজিলেন। তত্ত্ব-মঞ্জরীর পাঠক পাঠিকাগণ বোধ হয় জানেন, শ্রীশ্রীঠাকুর গিরিশচন্দ্রের অভ্যাস ও মনের অবস্থা বুঝিয়া, তাঁহাকে মদ খাইতে নিষেধ করেন নাই, হাস্যমুখে বরং তাঁহার সকল কলঙ্ক-"কালীমা'র নীলকণ্ঠের ন্যায়"—আপন শ্রীকণ্ঠে ধারণ করিয়া, হাস্যমুখে কতই বাক্য-বাণ সহ্য করিয়াছেন!

পণ্ডিতগণ ইহা দেখিলেন ও কিয়ৎকাল অবস্থানান্তর বিস্মিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। এরূপ দৃষ্টান্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানগণের মধ্যে অপ্রতুল নাই। যে মনে প্রাণে "রামকৃষ্ণ" নাম লইয়াছে, তাহার আর "ভাবের ঘরে চুরি" থাকিতে পারে না। সে আর আত্মগোপন করিবার অবসর পায় না। সে শ্যাম-কলঙ্কের কলঙ্কিনী হইয়া, কুলশীল-মানের মস্তকে চিরতরে অশনি সম্পাত করিয়া, শ্রীভগবানের শ্রীচরণ-নিঃসৃত প্রেমতরঙ্গে ভাসিয়া যায়—সে আপন প্রাণেই গাহিতে থাকে :—

"আমি সকলি সঁপেছি জাতি-কুল-মান, প্রাণ দিছি পায়ে ধ'রে।
হরি, হরি, হরি! করোনা চাতুরী, চরণে রাখিও মোরে॥
হেনেছ নয়নে দারুণ কামান, বিষম বেজেছে বুকে,
আকুলি বিকুলি, (তব) মোহে পড়ি ঢলি, বচন না সরে মুখে॥" "কাঙ্গাল।"

নূতন ও পুরাতন।

"ধ'রে বেঁধে পীরিত, আর মেজে ঘোষে রূপ" একই কথা। এটাও হয় না, ওটাও হয় না। ভাদরের ভরা বন্যার পতিতপাবনী প্রসন্নসলিলা গঙ্গা আনন্দে নাচিয়া নাচিয়া দুকূল ভাসাইয়া চলিয়া যায়, তার ঘোলা জলের মহিয়সী মাধুর্য্যে প্রাণ মাতোয়ারা হইয়া উঠে। ইচ্ছা হয়, গা ঢালিয়া দি, যথা ইচ্ছা তথা লইয়া যা'ক্। আবার শীতের অবসানে তিনি যখন শীর্ণকায়া, তখন স্বচ্ছ সলিলের ধপ্ধপে কাপড়খানি পরিলেও তাকাইতে ইচ্ছা হয় না। রূপ আপনি আপনার ফোয়ারা, প্রেমও তাই। ঠাকুর যখন হৃদয়ে থাকেন, তখন মনে হয় আমি কত সুন্দর, আমার প্রেমের কূল কিনারা নাই, ভাবে বিভোর হইয়া বৃক্ষলতাকেও দুই হাতে বুকে জড়াইয়া ধরিতে ইচ্ছা হয়। প্রাণ তখন কোন বাধাই মানিতে চাহে না। আবার যখন হৃদয়ের এ পিঠ ও পিঠ পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়াও ঠাকুরকে পাই না, তখন মনের লাগাম কসিতে গেলে, মন মুখ ফিরাইয়া বসে,—জোর করিয়া পরাইয়া দিলে রাশ ছিঁড়িয়া যায়।

মনকে সংযত করিতে না পারিয়া—অনেক ঘষিয়া মাজিয়া দেখা গেল, রূপ বাহির হইল না। ধরিয়া বাঁধিয়া, পীরিতি করিতে গিয়া দেখা গেল, সাময়িক চাক্‌চিক্য—'অহঙ্কার' ভায়াকে সিংহাসনে চড়াইয়া আমি তাহার পদ-লেহন করিতে লাগিলাম ও স্বার্থের পদতলে মাথা বেচিয়া ফেলিলাম। সাম্‌নে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে তাকাইলাম; দেখিলাম, প্রাণের দেবতা অন্তর্হিত হইয়াছেন। পথবাহী যাত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম। কেহ বলিল, আমার সঙ্গে আইস দেখা হইবে; তাহার পশ্চাতে অনেক দূর চলিলাম। দেখিলাম, জলন্ত অক্ষরে "নাই" লেখা আছে। এইরূপে সব দিকই ঘুরা গেল, দেখিলাম বাহিরে নাই; অদূরে কে গাহিল,—

> "ডুব্ দেরে মন কালী বলে।
> হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে॥
> রত্নাকর নয় শূন্য কথন,
> দু চার ডুবে ধন না পেলে,

তুমি দম-সামর্থে এক ডুবে যাও
কুল-কুণ্ডলিনীর কূলে॥

ডুবিতে চাহিলাম, দেখিলাম—জল নাই। মরুভূমির শুষ্ক বালুকারাশী আমার দিকে চোখ মেলিয়া চাহিয়া হাসিতেছে!—সে হাসিও বড় বিকট, বাতাস শন্ শন্ করিয়া বহিতেছে বটে, কিন্তু বড়ই পীড়াদায়ক। ভাবিলাম, এখানে বুঝি শান্তি নাই, পুনরায় পাছু হাঁটিলাম। প্রাণের নিভৃত কন্দরে যদি বা কখন ঠাকুরের স্নেহমাখা মুখখানি উঁকিঝুঁকি মারিত, আমি কি জানি—কেন সরিয়া সরিয়া আসিতাম; ভাবিতাম, তুমি যখন স্বেচ্ছায় আসিবে, তখনই তোমায় স্থান দিব, নতুবা নয়। ধরিয়া বাঁধিয়া তোমার সঙ্গে পীরিতি করিব না। তুমি আকাশ-কুসুম, বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তির কল্পনাপ্রসূত ছবি মাত্র!

কিসে সুখী হইব, চিন্তা করিলাম। মনে করিলাম, লাগাম ছাড়িয়া দিলেই সুখী হওয়া যাইবে। কামিনী-কাঞ্চনে ডুবিতে চাহিলাম. যথেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃখল বৃত্তির শেষ সীমায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম, সুখ নাই। সদসৎ উভয়বিধ উপায়েই অর্থ উপার্জ্জন করিলাম, জমাইয়া দেখিলাম সুখ নাই; খরচ করিয়া দেখিলাম, সুখ নাই। নিত্য নূতন রমণী উপভোগ করিলাম, দেখিলাম সুখ নাই। তখন ভাবিলাম, স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভগ্নী ইহাদের সুখস্বাসবিধান করিতে পারিলেই সুখী হইব, কিন্তু কাহাকেও সুখী করিতে পারিলাম না—দেখিলাম, সুখ নাই। এইবারে চিন্তার মাত্রা একটু বাড়াইয়া দিলাম। আমি কি চাই, স্থির করিতে চেষ্টা করিলাম। মনে হইল, আমি কিছুই চাহি না, আমার কিছুই আবশ্যক নাই। চোখ মেলিয়া দেখিলাম, বন্ধু একটী তল্পী ঘাড়ে করিয়া আসিয়াছেন, ঠোঁটের কোণে মুচ্কি হাসিয়া বলিলেন, "কি গো কেমন আছ, শান্তির দেখা পাইলে কি?" আমার রাগ হইল। বলিলাম, তুমি চলিয়া যাও, তুমি আমার কাটা ঘায়ে নুন্ মাখাইতে আসিয়াছ? উত্তর করিলেন, "তুমি মূর্খ, ইচ্ছা হয় তোমার এই তল্পীটী দূরে ফেলিয়া দিয়া, তল্পী-টাঙ্গা লাঠিগাছি দিয়া তোমার আপাদ-মস্তক ঝাড়িয়া দি।" আমি বলিলাম, অপরাধ? উত্তর করিলেন, "তুমি যাহা ইচ্ছা করিয়াছ, আর আমি তোমার পিছে থাকিয়া সদাসর্ব্বদা এই তল্পী বহিয়াছি; আর আমায় বলিতেছ, চলিয়া যাও?" আমি বলিলাম, "তুব

দেরে মন কালী বলে" গল্প শুনাইলে, আমি ডুবিতে গেলাম, তুমি জল সরাইয়া নিলে কেন? উত্তর করিলেন, "বাসনা পেটে গজ্ গজ্ করিতেছে, উহার ক্ষয় জলে হইবে না, আগুনে পুড়াইয়া বিশুদ্ধ করিতে হইবে।"

তাহার পর আমার সঙ্গে সেই তল্পী-বাহক প্রেমিকের আর সাক্ষাৎ হয় নাই। তাই আমি কখন খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ফেলি, কখন কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দি। তবে ত আমি পাগল! এ পাগলামীর কি ঔষধ নাই! ওগো, তুমি একবার আসিয়া দেখিয়া যাও, আমি তোমারি জন্য পাগল সাজিয়াছি! বুঝিয়াছি, সবই পুরাতন, কেবল তুমিই নূতন। ভক্ত-পদাশ্রিত

শ্রীজীবিতনাথ দাস।

যুগাবতার
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব
ও
হিন্দুশাস্ত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৩৬ পৃষ্ঠার পর)

সপ্তম উপদেশ।

সাকার-নিরাকারতত্ত্ব।

একজন ব্রাহ্মভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈশ্বর—সাকার না নিরাকার। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিলেন, তাঁর ইতি করা যায় না। তিনি নিরাকার, আবার সাকার। ভক্তের জন্য তিনি সাকার। যারা জ্ঞানী অর্থাৎ জগৎকে যাদের স্বপ্নবৎ মনে হ'য়েছে, তাদের পক্ষে তিনি নিরাকার। ভক্ত জানে, আমি একটী জিনিষ, জগৎ একটী জিনিষ। তাই ভক্তের কাছে ঈশ্বর ব্যক্তি হ'য়ে দেখা দেন। জ্ঞানী—যেমন বেদান্তবাদী—কেবল নেতি নেতি বিচার করে। বিচার ক'রে জ্ঞানীর বোধে বোধ হয় যে; আমিও মিথ্যা, জগৎও মিথ্যা—স্বপ্নবৎ।' জ্ঞানী ব্রহ্মকে বোধে বোধ করে। তিনি যে কি, মুখে ব'লতে পারে না।

"কি রকম জান? যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র—কূল কিনারা নাই—ভক্তি-হিমে স্থানে স্থানে জল বরফ হ'য়ে যায়—বরফ আকারে জমাট বাঁধে। অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্তভাবে কখন কখন সাকার রূপ ধ'রে থাকেন। জ্ঞানসূর্য্য উঠ্‌লে, সে বরফ গ'লে যায়, তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি ব'লে বোধ হয় না—তাঁর রূপও দর্শন হয় না। তিনি কি মুখে বলা যায় না। কে ব'ল্‌বে? যিনি ব'ল্‌বেন, তিনিই নাই, তাঁর 'আমি' আর খুঁজে পায় না।

"যে ব্যক্তি সদা সর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্তা করে, সেই জান্তে পারে, তাঁর স্বরূপ কি? সে ব্যক্তিই জানে যে, তিনি নানা রূপে দেখা দেন, নানা ভাবে দেখা দেন—তিনি সগুণ, আবার তিনি নির্গুণ; যে গাছতলায় থাকে, সেই জানে যে, বহুরূপীর নানা রঙ—আবার কখন কখন কোন রঙই থাকে না। অন্য লোকে কেবল তর্ক ঝগড়া ক'রে কষ্ট পায়।"

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে সূত বলিয়াছেন, যেরূপ একটী অক্ষয় জলাশয় হইতে অসংখ্য স্রোতোধারা প্রবাহিত হইয়া দিকে দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ সেই একমাত্র ঈশ্বর হইতে নানাবিধ অবতারের উৎপত্তি হইয়া থাকে। প্রজাপতি, দেবতা, ঋষি, মনু ও মানব সকলেই তাঁহার অংশ। জ্ঞানময় ঈশ্বর মহদাদিরূপ মায়াগুণেই এই সকল রূপ ধারণ করেন, বাস্তবিক তিনি নিরাকার। (এই জন্যই ঠাকুর বলিয়াছেন, "তাঁর ইতি করা যায় না। তিনি নিরাকার, আবার সাকার।") কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না, কিন্তু তিনি সকলকে দেখিতেছেন। (ঠাকুর দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতেন, "সার্জ্জন সাহেব রাত্রে আঁধারে লণ্ঠন হাতে ক'রে বেড়ায়। তার মুখ কেউ দেখ্‌তে পায় না; কিন্তু ঐ আলোতে সে সকলের মুখ দেখ্‌তে পায়।") যেমন মেঘ দেখিয়া শূন্যময় আকাশ দেখিলাম বিবেচনা হয়, যেমন উড্ডীন ধূলি দর্শনে বায়ু দেখিলাম বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ লোকে অজ্ঞান বশতঃ ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরব্রহ্মকে দর্শনীয় বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত অবতার সমূহ ব্যতীত ভগবানের যে সূক্ষ্ম রূপ আছে, তাহার হস্তপদাদি কিছুই নাই, সুতরাং শ্রবণ-দর্শনের বহির্ভূত। তাঁহার কোন অঙ্গ নাই, কিন্তু অস্তিত্ব বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই, কারণ তাঁহা হইতেই স্থূল দেহে জীব-শব্দের প্রয়োগ ও জীবের পুনর্জ্জন্ম হইয়া থাকে। যখন জ্ঞান লাভ হইয়া ঈশ্বরের সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহ এই

উভয় কল্পনাকে ভ্রম বলিয়া বোধ হয়, তখনই জীব আপনাকে জ্ঞানময় ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে পারে। মায়াশক্তি দ্বারা যতদিন আত্মা আচ্ছন্ন থাকেন, ততদিন অজ্ঞান নষ্ট হয় না; কিন্তু যখন অজ্ঞান বিদূরিত হইয়া জ্ঞানের উদয় হয়, তখন স্থূল সূক্ষ্ম প্রভৃতি ভগবানের উপাধি-ভ্রম আপনা আপনিই বিনষ্ট হইয়া থাকে। (ঠাকুর এই জন্ম বলিয়াছেন, "যারা জ্ঞানী, তাদের পক্ষে তিনি নিরাকার)।" অন্তর্যামী ঈশ্বর কর্ম্ম ও জন্ম বিরহিত, কিন্তু তিনি অবিদ্যাসংসর্গে জন্ম-লাভ ও কর্ম্ম করিয়া থাকেন। তিনি জন্ম-লাভ করিলেও জীব হইতে অনেক বিশেষ। তিনি এই বিশ্বের সৃজন পালন ও নাশ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও নির্লিপ্ত।

ঠাকুর বলিতেন, "যেমন পায়ে কাঁটা ফুটলে আর একটী কাঁটা আহরণ করিতে হয়; তারপর পায়ের কাঁটাটী তুলে দুটী কাঁটাই ফেলে দেয়। তেমনি অজ্ঞান-কাঁটা তুলবার জন্য জ্ঞান-কাঁটা জোগাড় করতে হয়। অজ্ঞান নাশের পর জ্ঞান-অজ্ঞান দুইই ফেলে দিতে হয়, তখন বিজ্ঞান।"

অব্যক্ত, জগদ্ব্যাপী আমি সুকৌশলে;
আমাতে সকল, আমি নাই সে সকলে।

(গীতা ৯অঃ ৪ শ্লোঃ)

কুবুদ্ধিলোকে তর্কাদিদ্বারা তাঁহার লীলার প্রয়োজন স্থির করিতে পারে না। তবে যিনি তাঁহার পাদপদ্ম-সৌরভ ভজনা করেন, তিনিই ভক্ত বলিয়া কিছু কিছু জানিতে পারেন।

শ্রীভগবান বলিয়াছেন,

না জানি নির্ব্বোধগণ নিত্য নির্ব্বিকার
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বোত্তম স্বরূপ আমার,
মায়ার অতীত মোরে জ্ঞানের বিহনে—
ব্যক্তি-ভাবাপন্ন মাত্র ভাবে মনে মনে।
সকলের কাছে আমি না হই প্রকাশ,
যোগমায়া-অন্তরালে করি আমি বাস।
আদি নাই, অন্ত নাই, অনন্ত আমায়
মূঢ়জনগণ ভবে জানিতে না পায়।
ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান অবস্থায়,
সর্ব্বভূতে জানি আমি, কে জানে আমায়?

(গীতা ৭অঃ ২৪।২৫।২৬ শ্লোঃ)

'যোগমায়া-অন্তরালে করি আমি বাস' গীতার এই উক্তির সমর্থনে ঠাকুর দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়াছেন, "যেমন চিকের ভিতর মেয়েরা থাকে, তারা সকলকে দেখতে পায়, তাদের কেউ দেখতে পায় না।" তেমনি, মধ্যে মায়া ব্যবধান আছে বলিয়া আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না। তৃতীয় স্কন্ধে ব্রহ্মা ভগবানের স্তবে বলিয়াছেন, "প্রভো! আমি বহুকাল উপাসনা করিয়া আপনাকে জানিতে পারিলাম। মনুষ্যের সাধ্য কি, যে আপনার স্বরূপ জানিতে পারে! ভগবান্! আপনিই একমাত্র বর্ত্তমান রহিয়াছেন, অন্য আর কিছুই নাই। যদিও দৃষ্ট বস্তু সকল আপনা হইতে পৃথক বোধ হয় বটে, বস্তুতঃ তাহা নহে। আপনি একাকীই বিবিধ মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতেছেন। জীবগণ মায়া বশতঃই পৃথক পৃথক বিবেচনা করে। হে বিশ্ববিধাতঃ! ভক্তগণ জ্ঞান-নয়ন দ্বারা আপনার স্বরূপ দেখিতে পান অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্র এবং বিজ্ঞব্যক্তির উপদেশাদি শ্রবণ করিয়া মনুষ্যের তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেই, সে আপনার স্বরূপ জানিতে সমর্থ হয়; চর্ম্মচক্ষু দ্বারা সে রূপ দর্শন অসম্ভব। যে সকল ভক্তের চিত্ত ভক্তিভাবে বিগলিত হইয়াছে, আপনি সেই সকল সুকোমল ভক্তি-পূতান্তঃকরণে নিয়ত বাস করিয়া থাকেন। হে দয়াময়! ভক্তজন মধ্যে যিনি যে ভাবে যেরূপে আপনার ভাবনা করেন, আপনি কৃপা করিয়া সেইরূপে এবং সেইভাবে ভক্তের অভীষ্ট-ফল প্রদান করেন। এই জন্য ঠাকুর বলিয়াছেন, "ভক্তের জন্য তিনি সাকার। যে ব্যক্তি সদা সর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্তা করে, সেই জান্তে পারে, তাঁর স্বরূপ কি? সেই ব্যক্তিই জানে যে, তিনি নানারূপে দেখা দেন—তিনি সগুণ আবার তিনি নির্গুণ।" আবার গীতাতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন,

> জ্ঞান-যজ্ঞে কেহ মোরে করেন অর্চ্চন,
> তার মধ্যে 'সর্ব্ব ব্রহ্ম' জ্ঞানে কেহ রন।
> দাস্ত ভাবে কেহ মোরে পূজে ধনঞ্জয়,
> নানা ভাবে নানা পূজা—আমি সর্ব্বময়। (গীতা ৯অঃ ১৫ শ্লোঃ)

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত স্কন্ধে, ব্রহ্মার স্তবে নারায়ণ সন্তুষ্ট হইয়া এক স্থানে বলিয়াছেন, "হে ব্রহ্মন্! আমি গুণময় বলিয়া জীবলোকে প্রতীয়মান হই, কিন্তু তুমি সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া আমাকে যে নির্গুণ বলিয়া স্তব করিয়াছ, ইহাতে আমি যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি।" আরও ষষ্ঠ স্কন্ধে, হংস-গুহ্য স্তবে,

প্রজাপতি দক্ষ কহিয়াছেন, "যাঁহারা পাদমূল ভজনা করেন,' তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য যে ভগবান অনন্তদেব নামরূপ-বিহীন হইয়াও জন্ম-কর্ম্ম স্বীকার করতঃ নামরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই পরম-পুরুষ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। বায়ু যেমন পার্থিব গুণ গ্রহণ করিয়া গন্ধবান ও রূপবান হয়, সেইরূপ অন্তর্যামী ভগবান্ উপাসনা-মার্গ দ্বারা উপাসকের মনোগত বিবিধ দেবতারূপে প্রতিভাত হন। প্রার্থনা করি, সেই শ্রীহরি আমার মনোরথ পূর্ণ করুন।" অতএব এক্ষণে প্রমাণ হইল যে, তিনি সাকারও বটেন, নিরাকারও বটেন। ফলতঃ শাস্ত্রাদি দ্বারা এ বিষয় সুচারুরূপে মীমাংসিত হইয়া লোকের মনে প্রত্যয় জন্মান কঠিন। ভগবৎ প্রেরিত স্থির বুদ্ধি ভিন্ন কেহই এ বিষয়ে সহজে জ্ঞান-লাভ করিতে পারে না। কতকগুলি শুষ্ক কুতার্কিক লোক আছে, তাহারা প্রকৃত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু নহে, যেন তাহারা ভগবানকে লাভ করিতে কতই ইচ্ছা করে। তাহাদের কেবল মাত্র বৃথা তর্ক করাই স্বভাব। অথবা 'দেখাদেখি চকা নাচের' ন্যায় এক জনকে তর্ক করিতে দেখিয়া তাহারই অনুকরণ করে। এই সকল শুষ্ক কুতার্কিক, আত্মশ্লাঘা-পূর্ণ যথেচ্ছাচারী লোকদের সহিত আমাদের অত্র প্রবন্ধের কোনও সম্বন্ধ নাই। কাহারও কোন বিষয়ে অভাব হইলেই, সে যে কোন উপায়ে তাহা পরিপূরণ করিবার জন্য চেষ্টিত হয়। যেমন, প্রকৃত অর্থাভাবগ্রস্ত ব্যক্তি যে কোন একটী অর্থোপার্জ্জনের পথ পাইলেই, তাহার ভাল মন্দ, সুবিধা অসুবিধা, বিচার না করিয়া তাহাতেই প্রবিষ্ট হয় এবং অধ্যবসায় বলে তাহাতেই ক্রমশঃ উন্নতি করিতে থাকে। কিন্তু যাহাদের প্রকৃত অর্থোপার্জ্জনের বাসনা নাই, কেবল মাত্র 'লোক লজ্জার ভয়ে' অথবা 'সখের বশে' অর্থোপায়ে ইচ্ছুক, তাহারা অর্থোপায়ের পথ পাইলে, 'এটা ভাল ওটা মন্দ' 'এটা মন্দ' ওটা ভাল' এইরূপ সুবিধা অসুবিধা বিচার করিতে থাকে। এইরূপ বিচার করিতে করিতে শেষে কোনটাই হয় না এবং এইরূপ বিচারেই তাহাদের জীবনাতিবাহিত হইয়া যায়। ফলতঃ, তাহাদের 'কলা বেচ্তেই দিন ফুরাইয়া যায়, রথ দেখা আর হয় না। যাহাদের 'রথ দেখিবার বাসনা থাকে, তাহাদের কর্ত্তব্য—আগে যো সো ক'রে, ধাক্কাধুক্কি খেয়েও রথ দেখা। কারণ রথ দেখাই তাহাদের উদ্দেশ্য, কলা বেচা উদ্দেশ্য নহে। (ক্রমশঃ)

শ্রীহরিপদ নন্দী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীচরণ ভরসা।

জয় গুরুদেব !!

তত্ত্ব-মঞ্জরী

ঊনবিংশ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা।
অগ্রহায়ণ, সন ১৩২২ সাল।

এস মা!

মা! মা আমার, এস মা। মা তোমার অধম সন্তানের হৃদিপদ্ম বিকশিত করিয়া বস মা। মা, মা গো! তোমায় আর কি বলিব মা, তোমার পায়ে পড়ি, একবার এস, বড় জ্বালায়, বড় যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ডাকিতেছি, মা! আয় মা আয়!" মা, তুমি ব্যতীত জগৎ অন্ধকার দেখিতেছি, প্রাণশূন্য হইয়া আছি, আর মা আয়। আর তোর কাঙ্গাল সন্তানদের ভুলিয়া থাকিস্‌নি মা, আয় মা আয়। মা গো! আর চুষীকাটী দিয়া ভুলাইয়া কাজ নাই মা, ঢের হইয়াছে। এস মা এস, আর কঠোর সাজা দিওনা মা, খুব হইয়াছে। মা, তোমার স্নেহের অভাবে অস্থি-চর্ম্মসার হইয়াছে। এস মা, কোলে লও মা, বড় ভয় পাইয়াছি। এস মা, তোমার স্নেহাঞ্চলে আবৃত করিয়া রাখ মা। মা, মা গো! আর কূল কিনারা দেখিতে পাইতেছি না, এস মা। আমার তুমি বিনা কে আছে মা? তোমায় ভুলিয়া বিষম ভববন্ধনে পড়িয়াছি, এস মা, আর উপায় নাই। এস মা, একবার ছুটিয়া এস, মা একবার কোলে লও।

ওঁ আয়াহি বরদে দেবী ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনী
গায়ত্রীচ্ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনী নমোঽস্তুতে ॥

সব ভুলিয়াছি মা, তোমায় হারাইয়া সব হারাইয়াছি মা! মা, কেন মা হাত ছাড়িয়া দিয়াছিলে? কেন মা এমন ঘটিয়াছিল? মা গো বুদ্ধিরূপিণী! কোন বুদ্ধিতে তোমাকে হাত ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছিলাম? এ আবার কেমন খেলা মা? মা, তোমার পায়ে পড়ি, এমন খেলা আর খেলিও না, মা। দেখ দেখি কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি; কি দশা হইয়াছে! মা গো! মার কাছে সন্তান চিরকালই শিশু! মা লীলাময়ী, সন্তানের সহিত এ লীলা কি সাজে? মা গো, কোলের ছেলের সঙ্গে একি রঙ্গ মা? মা একবার দেখ, দেখ—শ্রীহীন কঙ্কালসার, চক্ষু কোটরগত, উদরে অন্ন নাই, গাত্রে বস্ত্র নাই, কি দশা হইয়াছে একবার দেখ! মা আপনার জালে কেমন বদ্ধ হইয়াছি দেখ মা, নীচ স্বার্থপরতায় কেমন ভূত সাজিয়াছি, একবার দেখ মা! সর্ব্বাঙ্গে কেমন মনের কালি ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখ মা! তোমাকে ছাড়িলেই অপরাধ, নচেৎ তোমার আশ্রিত থাকিলে কোন ভয় নাই। মা, কাছে থাকিয়া হাজার দোষ করিলেও তুমি অভয় দাও মা, ইহা তোমার শান্ত ছেলের কৃপায় বুঝিয়াছি। মা এখন যে আর শক্তি নাই, জীবন্মৃত হইয়া পড়িয়া আছি, তোমায় বিস্মৃতি-রূপ পাপ ও স্বেচ্ছাচারিতা-পারা সর্ব্বাঙ্গে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, জর জর করিয়াছে, একবার এস মা, এস—দেখ তোমার নাড়ি ছেঁড়া ধনের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে দেখ! এখন সব ভুলিয়াছি,—কি ছিলাম তাহাও ভুলিয়াছি, আর উপায় নাই, তুমি না ধরিলে আর উপায় নাই, তুমি না রাখিলে আর রক্ষা নাই। আমি অলস, অবশ, স্পন্দহীন, দারুণ যন্ত্রণায় হিতাহিত বিবেচনা-শূন্য, আত্মহারা! মা, মঙ্গলময়ী! মোড় ফিরাইয়া দাও মা। দেখ দেখি, হিংসার অনলে সব নাশ করিয়াছি, আপন মঙ্গল-ঘট আপনি চূর্ণ করিয়াছি, পরশ্রী-কাতরতায় জ্বলিয়া মরিতেছি, তোমার নন্দনকানন নরকে পরিণত করিয়াছি! দেখ, দেখ একবার চক্ষু মেলিয়া দেখ মা! তোমার সোণার ভারতের কি সর্ব্বনাশ করিয়াছি! ভ্রাতায় ভ্রাতায় কেমন ভাগ বাটোয়ারা করিতেছি! মা গো, একমুষ্টি ভিক্ষা দিবারও সামর্থ্য নাই, কিন্তু মা! ভ্রাতার সর্ব্বনাশের জন্য তোমার নিকট ছাগ, মহিষ বলি দিয়া কেমন নিজের পদে কুঠারাঘাত করি-

তেছি। হায় হায়! মা, একি হ'ল! তোমার প্রেমের এই পরিণতি! কি মতিভ্রম! নিজের নাক কাটিয়া ভায়ের যাত্রা ভঙ্গ করিতেছি। বাঃ, কি মজা! মা খুব খেলা হইয়াছে, ভোজবাজী থামাও মা। একবার কৃপা কর মা, দেখ সকলেই তোমার মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। তুমিই ত মা বলিয়াছ, যাহাকে ভূতে পায়, সে যদি জানিতে পারে তাহাকে ভূতে পাইয়াছে, তখনই ভূত ছাড়িয়া যায়। যখন বদ্ধজীব বুঝিতে পারে সে বদ্ধ, সেইক্ষণ হইতেই সে মুক্ত হইয়া যায়। একবার হৃদি-আলো-করা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণরূপে এস মা! মা তোমার ঐ ভুবনমোহন মনপ্রাণহারী বরাভয়-রূপে হৃদিপদ্ম বিকশিত করিয়া বস মা! মা আমার, একবার এস।

"এস মা, এস মা ও হৃদয়রমা! পরাণ-পুতলী গো!
হৃদয়াসনে (একবার) হও মা আসীনা নিরখি তোমারে গো।
জন্মাবধি তব মুখ পানে চেয়ে, (আমি) এ জীবন ধরি
যে যাতনা স'য়ে,—তা'ত জান গো,—
একবার হৃদয়-কমল বিকাশ করিয়ে, প্রকাশ তাহে আনন্দময়ী গো॥

"কাঙ্গাল"।

যোগোদ্যানে শ্রীরামচন্দ্র।

১২৯৩ সালের ৮ই ভাদ্র, রবিবারে যোগোদ্যানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমাধি-কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া, ভক্তগণ তথায় উৎসব করেন। যোগোদ্যানে সে সময়ে স্থানের কোন ব্যবস্থা না থাকায়, ভক্তবীর সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের সন্নিকট-বর্ত্তী উদ্যানে সকলে সমবেত হইয়া প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সায়াহ্নে প্রেমিক ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং ভক্ত-রাজ নিত্যগোপাল (রামচন্দ্রের মাসতুতো ভ্রাতা) উপস্থিত থাকিয়া ঠাকুরের আরতি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন এবং কিছু জলপান ভোগ দেন। কয়েক দিবস এইরূপ কোনও না কোনও ভক্ত যাইয়া ঠাকুরের সেবাকার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেন। সেই সময়ে যাঁহারা ঠাকুরের অন্তরঙ্গরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা যোগোদ্যানে থাকিয়া ঠাকুরের

সেবাকার্য্য সম্পন্ন করিবেন এইরূপ প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা কাহারও তত্ত্বাবধারণের অধীন হইতে ইচ্ছুক না হওয়ায়, অথবা কোনও নিয়মাবলীর বন্ধনের মধ্যে থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায়, সে প্রস্তাব আর কার্য্যে পরিণত হইল না। তখন শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় ('ভুটেকালী' নামে ভক্তগণ মধ্যে পরিচিত) নামক জনৈক ভক্ত যোগোদ্যানে থাকিয়া ঠাকুরের সেবাকার্য্যের ভার গ্রহণ করেন, এবং তাঁহার সহকারীরূপে শ্রীকীর্ত্তিবাস চক্রবর্ত্তী নামক একজন ব্রাহ্মণকে পাচক রূপে নিযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য যে, ঠাকুরের সমগ্র গৃহীভক্ত যোগোদ্যানের ব্যয়ভার বহন করিতে প্রথমতঃ স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমশঃ অনেকেই পৃষ্ঠদেশ দেখাইলেন। সমস্ত ব্যয়ভার বিশেষ ভাবে রামচন্দ্রের উপরেই পতিত হইল। প্রভুর কার্য্যে রামচন্দ্র কখনই কাতর ছিলেন না, তিনি পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করিয়া সকল ব্যয়ই বহন করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দিবস ঠাকুরের সমাধির উপরে বিশেষ কোনওরূপ আবরণ ছিল না। রামচন্দ্রের মামাশ্বশুর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় ঐ সময়ে একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন যে, আচ্ছাদন-বিহীন অবস্থায় বর্ষা ও রৌদ্রে ঠাকুরের খুব কষ্ট হইতেছে। পরদিন তিনি রামবাবুর নিকট যাইয়া এই বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। রামচন্দ্র তখনই ঐ সমাধিস্থানের উপর একটী 'চাঁলা' নির্ম্মাণ করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

ভক্তগণ মধ্যে মধ্যে যোগোদ্যানে যাতায়াত করিতেন। রামচন্দ্র, তাঁহার ভ্রাতা মনোমোহন এবং কথক শ্রীবরদাকান্ত শিরোমণি ইঁহারা প্রায় প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিয়া যোগোদ্যানে বেড়াইতে যাইতেন এবং রবিবারে প্রাতেই তথায় চলিয়া গিয়া সমস্ত দিন সৎপ্রসঙ্গে অতিবাহিত করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে ঠাকুরের যে মন্দিরটী রহিয়াছে উহা ১২৯৩ সালের আশ্বিন মাসে রামচন্দ্রের দ্বারায় নির্ম্মিত হয়।

"ভক্তের প্রাণের ভাব সাধারণের সহজ বোধগম্য হয় না। প্রেমের রাজ্যের প্রেমের খেলা এক প্রেমময় ও প্রেমিক ব্যতীত আর কেহ বুঝিতে পারে না। যোগোদ্যানে প্রভুর সমাধি দেওয়া হইল, রামচন্দ্র প্রায়ই যাতায়াত করেন, ঠাকুরের সকল কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন, সকল ব্যয় সযত্নে প্রদান করেন,

তথায় যাইয়া সৎপ্রসঙ্গ করেন, কীর্ত্তন করেন, সমস্ত দিন অতিবাহিত করেন, কিন্তু ঠাকুরের সমাধি-মন্দিরে তাঁহার শ্রীচরণতলে একদিনও প্রণাম করেন না। তাঁহার প্রাণে এইরূপ একটী ভাব জাগিয়াছিল যে, প্রভু এখানে আসিয়াছেন, তিনি এখানে রহিয়াছেন, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ যতক্ষণ না প্রাণে বুঝিতেছি, ততক্ষণ ওস্থলে প্রণাম করিতে পারিব না। রামচন্দ্র চিরদিনই প্রত্যক্ষ প্রমাণের পক্ষপাতি, অনুমানের ধর্ম্ম তিনি জীবনে একদিনও পালন করেন নাই, সুতরাং এইরূপ একটী মহা ঘটনায় তিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাইয়া কাহার চরণে মস্তক অবনত করিবেন? অমন একজন মহাবিশ্বাসী ভক্ত—ঠাকুরকে প্রত্যক্ষ না দেখিয়া, না বুঝিয়া কি সাধারণ ভাবে অনুমানের উপরে ধর্ম্ম রাজ্যের একটী মহান্ ভিত্তি স্থাপন করিতে পারেন? না—কখনই না। রামচন্দ্রের জীবন যাঁহারা আলোচনা করিয়া দেখিবেন, তাঁহারা প্রাণে প্রাণে বুঝিবেন যে, রামচন্দ্র সকল সময়েই ভগবানকে হাতেনাতে প্রত্যক্ষভাবে ধরিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন, এবং সেইভাবে তাঁহাকে লাভ করিয়া জীবনে ধন্য হইয়াছেন। রামচন্দ্রের ভিতরে এই যে একটী ভাব জাগিল, আমাদের মনে হয়, উহা ঠাকুরের একটী বিশেষ লীলা। রামচন্দ্রের মনে ঠাকুর এই সন্দেহ তুলিয়া দিয়া জগৎবাসী ভবিষ্য ভক্তজনের মনের সন্দেহ বিনাশ করিয়া দিয়াছেন। ভাবীভক্তজনের মনের কালিমা মুছাইয়া দিবার জন্যই ভক্ত ও ভগবানে এই মধুর লীলা-রহস্য। এইরূপ ভাব লইয়া রামচন্দ্র দিন যাপন করেন, এমন সময়ে একদিন অপরাহ্ণ প্রায় ৪৷৷০ ঘটিকায় তিনি তাঁহার কলিকাতাস্থ বাটী হইতে যোগোদ্যানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সে সময়ে যোগোদ্যানে অনেক পুষ্প-বৃক্ষ ছিল। ফটকের ভিতরে ঢুকিয়া রামচন্দ্র সম্মুখে একটী সুন্দর বস্‌রাই গোলাপ প্রস্ফুটিত হইয়া আছে দেখিতে পাইলেন। তৎপরে যে কি ঘটিয়াছে, তাহা আর রামচন্দ্র জানেন না, কিন্তু যখন তাঁহার হুঁস হইল, তখন তিনি দেখেন যে, তিনি প্রভুর সমাধিস্থলে তাঁহার শ্রীচরণতলে পুষ্পটী রাখিয়া অজস্র চক্ষুজলে সেই স্থানটী আর্দ্র করিয়া ফেলিয়াছেন। সঙ্গে দু'তিনজন ভক্ত ছিলেন, রামচন্দ্র তাঁহাদের দেখিয়া প্রথম যেন একটু লজ্জিত হইলেন; পরে স্বীয় প্রাণের সেইভাব, আর এইমাত্র আজ ঠাকুর যে তাহার সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিলেন, তাহা ভক্তগণের নিকট প্রকাশ করিয়া পরম আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

পাঠক! এ ব্যাপারটী কিছু বুঝিলেন কি? ফুলটী দেখার পর, রামচন্দ্র কখন যে যে ফুলটী তুলিয়াছেন, কি ভাবে, কেমন করিয়া, কি অবস্থায় যে ঠাকুরের মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন, কিরূপে ফুলটী তাঁহার শ্রীচরণোপরি রাখিয়া প্রণত হইয়াছেন, রামচন্দ্র এ সকলের কিছুই নিজে অবগত নহেন। তাঁহার অন্তরে, তাঁহার অজ্ঞানিত ভাবে, একটী মহাভাবের ঢেউ আসিয়া তাঁহার দ্বারায় এই কাজটী করাইয়া লইয়াছে। আর যে সময়ে রামচন্দ্র সেই সমাধি-স্থলে এই ভাববিভোর অবস্থায় প্রণত ছিলেন, সেই সময়ে যে ঠাকুরকে তিনি তথায় প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া তাঁহার শ্রীচরণতল নয়নজলে ধৌত করিয়া দিয়াছেন, একথা বোধ হয় আর কোনও ভাবুকভক্তকে প্রকাশ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। রামচন্দ্রের জীবনে এই একটী মহাঘটনা এবং এই দিন তাঁহার জীবনের একটী বিশেষ দিন। ভবিষ্য রামকৃষ্ণ ভক্তগণের পক্ষেও ইহা একটী মহা সুসমাচার। যোগোদ্যানে ঠাকুর রামকৃষ্ণ প্রত্যক্ষভাবে আছেন কি না—এই ঘটনা যে শ্রবণ করিবে, তাহার হৃদয়ে প্রশ্নের মীমাংসা অতি সহজেই হইয়া যাইবে, তাহাকে ভাবিয়া চিন্তিয়া বিচার করিয়া, তর্ক যুক্তিদ্বারা বুঝিয়া আর জানিয়া লইতে হইবে না। তাই পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জগৎবাসীর মঙ্গলবিধান উদ্দেশ্যেই ভক্ত ও ভগবানের এই সমস্ত অদ্ভুত লীলা-খেলা। সাঙ্গোপাঙ্গের ভিতর দিয়াই ভগবান জগৎজীবকে শিক্ষা বিধান করিয়া থাকেন, নতুবা দুর্ব্বল জীব কি কোনও পরীক্ষা দিতে পারে, না ভগবানকে এইরূপ করিয়া প্রত্যক্ষ ভাবে বুঝিয়া লইতে সক্ষম হয়?

এই ঘটনার পর রামচন্দ্রের ভিতরে যেন একটী নূতন ভাবের তরঙ্গ উঠিল। স্বহস্তে ঠাকুরের সেবা করিবার জন্য প্রাণ ক্রমশঃ অতি ব্যাকুল হইতে লাগিল। সংসার হইতে প্রাণটী এক অতি উচ্চস্তরে উঠিয়া দাঁড়াইল। ত্রিতাপতপ্ত সংসারী জীবের দুঃখকষ্ট দূর করিবার জন্য, তাহাদিগকে প্রভুর মাভৈঃ মাভৈঃ বাণী শুনাইবার জন্য, তাহাদের প্রভুর চরণতলে টানিয়া আনিবার জন্য প্রাণ ক্রমশঃ অতি আকুল হইয়া পড়িল। আশ্চর্য্য! ঠিক এমনি সময়ে হাওড়া জেলার অন্তর্গত বরিজহাটী নিবাসী একটী তত্ত্বপিপাসু ব্রাহ্মণ যুবক রামচন্দ্রের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নাম শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র চৌধুরী। তিনি এখন স্বর্গগত। তাঁহার ধর্ম্মতিতিক্ষা, জপ, ধ্যান এবং নিরশন ব্রতাদির কথা বলে হইলে,

আমরা এখনও চমকিত হইয়া উঠি। তাঁহার অনেক ধনী আত্মীয় ছিলেন, তাঁহার বড় ভাই গবর্ণমেন্টের একজন বিশেষ উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। অপূর্ব্বচন্দ্র লেখাপড়াও বেশ জানিতেন, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ এত প্রবল ছিল যে, কখন মনের সহিত সংসার করিতে পারেন নাই বা মন দিয়া পরের চাকুরী করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হন নাই। কোনওরূপে দিন কাটিয়া গেলেই তিনি পরম আনন্দ বোধ করিতেন, এবং সকল সময়ই তিনি প্রায় তত্ত্বালোচনা লইয়াই থাকিতেন। এই অপূর্ব্বচন্দ্র, রামচন্দ্রের নিকট আসিয়া ঠাকুরের কথা খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ১০টা ১১টা পর্য্যন্ত ঠাকুরের জীবন-কথা শ্রবণ করিতেন। কোনও কোনও দিন এমনি মসগুল হইয়া যাইতেন যে, রাত্রে আর উঠিয়া বাসায় যাইতেন না, রামচন্দ্রের গৃহেই আহারাদি করিয়া বৈঠকখানায় শয়ন করিয়া থাকিতেন। তাঁহারই বিশেষ আগ্রহে রামচন্দ্র ঠাকুরের জীবন-চরিত ১২৯৭ সালে রথযাত্রার সময়ে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত করেন। যাঁহারা রামচন্দ্র লিখিত ঠাকুরের জীবন-চরিত পাঠ করিবেন, তাঁহারা উক্ত জীবনীর ভূমিকায় ইহার উল্লেখ দেখিতে পাইবেন।

এই সময়ে আরও একজন অনুরাগী ভক্ত রামচন্দ্রের নিকট আসা যাওয়া করিতেন। তাঁহার নাম তারক। রামচন্দ্রের অবসর সময়ে অপূর্ব্বচন্দ্র এবং তারকনাথ উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট ঠাকুরের কথা শুনিতেন এবং ঠাকুরের কার্য্য করিবার জন্য তাঁহারা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। জীবনী প্রকাশিত হইবার পর রামচন্দ্র, ঠাকুরের উপদেশ-পুস্তক 'তত্ত্বপ্রকাশিকা'র ২য় সংস্করণ বিস্তারিত ভাবে লিখিতে আরম্ভ করেন। গভীর রাত্রে রামচন্দ্র নিদ্রোত্থিত হইয়া ঠাকুরকে স্মরণ করিয়া এই সমস্ত লিখিতে বসিতেন। লিখিবার কালে তাঁহার হাত যেন কলে চলিত এবং তাঁহার অন্তরে ঐ সকল কথা ও ভাব যে কোথা হইতে আসিত, তিনি সে সময়ে তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। এমন কি, নিজের লেখা নিজে পড়িয়া রামচন্দ্র অবাক হইয়া যাইতেন, কখনও ভাবে অশ্রুজল ফেলিতেন। প্রভু, পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘন করাইতেছেন বলিয়া আপনাকে ধন্য ও সৌভাগ্যবান মনে করিতেন।

১২৯৭ সালের শীতকালের প্রারম্ভে রামচন্দ্রের মন যোগোদ্যানে বাস করিবার জন্য এত বিচলিত হইল যে, আর তিনি গৃহে থাকিতে পারিলেন না। একদা

নিশীথে যোগোদ্যানে যাইতে হইবে—থাকিতে হইবে—ঠাকুরের সেবা করিতে হইবে—এইরূপ একটা চিন্তা আসিয়া সে রাত্রে আর তাঁহার নিদ্রা হইল না। তিনি তখন তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে বলিলেন, "দেখ, আর আমি এখানে থাকতে পারছিনা, ঠাকুর আমায় যোগোদ্যানে থাকবার জন্য যেন অনবরত ডাকচেন। গিরিশ বাবু "রূপসনাতন" পুস্তকের গোড়ায় লিখেচেন—সনাতন বলচেন—"কে আমায় ডাকছে, কে আমায় টানছে, আমি স্থির হ'তে পাচ্ছিনা কেন?" এ ভাবটা এখন নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ বোধ ক'রছি। আমি কাল থেকেই যোগোদ্যানে গিয়ে থাকবো, ঠাকুরের অনেক কাজ যে আমাদের ক'রতে হবে, এক সময়ে বলেছিলেন—বোধ হয়, এইবার সেই কাজের সূচনা করাবেন।" পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণী রামচন্দ্রের নিদ্রা না হওয়ায় পাদমূলে বসিয়া পদসেবা করিতেছিলেন। রামচন্দ্রের মুখে ঐ কথা শুনিয়া তাঁহার নয়নযুগল হইতে কয়েক ফোঁটা চক্ষুজল রামচন্দ্রের চরণোপরি গড়াইয়া পড়িল, কিন্তু মুখে কোনওরূপ বাক্‌-নিষ্পত্তি করিলেন না। ঠাকুরের কার্য্যে তিনি কি কোনওপ্রকার দ্বিরুক্তি করিতে পারেন? রামচন্দ্র স্ত্রীর হৃদয়ভাব বুঝিতে পারিলেন, তিনিও আর ঐ সম্বন্ধে কোনও কথা না বলিয়া, ঠাকুরের প্রসঙ্গে সময় কাটাইয়া দিলেন।

পরদিন যোগোদ্যানে বাস করিবার ব্যবস্থা হইল। কথক শ্রীবরদাকান্ত ও অপূর্ব্বচন্দ্র, রামচন্দ্রের সমভিব্যাহারে যোগোদ্যানে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র তথা হইতে স্বীয় কর্ম্মস্থলে প্রথম প্রথম ভাড়া গাড়ীতে আসা যাওয়া করিতেন। কিন্তু নিত্য ঐরূপ আসা যাওয়ার সুবিধা না হওয়ায়, নিজে গাড়ী ঘোড়ার ব্যবস্থা করিয়া লইলেন।

১২৯৮ সালের ফুলদোলে 'তত্ত্বপ্রকাশিকার' ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তত্ত্বপ্রকাশিকার প্রথমে যে বাঙ্গলা স্তবটী সন্নিবেশিত আছে, উহা রামচন্দ্র কর্ত্তৃক রচিত। যোগোদ্যানে যাওয়ার পর হইতে তিনি নিত্য ঐ স্তবটী পাঠ করিয়া ঠাকুরের পূজা করিতেন। যাঁহারা সমভিব্যাহারে থাকিতেন, তাঁহারাও ঐ স্তবটী শিক্ষা করিলেন। ভক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায় এবং ব্রাহ্মণ কীর্ত্তিবাস আর সে সময়ে থাকেন না। ঘটনাচক্রে তখন আর একজন পাচক নিযুক্ত হইলেন, তাঁহারও নাম কীর্ত্তিবাস চক্রবর্ত্তী। এই কীর্ত্তিবাস অল্প বয়স, অতি ধীর নম্র এবং ভক্তপ্রাণ ছিলেন। ইনি ৪ বৎসর যোগোদ্যানে ঠাকুরের সেবা-

কার্য্যে ছিলেন, প্রথম প্রথম বেতন লইতেন, কিন্তু ক্রমশঃ তিনি ঠাকুরের ভাবে আকৃষ্ট হওয়ায় রামচন্দ্রের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, এবং সেই হইতে আর বেতন গ্রহণ করেন নাই। দেশ হইতে ইঁহার ভ্রাতারা অনেকবার তাঁহার বিবাহ দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইনি কখনও তাহাতে সম্মতি দেন নাই। ১৩০০ সালের ফাল্গুন মাসে ইনি যোগোদ্যানে অতি কঠিন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। এবং সেই রোগেই তিনি কলিকাতায় চিকিৎসার্থ আসিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

রামচন্দ্র এইরূপে যোগোদ্যানে বাস করিয়া ঠাকুরের সেবাকার্য্য করিতে লাগিলেন। বরদাকান্ত, অপূর্ব্ব এবং কীর্ত্তিবাস তখন তাঁহার সমভিব্যাহারে তথায় থাকেন। গোবিন্দ নামে একজন মালী এবং নিকটস্থ একটী বৃদ্ধা তখন ঝি রূপে উদ্যানের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। মাধবচন্দ্র ঘোষ নামে রামচন্দ্রের বাড়ীতে অনেক দিন হইতে একজন ভৃত্য নিযুক্ত ছিল, সেই বাড়ীর তত্ত্বাবধান করিত। রামচন্দ্র কর্ম্মস্থল হইতে যোগোদ্যানে ফিরিবার কালে একবার বাড়ীতে নামিয়া মুখহাত ধুইয়া একটু জলযোগ করিয়া যোগোদ্যানে চলিয়া আসিতেন। যোগো-দ্যানে আসিয়া আবার ভক্তজনসঙ্গে ঠাকুরের কার্য্য লইয়া থাকিতেন।

রামচন্দ্র যোগোদ্যানে আসিয়া বাস করায় ক্রমশঃ ভক্তগণ আসা যাওয়া করিতে লাগিলেন। প্রতি রবিবারে অনেক ভক্ত সমবেত হইয়া ঠাকুরের কীর্ত্তন ও সৎপ্রসঙ্গ করিতেন। এইরূপে ক্রমশঃ যোগোদ্যান সাধারণের গোচরীভূত হইতে লাগিল।

ধন্য রামচন্দ্র! তোমার কথা যখন স্মৃতিপথে উদিত হয়, তখন মানসিক অবস্থা যে কি প্রকার হয়, তাহা ব্যক্ত করিবার ভাষা আমি খুঁজিয়া পাই না। যতটা বলিব মনে করি, ভাষায় ততটা ব্যক্ত করা যায় না। যাঁহারা তোমার সঙ্গ পাইয়া জীবনে কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ধরাধাম হইতে অপসৃত হইতেছেন। কাল, চিরদিনের জন্য কিছুই রাখিয়া যায় না। যাঁহারা এখনও এ ধরায় ফিরিতেছেন, তাঁহারা সকলে যদি তোমার মধুর চরিতামৃত কিছু কিছু জগতে দিয়া যান, তবে জগৎ একটী অমূল্য রত্নের সন্ধান পাইবে। আমার ক্ষুদ্র সামর্থে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটুকু তত্ত্ব-মঞ্জরীর সম্পাদক মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিলাম। প্রার্থনা—সকলে যাঁহার যাহা জানা আছে—তাহা প্রকাশ করিয়া তোমার মাহাত্ম্য ভক্ত মাঝে প্রচার করেন। হে রামচন্দ্র!

হে গুরো! তুমি সকলের সুমতি দাও। সংসারের খেলাতে অনেক খেলা হইল, এইবার সকলকে নিজখেলায় নিয়োজিত কর।

সেবক বিজয়নাথ মজুমদার।

গুরু-শিষ্য কথোপকথন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৭১ পৃষ্ঠার পর)

গুরু শিষ্যের বাক্য শ্রবণ মাত্র ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "হাঁ, অনেক সময়ে আমরা তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া বুঝিতে পারি না বটে, কিন্তু ইহা সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে, আমাদের এই এক ছটাকী বুদ্ধি লইয়া তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যকলাপ সহজে বুঝিতে পারিব মনে করাও হাস্যাস্পদ! তিনি মঙ্গলময়, তিনি যাহা করেন সমস্তই আমাদের মঙ্গলের জন্য—এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। তাঁহার কোন কার্য্যই উদ্দেশ্যবিহীন নয় এবং সমস্তই জীবের মঙ্গল হেতু। যদিও আমরা তাঁহার কার্য্যকলাপ বুঝিতে পারি না বটে, কিন্তু যদি বুঝিতে চেষ্টা করি তিনি ক্রমশঃ আমাদিগকে বুঝান। আমি তোমাকে এ বিষয়ে একটী গল্প বলিতেছি শ্রবণ কর, ইহাতেই তোমার প্রশ্নের মীমাংসা হইবে:—

"এক সময়ে ভক্তকুলতিলক দেবর্ষি নারদের মনেও ঐরূপ সন্দেহ হইয়াছিল যে, যথার্থই কি ভগবান্ যাহা করেন, সমস্তই জীবের মঙ্গলের জন্য? সেই সন্দেহ ভঞ্জনার্থে তিনি বীণাযন্ত্রে হরিগুণ-গান করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ বৈকুণ্ঠে যাত্রা করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া নারায়ণকে লক্ষ্মী সহ আসীনা দেখিলেন। অন্তর্যামী ভগবান্ নারদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার হঠাৎ আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

দেবর্ষি নারদ ভগবৎ সমীপে নিজের মানসিক দুর্ব্বলতা প্রকাশ না করিয়া করযোড়ে বলিলেন, "প্রভু, মনে চঞ্চলতা উপস্থিত হওয়াতে দাস আপনার শ্রীচরণ দর্শন মানসে আসিয়াছে।" অন্তর্যামী পূর্ব্ব হইতেই নারদের মানসিক দুর্ব্বলতার কারণ জানিতে পারিয়াছিলেন এবং ভক্তের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ বলিলেন,

"নারদ! আমার নরজগতে ভ্রমণ করিবার বড় ইচ্ছা হইয়াছে, চল দু'জনে কিছুদিন পৃথিবীতে ভ্রমণ করিয়া আসি।" এই কথা বলিয়া নারায়ণ নারদকে সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিলেন এবং পৃথিবীতে আসিয়া দুইজনে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণপূর্ব্বক সমস্ত দিন ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং সন্ধ্যা সমাগতা দেখিয়া নারদকে সম্মুখে অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিলেন, "দ্যাখ নারদ, সাম্‌নে একটা বড় অট্টালিকা দেখ্‌তে পাচ্ছ, আমার বোধ হয় উহা কোন ধনীর বাড়ী হইবে। চল আমরা ওখানে রাত্রিবাসের জন্য চেষ্টা করিগে।" নারদ এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "প্রভু, আমি অনেকবার পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছি এবং এখানকার রীতি নীতি বিশেষরূপ অবগত আছি। ধনী ব্যক্তিদের বাড়ীতে প্রায়ই অতিথিসৎকার হয় না। দ্বারে ঐ যা শাস্ত্রিপাহারা দেখিতে পাইতেছেন, উহারা মানবাকারে পশু। উহাদের হৃদয়ে প্রায়ই দয়া মায়া দেখিতে পাওয়া যায় না। উহারা অতিথি ভিখারী দেখিলেই কটু বাক্য বলে, এবং এমন কি তাহাদের প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিতেও কুণ্ঠিত হয় না।" নারায়ণ এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন, "নারদ! একবার তোমার পরিধেয় বস্ত্রের উপর দৃষ্টি কর। সন্ন্যাসীর আবার মান অপমান কি! চল ঐ গৃহস্বামী বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন উঁহাকে আমাদের মনোগতভাব ব্যক্ত করিগে"। এই কথা শুনিয়া নারদ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "ঠাকুর! আমার নিজের জন্য বলি নাই, আমাকে প্রহার করিলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু আমার সম্মুখে আপনাকে যদি কেহ কটুবাক্য বলে, তাহা আমার হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইবে। আপনি এই নরজগতবাসীর রীতি নীতি অবগত নহেন, সেই জন্যই আপনাকে সাবধান করিয়া দিতেছিলাম।"

উভয়ে গৃহস্বামীর সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমরা রাত্রের জন্য আপনার নিকট একটু আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি,—পাইব কি?" গৃহস্বামী শুনিবামাত্র করযোড়ে বলিলেন, "সেকি কথা—এ আপনাদেরই বাটী বলেই জানিবেন। আজ আপনাদের চরণধূলিতে এ বাটী পবিত্র হইল—শুধু—আজিকার রাত্রি কেন যতদিন আপনাদের ইচ্ছা হয় থাকুন।" এই বলিয়া সেই ধনী ব্যক্তি সন্ন্যাসীদ্বয়কে বাটীর ভিতর লইয়া গেলেন এবং ভৃত্যের দ্বারা তাঁহাদিগের পাদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক দুই খানি বহুমূল্য আসনে বসিতে দিলেন এবং

দ্বারার স্বর্ণপাত্রে রাত্রিকালীন আহার আনাইয়া দিলেন। তাঁহাদিগকে পৃথক গৃহ দেওয়া হইয়াছিল এবং অনতিবিলম্বে দুইটী শয্যা প্রস্তুত হইল। গৃহস্বামী বলিলেন, "আপনারা এক্ষণে শয়ন করুন—আমি আহারাদি করিতে যাই—যদি আপনাদের কিছু প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ভৃত্যাদিগকে আদেশ করিবেন।"

ছদ্মবেশী নারায়ণ শয্যার দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক দেখিলেন, শয্যাটী মখমল দ্বারা আবৃত ও চারিপাশে বালিশ রহিয়াছে। নারায়ণ এই সমস্ত আলোকন করিয়া গৃহস্বামীকে বলিলেন, "আপনি আমাদের জন্য কেন এই সমস্ত আয়োজন করিয়াছেন? আমরা সন্ন্যাসী, আমাদের এই সমস্ত দ্রব্যে কি প্রয়োজন।" গৃহস্বামী এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "আপনারা অতিথি—আপনাদের যথোচিত সম্মান করা আমার উচিত।" তৎপরে ভৃত্যাদিগকে বলিলেন, "এই থালাবাটী তোরা বাটীর ভিতর নিয়ে যাস্‌নি এই খানেই থাক্। আমি কাহাকেও অবিশ্বাস করি না—তা ছাড়া এঁরা সন্ন্যাসী মানুষ কোন ভয় নেই।" এই কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন এবং সন্ন্যাসীদ্বয়ও আহারাদি সমাপন করিয়া শয়ন করিলেন।

নারদ মনে মনে গৃহস্বামীর প্রভূত প্রশংসা করিতে করিতে নিদ্রিত হইলেন। প্রভাত হইবার দুই দণ্ড পূর্ব্বে নারায়ণ নারদকে জাগরিত করিয়া বলিলেন, "শীঘ্র এই থালা বাটীগুলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া আইস।" নারদ তদ্রূপ করিলে নারায়ণ তাঁহাকে সেইগুলি ঝুলির ভিতর লইতে বলিলেন। নারদ এই কথা শ্রবণমাত্র তাঁহার মুখের দিকে কিছুক্ষণ বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন এবং অবশেষে তাঁহাকে বলিলেন, "প্রভু! এ ব্যক্তি আমাদের এত যত্ন ও ভক্তি করিল, শেষে ইহার থালা বাটীগুলা চুরি করিয়া লইয়া যাইব।" নারায়ণ বলিলেন, "ভাল মন্দ আমি বুঝি, যাহা বলিতেছি, তাহা বিনা বাক্যব্যয়ে কর এবং ভবিষ্যতে আমার কথার উপর কথা কহিও না।" নারদ অগত্যা সেই স্বর্ণময় পাত্রগুলি ঝুলির ভিতর পুরিয়া বলিলেন, "এখনও কেহ উঠে নাই, চলুন এই বেলা সরে পড়ি, তা না হইলে শেষে প্রাণ বাঁচান দায় হইবে।" অনন্তর তৎক্ষণাৎ দুইজনে সেই বাটী হইতে বহির্গত হইয়া পুনরায় ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সমস্ত দিন ভ্রমণহেতু অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া সন্ধ্যাকালে পুনরায় একটী বৃহৎ অট্টালিকা দেখিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দ্বারবান তাহাদিগকে দেখিয়া বলিল, "তোমরা কি চাও?" নারদ অগ্রসর হইয়া বলিলেন,

"আমরা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় বড় কাতর হইয়াছি, আমরা কিছু খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষা করছি।" দ্বাররক্ষক—"এখানে হবে না, অন্য জায়গায় দেখগে।"

নারায়ণ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা আমরা খাদ্যদ্রব্য চাইনা, একটু রাত্রের মত থাকিবার স্থান হবে না ?"

দ্বাররক্ষক। "বাবুর হুকুম কোন অতিথি ভিখারী আসিলেই তাহাকে তাড়াইয়া দিবি—তোমরা অন্য জায়গায় চেষ্টা দেখগে।"

নারায়ণ নারদকে বলিলেন, "তুমি ওকে বুঝিয়ে বল—আমরা আজ প্রথম এ গ্রামে এসেছি, কাহাকেও চিনিনা, আমরা আর কোথায় চেষ্টা করবো, আজিকার রাত্রিটা থাকিয়া অতি প্রত্যূষে চলিয়া যাইব।" নারদ পুনঃ পুনঃ দরোয়ানকে অনুরোধ করিতে সে রাগান্বিত হইয়া অশ্রাব্য কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। গোলমাল শুনিয়া গৃহস্বামী বাহিরে আসিলেন এবং উহার কারণ জ্ঞাত হইয়া দ্বাররক্ষককে বলিলেন, "তোর গায় জোর নেই ও দুটোকে মেরে তাড়া না।" দরোয়ান প্রভুর আদেশ পাইবামাত্র তদ্রূপ করিতে কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ হইল না। সন্ন্যাসীদ্বয় বিশেষরূপে লাঞ্ছিত হইয়া চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে একটী ভৃত্য আসিয়া তাঁহাদিগকে ডাকিল। তখন গৃহস্বামী তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আচ্ছা আমার স্ত্রীর অনুরোধে তোমাদিগকে আজিকার থাকিবার মত একটু স্থান দিলাম, কিন্তু কাল অতি প্রত্যূষেই তোমরা অন্যত্র যাইও।" নারদের সেখানে থাকিবার আদৌই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু নারায়ণ তাঁহাকে বলিলেন, "সন্ন্যাসীর মান অপমান দুইই সমান। চল আজকের মত এই খানেই থাকা যাক।" অনন্তর তাঁহাদিগকে একটী ছোট ঘরে থাকিবার স্থান দেওয়া হইল কিন্তু কোনরূপ আহারের বন্দোবস্ত হইল না। প্রায় রাত্রি ১১টার পর গৃহস্বামী শয়ন করিলে তাঁহার স্ত্রী সন্ন্যাসীদ্বয় অনাহারে থাকিলে গৃহস্থের অমঙ্গল হইবে ভাবিয়া কিঞ্চিৎ জলখাবার পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা উভয়েই ক্ষুৎপিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন, সুতরাং সম্মুখে আহার্য্য দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। অতঃপর দুইজনে তাহা গলাধঃকরণ করিয়া মেঝের উপর শয়ন পূর্ব্বক অচিরে নিদ্রিত হইলেন।

রাত্রিশেষে নারায়ণ নারদকে ডাকিয়া বলিলেন, "নারদ, তোমার ঝুলির ভিতর যে বালা ঘটীবাটীগুলা আছে সেগুলি এখানে রাখিয়া চল, আমরা

পলায়ন করি।" নারদ এই কথা শ্রবণমাত্র বিস্ময়ান্বিতনেত্রে নারায়ণের মুখের দিকে অবলোকনপূর্ব্বক বলিল, "প্রভু, আপনি যাহা ভাবিতেছেন, তাহা হইবে না—এ ব্যক্তি ধনী, এর গৃহে কেহ থানাতল্লাসী করিতে সাহস করিবে না। তদ্ভিন্ন এ দ্রব্যগুলিতে কাহারও নামাঙ্কিত নাই, সহজে কেহ ইহাকে বিপন্ন করিতে পারিবে না।" নারায়ণ এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন, "না হে না, আমি ও সমস্ত কিছুই ভাবি নি এবং আমার এ ব্যক্তির উপর কিছুমাত্র ক্রোধও হয়নি যে তাহার দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিশোধ লইব। এস, শীঘ্র এস, আর বিলম্ব করিও না—নিদ্রাবসান হইবার পূর্ব্বেই আমি এ গ্রাম পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি" নারদও এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব কৌতুকচিত্তে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন। মধ্যাহ্নে নারদ প্রখর রবির কিরণে ভ্রমণ করতঃ ও পূর্ব্ব দিনের অনাহার হেতু অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া নারায়ণকে বলিলেন, "আর আমি হাঁটিতে পাচ্ছিনি বড় কষ্ট হচ্ছে—এখন একটু বিশ্রাম করিলে হয় না?" নারায়ণ বলিলেন, এখানে কোথায় বিশ্রাম করিবে? এ মাঠে ত কোন লোকালয় দেখ্‌তে পাচ্ছিনি তুমি আর একটু অপেক্ষা কর, এ প্রান্তর অতিক্রম করিলেই কোন এক গৃহস্থের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিব। এই বলিয়া তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং নারদও বীণা যন্ত্রে সর্ব্বদুঃখনিবারক হরিগুণ-গান করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাদনুবর্ত্তী হইলেন। অনন্তর মাঠের ধারে একটী পর্ণ কুটীরের দ্বারে একটী বৃদ্ধাকে দণ্ডায়মান দেখিয়া নারায়ণ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "মা, আজ আমরা তোমার অতিথি হইতে ইচ্ছা করি। বৃদ্ধা সম্মুখে দুইটী সন্ন্যাসীকে দেখিয়া ভক্তিসহকারে তাঁহাদিগের চরণধূলি গ্রহণপূর্ব্বক বলিল, "আজ আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনাদের শ্রীচরণ দর্শন পেলেম। যদি দয়া ক'রে এসেছেন, ত বাটীর ভিতরে চলুন।" তাঁহারা ভিতরে আসিলে বৃদ্ধা তাঁহাদিগকে ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর দেখিয়া নিজ হস্তে ব্যজন করিতে লাগিলেন। তাহার পর তাঁহারা একটু শ্রান্তিদূর বোধ করিলে বৃদ্ধা তাঁহাদিগের চরণ ধৌত করিয়া দিল এবং সন্ন্যাসীদ্বয়ও প্রফুল্লচিত্তে একটু বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

অতঃপর বৃদ্ধা একটী গৃহে যাইয়া প'দোদকের কিয়ৎ অংশ একটী পাত্রে স্বামীর জন্য রাখিয়া অবশিষ্টটুকু নিজে পান করিল। তারপর নতজানু হইয়া করযোড়ে বলিতে লাগিল, "হে বিপদভঞ্জন মধুসূদন—আজ আমাদের এ বিপদ থেকে রক্ষা

কর। দুদিন আমাদের স্বামীর স্ত্রীর পেটে অন্ন যায়নি তাতে আমাদের কোন দুঃখ খেদ নেই, কিন্তু আজ অতিথি গৃহে যেন উপবাসী না থাকে। তুমিইত বলেছ প্রভু যে অতিথিতে তোমাতে কোন প্রভেদ নাই। অন্তর্যামী! আমার স্বামী ভিক্ষায় বেরিয়েছেন, যেন শুধু হাতে না ফেরেন। তোমার করুণাবলে আজ যেন আমরা অতিথি সৎকার করতে পারি।" বৃদ্ধা যখন বার বার এইরূপে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছিল, সেই সময় তাহার স্বামী আসিয়া বলিল, "দেখ ভগবানের কি অপার করুণা!—আমি কোথাও ভিক্ষা না পেয়ে বাড়ী ফিরে আস্‌ছিলুম এমন সময় একটা লোক আমাকে ডেকে একটা সিধা দি'য় গেল। দেখ এতে আমাদের দুজনের আজ বেশ আহার হইবে। তুমি শীঘ্র রন্ধন কর—আমার অত্যন্ত ক্ষুধা পেয়েছে।" স্বামীর কথা শ্রবণমাত্র ছল ছল নেত্রে বৃদ্ধা বলিল, "স্বামিন্! এ আহার্য্য আমাদের জন্য ভগবান্ দেননি্। আজ আমাদের গৃহে দুইজন অতিথি আসিয়াছেন, তাঁহারা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর—আমি শীঘ্র রন্ধন করিগে, তুমি তাঁহাদিগকে পুষ্করিণীতে স্নান করাইয়া লইয়া আইস।

বৃদ্ধ স্ত্রীর মুখে সমস্ত অবগত হইয়া সন্ন্যাসীদ্বয়ের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া করযোড়ে বলিল, "প্রভু—বেলা হইয়াছে, স্নান করিবেন আসুন। আমরা বড্ড গরীব, আমাদের গামছা কিম্বা তৈল কিছুই নাই। আপনাদের যদি প্রয়োজন হয় এই ছেঁড়া ন্যাকড়াখানি গামছারূপে ব্যবহার করিতে পারেন।" নারদ তৎশ্রবণে বলিলেন—"বাবা! আমাদের কোন দ্রব্যেরই দরকার নেই, চল স্নান করিয়া আসি।" অতঃপর তাঁহারা স্নান করিয়া আসিলে স্বামী স্ত্রী তাঁহাদিগকে অতি ভক্তিসহকারে ভোজন করাইলেন। নারায়ণ ভোজনান্তে বলিলেন—"মা তোমার রান্না বেশ হইয়াছিল, আমরা অতি তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়াছি। এক্ষণে আমাদের শয়ন করিবার একটু বন্দোবস্ত করিয়া দাও। বৃদ্ধা শয্যা কোথায় পাইবে মেঝের উপর একটী জীর্ণ কন্থা বিছাইয়া দিল এবং সন্ন্যাসীদ্বয় তাহার উপরেই শয়ন করিলেন। সেদিন দম্পতীর ভাগ্যে আহার জুটিল না। তাহারা সন্ন্যাসীদের পাতে যা দু একটী তণ্ডুলকণা পড়িয়াছিল, তাই খাইল এবং অতিথিসৎকার করিতে পারিয়াছে বলিয়া ভগবানকে বার বার ধন্যবাদ দিতে লাগিল। তাহার পর স্বামীস্ত্রী উভয়ে সন্ন্যাসীদ্বয়ের পদসেবায় নিযুক্ত হইল।

কিছুক্ষণ পরে নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! তোমাদের কিরূপে চলে?"

বৃদ্ধা—বাবা, আমার স্বামী ভিক্ষা কর্ত্তে যান, যেদিন কিছু ভিক্ষা পান আমরা তাই ভোজন করি। আর যেদিন কিছু না পান, সেদিন ঐ যে দ্বারের সম্মুখে যে গাভীটী বাঁধা আছে, উহারই দুগ্ধ পান করিয়া দিন অতিবাহিত করি। আর স্বামীও আমার বৃদ্ধ, তিনি সব দিন বেরুতে পারেন না।

নারদ—তা হ'লে ত মা তোমাদের বড় কষ্টে দিন যায়।

বৃদ্ধা—কেন বাবা, কষ্ট আবার কি? এই পেটে ক্ষীর ছানা দাও তাতেও উদর পূর্ণ হবে, আবার শাক অন্ন দিয়ে ভরাও তাতেও ক্ষিধে মিটবে। যে রকম করেই হ'ক দিন চলে যায়। যে দিন আমাদের ঘরে চাল থাকেনা, আমার স্বামী ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারক হরিগুণ গান করিতে থাকেন এবং আমিও বসে শ্রবণ কর্ত্তে থাকি। শ্রবণ কর্ত্তে কর্ত্তে ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা আর আমাদের মনে থাকেনা। তারপর আমার স্বামী গো-দোহন করিয়া দুগ্ধ আনেন। তাহা ভগবানকে নিবেদন করিয়া আমরা তাঁহার প্রসাদ পান করি।

নারদ বৃদ্ধার কথা শ্রবণ করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার নয়ন হইতে দর দর ধারে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তাঁহার ইচ্ছা হইতে লাগিল যে, তিনি তাঁহাদিগকে কোনরূপ বর প্রদান করেন কিন্তু ভগবানের সম্মুখে তদ্রূপ করিতে সাহস হইল না। নারায়ণকে নিদ্রিত দেখিয়া তিনি তখন বৃদ্ধাকে ইসারায় বলিলেন, "সন্ন্যাসীরা অসাধ্য সাধন করিতে পারে তাহা বোধহয় তুমি জান। তুমি ওঁর (নারায়ণের) কাছে কিছু প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই পূর্ণ করবেন।"

বৃদ্ধা—বাবা! আমাদের প্রার্থনা করবার ত কিছুই নাই। তুমি আমাদের অবস্থা দেখে মনে করিতেছ যে আমরা অত্যন্ত কষ্টে আছি। কিন্তু সত্য কথা বল্‌তে কি, বাবা আমাদের কোন কষ্ট নাই। আমরা কেন আমাদের সামান্য সুখের জন্য উঁহাকে উত্যক্ত করবো, যদি আমাদের উপর আপনারা সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, এই আশীর্ব্বাদ করুন সেই পদ্মপলাশলোচন হরিকে ক্ষণেকের তরেও যেন বিস্মৃত না হই।

নারায়ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি দম্পতির নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক নারদকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর নারায়ণ নারদকে বলিলেন, "অহো নারদ! আমার একটা ভুল হয়ে গেছে তুমি

একটু দাঁড়াও, আমি এখুনি আস্‌ছি।" নারদের মনে অত্যন্ত কৌতূহল হওয়াতে তিনিও নারায়ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। নারায়ণ বৃদ্ধার বাটীর সম্মুখে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত সেই গাভীটাকে বধ করিয়া তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসেন, এমন সময়ে নারদ তাঁহাকে বলিলেন, "প্রভু আজ কয়েক দিন ধ'রে আপনার এ কি ব্যবহার দেখিতেছি! আমি জানি আপনি যা করেন, সমস্তই জীবের মঙ্গলের জন্য, কিন্তু এ কয়দিন আপনার কার্য্য কলাপ যাহা দেখিতেছি, তাহাতে আমার মনে ভয়ানক সন্দেহ হইয়াছে। আমাকে আর সংশয়চিত্তে রাখিবেন না, অনুগ্রহপূর্ব্বক সমস্ত খুলিয়া বলুন।"

নারায়ণ তখন নারদকে বলিলেন, "আমি আর তোমায় সংশয়ে রাখিব না—তোমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াই আমি তোমাকে আমার কার্য্যকলাপে কিরূপ মহা উদ্দেশ্য থাকে তাহা দেখাবার জন্যই তোমাকে এতদিন সঙ্গে করিয়াই ঘুরিতেছি।

নারদ। প্রভু! আমি অনেকবার আপনার উদ্দেশ্য বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারি না।

নারায়ণ। আমি তোমাকে সমস্ত খুলিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর—প্রথমে আমরা যে ধনীর গৃহে যাই, সেই ব্যক্তি যদিও সাত্ত্বিকভাবে কার্য্য করিতে যাইতেছে বটে, কিন্তু এখনও তাহার রাজসিক ভাব যায় নাই। আমি তাহার রাজসিক ভাব বিনাশ করিয়া দিলাম।

নারদ। আপনার ব্যবহারে ফল এই হ'ল যে, সে আর অতিথিকে আশ্রয় দেবে না।

নারায়ণ। না বৎস সেরূপ হইবে না। সে ব্যক্তি অতিথিকে দেবতা তুল্য জ্ঞান করে। সে কখনই অতিথি গেলে তাহাকে বিমুখ করিতে পারিবে না। থালা ঘটী বাটীগুলা চুরি যাওয়াতে সে পুনঃ বাহ্যাডম্বর করিবার প্রয়াস পাইবে না। এখন হইতে সাত্ত্বিকভাবে অতিথি সৎকার করিতে আরম্ভ করিবে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি যাহাকে অপহৃত দ্রব্যগুলি দিয়া আসিলাম, সে এখন হইতে অন্ততঃ লোভের বশীভূত হইয়াছে—অতিথি গেলে তাহাকে আশ্রয় দান করিবে। ভগবানের এমনি মহিমা! অচিরে তাহার লোভ গিয়ে সেও অতিথিকে শীঘ্রই দেবতা জ্ঞানে সেবা করিবে।

নারদ। আচ্ছা প্রভু, এ তুজনকার কথা যা বল্লেন, তা না হয় বেশ বুঝতে পারলুম, কিন্তু ঐ দম্পতির প্রতি এমন ব্যবহার কেন করিলেন। তাহারা নিজে না খাইয়া আমাদের নিঃস্বার্থভাবে সেবা করিল, আর আপনি তাদের সহিত কি দুর্ব্যবহারই কল্লেন। শুনিলেন যে ঐ গাভীটীর দুগ্ধ দ্বারা তাহারা প্রাণ ধারণ করে, আপনি জানিয়া শুনিয়াও সে গাভীটী বধ করিতে কোনরূপ মনে দ্বিধা বোধ করিলেন না। অহো! আপনি কি নৃশংস ব্যবহার তাহাদের সঙ্গে করিলেন। হ'তে পারে—তারা পূর্ব্বে হয় ত কোন মহাপাতক করিয়া থাকিতে পারে—এখন ত তারা আপনার নামের গুণে নিষ্পাপ হইয়াছে—এখন কি আপনি তাহাদের সেই পূর্ব্বেকার পাপের ফল দিয়ে আসিলেন?

নারায়ণ। বৎস! আমার কাছে পাপী পুণ্যাত্মা নাই—আমি আমার সন্তানদের কখনই ভিন্ন ভিন্ন চক্ষে দেখি না। আমি সর্ব্বদাই তাহাদের সৎ পথে লইয়া যাইবার জন্য তাদের বার বার সৎ পরামর্শ দিই। আর তুমি ঐ বৃদ্ধার বিষয় যা মনে করিতেছ, তা তোমার ভুল ধারণা। সে আমার প্রতি সমস্ত ভার অর্পণ করে—তার জন্যে আমাকে সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত হ'তে হয়। যেমন যে শিশু, মা তারই জন্যে সর্ব্বদা চিন্তিত থাকেন, যখন যেখানে যে রকম অবস্থাতেই থাকুন না কেন, সর্ব্বদা সেই শিশুর উপর নজর রাখিতে হয়। আর যে ছেলে নিজে খুঁটে খেতে শিখে, মা তার জন্য তত চিন্তিত থাকে না। এই স্বামী স্ত্রী আমার উপর সমস্তই নির্ভর করিত, সেই জন্য স্বয়ং কমলাকে বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া উহাদের দ্বারে গাভীর বেশ ধারণ করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। উহার গৃহে এমন কি যদি দশজন অতিথিও আসিত, ঐ গাভীর দুগ্ধেই সেই দশজনের সেবা হইত। সময়ে সময়ে যখন উহারা আমাকে কাতরপ্রাণে অতিথি সৎকারের জন্য ডাকিত, আমাকেও বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া উহাদের সাহায্য করিতে আসিতে হইত। আজ যখন আমরা উহাদের গৃহে যাই, তখন উহাদের গৃহে একটী তণ্ডুলকণা পর্য্যন্তও ছিল না। আমি বৃদ্ধার কাতরতায় স্থির থাকিতে না পারিয়া ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া ঐ সমস্ত আহার্য্য বৃদ্ধাকে প্রদান করি। এ জনমানবশূন্য প্রান্তরে তা না হ'লে কে উহাদের নিত্য আহার যোগাইবে। উহারা এত কষ্টে থাকিয়াও এক দিনের জন্যও নিজের সুখস্বচ্ছন্দতা জন্য প্রার্থনা করে নাই—আমার কাছে চাহিবার মধ্যে তাহারা

কেবল "শুদ্ধাভক্তি" চাহিয়াছে। এ সমস্ত সত্ত্বেও তাহারা আমার নিকট আসিতে পারে নাই কেন বৎস্য জান?—মায়ায়। জীব যতক্ষণ মায়ায় মুগ্ধ থাকে, ততক্ষণ সে আমার কাছে আসিতে পারিবে না। উহারা জগতের মধ্যে ঐ গাভীটীর মায়ায় মুগ্ধ ছিল, আজ সেই মায়ার বন্ধ ভঙ্গ করিয়া দেওয়াতে তা'দের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে এবং তাহারা আমাতেই লীন হইয়াছে।

নারদ। এত দয়া তোমার না থাকিলে প্রভু তোমাকে লোকে দয়াময় বলে ডাকে। চলুন, আমরা এক্ষণে বৈকুণ্ঠে যাই। এই বলিয়া নারদ তাঁহার বীণাযন্ত্রে হরিগুণগান করিতে করিতে নারায়ণকে লইয়া বৈকুণ্ঠধামে চলিলেন।

গুরু। বৎস্য! তোমার প্রশ্নের মীমাংসা কি হ'ল? তুমি ভুল বুঝিয়াছ যে পুত্র বিহনে বৃদ্ধার আহারের কষ্ট হইবে এবং সাধনার ব্যাঘাত হইবে। কে কারে খাওয়ায়? সে যাকে দিনরাত ডাকৃছে, সে এসে তার খাওয়ার যোগাড় করে দেবে না। তবে যাকে না ডাকৃলে সে আপনিই আসে, আর এ যে তার জন্যে পার্থিব সমস্ত প্রলোভন পরিত্যাগ করে অহোরাত্র তাকে নিয়ে পড়ে আছে, তার জন্যে কি সে স্থির হয়ে থাকতে পারবে?

শিষ্য। প্রভু! এবার আমার সমস্ত সংশয় দূর হইয়াছে। আমি সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছি।

গুরু। সন্ধ্যা আগতপ্রায়—এক্ষণে চল সন্ধ্যাবন্দনাদি করিগে। সময়ান্তরে তোমার অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর দিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ।

ভগবান্

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি।

হ'বে নাকি ভোর আর? কোথা তুমি হে মোর অরুণ!
কোটী কোটী রবি তেজে এস, এস! তোমার এ ঊষা,
সারারাত্রি সারারাত্রি বসে আছে, পরি ফুল-ভূষা,
কণ্ঠে শিশিরের মালা!—হে সুধাংশু, মোহন, তরুণ,
কোথা তুমি, কোথা তুমি? সতী-দাহে জলন্ত আগুন

মাঝে সতী যথা, হের দহিতেছে ধিকি ধিকি তুষা-
নল-কুণ্ডে তোমার এ ম্লান সন্ধ্যা! রতন-মঞ্জুষা
তারকায়, হাসে তার!—কোথা তুমি, সুন্দর, করুণ?
কোথা তুমি ফেণময় ফণাময় সুনীল জলধী?
রিণিকি রিণিকি রিনি, দুচরণে রজত-শিঞ্জিনী,
ছুটিতেছে তীর-বেগে তোমার এ গিরি-নির্ঝরিণী,
তব লাগি, তব লাগি! এ গতির নাহি কি অবধি?
মাঝে মাঝে কাণে পশে সুমধুর সমুদ্র-গর্জ্জন!
কোথা তুমি রত্নাকর? কোথা তুমি, মধুর ভীষণ?

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন, এম, এ।

যুগাবতার
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব
ও
হিন্দুশাস্ত্র।

ঠাকুর বলিতেন, "যেমন কোন বাবুকে অথবা বাবুর ঐশ্বর্য্যাদি জানিতে হইলে, আগে যো সো ক'রে বাবুর সহিত আলাপ ক'ত্তে হয়; পরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করলেই, তিনিই সব জানিয়ে দিবেন;—ক'খানা বাড়ী কত টাকা, ক'খানা তালুক ইত্যাদি। তা না হ'য়ে আগে বাবুর বাগান দেখেই বিচার করতে আরম্ভ ক'র্লে, বাবুকে দেখা হবে কি রকম করে।" তদ্রূপ যাঁহারা ভগবান্‌কে লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ভগবানের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া বিচার না করিয়া সৎ গুরূপদেশে বিশ্বাস স্থাপন করতঃ ভগবানের যে কোন ভাব আশ্রয় করিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে লাভ করিতে চেষ্টা করা উচিত। এইরূপে যখন তিনি অধিকারী হইবেন, তখন তাঁর কৃপাতে সমস্তই জানিতে পারিবেন এবং তাঁহার সমস্ত সন্দেহ মীমাংসা হইয়া যাইবে। এইরূপ অধিকারী অর্জ্জুন ছিলেন; তাই গদাচক্রধারী সারথিবেশী শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে 'বিভূতিযোগ' বলিয়াছিলেন।

কিন্তু অর্জ্জুন তাহাতেও শান্ত না হইয়া ঔৎসুক্য বশতঃ তাঁহার 'বিশ্বরূপ' দর্শন করিতে অভিলাষী হইলে, তাঁহাকে 'বিশ্বরূপ' দেখাইয়া বলিয়াছিলেন,

তোমা সম ভক্ত ভিন্ন অন্যে কোন কালে,
দেখে নাই সেইরূপ—তব যোগ বলে
প্রসন্ন হইয়া আজ দেখানু তোমায়,
বিশ্বরূপ, অন্তহীন আদ্য তেজোময়।
হে কৌরব, বেদ যজ্ঞ কিম্বা অধ্যয়নে,
ক্লেশকর ক্রিয়া, উগ্র তপস্যা কি দানে,
দেখিতে আমার এই রূপ বিশ্বময়,
তোমা ভিন্ন অন্য কেহ সমর্থ না হয়।

(গীতা ১১ অধ্যায় ৪৭।৪৮ শ্লোক)

এইরূপে ভক্তের জন্য নারায়ণ চতুর্ভূজধারী সারথিবেশী হইয়াও অর্জ্জুনকে অনাদি অনন্তরূপ দেখাইয়াছিলেন, এইথানে ঠাকুরের উক্তি, "তিনি সাকার ও নিরাকার, দুইই তিনি," এই বিষয়টী বিশেষরূপে মীমাংসা হইয়া যাই-তেছে। ফলতঃ অর্জ্জুনের সমান ভক্ত ভিন্ন যখন অন্য কেহ তাঁহার স্বরূপ জানিতে পারে না, তখন আমাদের মিছামিছি তর্ক ঝগড়া ক'রে কষ্ট পাওয়ার আবশ্যকতা কি? এই জন্য ঠাকুর দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়াছেন যে, "যে গাছতলায় থাকে, সেই জানে যে, বহুরূপীর নানা রঙ—আবার কখন কখন কোন রঙই থাকে না। অন্য লোকে কেবল তর্ক ঝগড়া ক'রে কষ্ট পায়।" এক্ষণে আমাদের আর একটী বিষয় বিশেষরূপে জানা আবশ্যক। 'তিনি সাকার ও নিরাকার দুইই।' তবে আমরা কিরূপ উপাসনাতে তাঁহাকে শীঘ্র এবং সহজে লাভ করিতে পারিব? এই কথার উত্তরে ঠাকুর বলিয়াছেন, "যেমন বাণ ছোড়া শিখতে হ'লে, আগে কলাগাছ তাগ ক'র্ত্তে হয়, সেইরূপ সাধক সাকাররূপ আশ্রয় করিয়া উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইলে, সহজে কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে।" অর্জ্জুন, তাঁহার অনাদি অনন্তরূপ দেখিবার পর, তাঁহাকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

তোমাতে সঁপিয়া চিত্ত যেই ভক্তগণ
হেন উপাসনা তব করে সর্ব্বক্ষণ,

আর সে অব্যক্ত ব্রহ্মে যারা ধ্যান করে—
শ্রেষ্ঠ যোগী কহ কৃষ্ণ, কহিব কাহারে ?
(গীতা ১২ অঃ ১ শ্লোক)

তাহাতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন,

আমাতে নিবিষ্ট চিত্ত নিত্য যুক্ত যাঁরা,
শ্রদ্ধায় করেন ধ্যান যোগী শ্রেষ্ঠ তাঁরা।
আর যাঁরা সমদর্শী জিতেন্দ্রিয় হন,
সর্ব্বভূত-হিতে রত নির্ব্বিকার মন,
অচিন্ত্য অব্যক্ত ব্রহ্ম ধ্যান-পরায়ণ,
তাঁহারাও, ধনঞ্জয়, মোরে প্রাপ্ত হন।
সাধক অব্যক্ত ব্রহ্মে বহু ক্লেশে পায়,
বহু কষ্টে সেই নিষ্ঠা লাভ করা যায়।
কিন্তু করি সর্ব্ব কর্ম্ম অর্পণ আমাকে,
যাহারা একাগ্র যোগে আমাতেই থাকে,
ধ্যানেতে আমায় সদা উপাসনা করে,
আমাতে নিবিষ্টচিত্ত সেই সব নরে,
অচিরে কাণ্ডারী হ'য়ে করি আমি পার
মৃত্যুময় এ সংসার—জলধি অপার।
(গীতা ১২ অঃ ২।৩।৪।৫।৬।৭ শ্লোক)

'ধ্যানেতে আমায় সদা উপাসনা করে' এই কথার তাৎপর্য্য এই যে, সৎ-গুরূপদেশে তাঁহার যে কোন মূর্ত্তি ভাবনা করিয়া তাহাতেই নিবিষ্টচিত্ত হইতে হইবে। তাহা হইলেই শীঘ্র আমরা তাঁহার কৃপালাভে অধিকারী হইব।

এই জন্য একলব্য বাণ শিক্ষার জন্য দ্রোণাচার্য্যের নিকট নিষাদ পুত্র বলিয়া উপেক্ষিত হওয়ায়, বন মধ্যে স্বীয় মনঃকল্পিত গুরু দ্রোণাচার্য্যের মৃন্ময় মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া একাগ্রচিত্তে বাণ শিক্ষা করিয়াছিলেন। ভাবীকালে সেই একলব্যই দ্রোণাচার্য্যের প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুন অপেক্ষাও ধনুর্ব্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন। ঠাকুরও এই জন্য বলিয়াছেন, "কালী, দুর্গা, শিব, রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্য অথবা খ্রীষ্ট, মহম্মদ আদি যে কোন রূপকে আশ্রয় করিয়া নিবিষ্টচিত্তে

কার্য্য করিলে অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে, নিষ্ফল হইবে না।" এমন কি যে কোন দ্রব্যে তাঁহাকে চিন্তা করিতে পারা যায়। যে হেতু,

সর্ব্বভূতে বীজ আমি, শুন পার্থ তাই
আমি ভিন্ন চরাচরে আর কিছু নাই।
(গীতা ১০ অঃ ৩৯ শ্লোক)

এই হেতু যখন হরিভক্ত প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন, "আমার হরি সকল স্থানেই আছেন" তাহাতে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ক্রোধান্বিত হইয়া আরক্তলোচনে, সম্মুখস্থ স্তম্ভের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়াছিলেন, "এই স্তম্ভের ভিতর তোর হরি আছেন?" প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন, "আছেন"। এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু যেমনই স্তম্ভের দিকে লক্ষ্য করিয়া গদা নিক্ষেপ করিলেন, অমনই সর্ব্বভূতভাবন ভগবান, হিরণ্যকশিপু ও প্রহ্লাদ এই দুই ভক্তের প্রতি কৃপা বশতঃ সেই ভগ্ন স্তম্ভের ভিতর হইতে অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব নৃসিংহরূপে আবির্ভূত হইলেন। এই জন্যই ঠাকুর বলিয়াছেন, "ভক্তের জন্য তিনি নানারূপ ধ'রে আসেন। ফলতঃ তাঁহার কোনরূপই মিথ্যা বা কল্পনা নহে।" ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত মহাত্মা রামচন্দ্র তাঁহার বক্তৃতাবলীর মধ্যে দ্বিতীয় বক্তৃতাতে 'সাকার নিরাকার' সম্বন্ধে, দৃষ্টান্তাদি দ্বারা যাহা সুচারুরূপে মীমাংসা করিয়াছেন, পাঠক, তাহা পাঠ করিলে এ বিষয় আরও বিশদরূপে বুঝিতে পারিবেন।

অষ্টম উপদেশ।

সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, "কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু। যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কোন কাজ ক'রছেন না, এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এই সব কার্য্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি, নাম রূপ ভেদ।"

যেমন জল, ওয়াটার, পানি। এক পুকুরে তিন চার ঘাট আছে। এক

ঘাটে হিন্দুরা জল খায়, তারা বলে 'জল'। এক ঘাটে মুসলমানেরা জল খায়, তারা বলে 'পানি'। আর এক ঘাটে ইংরাজেরা জল খায়, তারা বলে 'ওয়াটার'।

"তিনি একই; কেবল নামে তফাৎ! তাঁকে কেউ বল্‌ছে 'আল্লা', কেউ বল্‌ছে 'গড্'; কেউ বল্‌ছে 'ব্রহ্ম'; কেউ বল্‌ছে 'কালী'; কেউ কেউ বল্‌ছে রাম, হরি, যীশু, দুর্গা। আন্তরিক হ'লে সব ধর্ম্মের ভিতর দিয়া ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবেরাও ঈশ্বরকে পাবে, শাক্তরাও পাবে, বেদান্তবাদীরাও পাবে, ব্রহ্মজ্ঞানীরাও পাবে; আবার মুসলমান, খ্রীষ্টান এরাও পাবে। আন্তরিক হ'লে সবাই পাবে। কেউ কেউ ঝগড়া করে বসে। তারা বলে, 'আমাদের শ্রীকৃষ্ণকে না ভজলে কিছুই হবে না'; কি আমাদের মা কালীকে না ভজলে কিছুই হবে না'; 'আমাদের খ্রীষ্টান ধর্ম্মকে না নিলে কিছুই হবে না।' এ সব বুদ্ধির নাম মতুয়ার বুদ্ধি; অর্থাৎ আমার ধর্ম্মই ঠিক, আর সকলের মিথ্যা। এ বুদ্ধি খারাপ। *ঈশ্বরের কাছে নানা পথ দিয়ে পৌঁছান যায়।*"

পূর্ব্বোক্ত সপ্তম উপদেশে 'সাকার-নিরাকার-তত্ত্ব' আলোচনাতে গীতা ও ভাগবত হইতে যে সকল প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে, তদ্দ্বারা অত্রোপদেশের অনেক বিষয় খণ্ডন হইয়া যাইবে। সুতরাং বাহুল্য বশতঃ তাহা আর পুনরালোচিত হইল না। কেবল মাত্র কয়েকটী স্থূল দৃষ্টান্ত দ্বারা অত্রোপদেশ আলোচিত হইবে।

গীতাতে উক্ত হইয়াছে,

যে ভাবে যে জন করে ভজন আমায়,
সেইভাবে অনুগ্রহ করি আমি তায়।
সকাম নিষ্কাম পূজা—যে করে যেমন,
সর্ব্বথা আমার পথে করে আগমন।

(গীতা ৪ অঃ ১১ শ্লোক)

ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, হিন্দু (বৌদ্ধ, শাক্ত, বৈষ্ণবাদি নানা প্রকার উপাসক) মুসলমান ও খ্রীষ্টান প্রভৃতি সর্ব্ব সম্প্রদায় একজনেরই উপাসনা করিতেছে। তবে আলাহিদা ভাষাতে অথবা উক্তিতে। যেমন দর্শকের তুষ্টিসাধন জন্য অথবা অভিনয় ব্যাপারের প্রয়োজন অনুসারে একজন ব্যক্তিই ভিন্ন ভিন্ন সাজে কল্পিত হইয়া রঙ্গস্থলে অভিনয় করেন। তদ্রূপ ভগবানও প্রয়োজন মত ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিতে অথবা সৃষ্টির শান্তি বিধান মানসে,

যখন যে রূপ ধারণের আবশ্যকতা অনুভব করেন, তখন সেই রূপ ধারণ করিয়া সংসার রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হন। পূর্ব্বোক্ত উপদেশে বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে, "যেরূপ একটী অক্ষয় জলাশয় হইতে অসংখ্য স্রোতোধারা প্রবাহিত হইয়া দিকে দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ সেই একমাত্র ঈশ্বর হইতে নানাবিধ অবতারের সৃষ্টি হইয়া থাকে।" এক স্বর্ণ হইতে নানাবিধ অলঙ্কারের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যথা,—তাগা, বালা, চুড়ি, হার ইত্যাদি। তাহা খরিদ্দারের প্রয়োজনানুসারে স্বর্ণকার প্রস্তুত করিয়া থাকে অর্থাৎ যাহার তাগার প্রয়োজন তাহাকে তাগা দেয়, যাহার বালার প্রয়োজন তাহাকে বালা দেয়, যাহার চুড়ির প্রয়োজন তাহাকে চুড়ি দেয়। এমত স্থলে তাগা, বালা ও চুড়ি প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি বলিয়া উহারা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ হইতে উৎপন্ন নহে। একজন বালা পরিধান করিলে তাহারও যেরূপ স্বর্ণ পরিধানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়; একজন হার পরিধান করিলে তাহারও তদ্রূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। তবে যাহার যেটী ভাল লাগে। দধি, ক্ষীর, ছানা, মাখন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, উহারা দুগ্ধেরই অবস্থান্তর মাত্র। যে দধি খাইয়াছে, সে দধিরই প্রশংসা করিবে। যে ক্ষীর খাইয়াছে, সে ক্ষীরেরই প্রশংসা করিবে। যে ছানা খাইয়াছে, সে ছানারই প্রশংসা করিবে। যে মাখন খাইয়াছে, সে মাখনেরই প্রশংসা করিবে। কারণ যে যেটী খাইয়াছে, সে তাহারই আস্বাদ পাইয়াছে। সুতরাং সে সেইটীরই প্রশংসা করিয়া থাকে। অন্যগুলির সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকে। যে সমস্ত গুলিই খায়, কেবলমাত্র সেই উপলব্ধি করিতে পারে, যে, সমস্ত গুলিই অর্থাৎ দধি, ক্ষীর, ছানা, মাখন প্রভৃতি দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন। ভগবান রামকৃষ্ণদেবই কেবলমাত্র দধি, ক্ষীর, ছানা, মাখন প্রভৃতি সমস্ত খাইয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, সমস্তই দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ ঠাকুর সাধকবেশে জীবশিক্ষার জন্য প্রত্যেক ধর্ম্ম পৃথক ভাবে নিজে সাধন করিয়া পথভ্রান্ত অজ্ঞ মানবগণকে দেখাইয়া গিয়াছেন যে, সমস্ত ধর্ম্মের সাধনে সিদ্ধ হইলে একস্থানে পৌছাইয়া দেয়। এই বিষয় তিনি নিজে উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছেন, 'যত মত তত পথ মাত্র।' যদিও আমরা অন্ধ, সাধন ভজন বিহীন, আমরা কিছুই জানিনা, আমরা কিছুই বুঝি না। তথাপি আমরা চির-কালই 'মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা' এই বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া

চলিতেছি। 'মহাজন' যে সে মহাজন নহে, ভবপারের কর্ণধার স্বয়ং ভগবান রামকৃষ্ণদেবকে আদর্শ মহাজন পাইয়াছি। আর আমাদের ভয় কি? কারণ 'যিনি কাশী গিয়াছেন, তিনি কাশীর পথ ঘাট উত্তম রূপে চেনেন।' আমরা তাঁহার প্রদর্শিত পথ পাইয়াছি। আমরা ভগবান রামকৃষ্ণদেবকে, জীবন তরণির কর্ণধারকে কাশীধামে যাইবার পথ প্রদর্শক পাইয়াছি। তাঁহারই প্রদর্শিত পথে আমরা চলিব। হই না আমরা অন্ধ, হই না আমরা অজ্ঞ, তিনিই আমাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবেন। 'প্রভো,

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা,
এ সমুদ্রে আর কভু হ'ব নাকো পথহারা।'

এইজন্য অন্ধ হইলেও আমরা চক্ষুষ্মান। ঠাকুরের প্রদর্শিত উপদেশ সত্ত্বেও যদি আমরা অন্ধ থাকি, যদি আমরা অজ্ঞ থাকি, তবে আমাদের আর কোনকালে চক্ষু ফুটিবে না। আমরা চিরদিনই অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিব। কে আর আমাদিগকে বিপথ হইতে সুপথে লইয়া যাইবে?

আরও শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, যে সময় শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় আয়ানসহ কুটিলাকে আসিতে দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, কালিকারূপে শ্রীমতি প্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ করিতে থাকেন। শ্রীমতী রাধিকা শ্রীশ্রীকালিকা পূজা করিতেছেন দেখিয়া আয়ান সন্তুষ্ট চিত্তে, কুটিলাকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে চলিয়া গেলে, পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ মুরলীধারীরূপ ধারণ করেন। এক্ষণে শাক্তদ্বেষী বৈষ্ণবদিগকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, যিনি কৃষ্ণ, তিনি কৃষ্ণই থাকিবেন। তিনি কালী হইলেন কেন? যদি তিনি ইচ্ছা করিলেই কালী হইতে পারেন, তাহা হইলে শ্রীশ্রীকালিকা মূর্ত্তি কি শ্রীকৃষ্ণেরই রূপান্তরিত মূর্ত্তি নহে? এবং এই কালীমূর্ত্তি অথবা শক্তি উপাসকদিগকে নিন্দা করিলে কি তাঁহাদের ইষ্টমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে অথবা বৈষ্ণবদিগকে নিন্দা করা হয় না? আবার পক্ষান্তরে, বৈষ্ণবদ্বেষী শাক্তদিগকে জিজ্ঞাসা করা যায়, যিনি ইচ্ছামাত্রেই কালীমূর্ত্তি হইতে দ্বিভুজ মুরলীধারী রাখালবেশী শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিতে পারেন; সেই শ্রীকৃষ্ণই কি তাঁহাদের ইষ্টমূর্ত্তি শ্রীশ্রীকালিকা মাতা নহেন? এবং বৈষ্ণবগণও কি প্রকারান্তরে শক্তির উপাসনা করিতেছে না? অতএব শ্রীকৃষ্ণকে অথবা বৈষ্ণবগণকে নিন্দা করিলে কি নিজ ইষ্টমূর্ত্তি অথবা নিজ ইষ্টোপাসক

দিগকে নিন্দা করা হয় না? বৃক্ষের শাখা প্রশাখাকে আঘাত করিলে কি বৃক্ষকে আঘাত করা হয় না? এইরূপে প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীগণ বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, অপর ধর্ম্মের নিন্দাবাদ আদি করিলে নিজ ধর্ম্মের উপরই আঘাত লাগে।

এক্ষণে এক অদ্বিতীয় ভগবানকে লাভ করা যখন সকল ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, তখন নিজ নিজ সীমাবিশিষ্ট বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারা তাঁহার এক একটী রূপকে প্রধান রূপ কল্পনা করিয়া পরস্পর দ্বেষাদ্বেষী, তর্ক, ঝগড়া করা উচিত নহে। ফলতঃ যিনি যে কোন রূপকে ইষ্টমূর্ত্তি জ্ঞান করেন, তাঁহাকেই আন্তরিক নিষ্কাম ধ্যান করিলে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে।

প্রত্যেক ভগবৎলাভেচ্ছুক ব্যক্তির স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অন্য দেব দেবীর নিন্দা অথবা অন্য ধর্ম্মের নিন্দা করা তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির পথে প্রধান অন্তরায়। এক্ষণে একটী প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি সব ধর্ম্ম ও সব মূর্ত্তি অর্থাৎ সমস্ত দেবতা এক অদ্বিতীয় ভগবানের অংশমাত্র, তাহা হইলে সাধনা করিতে হইলে কি সমস্ত দেবতাকে অথবা সমস্ত ধর্ম্মেরই উপাসনা করিতে হইবে? তাহার উত্তরে ঠাকুর বলিয়াছেন, "গৃহস্থের বাড়ীর বউ শ্বশুর, শাশুড়ী, ভাশুর, দেবর প্রভৃতি সকলেরই সেবা যত্ন করে, সকলকেই আদর অভ্যর্থনা করে; কিন্তু তাহার স্বামীর কাছ ভিন্ন কারও কাছে শোয়না। তদ্রূপ সকল ধর্ম্মের প্রতি সম্মান কর, সকল দেব দেবীকে ভক্তি কর, কাহাকেও নিন্দা অথবা বিদ্বেষ ক'রনা। কিন্তু নিজ ধর্ম্ম অথবা নিজ ইষ্টমূর্ত্তির উপর "নিষ্ঠা" রাখিবে। অর্থাৎ যে মন্ত্রে তুমি দীক্ষিত, তাহারই উপাসনা করিবে। যেমন একজন 'কৃষ্ণ' মন্ত্র উপাসক, তিনি বিবেচনা করিবেন 'আমার কৃষ্ণই' দুর্গারূপে, কালীরূপে, শিবরূপে যীশু-খ্রীষ্টরূপে ইত্যাদি নানারূপে বিরাজিত রহিয়াছেন। যিনি কালী মন্ত্রের উপাসক, তিনি অপরাপর দেবদেবীকে 'কালী' মাতারই রূপান্তরিত মূর্ত্তি বিবেচনা করিয়া ভক্তি করিবেন। যিনি 'রাম' মন্ত্রের উপাসক, তিনি অপরাপর দেবদেবীকে তাঁহার 'শ্রীরামচন্দ্রেরই' অন্য মূর্ত্তি জ্ঞান করিয়া তৎপ্রতি ভক্তিমান হইবেন। ফলতঃ সাধক নিজ নিজ ইষ্টমূর্ত্তিকে অপরাপর দেবদেবী হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান না করিয়া, নিজ ইষ্টমূর্ত্তিতেই সকলরূপের ভাব সন্নিবেশিত করিবেন। মহাত্মা রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকাগ্রণীগণ নিজ নিজ ইষ্টদেব দেবীকে নানারূপে

বর্ণনা করিয়া, শেষে নিজ ইষ্টদেবেই সকল রূপের উৎপত্তির স্বীকার করিয়াছেন। রামপ্রসাদ গাইয়াছেন,

মন করোনা দ্বেষাদ্বেষী।
যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী॥
আমি বেদাগম পুরাণে কারলাম কত খোঁজ তল্লাসী।
ঐ যে কালী কৃষ্ণ শিব রাম সকল আমার এলোকেশী॥

ইহারই নাম "নিষ্ঠা"। ইহা দ্বারা তাঁহার অন্যান্য দেবদেবীর প্রতি দ্বেষভাব অথবা নিজ ইষ্টদেবেরই শ্রেষ্ঠতা বুঝাইতেছে না। সাধক রামপ্রসাদ 'কালী' উপাসক ছিলেন। সেই জন্য তিনি কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম প্রভৃতি সমস্ত রূপকে 'কালী' রূপেই পর্য্যবসিত করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, নিজ ইষ্ট-দেবীকে, এমন কি, স্থাবর জঙ্গমাদি যাবতীয় পদার্থের মধ্যেও সন্নিবেশিত করিয়া,—

সর্ব্বভূতে বীজ আমি, শুন পার্থ ভাই,
আমি ভিন্ন চরাচরে আর কিছু নাই। (গীতা ১০ অঃ ৩৯ শ্লোক)

গীতার এই উক্তিটীর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ঠাকুর যাহা বলিয়াছেন, "গৃহস্থের বাড়ীর বউ, শ্বশুর, ভাসুর সকলেরই সেবা করে, যত্ন করে; কিন্তু কারও কাছে শোবে না, স্বামীর কাছেই শোবে।" এই উক্তিটীর সহিতও সাধক বিশেষ সামঞ্জস্য রাখিয়া ছিলেন। অতএব উপরোক্ত রূপ ঠাকুরের উপদেশ মত ধারণা করিতে করিতে সাধকের দ্বেষভাব একেবারে দূরীভূত হইবে এবং অপরাপর দেবদেবীর প্রতি ভক্তি ও সকল ধর্ম্মের প্রতি সমান সহানুভূতি আসিতে থাকিবে। এমন কি, ঠাকুর কখন কোন ভক্তের মন সংসারে কোন ভালবাসার পাত্রের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত থাকায় ধ্যানের সময় স্থির হইতেছে না দেখিয়া, তাঁহাকে তাঁহার উক্ত ভালবাসার পাত্রকেই নিজ ইষ্টমূর্ত্তি জ্ঞানে সেবা করিতে ও ভালবাসিতে বলিতেন। এই সম্বন্ধে ঠাকুরের লীলা প্রসঙ্গে, পূর্ব্বার্দ্ধ প্রথম অধ্যায়ে, এক স্থানে পাঠ করিয়াছি, "জনৈকা স্ত্রী ভক্তের মন তাঁহার অল্পবয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্রের উপর অত্যন্ত আসক্ত দেখিয়া তাঁহাকে ঐ বালককেই গোপাল বা বালকৃষ্ণ জ্ঞানে সেবা করিতে ও ভালবাসিতে বলিয়াছিলেন; এবং ঐরূপ অনুষ্ঠানের ফলে ঐ স্ত্রীভক্তের স্বল্প কালেই ভাব-সমাধি হইয়াছিল।" মহাত্মা রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলীতে, তৃতীয়

বক্তৃতাতে 'রাজসূয় যজ্ঞকালে বিভীষণের কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান' ও হনুমানের মুকুতার হার খণ্ড খণ্ড করণ ইত্যাদি নৈষ্টিক ভাবের দৃষ্টান্ত দ্বারা যাহা সুচারুরূপে মীমাংসিত হইয়াছে, পাঠক, তাহা পাঠ করিলে, এ বিষয় আরও বিশদরূপে বুঝিতে পারিবেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীহরিপদ নন্দী।

উত্তরাখণ্ডে ভ্রমণ ও স্থিতি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৪৫ পৃষ্ঠার পর)

পাণ্ডাজী বলিলেন, এ বৎসরের মত এত বরফ আমার জীবনে দেখি নাই। বোধ হয় ১৮।১৯ বৎসর পূর্ব্বে এই রকমই হোয়েছিল, আমার দাদার মুখে শুনিয়াছি। সে দিন সমস্ত দিন রাত্রি সব ঐ চটিতে থাকা গেল, ও যাইবার পরামর্শ চলিতে লাগিল। পাণ্ডাজীর সহিত সঙ্গিনীদের সহিত গল্প করিতে করিতে বলিলাম, দেখুন গত রাত্রে শীতে নিদ্রা হয় নাই, (গৌরীকুণ্ডেই গত রাত্রি ছিলাম) শেষ রাত্রি এক ভীষণ স্বপ্ন দেখেছি। পাণ্ডাজী মধুভাষী— হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "মাকে কি ভয় আছে গো, কি বল্ গো, কি স্বপন্ হোলো, যে এত ভয় মিলল।" আমি বলিলাম, গত রাত্রে দেখিলাম সুধু গায়ে আপনি একটা ভয়ঙ্কর উগ্র প্রখর সাপ গলায় জড়িয়ে জড়িয়ে এসে আমরা বোসে আছি, সামনে দাঁড়িয়েছেন। আমরা সব দেখছি অবাক হোয়ে। পাণ্ডাজী স্বপ্নটি শুনে আনন্দে পরিপুর্ণ ও আমার পিঠ চাপড়ে "কেদারনাথ স্বামিজীকি জয়" দিয়া কহিলেন, মাকে আর কি ভয় আছে গো, ওটাত মহাদেব আছে গো, কেদারনাথ তো দেখা দিলে গো, চল্ মা কিছু ভাবনা নাই গো।" স্বপ্নটা যে উল্টে এমন হোয়ে দাঁড়াবে, তা ত মোটেই ধারণা করিতে পারি নাই। শেষে আনন্দময় ঠাকুরকে মনে হোয়ে বড় আনন্দ হোলো, ঠাকুর ভরসা দিতে এই সব কোচ্ছেন।

সে রাত্রি সেই চটিতে থাকা গেল। গলায় একটু ব্যথা হইল, কাশীও একটু একটু হইল। ছোট সাধু ছেলেটি শুঁট মিছরি ইত্যাদি ইত্যাদি দিয়া গরম জলে ঔষধ তৈরি কোরে খুব যত্নের সহিত খাইয়ে গেলেন। রাত্রে

সঙ্গিনী ও বুড়দিদিকে লইয়া শয়ন করিলাম। বুড়দিদির দেহ বেশ খারাপ ভাবেই চলিয়াছে। আহার নাই, আহারের দ্রব্যও নাই। মানুষের কাঁধে চলিয়াছেন। তবুও সকলে আনন্দেই চলিয়াছি।

জয় কেদারনাথ স্বামীজীকে জয় দিয়া প্রাতে আমরা রীতিমত শীতবস্ত্রে অঙ্গ ঢাকিয়া ডবল ইকান তার উপর পট্টুর টুকরা জড়াইয়া জুতাকে শক্ত করিয়া পায়ের সঙ্গে বাঁধিয়া লইয়া ভয়ে ভয়ে আনন্দে আনন্দে চলিলাম। অপূর্ব্ব দৃশ্য সকল নয়ন সম্মুখে পড়িল, আশ্চর্য্য হোয়ে গেলাম। কি একি? এই কি স্বপ্নরাজ্য? এ ত ধ্যানে পাই নাই? কল্পনায়ও দেখি নাই, এ কি? উর্দ্ধে অনন্ত আকাশ বেশ শুভ্র। আর সে পথ বর্ণনা করি কি কোরে, ঢালু পথ সুধু বরফ। দোবরা চিনির মত বরফে জমাট পথ।

পাণ্ডাজীর আনন্দে স্বপ্নটার বিষয় মনে হইয়া মনে বুঝি কিছু অহঙ্কার হইয়াছিল। তেমনি লীলাময়ের লীলা। দড়ির জুতা সে দিন না পরিয়া রবার সু পরিয়াছি দু-সঙ্গিনীতেই। পা আর বরফে বসে না, এক এক পা দিতেই পতন, আবার সাম্‌লাইয়া ঠাকুরের নাম ধ্বনীপূর্ব্বক জষ্টি বন্ধুর সাহায্যে উঠিতে না উঠিতেই আবার পতন। পথে পা বাড়াইয়াই ত যাত্রীদের দশা এমনি হইল। কিন্তু ধন্য পাণ্ডাজীর দক্ষতা। একায় একশ, যেন দৈবশক্তিবিশিষ্ট।

বুড়ীমাদের ত ছোটবেলার মত ঢেস্ কুমড়ার মত তাঁরই সব লোকজনের কাঁধে তুলিয়া দিলেন। দলের মধ্যে আমি ও দুই সঙ্গিনী কিছু কিছু বয়ঃকনিষ্ঠা ছিলাম। আমাদের হাত ধরিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতে হইল। সে পতনের আনন্দও অপরিসীম। পথে মাঝে মাঝে কেহ কেহ শক্ত হইয়া যায় তৎক্ষণাৎ গাণ্ডিওলার পিঠ হইতে কাঠ ও কাঠ জ্বালাইবার লৌহমদ্ধ পাত্র লইয়া স্থানে স্থানে আগুন করিয়া সব হাত পা স্যাঁকা চলিতে লাগিল। মধ্য পথে একটী পাঞ্জাবী তাহার স্ত্রী ও আর একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে লইয়া চলিয়াছে। পাঞ্জাবীটি জোয়ান। খুব স্ফূর্ত্তির উপর চলিয়াছে। অর্দ্ধ পথে একটা করুণ ধ্বনী কর্ণে গেল। কি হোলো সবত সেই পথে স্থির—পাণ্ডাজী ছুটিলেন। তারপর দেখি পাঞ্জাবীটি বরফ পথ হইতে পিছলাইয়া অলকনন্দার সন্নিকটে এক ঝরণার পাথরের উপর পড়িয়াছে। তৎক্ষণাৎ ২।৩ জন লোক ও পাণ্ডাজী নামিয়া তুলিলেন। তুলিল কি? সে দৃশ্য ভীষণ। গৃহে সে ভীষণ দৃশ্য দেখিলে

জানিনা জ্ঞান থাকিত কিনা সব, তথায় উদাস হইয়া গেলাম। মস্তকটা চূর্ণ হোয়ে গেছে। দেহটা ঠিক আছে। আর একটী মূর্ত্তি দেখিলাম অতি করুণ, অতি মধুর। সেটি একটী শ্রীমূর্ত্তি। আমাদের দলে যে কয়জন সেই পথে ছিল, কেহই আর চলিল না। সব স্থির হইয়া দাঁড়াইলাম। আমাদের মধ্যে একজন এসে ঐ রক্তিমবদনা প্রস্তর খোদিতামত রমণী মূর্ত্তির নিকটে আসিয়া কহিল, "এ তোমার কে?" রমণী জোড়হস্তে অত্যন্তই ব্যাকুল হইয়া কহিল, (তার ভাষায়) "তোমার পায়ে পড়ি জিজ্ঞাসা কোরনা আমার এ কে?

পাণ্ডাজী এসে কহিলেন, ওর স্বামী। সঙ্গিনী ব্রহ্মচারিণীকে ধরিলাম, সে তখন কাঁপিতেছে। নিজে স্থির হইয়া দেখিতে লাগিলাম, রমণীর ধৈর্য্য আর সহিষ্ণুতা। জোড় করে রক্তমুখী হইয়া ঊর্দ্ধে চাহিয়া বসিয়া রহিয়াছে। শেষে উহার মৃত পতির কোমর হইতে টাকা লইল। আমরা দাঁড়াইয়া রহিলাম। দেহটাকে টানিয়া অলকনন্দায় ভাসাইয়া দেওয়া হইল। আমরা "কেদারনাথ স্বামীজিকি জয়" দিয়া আবার চলিলাম। ভাবিতে লাগিলাম, জড় দেহের পরিণাম। প্রাণটা ঠিক শশ্মানের মত ভাব হইয়া গেল, সুখ না দুঃখও না। অর্দ্ধ পথে এসে দেখি ভয়ঙ্কর বরফের শৃঙ্গ। তৎনিম্নে তত বরফ। উঁচু থেকে নামিতে হইবে। সাধু ছেলে দুটি পার হইয়া নিচুতে দাঁড়াইয়া আমাদেরই জন্ম অপেক্ষা করিতেছেন। সেথানে এসে ত পাণ্ডাজী খুব হাসিলেন। তারপর সেই উঁচুতে সব দাঁড় করাইয়া এক এক জনকে নামাইয়া লইতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে পাণ্ডাজীও খুব পড়িতে লাগিলেন। সাধু ছেলেদের বড় ছেলেটি হাততালি দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, "হাবিলদার পোড়েছে শিব গুরু শিব গুরু হরি হরি।" আমাদেরও তত ভয় হইল না, জীবনটার উপর মোটেই মায়া নাই; যা হবার হোক।

তার উপর বড় ছেলে বলিতেছেন, সুশীলা মা, ভক্ত হোলেই শক্ত হোতে হয়, পড়বেন কেন, পায়ে জোর করুন।" কোন প্রকারে পাণ্ডাজীর সাহায্যে পতন ও উত্থানে সে স্থান পার হইলাম। আবার তেমনি কত স্থান পার হোয়ে অনন্ত অপূর্ব্ব এক মধুর রাজ্যে আসিলাম। সাধ্য কি যে বর্ণনা করি। উপরে শুভ্র আকাশ নিম্নে প্রশস্ত শুভ্র বরফ। তন্মধ্যে বরফে ঢাকা একটী মাত্র মন্দির স্বর্ণচূড়া জাগাইয়া আছে। অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব। প্রাণ প্রশান্ত ধীর স্থির।

বরফের উপর থানকতক চেটাই ও থাতকতক কম্বল পাতা হইল। আগুণ ত

ধু ধু জ্বলিল। আমরা জুতা খুলিয়া মন্দিরে চলিলাম। সেখানে স্নান করা একেবারেই নিরুপায়। শুনিলাম হংসকুণ্ড, উদককুণ্ড, রেতকুণ্ড, অমৃতকুণ্ড ও সূর্য্যকুণ্ড নামে কয়টি কুণ্ড আছে। কিন্তু বরফরাশি সব ঢাকিয়া রাখিয়াছে। কিছুই দেখিলাম না। ঘর বাড়ী সব বরফে ঢাকা। সঙ্গিনী ব্রহ্মচারিণীত আনন্দে ফুলের মত ফুটিয়া উঠিল। ছোট বেলার মত আদরে উচ্চ হাস্যে সেই বরফ রাশির উপর কম্বলের উপর বসিয়া সযত্নে আমাকেই ক্রোড়ে লইল। মনে মনে তাহাকে ব্রহ্মরত্ন লাভ হউক বলিয়া উঠিয়া পড়িলাম। মন্দিরে চলিলাম। মন্দির দ্বারে পাণ্ডাজী ৺কেদারনাথের পাণ্ডাজী কাশীরাম সমস্ত পূজার উপকরণ লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমরা মন্দির দ্বারে জুতা খুলিয়া শুধু পায়ে মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক এক রূপ অপূর্ব্ব ভাবে ভরিয়া গেলাম। তাহা অব্যক্ত। বিশাল শিলা মূর্ত্তিস্পর্শ করিতেই দেহটা মুগ্ধ পবিত্র শান্তধীর হইয়া গেল। ঘৃত লইয়া মাথাইতে মাথাইতে জানিনা কেন চোথের জলে বুক ভেসে গেল। আনন্দ-অশ্রু। মনে হোতে লাগল, সেই শিবময় পিতৃদেবকে। এই ত তিনি। মূর্ত্তির হীম শীতল বক্ষে বক্ষ দিয়া "বাবা বাবা" করিয়া বলিলাম, ভববন্ধন মোচন কর। শিব শিব ধ্বনীতে মন্দিরটী মুখরিত।

প্রাণে এক মধুর অপূর্ব্ব শান্ত ভাব লইয়া, যখন বাহির হইলাম, পায়ের যন্ত্রণায় শ্বাস রোধ হইয়া এল। শুধু পায়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে অদূরে কম্বলের নিকট আগুণের নিকটই চলিলাম। এসে দেখি বৃদ্ধাদিদি মৃতবৎ নীলমূর্ত্তি হইয়া পড়িয়াছেন। সাধু ছেলেরা অগ্নি করিয়া বুড়াদিদিকে সেঁকিতেছেন ও বলিতেছেন ভয় নাই ও ডাকিতেছেন "বুড়া মা, বুড়া মা।" দেখিলাম বটে, কিন্তু পা অসাড় হইয়া এসে প্রাণ যায়। সন্তান, ঠাকুরের সন্তান না হইলে সেবা জানিবে আর কোথায় কে? পা ধরিয়া তৎক্ষণাৎ আগুণে সেঁকিয়া গাত্রবস্ত্র, কম্ফর্টার ইত্যাদি তৎক্ষণাৎ সেঁকিয়া সকলকে স্থির করিয়া দিলেন। ক্রমশঃ বুড়িদিদির কাছে এসে দু'সঙ্গিণীতে ভীত হইয়া বসিলাম। ব্রহ্মচারিণী একটু কাঁদিল। তারপর বুড়িদিদি পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল। তখন সব হাসি আরম্ভ হইল। তখন একটী শ্লোক ভাবিতে লাগিলাম,

মৃতো যত্র মহাদেবী শিব এব ন সংশয়ঃ
ধন্যাস্তে পুরুষালোকে পুণ্যাত্মানো মহেশ্বরী।"

অর্থ, "হে মহেশ্বরী! মহাদেবী, ঐ স্থানে মৃত্যু হইলে মানব শিবত্ব প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। সেই পুরুষগণই লোকে ধন্য যাহাদের ঐ স্থানে মৃত্যু হয়।

যাহউক সে সময় বুড়িদিদিকে শিবত্ব প্রাপ্ত হইতে দেখিতে ইচ্ছা হইল না। বুড়িদিদি উঠিয়া বসিলেন, আমরা আনন্দিতা হইয়া সাধু সন্তানদের পদধূলি লইলাম ও তাহাদের সেবা ধর্ম্মটী অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়া ধন্য হইলাম।

(ক্রমশঃ)

ভক্তকিঙ্করী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীচরণ ভরসা।
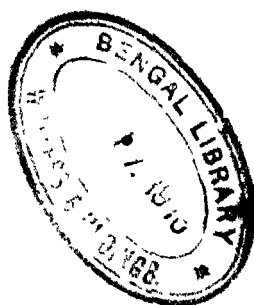
জয় গুরুদেব !!

তত্ত্ব-মঞ্জরী

ঊনবিংশ বর্ষ, নবম সংখ্যা।
পৌষ, সন ১৩২২ সাল।

দীননাথ।

জয় জয় প্রভু পতিতপাবন, কৃপাময় দীননাথ।
জয় জয় জয় অগতির গতি দীনবন্ধু জগন্নাথ॥
জয় জয় বিভু কাঙ্গাল-শরণ, জগতের প্রাণাধার।
কাঙ্গালের বেশে, কাঙ্গালে তরালে, হরিলে জীবের ভার॥
তব করুণায় হইল স্বরূপ, স্থাবর জঙ্গম ভূমি।
জয় জয় জয়, জয় রামকৃষ্ণ, জয় মা জনম ভূমি॥
জয় জগবন্ধু অধম তারণ, সর্ব্ব জীব মনোলোভা।
জয় জয় নাথ অভয়-মূরতী সুনির্ম্মল জ্যোতিঃ শোভা॥
শ্রীপদ পরশে প্রেমের প্রবাহে প্লাবিত মেদিনী হায়।
প্রেমের হিল্লোলে পাষণ্ডদলন ব্রহ্মাণ্ড তলিয়ে যায়॥
(তুমি) অহেতুক কৃপা অযাচিত প্রেম হৃদয়ে ঢালিয়া দাও।
আপনার হতে আপনার হয়ে, মন প্রাণ কেড়ে লও॥

"কেহ নাই যার তুমি আছ তার" শ্রীমুখে বলেছ তুমি।
কার মুখ চাব কোথায় দাঁড়াব বিনা তব পদ ছায় ॥
অধমের তুমি, পতিতের তুমি, তুমি বিনা কেহ নাই।
তুমি বিনা আর কে আছে আমার, তোমা ছেড়ে কোথা যাই ॥
(প্রভু) থাক হাত ধরে শ্রীচরণে নতি জীবন সর্ব্বস্ব সার।
মা বিনা বল মা দীন সন্তানের কে আছে গো আপনার ॥
তোমারি কৃপায় তোমারে চিনেছি, দিয়েছ চরণে ঠাঁই।
তুমি না রাখিলে কে আর রাখিবে, তোমা সম দু'টী নাই ॥
তোমারি তুলনা এ মহীমণ্ডলে, তুমিই প্রেমিক বর।
প্রেম চূড়ামণি, প্রেমময় তুমি, কাম-ক্রোধ-লোভ হর ॥
লও টেনে মোর, নিজ গুণে নাথ, সকল ইন্দ্রিয় চয়।
বেঁধে রাখ প্রভু শ্রীচরণে তব গাই গো তোমারি জয় ॥
জয় জয় জয়, জয় দীননাথ, রামকৃষ্ণ গুণমণি।
বস হৃদাসনে, পাতিয়া রেখেছি তুমি যে মুকুটমণি ॥

"কাঙ্গাল"।

পাগলিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যথার্থ তবে ঈশ্বর সর্ব্ব স্থানেই বিদ্যমান? আচ্ছা, কই আমি ত দেখতে পাচ্ছি না? আচ্ছা, সব লোকে বলে থাকে যে, এক মনে সেই পরম করুণাময়কে ডাকলে তাঁকে দেখা যায়, তবে আমি যে তাঁকে ডাকি, কই পাই না ত? বোধ হয়, আমি মনের সঙ্গে তাঁকে ডাকতে পারি না।' তা যদি পারতুম তবে তাঁর সাধ্য কি, যে ভক্তকে দেখা না দিয়ে থাকৃতে পারেন। আজ তবে দেখি, দেবতা সদয় হন কি না?

সুশীলা জল আনিতে ঘাটে গিয়াছিল। নদীতীর সম্পূর্ণ নীরব নিস্তব্ধ। বৈশাখের নিদারুণ রৌদ্র পৃথিবীর গায়ে পড়িয়াছে। নদীর কাল জল সমীরণে

হিল্লোলিত, মৃদুভাবে বহিয়া যাইতেছিল। কোথাও জন প্রাণীর চিহ্ন নাই, কেবল সুশীলা একা।

সত্যই সুশীলার সংসারে বড় কষ্ট। বাল্য বয়সে পিতামাতা হারাইয়া আত্মীয়গণের মধ্যে প্রতিপালিত। তাহার পর শ্বশুরালয়েও নির্য্যাতনের সীমা ছিল না। স্বামী দুশ্চরিত্র; বিবাহ হওয়া অবধি একদিনের জন্যও স্ত্রীর মুখ দর্শন করেন নাই; শাশুড়ীর গঞ্জনা,—নহিলে কে এই ভীষণ রৌদ্রে নদী-তীরে যায়?

সুশীলার মন যে সংসারের প্রতি আকৃষ্ট ছিল না, তাহা বরাবরই তাহার শিশুকাল হইতে দেখা যাইত। কখন কখন বালিকা একা কোন নির্জ্জন স্থানে বসিয়া কোনও একটী বিষয়ের ধ্যানে মগ্ন হইয়া থাকিত। অনেকক্ষণ ডাকিয়া ডাকিয়া তবে তাহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিত।

আজ এই রৌদ্র পানে চাহিয়া, সেই আধ ক্রোশ দূরবর্ত্তী নদী হইতে জল আনিতে হইবে শুনিয়া, তাহার প্রাণ শুকাইয়া উঠিল, কিন্তু উপায় নাই। ননদের গঞ্জনা, শাশুড়ীর লাঞ্ছনার বড় ভয়, নদীতে অগত্যা আসিতে হইল।

ঘড়া জলে পূর্ণ করিয়া উপরে রাখিয়া সে বসিয়া পড়িয়া এক প্রাণে তাহার ধ্যানের দেবতাকে ডাকিতে লাগিল। ক্রমে সে বাহ্যজ্ঞান হারাইল। তাহার প্রাণ যেন কোথায়,—কোন দেশে উধাও হইয়া চলিয়া গেল।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তখন উন্মত্তের ন্যায় গগন প্রতি চাহিয়া করযোড়ে বলিল, "তুমি আছ, তুমি আছ প্রভো! অজ্ঞান মানব আমরা, তোমার লীলা কি ক'রে বুঝবো; আমায় মুক্ত কর নাথ! আর আমায় সংসার জালে জড়াইও না।

উন্মত্ত পাদক্ষেপে কলসী কক্ষে সে ফিরিয়া চলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রায়েদের বড় বৌ—সুশীলা নাকি পাগল হইয়াছে! একদিন দুপুরবেলা ঘাটে জল আনিতে গিয়াছিল, সেই সময় নাকি তাহাকে উপদেবতায় দৃষ্টি দিয়াছে কেহ কোন কথা বলিলে সে তাহার মুখের দিকে কেবল ব্যাকুল নেত্রে চাহিয়া

থাকে। ব্যাকুল হৃদয়ের আবেগ ভরা উচ্ছ্বাসে বলে, "তুমি কি আমায় দীক্ষা দিতে এসেছ?"

সংসারের কাজ কর্ম্ম সুশীলা সমস্তই করে; কিন্তু জ্ঞান যেন নাই। কলের পুতুল যেমন হাত পা নাড়ে, সেও তেমনি সংসারে কলের পুতুলের ন্যায় ঘুরিতেছে ফিরিতেছে। কিন্তু আজ সহসা তাহার অন্য মূর্ত্তি। শাশুড়ী সম্মুখে যাওয়া মাত্র সে নতজানু হইয়া গলবস্ত্রে কাঁদিয়া বলিল, "আমায় ছেড়ে দাও, আমায় মায়াবন্ধন হ'তে মুক্তি দাও।"

শাশুড়ী কর্কশকণ্ঠে বলিলেন, "কত ছলই যে শিখেছ, তার ঠিক নাই; ধর্ম্মকর্ম্ম রাখ, আর ও সব ভাণ দেখাতে হবে না। সংসারের কাজ করতে হবে না?

রুদ্ধকণ্ঠে সুশীলা ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে বলিল, "সংসার কি?" সংসার নরককুণ্ড! সেই নরককুণ্ডের বন্দী আমরা। ভগবান! আমায় কেন নারী করেছ? যদি প্রাণে প্রেম দিলে, ভক্তি দিলে, তবে এমন অবরোধে কেন? সংসারে তোমার নাম নিলে পাপ, তোমার আরাধনা করলেও পাপ! সংসারে কেবল ভূতের ব্যাগার খাটতে হবে, আর যে কাজ আমায় পরলোকে শান্তি দেবে, তা হ'ল পাপ! আমায় মুক্ত কর প্রভু।

শাশুড়ী বলিলেন, '"এস গো"। উন্মত্তের ন্যায় তাঁহার পানে চাহিয়া সুশীলা বলিল, "সংসারে আমার কে আছে? সংসার কার? তুমিই যে সংসার সংসার ক'রছ,—এ সংসার কি তোমারই থাকবে? মরতে হবে না? মরণের কথাই বা কে বলতে পারে? মানুষ হঠাৎ মরে যায়, তখন এই সাধের সংসার তোমার কোথায় থাকবে মা?"

শাশুড়ী ক্রোধে জ্ঞান হারাইলেন। চিৎকার করিয়া বলিলেন, তুই মর, এখনি মর—আমার সকল আপদ জুড়াক; আমি ম'রব, আর তুই বুঝি সুখে দশ হাত পা মেলে রাণী হ'য়ে থাকবি? দূর হ', এমন বৌয়ের মুখ দর্শন করাও পাপ।" তিনি সবেগে বাহির হইয়া গেলেন।

সুশীলা ভাবিতে লাগিল, "সংসারে এ বিষম বৈষম্য কেন? মৃত্যু কি এতই ভয়ের বস্তু? মৃত্যুর নামে সংসারের লোক এত আতঙ্কে শিউরে উঠে কেন? মৃত্যু যা'দের সখা একদিন যে অবশ্যই আসবে, তাকে লোকে এত ভয় করে কেন?"

সুশীলা একবার আকাশ পানে চাহিল। সে স্পষ্ট দেখিল, যেন জগজ্জননী

তাহার দিকে স্নেহ-বাহু প্রসারণ করিয়া স্নেহগর্ভ বচনে বলিতেছেন, "ভয় কি মা, ভয় কি ? আমি ত আছি। সংসার তোকে চিন্‌বে না, আমি তোকে চিনেছি। তুই সংসারের ন'স্‌, তুই আমার, তোকে আমি কোলে নেবো। আয় মা! পাপ-দাবদগ্ধ সংসার ত্যাগ ক'রে মায়ের কোলে আয়।"

উন্মাদিনী মা মা বলিয়া বাহু প্রসারণ করিয়া ছুটিল। জ্ঞানহারা, তাহার চঞ্চল চরণ কোথা হইতে কোথা গিয়া পড়িতেছিল, ঠিক নাই ; স্থির-নয়ন শুধু সেই অভয়দায়িনী মাতৃকা-পদমূলে ন্যস্ত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যখন মদ্যপানে মাতুয়ারা, টলিতে টলিতে হরিচরণ বাটী প্রবেশ করিল, তখন মাতা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে পুত্রের নিকট দাঁড়াইয়া, বধূর আচরণ জানাইয়া উপসংহারে বলিলেন, আমারই যত দায় প'ড়েছে বাছা, আমায় পাঠিয়ে দাও, আমি কাশী যাই। তোমরা দুইজনে সুখে থাক। আর এ ঢলাঢলি আমার সহ্য হয় না। আজ কোথায় গিয়ে অজ্ঞান হয়েছিল নাকি। ঐ রকম ক'রে অপদেবতায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একদিন কোথায় ম'রবে, আর তখন পুলিস এসে হাতে দড়ি দেবে। কাজ নেই বাবা, আমি আপদ হয়েছি, আমায় দূর ক'রে দাও।

হরিচরণ জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, অপদেবতা না ছাই ক'রেছে। সব ন্যাকামো। কাজ কর্ম্ম সব বুঝি তোমায় ক'রতে হ'ল ? ও হারামজাদী পাছে কাজ কর্ত্তে হয়, সেই ভয়েই এমন ক'রছে। রও, আজ আমি ওকে মজা দেখাচ্ছি।

তখন রাত্র প্রায় এগারটা বাজিয়া গিয়াছে। পল্লীগ্রাম—ইহারই মধ্যে নিঝুম, মাঝে মাঝে দুই একটা কুকুর ডাকিয়া উঠিতেছে, দূরে কোথা হইতে একটা গানের মৃদু আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছিল। কৃষ্ণা-একাদশী—চারিদিকে ঘোর অন্ধকার।

টলিতে টলিতে হরিচরণ কক্ষে প্রবেশ করিল। গৃহে একটী প্রদীপ মিট্‌ মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল, আর গৃহের এক পার্শ্বে পদ্মাসনা, নিমিলিতনেত্রা, ধ্যান-নিরতা দেবীমূর্ত্তি। সেই সুন্দর মুখ তখন অপার্থিব জ্যোতিতে উজ্জ্বল, এলায়িত কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশরাশি জটা-বদ্ধ-ভাবে ভূমিতে লুটাইতেছিল।

হরিচরণ,—পাপিষ্ঠ হরিচরণ সে মুখ দেখিল না। দেখিলে বোধ হয় ধর্ম্মাত্মার পবিত্র দেহ পাপীর করে স্পর্শিত হইত না। হরিচরণ তাহার পশ্চাৎ হইতে তাহার কেশগুচ্ছ আকর্ষণ করিয়া বলিল, "বেরো হারামজাদী আমার বাড়ী থেকে, বেরো এখনি।"

সুশীলা অনেকক্ষণ এক দৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বিনা বাক্যব্যয়ে উঠিয়া অগ্রসর হইল।

হরিচরণ ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে তাহাকে ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সে দিন পূর্ণিমা। প্রস্ফুট শশধরের বিগলিত রজতধারায় ধরা প্লাবিত। বসন্তের মৃদুমন্দ মলয় পবন কুসুম-সৌরভ বহন করিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। রজনী দ্বিপ্রহর অতীত, প্রকৃতি-নিস্তব্ধতার ক্রোড়ে নিদ্রা-মগ্ন। এই সময়ে শ্মশানে দাঁড়াইয়া কে ঐ অপূর্ব্ব জ্যোতিঃবিভাসিত যুবতী? সর্ব্বাঙ্গে এমন পবিত্র ভাব যে পাপী সে দিকে চাহিলে তাহার চক্ষু ঝলসিয়া যায়—এ যে মাতৃমূর্ত্তি! পাপীর পাপ বাঞ্ছাও এ মূর্ত্তি একবার দেখিলে দূরীভূত হয়। যুবতীর পরিধানে একখানি গৈরিক বসন, মস্তকের কেশ জটাবদ্ধ, তাহা জানু সংস্পর্শ করিতেছে। অঞ্চলাগ্র বাতাসে হিল্লোলিত হইতেছে। যুবতীর ব্যাকুল-দৃষ্টি ঊর্দ্ধদিকে ন্যস্ত রহিয়াছে। অনেকক্ষণ স্থিরভাবে উন্মাদিনী চাহিয়া রহিল; তাহার পর বলিল, "দয়াময়ী নইলে দয়া ক'রবে কে? সন্তান ভয় পেলে মার কোল ভিন্ন কার কোলে যাবে? বড় ভয় পেয়েছি মা! তাই তোর পানে ছুটেছি; মা হয়েছিস্ সন্তানকে কোলে নিবিনা কি মা? আমায় ডেকেছিস্, আমি এসেছি, এখন নিবিনা বল্লে আমি ছাড়ব কেন? পাগলিনী উন্মত্তপ্রাণে গাহিয়া উঠিল:—

> বড় ভয় হয়েছে দয়াময়ী সংসারের সব দেখে শুনে
> তোর কাছে এসেছি ছুটে (কই মা) তুই ত অভয় দিলিনে?
> এই কি মা তোর দয়ামায়া, দিবিনা কি পদছায়া,
> ভয় পেয়েছি এসেছি কাছে (তুই) কোলে তুলেও ত নিলিনে!

কেন কাঁদাস্ বল মা তারা, বহাস্ কেন নয়নধারা,
আদর ক'রে কোলে তুলে নয়নজল কি মুছাবিনে ?
ভয় পেলে সবাই গিয়ে মায়ের পায়ে শরণ নিয়ে
ভয়েরে দেখায় ভয় (মায়ের) অভয় কমল পায়ে শুয়ে
আমায় দে মা চরণতরী, কর গো দয়া ও শঙ্করী,
সন্তান চায় জননীকে তুই তার পানে কি চাবিনে ?

পাগলিনী ক্ষণেক চুপ করিল ; কিয়ৎক্ষণ গগন প্রতি চাহিয়া রহিল, তাহার পর আবার মিষ্টস্বরে গাহিল—

আমি সদাই মাকে কাছে থাকিতে দেখি গো—
মাকে দেখি এ হৃদি-মাঝারে।
আমি নিয়ত দেখি যে মাকে আমার নিকটে গো
মা আছেন সদা নিকটে রে॥
আমি হারাই হারাই যত করি সদা ভয় গো
মা বলেন কি ভয় বাছারে।
আমি আছি কাছে তব, মা থাকিতে সন্তানের
ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই রে॥
শুনিয়া অভয়বাণী জননীর মুখে গো
আনন্দে ভাসিল চিত্ত আমারি।
হাসিব কি কাঁদিব ভাবিয়া না পাই গো
কোথায় রাখিব মম মাতারে॥

বিকট স্বরে সহসা পাগলিনী বলিয়া উঠিল, কই মা কই, কৈ সে স্নেহময়ী জননী আমার, কোথা গেল ? এই যে দেখলাম মা—এই মাত্র দেখা দিয়ে কোথায় লুকালি মা ?

পশ্চাৎ হইতে কে বলিলেন, "বৎসে !" রমণী চমকিয়া মুখ ফিরাইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিশাল জটাজুটধারী সর্ব্বাঙ্গ ভস্ম বিলেপিত—দীর্ঘকায় একটী মূর্ত্তি। বৃহৎ জ্যোতির্ম্ময় চক্ষের জ্যোতিঃপূর্ণ দৃষ্টি তাহার মুখের উপর নিক্ষিপ্ত করিয়া পশ্চাতে দণ্ডায়মান।

রমণী কি ভয় পাইল? না—সে বুঝিল, তাহার ডাকে বুঝি মায়ের আসন টলিয়াছে। পাগলিনী নতজানু হইয়া বসিয়া গদ্গদকণ্ঠে বলিল, "ভগবান্! ভগবান্! আমায় দয়া করুন, আমার দয়াময়ী করুণাময়ী শ্যামা মাকে দেখান, আমায় রক্ষা করুন,—মাকে না দেখতে পেলে আমি ম'রব।

ব্রহ্মচারী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, উন্মাদিনী! আমি কে? আমি মায়ের সামান্য উপাসক মাত্র; সাধনা কর, সিদ্ধি নিশ্চয়ই আছে। বিনা সাধনায় কোন কাজে সিদ্ধিলাভ করা যায় না।

উন্মাদিনী। সাধনা কি, আমায় বলে দিন।

ব্রহ্ম। সাধনা,—তাঁকে এক প্রাণে ডাকা। কারু পানে চেওনা, কারু কথা শুনো না, কেবল মনে রাখবে, তিনিই সত্য-সনাতন,; জগৎ কিছুই নয়। তাঁকে এক মনে, এক প্রাণে, ডাকৃলে সব পাবে। জগতে শ্রেষ্ঠ কি? জগতে অবিনশ্বর কি? এই যে দেখছ মা, এই সোণার দেহ এও নশ্বর; এরও ধ্বংস আছে। এই পচনশীল, ধ্বংসশীল দেহটাকে বৃথা যত্ন করেই বা লাভ কি? জগতে যা অক্ষয় অব্যয় সেই ধর্ম্মই চিরদিন তোমার থাকবে। আর পিতা মাতা ভ্রাতা পত্নী পুত্র কন্যা, এমন কি তোমার তুমিও তোমার নিজের নও,—সবই তাঁহারি। মূর্খ মানব আমরা, তিনি যা বুঝিয়েছেন, তিনি যা শিখিয়েছেন, তাই বুঝি—তাই শিখি। আমাদের আছে কি মা? ধর্ম্ম ভিন্ন আর আমাদের সঞ্চিত বস্তু কই? বল, বীর্য্য, অর্থ কিছুই সঙ্গে আসেনি, কিছুই সঙ্গে যাবে না। এ সব পৃথিবীর জিনীস—এখানেই পড়ে থাকবে।

উন্মাদিনী। বাবা! সংসারের সব লোকেই কি এ সব কথা জানে?

ব্রহ্ম। অনেকেই জানে।

উন্মাদিনী। জেনে শুনেও তবু পাপে ঝাঁপ দেয় কেন?

ব্রহ্ম। বালিকা! ঐ পতঙ্গকে জিজ্ঞাসা কর; সে জানে, যে অগ্নি তার

যম, তা জেনে শুনেও সে কেন আগুনে ঝাঁপ দিতে চায়? সে যেমন জানে অগ্নি তার যম, মানব তেম্নি জানে পাপ তার ইহ-পরকালের পথের কণ্টক। মানব জেনে শুনেও সে আগুনে ঝাঁপ দেয়—পুড়ে মরে।

উন্মাদিনী ব্রহ্মচারীর পদে লুটাইয়া পড়িল। কাতর বচনে বলিল, "আমায় দীক্ষা দিন বাবা।"

"এস মা" বলিয়া ব্রহ্মচারী অগ্রে অগ্রে চলিলেন—ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে পাগলিনীও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। * * * * *

ব্রহ্মচারী প্রদত্ত মন্ত্রে দীক্ষিত পাগলিনী তখন প্রকৃত পাগলিনী হইল, মায়ের রূপ দর্শন করিবার জন্য তাহার প্রাণ কাঁদিতে লাগিল। ব্রহ্মচারী নিভৃতে সাধনার প্রণালী বলিয়া দিয়াছিলেন,—পাগলিনী এখন দূর বনে প্রবেশ করিয়া মাতৃ সাধনা করিতে লাগিল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীচরণাশ্রিতা
সেবিকা শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী।

উত্তরাখণ্ডে ভ্রমণ ও স্থিতি।

মধ্যাহ্নে বরফ বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তদ্দৃষ্টে সাধু সন্তানেরা বলিলেন, মা! চলুন, এইবেলা রামবাড়া চটিতে ফিরিয়া চলুন, সন্ধ্যার সময় পৌছান যাইবে। নচেৎ এখানে থাকা অসম্ভব। আমরা দেখিলাম, আমাদের যাওয়াও অসম্ভব।

আমরা তাহাদের বাধা না দিয়া তাহাদের পাঠাইয়া দিয়া, অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে বসিয়া সঙ্গীত সাধন আরম্ভ করিলাম। সমস্ত দিন পরমানন্দে আগুনের নিকটে গেল। সন্ধ্যার সময় বরফমণ্ডিত এক বরফের দেয়ালযুক্ত কাঠের ও কম্বলের মেজেঘর পাইলাম। অর্থাৎ বরফে ঢাকা বাড়ীর একটী ঘর। তাহার মধ্যে কম্বল পাতিয়া অগ্নি জ্বালাইয়া রাত্রে সব জাগিয়া শিবনাম করিতে লাগিলাম।

শ্রীশ্রীকেদার মাহাত্ম্যম্ হইতে দু'একটা শ্লোক বলিয়া আনন্দ লাভ করিতে লাগিলাম, সকলে মিলিয়া সে পরমানন্দ।

পার্ব্বত্যুবাচ।

"কথয়স্ব মহাদেব বিস্তারাম্মম ক্ষেত্রকম্।
কেদারং নামবৎ প্রোক্তং স্বর্গমোক্ষ প্রদায়কম্॥"

শ্রীপার্ব্বতীদেবী মহাদেবকে কহিলেন, হে মহাদেব! কেদার নামে প্রসিদ্ধ স্বর্গ ও মোক্ষপ্রদ যে ক্ষেত্র আছে, তাহা বিস্তার পূর্ব্বক আমাকে বর্ণনা করুন।

ঈশ্বর উবাচ।

"ইদং ক্ষেত্রং তু যৎ প্রোক্তং ত্বয়াদেবী মমাধুনা।
ন ত্যজামি কদাচিদ্বৈ, ত্বত্তঃ প্রিয়তরং প্রিয়ে॥"

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! হে প্রিয়ে, এই ক্ষেত্র বিষয়ে তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তৎবিষয়ে আমি বলিতেছি—যে, এ ক্ষেত্র আমি কদাচ ত্যাগ করি না, ইহা তোমা অপেক্ষাও আমার প্রিয়তর।

হে দেবি! আমি তোমাকে একটী ব্যাধ ও হরিণের পুরাবৃত্ত বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। কোন গ্রামপ্রান্তে বিকরালক নামক এক মৃগহন্তা ব্যাধ বাস করিত। ঐ ব্যাধ নিত্য মৃগমাংস ভোজন করিত এবং সর্ব্ব বস্তু বিক্রয় করিত। একদিন ঐ ব্যাধ মৃগ বিনাশার্থে বনে গমন করিয়াছিল। হে মহাদেবি! এ বনে ঐ ব্যাধ বহু মৃগ বিনাশ করিতে লাগিল। ক্রমে মৃগগণকে বধ করিতে করিতে সে কেদার তীর্থের অরণ্যে উপস্থিত হইল। হে দেবেশি! মুনিগণ পরিবেষ্টিত ঐ বনে গমন করিতে করিতে সেই ব্যাধ মুনিশ্রেষ্ঠ বীণাবাদনপরায়ণ নারদকে দেখিতে পাইল। ঐ সময়ে ঐ ব্যাধ নারদকে দেখিয়া আনন্দিত হইল। এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিল, ঐ যে স্বর্ণরূপধারী মৃগ আমার সম্মুখে গমন করিতেছে। আমি এই স্বর্ণমৃগকে বিনাশ করিয়া নিজেও স্বর্ণময় হইব, এইরূপ চিন্তা করিয়া, ঐ ব্যাধ পরম বিস্ময়াবিষ্ট হইল। ব্যাধ ধনুতে জ্যা রোপণ করিয়া তাহাতে বাণ সন্ধানপূর্ব্বক যেমন সেই মৃগরূপধারী ঋষিকে বিনাশার্থে বাণ ত্যাগ করিল, অমনি সেই ঋষি অন্তর্হিত হইলেন। ব্যাধ এই পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া অতি বিস্মিত হইল, এবং যেমন অগ্রসর হইল, অমনি সম্মুখে গর্ত্ত মধ্যে একটী ভেক দেখিতে পাইল। দেখিল, এক প্রকাণ্ডদেহ কালসর্প ভেককে গ্রাস করিতেছে। কালান্তক ঐ সর্প যেমন ঐ ভেককে সম্পূর্ণ গ্রাস করিবে, অমনি মণ্ডূককে যজ্ঞোপবীতধারী মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্রভূষিত ও জটারাশিবিরাজিত দর্শন করিল। কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় শুভ্রদেহ গুণ বিরাজিত ত্রিশূলধারী, নীলকণ্ঠ হস্তিচর্ম্মাবৃত বিভুকে দেখিতে পাইল। ব্যাধ এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া ভাবিতে লাগিল, যে সেই সর্পগ্রস্ত মণ্ডূক সহসা এরূপ হইল

কেন? এবং ইহা বা কে? এ কাহার রূপ? এ মণ্ডূক কাহার দেহপ্রাপ্ত হইল? আমি কি স্বপ্ন দেখিলাম? অথবা আমি জাগিয়া আছি। স্বপ্ন কেন দেখিব? আমি ত সুস্থ আছি, তবে আমার ভ্রম কেন হইবে? অথবা এ কোন ভূতের উপদ্রবই বা হইবে। অথবা অদ্য আমার মৃত্যু সন্নিকট। যেহেতু আমার বিকৃতি হইতেছে কেন? কি করি, কোথায় যাই? এই বন ভূত সেবিত, এখানে কোথাও নিস্তার নাই। এক্ষণে এ মহা বনে কে আমায় রক্ষা করিবে। আমার সাক্ষাতে দেখিতে দেখিতে মণ্ডূক কেন বিকৃত হইল। এই সময়, সেই মহাব্যাধ একটী পুষ্টাঙ্গ ও সুন্দরাঙ্গ মৃগকে ব্যাঘ্র বিনাশ করিতেছে দেখিতে পাইল এবং দেখিবা মাত্র ভয়ে ব্যাকুল হইল। তৎপর ঐ ব্যাধ হন্যমান মৃগকে পঞ্চবদনবিশিষ্ট, ত্রিনয়ন, যজ্ঞোপবীতধারী শিবরূপী দর্শন করিল। হে দেবদেবেশি! সেই বিনাশকারী ব্যাঘ্র তখন এই ব্যাধ বা অন্য কোন এক ব্যাধ কর্ত্তৃক তৎক্ষণাৎ হত হইয়া বৃষরূপ ধারণ করিল। হে সুন্দরি, তৎপরে পূর্ব্বাহত সেই মৃগ ব্যাধের সাক্ষাতেই শিবরূপ ধারণ করতঃ সেই বৃষের উপর আরোহণ করিল। এইরূপ পরমাশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া ব্যাধ অত্যন্ত বিস্মিত হইল, এবং অহো! এ কি হইল, এইটি বহুবার চিন্তা করিতে লাগিল। হে দেবি, ব্যাধের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। সে বিস্ময়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তৎপর সেই ব্যাধ সেই নারদ মুনিকেই পুনর্ব্বার দেখিতে পাইল। হে দেবি! ব্যাধ সেই ভয়াবহ নিবিড় অরণ্যে মনুষ্যাকৃতি নারদকে দেখিয়া সেই সমস্ত ব্যাপার বর্ণনা করিল। নারদ তাহার মুখ হইতে সমস্ত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া বলিলেন, হে ব্যাধ! তুমি এখানেই বাস কর। ইহা বলিয়া নারদ সেই ব্যাধের সম্মুখে অন্তর্হিত হইলেন, এবং ব্যাধও সেই স্থানে বাস করিতে করিতে পরমাগতি প্রাপ্ত হইলেন। হে প্রিয়ে! আমি এই কেদার ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য শত বর্ষেও বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারি না। এ মাহাত্ম্য শ্রবণেও জীবের পরমাগতি লাভ হয়।

রজনীর মধ্যভাগে যাত্রীসমূহ কাতর ধ্বনি আরম্ভ করায় পাণ্ডাজীর লোকেরা ভীষণ আগুন জ্বালাইল। আমরা অনেকটা সুস্থ হইলাম। সাধু ছেলেরা সে রাত্রে কেদারনাথ ত্যাগ করিয়া রামবাড়া চটিতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। রজনী প্রভাত হইলে, আন্দাজ বেলা ৮টার সময় রৌদ্র উঠিলে, আমরা

কেদার প্রভুকে প্রণাম পূর্ব্বক আবার রামবাড়া চটিতে ফিরিবার জন্য বরফ পথে চলিলাম। কেদারপুরীতে সামান্য জলযোগ করা হইয়াছিল। রন্ধনের কোনও উপায় ছিল না। প্রাতে আবার বরফে উঠিতে পড়িতে হাসিতে কাঁদিতে চলিলাম। মধ্যাহ্নে রামবাড়ায় আসিয়া পড়িলাম। ঐ চটিতে আহারাদি পূর্ব্বক, বৈকালে আবার গৌরীকুণ্ডে ফিরিয়া গেলাম। রাত্রে গৌরীকুণ্ডে রহিলাম। গৌরীকুণ্ড চটিতে আসিয়া মনে হইতে লাগিল, হাঁ! কেদারনাথ স্বামী দর্শন হইল। গৌরীকুণ্ডে এসে প্রাণটা অস্থির হইল, আর থাকিতে পারিলাম না। লেখনী মুখে তাঁহারি সাধন তিনিই করাইলেন—আজ সেইটিই তত্ত্ব-মঞ্জরীতে বাহির করিতেছি।

জ্যোতির্ম্ময় নিরঞ্জন
অনন্তরূপ বিশ্বরাজ;
তুমি অসংখ্য অযুত মূর্ত্তি কোটী
বিশ্বরাজ্যে কর বিরাজ।
তুমি এক ব্রহ্ম নাস্তি দ্বিতীয়
প্রেম পাথারে লহরীসম,
জড় চৈতন্য সূক্ষ্ম স্থূল
আমিই তুমি প্রিয়তম।
চিত্ত'আকাশে পরকাশ যবে
তোমাতে আমাতে নাহি ভেদ;
পুন অন্তরে রহ নিদ্রিত যবে
ওঠে গো অমনি মোহের খেদ।
মাঝে মাঝে মোরে ধরা দাও যেন
মাঝে মাঝে হৃদিশূন্য হয়;
(মম) জ্ঞান অজ্ঞান পাপ পুণ্য
মন বাক্য হোক তোমাতে লয়।
জীবন মরণ বন্ধন মোচন
কর্ম্ম নিষ্কাম সকলি তুমি

চিত্তাকাশে চন্দ্র তোমারে
ভ্রমুক এ মন চকোর চুমী।
ভুলে ভুলে ভুলে ভুল হোয়ে যাই
তোমাতে রহিয়ে ভুলিয়ে রই,
তোমারি তোমারি তুমি তুমি তুমি
তোমাতেই সদা মগ্ন হই।
বিশ্বদৃশ্য সকলি তুমি
মূর্ত্তি সকলি তোমারি ছায়া
অন্তরে বাহিরে সবি তুমি সথে
ধাবধাম শুধু জড় এ কায়া।
মধু মধু মধু নামেরি জয়;
জয় ধ্বনি হোক জগতময়।

ব্রহ্মচারিণী সঙ্গিনী নিদ্রিতা হইয়াছে। কে শুনিবে। কাগজটি ব্যাগের মধ্যে রেখে একটা অব্যক্ত ভাব হৃদয়ে লইয়া শয়ন করিতে গাঢ় নিদ্রায় রজনী প্রভাত।

(১৭)

ভগবান রামকৃষ্ণনাম লইয়া অপরাহ্নে সকলে ফাটা চটি ত্যাগ করিয়া "উখিমঠ" মুখে যাত্রা করিলাম। পথে অত্যন্তই রৌদ্রও চড়াই ঠেকিল। স্থানে স্থানে জল পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল। আনন্দ মনে সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় উখিমঠে আসিয়া পড়িলাম। শীতল জল সেবন করিয়া তৃপ্ত হইয়া সকলে বিশ্রামার্থে বসা গেল। পরে সন্ধ্যার পর "উখিমঠ" দেখিতে লাগিলাম। বেশ পাথরের ঘরগুলি। দোকানও আছে। বৎসরে ৬ মাস এখানেই শ্রীশ্রী৺ কেদারনাথের পূজা ভোগ হয়। তখন বরফে ঠাকুর কেদারনাথ ঢাকা থাকেন। পূজ্যরাওল সাহেবকে আসিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি জগৎমোহন আনন্দময় স্বামী বিবেকানন্দের নাম শুনিয়া আমাদের বড়ই স্নেহের চক্ষে দেখিলেন। সাধু সন্তানেরা কথা কহিতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারিণী ও আমি প্রণামান্তে সমস্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। মন্দির মধ্যে বহু ঠাকুর রহিয়াছে। ৺ কেদারনাথের গদি রহিয়াছে। সমস্ত ঠাকুর দেখিয়া রাত্রে এসে কতকগুলি চিঠি

লিখিলাম, আমারও ২।৪ খানা, ও সমস্ত যাত্রীমাতৃগণেরও লিখিলাম। এখানে শীত খুব সামান্যই। সে রাত্রে সেখানে দ্বিতলের উপর দিব্য ঘর পাওয়া গেল। সুনিদ্রায় রজনী প্রভাত—প্রভাতে প্রাণে অনির্ব্বচনীয় এক আনন্দ উদয় হইল। শয্যায় থাকিয়া আনন্দময়ের নাম সাধন করিয়া সমস্ত যাত্রীগণের নিদ্রাভঙ্গ করিলাম।

বহু দিন পরে একটু জপের ইচ্ছা হইল। এতদিন জপ শুধু মনে মনেই হোচ্ছে, ঐ নাম। একটু বসিলাম। জনৈক দিদি গাহিতে লাগিলেন,—

অন্তে যেন ঐ চরণ পাই—

* * * * * * *

* * * * * * *

কৃপণতা কর যদি লাগে' শিবের দোহাই।

স্থানের গুণে সঙ্গীতটী বড় মধুর ঠেকিল. কেবল জপের ইচ্ছা প্রবল হইল। উখিমঠে জপ করিলাম, কোথাও এমন জপে রস পাই নাই।

গাড়িওলা শ্রীনন্দ আসিয়া "আমা" "আমা" করিয়া ব্যস্ত করিল, শেষে ঠাকুরের কি অপূর্ব্ব স্নেহ, অনন্ত করুণা। শ্রীনন্দকে কি বোঝাইয়া দিলেন, সে নিজে নিজে সব কম্বল ব্যাগ সব গোছাইয়া লইতে লাগিল। জুতা টিকিন সমেৎ গোছাইয়া সে বিদায় হইল। পাণ্ডাজী আসিয়া ডাকিলেন, ব্রহ্মচারিণী আমি ও আমার ঝি উঠিলাম।

ভালই হইল—আর কিছু করিতে হইল না, বুড়দিদিকে ঝাম্পানে তুলে দিয়ে ব্রহ্মচারিণী ও আমি এক এক আলোয়ান নিয়ে ঠাকুরের নামের জয়ধ্বনি দিয়ে উঠিলাম। যষ্টিবন্ধু ব্যতীত গতি নাই, পাহাড় পথে চলাই অসম্ভব। যষ্টিবন্ধু যে কি বন্ধু হইয়াছিল, তাহা যাঁহারা ভুক্তভোগী তাঁহারাই জানেন। আমি ত ঐ যষ্টিকেই শ্রীশ্রী৺ কেদারনাথ ও শ্রীশ্রী৺ বদ্রীনাথ জ্ঞানে প্রণাম করিতাম।

পথে আসিয়া ক্রমে ক্রমে সকল যাত্রীদের সহিত দেখা হইল! সে দিন ১৩ মাইল হাঁটিয়া জঙ্গল চটিতে আসিয়া পড়িলাম। সাধু সন্তানেরা আমাদের জন্য ঘর ঠিক রাখিয়াছেন, আসিয়া বসিলাম। সেই চটিতে মধ্যাহ্নে স্নান আহার সেরে বৈকালে আবার সব উঠিলাম।

পথে নামিতে নামিতে যাত্রীমাতৃদের মধ্যে মধুর বচসা বাঁধিয়া গেল। একটি হিন্দু রমণী আর একটি হিন্দুস্থানী।

সন্ধ্যার সময় এক পরম রমণীয় স্থানে আসিয়া পড়িলাম। অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যভরা চটিটি। সম্মুখে নদী খরতর বেগে চলিয়াছে। নীল সাদা গোলাপী বহু রংএর ছোট ছোট পাথর ছড়াছড়ী। বড় বড় পাথর সব স্থানে স্থানে বসিবার স্থানের মত শোভা পাচ্ছে। ঊর্দ্ধে চতুর্দ্দিক বেড়িয়া শুভ্র গিরি, লতাপাতা বেষ্টিত গগন স্পর্শে দাঁড়াইয়া আছে। অপূর্ব্ব স্থান, প্রাণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। ব্রহ্মচারিণী ও আমি দুজনে একটি পাথরে বসিয়া বিশ্বশিল্পীর অপূর্ব্ব রচনা কৌশল দেখিতে লাগিলাম। মনে হোতে লাগল আমরাও বনের পাখী, সকল বন্ধন মুক্ত, সুধু সেই অধর মানুষ একজনের জন্যই যেন ঘুরে বেড়াচ্ছি।

সন্ধ্যার সময় ধুম্রগিরি পানে চাহিয়া প্রাণের আবেগে গিরিকে বলিলাম,

"কৈলাস সুমেরু ওহে হিমাচল
দিবানিশি ধরি কি হেরিছ বল
কোরেছ কি হেরি জীবন সফল
বিশ্বম্ভর বিশ্বেশ্বরে।

ব্রহ্মচারিণী বলিল, উপযুক্ত স্থানে সঙ্গীতটি ঠিক সাধনীয় বটে।

বোধ হয় সে দিন ঠাকুর শুনতে চেয়েছিলেন, তাই কণ্ঠে কি নূতন সুর এল, সবাই মুগ্ধ হোয়ে গেল, নিজেও প্রাণে একটা মধুর তৃপ্তি পাইলাম। রাত্রে ঠাকুরের নাম স্মরণে সেই চটিতেই সব রহিলাম। (ক্রমশঃ)

ভক্তকিঙ্করী।

স্তব।

(১)

জয় জয় রামকৃষ্ণ, অগতির গতি।
আশীর্ব্বাদ কর পিতা ধর্ম্মে হোক মতি॥
আমি অতি হীন মতি,
নাহি জানি ভক্তি স্তুতি,
অলক্ষিতে হৃদে থাকি শিখাও আমারে।
কি বলিয়া পিতা সদা ডাকিব তোমারে॥

(২)

জয় জয় রামকৃষ্ণ, পাতকি তারণ—
দুঃখ, ভয়, শোক, তাপ, বিপদ বারণ।
তুমি ছাড়া গতি নাই,
জেনেছি মনেতে তাই,
কাতরেতে করজোড়ে ডাকি হে তোমারে।
সংসারের সৎ কার্য্য শিখাও আমারে॥

(৩)

জয় জয় রামকৃষ্ণ, জগতের গুরু—
সংসার মরুর মাঝে তুমি কল্পতরু।
তুমি হে পুরাও আশ,
যার যাহা অভিলাষ,
পাপীজন পাপ তাপ তুমি হে ঘুচাও।
তাই পিতা ডাকি তোমা, আমারে তরাও॥

(৪)

জয় জয় রামকৃষ্ণ, দেব অবতার—
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, তুমি হে আমার।
কর এই আশীর্ব্বাদ,
পুরে যেন মন সাধ,
তোমারে ডাকিতে পারি ভরিয়া হৃদয়।
চিরদিন তব নামে থাকি হে তন্ময়॥

ভক্তপদাশ্রিতা বিনীতসেবিকা
শ্রীমতী গোলাপবাসিনী দেবী।

আত্ম-সমর্পণ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথন)

বেণীমাধব অপুত্রক, সংসারে তাঁহার স্ত্রী, পরিচারক পরিচারিকা ব্যতিরেকে আর কেহই ছিল না। স্ত্রীর নাম সতী—সতীর বয়স ৪২ বৎসর হইবে। তাহার গৌরবর্ণ ভাবের অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিলে বোধ হয় যৌবনে সে সুন্দরী ছিল। স্বামী-স্ত্রীর বিশেষ প্রণয় ছিল না—কারণ সতীর অনেকগুলি গুণ ছিল। সে পরদুঃখ-কাতরা, উদারস্বভাবা। কেহ বিপদে পড়িয়া সতীর নিকট আসিলে, সতী সাধ্য-মত তাঁহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে প্রয়াস পাইত। ব্রাহ্মণ অতিথি আসিলে, সতী তাঁহাদিগকে সমাদর করিত। বেণীমাধবের এ সমস্ত ভাল লাগিত না, সেই জন্য স্বামীস্ত্রীতে প্রায়ই কলহ হইত। বেণীমাধব এমন কি, বলিতে লজ্জা হয়, সতীর গাত্রস্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। সতী কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করিত না। সে জগতের মধ্যে স্বামীকেই একমাত্র দেবতা জানিত, স্বামী ভিন্ন তাহার আর কোন আরাধ্য বস্তু ছিল না। সে ভাবিত, দেবদেবী ত মাটীর ঢিপি, আর স্বামী হোচ্ছেন জ্যান্ত দেবতা! জ্যান্ত দেবতার সেবা ছাড়িয়া দিয়া আমি মাটীর ঢিপি পূজা করিব? তাহা বলিয়া যে সে হিন্দু দেবদেবী আদৌ মানিত না তাহা নহে, তবে স্বামীকে হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ স্থানে বসাইয়াছিল!

বেণীমাধব পরিচারিকার সহিত বাটিতে প্রবেশ করিলেন। মন্দিরের পশ্চাতে তাঁহার বসতবাটী। বাটী দ্বিতল বাংলা ফ্যাসানে প্রস্তুত, চারিধারে ইষ্টকের প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। উপরে নীচে ১২টি ঘর, সম্মুখে এবং পশ্চাতে খানিকটা খালি জায়গা পড়িয়াছিল! ঘরগুলি বেশ সুসজ্জিত, বৈঠকখানা এবং শয়ন ঘরটি হিন্দু দেবদেবীর চিত্রপটে পরিপূর্ণ। বেণীমাধব দ্বিতলে উঠিয়া সতীকে ডাকিলেন। সতী স্বামীর নিকটে আসিয়া বলিল, হ্যাগা সদুকে কি বলেছ?

বেণী। কি আর বল্‌ব? দুইটা মাকড়ী বাঁধা ছিল, খালাস করতে এসেছিল, তা সমস্ত সুদ দেয় নাই বলে বাসুদেব বুঝি একটা মাকড়ী আটকে

রেখেছে। ওবেলা বাকী টাকা নিয়ে এলে, মাকড়ীটা নিয়ে যাবে—এতে আর হয়েছে কি?

সতী। বাসুদেবের সাধ্য কি যে সন্থর মাকড়ী আটকাইয়া রাখে। তুমি নিশ্চয়ই তাকে রাখতে বলেছ, তাই সে রেখেছে। শুনলুম ছয় আনার পয়সার জন্য তার মাকড়ীটা আটকে রেখেছ। ছি! ছি! এ কাজটা করা কি উচিত হয়েছে? গরীব লোক সুদ দিতে পেরেছে, এই ঢের। জিনিষ খালাস করবার সময় লোকে কত সুদ ছেড়ে দেয়, আর তুমি এ মাসের পর্য্যন্ত সুদ ধরে নিয়েছ। ওর মাকড়ী ওকে ফিরিয়ে দাও।

বেণী। তুমি মেয়েমানুষ, তুমি এ সব ব্যাপারে থাক কেন। আমি দরোয়ানকে বলে দিচ্ছি, কাল থেকে যেন কাহাকেও বাড়ীতে ঢুকতে না দেয়।

সতী। তুমি আমায় যা খুসী বল—ওর মাকড়ীটা ওকে ফিরিয়ে দাও—

বেণী। তা হ'লে কি আর ছয় আনা পয়সা আদায় হবে?

সতী। ছি ছি, তোমার ওকথা মুখে আনতেও লজ্জা হ'ল না। লোকে শুনলে কি বলবে?

বেণী। আমি কারুর তোয়াক্কা রাখি না। আমি যদি অভাবে পড়ি, তখন কি কেউ একটা পয়সা দিয়ে সাহায্য করবে?

সতী। যদি ভালয় ভালয় ওর মাকড়ী ওকে ফিরিয়ে না দাও, তা হ'লে আমার কোন দোষ নেই, আমি আমার মাকড়ীটা ওকে দিয়ে দেবো।

বেণীমাধব জানিত, সতী মুখে যা বলিত কাজেও তাহাই করিত। সেইজন্য অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাসুদেবকে ডাকাইয়া সন্থকে মাকড়ীটা দিয়ে দিতে বলিলেন। সন্থও মাকড়ীটি লইয়া প্রফুল্লচিত্তে সতীকে মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

সতী স্বামীর মুখ ভার দেখিয়া বলিল—তুমি আমার উপর রাগ করলে? আমি তোমার ভালর জন্যই বলছিলুম। চিরকালটা টাকা টাকা করে কাটালে, এখন পাঁচ জনকে দু'পয়সা হাত তুলে দাওনা।

বেণী। আমাকে আর কারুর শেখাতে হবে না। আমার মত কয়জন ধর্ম্মনিষ্ঠ আছে? আমি নিরামিষ ভোজী, সর্ব্বদাই ভগবানের নাম কচ্ছি। পয়সা কার জন্যে? আমার অবর্ত্তমানে তোমার আর শ্যামসুন্দরের থাকবে।

সতী। আমার জন্যে তোমাকে কিছু ভাব্‌তে হবে না, আর শ্যামসুন্দরকে তুমি কি পয়সা দেবে? যিনি এই স্বর্গমর্ত্ত পাতালের অধীশ্বর, তিনি কি ভিখারী? তোমার কি সাধ্য যে তুমি তাঁকে পয়সা দাও। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিফলে এ জন্মে পয়সার মুখ দেখ্‌তে পেয়েছ। এ জন্মে যদি অর্থের সদ্ব্যয় না কর, তা হ'লে *পরজন্মে কি হবে তা কি ভেবেছ?*

বেণী। কেন আমার মত সৌভাগ্যবান কয়জন আছে? আমি শ্যামসুন্দরের মন্দির তৈয়ারি করিয়া দিয়াছি। কত লোককে প্রত্যহ অন্নদান কচ্ছি। এ সব গুলো কি চোখে দেখ্‌তে পাওনা?

সতী। শ্যামসুন্দরের মন্দির ত তোমার একটা আয়ের উপায়, কত লোকে কত কি দিয়ে যাচ্ছে। আর তোমার চাকরবাকর, আর ২।৪ জন বন্ধু ছাড়া আর ত বড় একটা কেউ পাত পাড়তে পারে না। আর পালপার্ব্বণে যে সমস্ত ধূমধাম কর, সে ত খালি নিজের নাম কেনবার জন্যে। ভগবান্ তোমাকে মন্দির করে দিতেও বলেননি, আর দশজন চাকরবাকর রাখতেও বলেননি। তিনি ভাবগ্রাহী, তিনি মনুষ্যের মনের ভাব দেখেন। তুমি এ সমস্ত বাহ্যাড়ম্বর ছেড়ে তাঁকে এক মনে ডাক দিকিন।

বেণী। দেখ মিছামিছি বোকো না। সাধে বলে মেয়েমানুষী বুদ্ধি—সন্ন্যাসীরা বনে গিয়ে তাঁকে একমনে ডাকবে। আমরা গৃহী, পাঁচ জনের যাতে উপকার হয়, তাই করা উচিত। তা হ'লেই তিনি সন্তুষ্ট হ'বেন।

সতী। তাই তুমি এই রক্তশোষক ব্যবসা খুলেছ।

বেণী। কেন এতে কি পাঁচ জনের উপকার হচ্ছে না? কারুর ছেলে মরণাপন্ন, পয়সাভাবে চিকিৎসা করাতে পাচ্ছে না, আমি তাকে টাকা ধার দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দি—

সতী। যদি সুদ না নিয়ে, কোন জিনিষ বন্ধক না রেখে, তাকে কিছু অর্থ দিতে, তা' হ'লে ভগবান সন্তুষ্ট হতেন। তিনি তাঁর প্রিয় সন্তানদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করলে সন্তুষ্ট না হ'য়ে বরং রুষ্ট হন। আমাদের ত কিছুরই অভাব নেই, তুমি কেন একটা ডাক্তারখানা করে দাও না—কত গরীব লোক পয়সাভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে, তাদের উপকার হ'বে।

বেণীমাধব এই কথা শ্রবণমাত্র ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থান

পরিত্যাগ করিল। সতী যে তাঁহাকে বারংবার ডাকিল সে কথায় তিনি কর্ণপাত করিলেন না। তখন সতী মনে মনে বলিতে লাগিল—স্বামী, প্রভু, আমার আরাধ্য দেবতা, তুমি আমার প্রতি রাগ করলে? আমার কথা শুনলে না? যখন বিধাতার নিয়মে তোমার সুখেই আমার সুখ, তোমার দুঃখেই আমার দুঃখ, আর যখন তোমার ইহকাল পরকালও আমার উপর নির্ভর কচ্ছে, তখন আমি তোমায় সৎপরামর্শ দিতে ছাড়বো না। তুমি আজ না বুঝলেও এমন দিন আসবে, যেদিন তুমি এ সব কথা বুঝতে পারবে, জগতের সমস্ত লোককে আপনার ব'লে জানতে পারবে। হে অন্তর্য্যামী ভগবান্! তুমি আমার কার্য্যে সহায় হও। (ক্রমশঃ)

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব।

(১)

জয় জয় জয় দেব দয়ার মূরতি।
জগতের হিতে তব নিয়োজিত মতি।
সংসার ত্যজিয়া তুমি সেজেছিলে যতি।
হিন্দু খ্রীষ্ট বৌদ্ধ আদি নানা জাতি প্রতি;
লোক শিক্ষা প্রদানিলে সযতনে অতি।

(২)

সাধনার পথে তুমি করিয়া গমন
অনায়াসে লভেছিলে সাধনার ধন।
জীবগণে মুক্তি পথ দেখাতে মহান্;
দুঃসহ কঠোর ব্রত করিলে পালন।
অতি দীন হীন ভাবে যাপিলে জীবন।

(৩)

কত জ্ঞানী চূড়ামণী, বিবেকীপ্রবর,
কত ভক্ত, উদাসীন, সাধু, যোগীবর,
কত শত অবিবেকী নীচাসক্ত নর,
গৃহী, দণ্ডী, ধর্ম্মী, কর্ম্মী, আদি সর্ব্বনর
লভিলা ধরম শিক্ষা তোমার গোচর।

(৪)

পশু প্রকৃতির কত অসংখ্য পামর,
মদ্যপ, দুষ্কৃতাচারী, বেশ্যাসক্ত নর,
নরাকারে প্রেতরূপী সঙ্কীর্ণ অন্তর,
শত শত জীবঘাতী নির্ম্মম বর্ব্বর
লভিলা মানব নাম কৃপাতে তোমার।

(৫)

শ্রীস্বামী বিবেকানন্দ তব পদ পেয়ে,
তব নাম প্রচারিলা পৃথিবী ব্যাপিয়ে।
পাশ্চাত্যেরা প্রাচ্যভাবে মোহিত হইয়ে;
বেদান্তের সার ধর্ম্ম হৃদয়ে ধরিয়ে,
ঘোষিতেছে তব নাম দিক্ কাঁপাইয়ে।

(৬)

সংস্কারিয়ে বিধি মতে পূর্ব্ব পূর্ব্বমত,
দেখাইলে মানবেরে সাধনার পথ।
মথিয়ে সমুদ্রসম ধর্ম্মশাস্ত্র যত,
আবিষ্কারি তত্ত্ব কথা শাস্ত্র মনোমত,
প্রচারিলে মহামূল্য উপদেশ কত।

(৭)

কালী কল্পতরু মূলে আশ্রয় লইয়ে,
বিবেকেরে শুরু করি নিজ সঙ্গে লয়ে,
ভিন্ন ভিন্ন সাধনায় সাধক সাজিয়ে,

অসার সংসার সুখ সব তেয়াগিয়ে,
নিষ্কামী হইলে তুমি কায়ে পরাজিয়ে।

(৮)

নূতন সাধন পথ করিয়ে সৃজন;
দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয় বশে করিয়ে দমন,
জায়াধনে মাতৃ ভাবে করিয়ে ভজন,
ভোগ অভিলাষসুখ দিলে বিসর্জ্জন।
এ অধম দীনে দাও তব শ্রীচরণ।

(৯)

আদর্শ সংযমী তুমি যোগীকুল শশী,
ত্যাগ পথ অনুসরি হইলে সন্ন্যাসী।
অপার মহিমা তব ওহে পূর্ণন্যাসী,
অসীম করুণা বলে হলে অবিনাশী।
ঘোষিছে জগতবাসী তব গুণরাশি।

(১০)

সংসারে শ্মশান জ্ঞান শ্মশানে সংসার,
উদাসী পরম যোগী কেবা আছে আর?
জীব শিক্ষা তরে দেব তব অবতার,
অনেক সাধন তত্ত্ব করিলে প্রচার।
কে বর্ণিতে পারে ভবে মহিমা তোমার।

(১১)

গীতার মহান্ বাণী ঘোষিয়ে জগতে,
সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় করিলে বিশ্বেতে।
শ্রেষ্ঠ সনাতন ধর্ম্ম হ'ল তোমা হ'তে।
স্বয়ং তুমি নারায়ণ জীবেরে তরাতে,
শ্রীচরণ দেহ দাসে ওহে মহামতে।

রামকৃষ্ণ কৃপাপ্রার্থী—

জনৈক অধম।

ডাক্তার আব্দুল ওয়াজীজ।

১২৯৮ সালের ভাদ্র কিম্বা আশ্বিন মাসে, আমরা সেবক রামচন্দ্র লিখিত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনচরিত প্রথমে পাঠ করি। ঐ পুস্তকের চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদে একজন মুসলমান ভক্ত (ডাক্তারের) উল্লেখ আছে। ঐ ডাক্তারটী মফঃস্বলে কাজ কর্ম্ম করিতেন বলিয়া প্রায় কলিকাতায় আসিতেন না। অথবা যদিও কখন আসিতেন, আমাদের সংস্রবে আসিবার তাঁহার কোনও কারণ ঘটিত না। ইংরাজী ১৮৯৮ খৃঃ ৭ই আগষ্ট, রবিবার আমরা তাঁহাকে প্রথম দর্শন করি।

বেলা অনুমান ৪ ঘটিকা। যোগোদ্যানের বৈঠকগৃহে শ্রীরামচন্দ্র বসিয়াছেন। তাঁহার আশে পাশে হরমোহন, তাঁহার পুত্র যতীন, বিপিন গাঙ্গুলী, সুরেশ, কালী, অপূর্ব্ব, বিপিন দত্ত, অমৃতবাবু, নন্দবাবু, ললিত এবং বিজয় বসিয়া আছেন। ঠাকুরের প্রসঙ্গ হইতেছে। একটু পূর্ব্বেই অমৃতবাবু কতকগুলি মধুর বৃন্দাবন লীলাবিষয়ক গোবিন্দ অধিকারীর বিরচিত সঙ্গীত গাহিয়াছেন। সুরেশ গান এবং সুর আয়ত্ত করিতে অতি সুনিপুণ। তাই কেহ কেহ বলিতেছেন—"ফনোগ্রাফে গান উঠিয়াছে কি?" এমন সময়ে যোগোদ্যানের ফটকের নিকট একখানি গাড়ী আসিয়া থামিল। আমরা উদগ্রীব হইয়া দেখিতে লাগিলাম। একজন ইজার চাপকান পরা, মাথায় টুপি, দীর্ঘ শ্মশ্রু, গৌরবর্ণের লোক অবতরণ করিলেন। দেখিয়াই মুসলমান বলিয়াই মনে হইল। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া আসিলেই, মহাত্মা রামচন্দ্র কহিলেন, "ইনি ঠাকুরের সেই মুসলমান ভক্ত—যিনি ডাক্তার। বহুকাল পরে এঁকে দেখলাম।" এই কথা শুনিয়া আমরা জন কয়েক ছুটিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া অভিবাদন করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গৃহাভিমুখে আসিতে লাগিলাম। রামচন্দ্র গৃহ হইতে অবতরণ করিয়া আসিয়া যথাযোগ্য অভিভাষণাদির পর তাঁহার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তৎপরে কহিলেন, "চলুন! ঠাকুর দর্শন করিবেন।"

ওয়াজীজ সাহেব অতি শান্ত প্রকৃতি এবং অতি মিষ্টভাষী। কথায় কথায় শুনিলাম, তিনি নিরামিষভোজী। ঠাকুরের চাতালের সম্মুখে গিয়া মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "চাতালের উপরে অগ্রসর হইতে পারি কি?" রামচন্দ্র সম্মতি জানাইলে, তিনি জুতা ও মোজা খুলিয়া মন্দিরের সম্মুখীন হইয়া অর্দ্ধনত হইয়া

তিনবার সেলাম্ করিলেন এবং পূর্ব্বস্মৃতি স্মরণ হওয়ায় তাঁহার চক্ষুকোণে কয়েক ফোঁটা জল আমাদের নয়নগোচর হইল। রুমালে মুখ পুছিয়া তিনি আবার রামচন্দ্রের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন।

কহিলেন—যোগোদ্যানে এই আমার প্রথম আসা। বহুকাল কলিকাতায় আসি নাই—আপনাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। এখন নোয়াখালির মিউনিসিপ্যালিটীতে চাকরী করছি। একটা কূয়া কাটা হইতেছে, তাহার জল কিরূপ হইবে, সেটী পরীক্ষা করানর উদ্দেশ্যেই আপনার নিকট আমার আসা, কারণ আপনার পরীক্ষার উপরে আর কোনও সন্দেহ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। জলটী বাসায় আছে, কল্য আপনার কলেজে পৌঁছিয়া দিব। অবশ্য এ সম্বন্ধে কলেজে দেখা করিতেই পারিতাম, কিন্তু তাহাতে প্রাণের তৃপ্তি হইত না। বহুদিন আপনাদের সুখসঙ্গ হইতে বঞ্চিত আছি, বিশেষতঃ বহুদিন হইতে যোগোদ্যান কর্ণে শুনিতেছি মাত্র, কিন্তু চক্ষে দেখা ঘটে নাই। তাই ভাবিলাম যে, যাঁহাকে নরদেহে দেখিয়া একবার ধন্য হইয়াছি, তিনি এখন কিভাবে বিরাজ করিয়া ভক্তের পূজা গ্রহণ করিতেছেন, দেখিয়া আসি।

রামচন্দ্র কহিলেন, আসিয়া খুব ভালই করিয়াছেন। আপনাদের দেখিতে আমাদের কতই সাধ হয়। এই যে সব ছেলেদের দেখচেন, এরা সব আপনাদের বিষয় শুনেছে, আপনাদের দেখবার জন্য এরা খুব আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। চলুন বৈঠকখানায় বসে, আপনি এদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইবেন। তাঁকে কেমন দেখেছিলেন, এদের সব বলবেন।

সকলে বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। ডাক্তার সাহেব এক একজন বালকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা ও আলাপ করিতে লাগিলেন। সকলেই বিশিষ্ট ভদ্রসন্তান এবং শিক্ষিত পরিচয় পাইয়া তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং এ বয়সে সকলেই ধর্ম্মানুরাগী এবং সুপথ অবলম্বী দেখিয়া তাহাদিগকে ভাগ্যবান বলিয়া অভিহিত করিলেন, এবং রামচন্দ্রের ন্যায় মহৎ ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিয়া ইহারা যে জীবনে মহা উন্নত হইবেন, এ কথা বার বার ব্যক্ত করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র কহিলেন যে, যাঁহার চরণতলে আসিয়া উহারা আশ্রয় লইয়াছে, তিনিই উহাদের কল্যাণ বিধান করিবেন। আমরাই বা মানুষ ছিলাম কবে? তাঁহারই চরণধূলির বলে যা এখন মনুষ্যপদবাচ্য হইয়াছি! নতুবা আমরাও ত এককালে

পশু ছিলাম। সংসার ও কামিনী-কাঞ্চনকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া জ্ঞান করিতাম। যাহা হউক, আপনি ত তাঁর কাছে গিয়া আমাদের সেই সম্মিলন ছবি দুই একবার দেখিয়াছেন, সেই সব দিন আর এখনকার দিন ভাবিলে আমরা দিশে হারা হয়ে পড়ি। তবে তিনিই এই সব ছেলেদের জুটিয়ে দিয়েছেন, এদের সঙ্গে তাঁর মধুর প্রসঙ্গে দিন এক রকমে কেটে যাচ্ছে। ঠাকুর সম্বন্ধে অনেকগুলি বক্তৃতা হয়ে গেছে। তাঁর সময়ে যে তত্ত্ব-মঞ্জরী কাগজ বেরুত, সেটা কিছুদিন বন্ধ ছিল, আবার সেটাকে চালান যাচ্ছে। ছেলেদের মুখে দুটী একটী গান শুনুন—

ওয়াজীজ সাহেব আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আপনারা একটী গান করুন। সকলে গাহিলেন—

বাঞ্ছাপূর্ণ হল আজি ধরাতে রামকৃষ্ণ এলো।
তত্ত্বলাভের বিড়ম্বনা দ্বৈতভাবের বিবাদ গেল॥
রামকৃষ্ণ একাকার, এ নব ভাবে প্রচার,
এক অনন্ত সবার মূলাধার—
যে যা বলে তাতেই মেলে, একজনার খেলা সকল॥
যে কালী সে বনমালী, হরি বলি আর ঈশাই বলি,
আল্লা বলে মোল্লা ভজায় কর্ত্তাভজায় সেই কেবল।
স্বভাবে সহজে পাবে অভাবে হবে বিফল॥

গান শুনিয়া ডাক্তার পরমপ্রীত হইয়া বলিলেন, বেশ গান। আপনারা দয়া করিয়া আর একটী গাহিবেন কি? আবার গান হইল—

ডাকরে জপরে মন দিন যে ফুরায়ে যায়।
যে নামে যে ভাবে ডাক, সে ত তাতেই শুনতে পায়॥
না বাধে তাঁর নাম ভেদে, ঈশা মুশা মহম্মদে,
কালী তারা হরিপদে সম সে উপায়—
সতই ধরম ভবে, নহে কেহ একভাবে,
মতভেদে, একরই পূজায়
নানা ফুলে গাঁথা মালা, একটী সুতায় বাঁধন তায়॥

গান শেষ হইলে ডাক্তার সাহেব সকলকে ধন্যবাদ জানাইলেন। তখন সকলে

কহিলেন যে আপনি ঠাকুরের কাছে কি ভাবে গিয়াছিলেন, তাহা আমাদের নিকট বলুন।

ডাক্তার সাহেব বলিতে লাগিলেন।—আমার নিবাস সাতক্ষীরায়, লেখা পড়া ছাড়িয়া কাজকর্ম্ম উপলক্ষে অনেক দিন চুয়াডাঙ্গায় ছিলাম। পরে কলিকাতায় আসিয়া ডাক্তার সরকারের নিকট হোমিওপ্যাথি পড়িতে থাকি এবং তাঁহার স্থাপিত দাতব্য ডিস্পেন্সারীতে কার্য্য করিতাম। তথায় থাকিতে থাকিতে এই রামবাবুর বিষয় শুনিয়াছিলাম। শুনিয়াছিলাম রামকৃষ্ণ-পরমহংস নামে একজন সাধু পুরুষ আছেন, তিনি সকল ধর্ম্ম সত্য বলিয়া মানেন এবং বিশ্বাস করেন, এবং রামবাবু তাঁহার প্রধান শিষ্য। বরাবরই আমার মনে হইত যে, সকল ধর্ম্মের মধ্যেই সত্য আছে এবং সকল ধর্ম্মশাস্ত্রাদি পাঠ করা কর্ত্তব্য। যদিও আমি মুসলমান ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী, তথাপি কাহারও প্রতি আমার মনে দ্বেষ-ভাব ছিল না। যখন আমি পরমহংসদেব এবং রামবাবুর কথা শুনিলাম, তখন হইতেই মনে মনে ইচ্ছা করিলাম যে, এক দিবস রামবাবু সহ আলাপাদি করিয়া তাঁহার সহিত পরমহংসদেবের দর্শনে যাইব। এই সময়ে আমি শুঁড়ায় থাকিতাম। আমার অত্যন্ত আমাশয় হওয়ায় কার্য্য হইতে ৪।৫ দিনের অবসর লইয়া বাসায় ছিলাম, একটু সুস্থ বোধ হইলেই রামবাবু সহ দেখা করিব, সাধ ছিল। আমার একটু বেলা পর্য্যন্ত ঘুমান অভ্যাস, কিন্তু একদিন খুব সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সেই সঙ্গে সঙ্গে চট্‌কলের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। তখন ভোর ৪॥০টা এইরূপ হইবে। সেই দিন টিপ্ টিপ্ করিয়া একটু বৃষ্টিও সেই সময়ে হইতেছিল। কিন্তু অত প্রাতে ঘুম ভাঙ্গায়, এবং সেই দিন রবিবার থাকায়—মনে করিলাম, আজ ত খুব সুবিধা। আজই রামবাবুর বাটী যাইয়া তাঁহার সহিত দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া যাক্। আমার আমাশয়ও সে দিন বেশ ভাল ছিল।

যেমন মনে হওয়া, অমনি, আমার একজন বন্ধু আব্বাস আলি M. A. (এখন তিনি Sylhet ফেণী বাজারে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট) সহ তল্লাস করিতে করিতে রামবাবুর বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। রামবাবুকে আমাদের উদ্দেশ্য বলিবামাত্র উনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া আমাদের সঙ্গে করিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। পরমহংসদেব সে সময়ে ঝাউতলায় শৌচে গিয়া-

ছিলেন। রামবাবু আমাদের সঙ্গে লইয়া পঞ্চবটীতলে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যখন পরমহংসদেব শৌচান্তে সেই দিকে আসিতেছিলেন, রামবাবু অগ্রসর হইয়া গিয়া প্রণাম করিলেন। আমরা প্রণাম করিব না, ইহাই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম, কারণ আমাদের ধর্ম্মানুসারে একমাত্র আল্লা বা ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও নিকট মাথা নোয়াইতে নাই। তবে তাঁহাকে যথাসম্মান প্রদর্শন করিব, ইহাই বাসনা ছিল। কিন্তু তিনি আমাদের সম্মুখে আসিয়া নতভাবে আমাদিগকে প্রণাম করিলেন, আমরাও তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে বাধ্য হইলাম। পরে তিনি আমাদের সঙ্গে লইয়া আপন গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমাদের বসিবার জন্য একখানি আলাহিদা কম্বল বিছাইয়া দিলেন এবং নিজে অপর একটী আসনে বসিয়া আমাদের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। আমরা পৃথক্ আসনে বসিয়া মনে করিতেছিলাম যে, ইনি এমন সাধু ব্যক্তি শুনি, কিন্তু ইঁহার কাছে এরূপ পার্থক্য কেন? আমরা মুসলমান, এবং ইনি ব্রাহ্মণ বা হিন্দু বলিয়া কি আমাদিগকে পৃথক্ আসন দিলেন? কিন্তু এ সন্দেহ আমাদের প্রাণে অধিকক্ষণ স্থান পাইল না। কারণ, তিনি ধর্ম্মকথা প্রসঙ্গে এমন উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন যে, ক্রমশঃ আমাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এবং পরে এক বিছানায় আসিয়া বসিয়া কথা কহিতে লাগিলেন। এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া আমাদেরও প্রাণে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ হইতে লাগিল।

যাইবার কালে মনে মনে তিনটী প্রশ্ন ঠিক করিয়া গিয়াছিলাম, মনে করিয়াছিলাম, এই প্রশ্ন কয়টী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর লইব। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কোনও প্রশ্নই তাঁহাকে করিতে হয় নাই। তিনি কথা প্রসঙ্গে তিনটী প্রশ্নেরই অতি সদুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটী প্রশ্ন এই—'সংসারে থাকিয়া যোগসাধন হয় কি না?' ইহার উত্তর-স্বরূপ কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন যে, বাহির হইতে তৈয়ারী হইয়া গিয়া যদি সংসারে থাকে, তাহাতে সাধনপথে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু সংসারে থাকিয়াই সাধনপথে অগ্রসর হওয়া অতি দুরূহ। কাজলের ঘরে খুব সাবধানে থাকিলেও যেমন একটু কালি লাগেই লাগে, তদ্রূপ সংসারে থাকিয়া সাধন করিতে গেলেও কিছু না কিছু আসক্তি সংসারে জন্মিয়া

যায়। কিন্তু কিছুকাল বাহিরে থাকিয়া তৈয়ারী হইয়া পরে সংসারে আসিলে, সে আসক্তি জন্মিবার ভয় থাকে না।

আমরা পূর্ব্বেই রামবাবুর নিকট শুনিয়াছিলাম যে, উঁহার গলায় বেদনা হইয়াছে, সেইজন্য আমরা কোনও কথা তুলিয়া তাঁহাকে বেশী ঘাটাই নাই; কিন্তু তিনি আপনিই এমন উন্মত্তভাবে আমাদের সহিত আলাপ করিতেছিলেন যে, আমাদের অন্তরের সকল সংশয় ভঞ্জন হইয়া যাইতে লাগিল এবং অপার আনন্দে হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। কথাবার্ত্তা একরূপ শেষ হইলে, রামবাবু তাঁহার নিকটে আমায় ডাক্তার বলিয়া পরিচয় করিয়া দিলেন। তিনি তাহা শুনিয়া বলিলেন বেশত, আমার এ ব্যায়রামটা দেখানর আবশ্যক। তাহা শ্রবণে আমরা বলিলাম যে, যদ্যপি আপনি শক্তি দেন তবেই হয়, নতুবা আমাদের এমন শক্তি নাই যে আপনাদের ন্যায় ব্যক্তির রোগ ভাল করি।

তিনি আমাদের কিছু মিষ্টান্নাদি খাওয়াইয়াছিলেন। পরে আমরা যখন ফিরিয়া আসি, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, আরও তিনবার এখানে আসিও। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকটে আর আমাদের যাওয়া ঘটে নাই। ভয় হইয়াছিল, পাছে বেশী ধর্ম্মবুদ্ধি হইলে সংসারাদি ছাড়িয়া যায়। আমাদের শাস্ত্রে পেগম্বরের যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহাকে আমাদের পেগম্বর বলিয়াই জ্ঞান হইয়াছিল। কিন্তু নারী ও অর্থের কেমন আসক্তি বুঝুন যে, আমরা উহার প্রলোভনে বা আসক্তিতে লিপ্ত থাকায়, আর তাঁহার সমীপে যাইতে সাহস করি নাই।

আর একবার রামবাবুর বাটীতে তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। অমৃত (ডাক্তার সরকারের পুত্র) আমাদের সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। আমরা যখন পৌছিলাম, তখন দেখি, খুব সংকীর্ত্তন হইতেছে, পরমহংসদেব গান গাহিয়া নাচিতেছেন। নাচিতে নাচিতে তাঁহার ভাবসমাধি হইল। আমরা ওরূপ কখনও দেখি নাই। অমৃতকে ব্যাপারটী জিজ্ঞাসা করিলাম, অমৃত সমাধির ব্যাপারটী আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন।

সংগীত শেষ হইলে, যখন দেখা হইল, আমরা প্রণাম করিলাম। মধুর হাস্যে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন, আর দেখিতে পাইনা কেন? মাঝে মাঝে যাওয়া আসা করিবে। পরে আবার নানাপ্রসঙ্গ ও কীর্ত্তনাদি হইতে

লাগিল। পরে আমরা রামবাবুর বাটীতে খুব আনন্দে প্রসাদ পাইয়া বাটী গিয়াছিলাম। অতঃপর অর্থোপার্জ্জন বশতঃ নানাস্থানে কাজকর্ম্ম লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। এ ভাগ্যে আর তাঁহার দর্শন ঘটে নাই।

অতঃপর ইনি যোগোদ্যানে ঠাকুরের বৈকালিক জলপানী প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। যখন তিনি বাসায় ফিরিয়া যাইবার জন্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, রামচন্দ্রের আদেশ মতে সুরেশ তাঁহার হস্তে বক্তৃতাপুস্তক এবং তত্ত্ব-মঞ্জরী পত্রিকাগুলি আনিয়া দিলেন। পরে তিনি ঠাকুরস্থলে প্রণাম করিয়া এবং সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া গাড়ি চড়িয়া কলিকাতাভিমুখে ফিরিলেন।

তিনি চলিয়া যাইলে রামচন্দ্র আমাদিগকে বলিলেন যে, যে দিন উনি আমাদের বাটীতে আমাদের সঙ্গে এক পুংক্তিতে বসিয়া প্রসাদ পাইয়াছিলেন, সেদিন আমাদের মনে সেই গৌরাঙ্গ লীলার কথা উদয় হইয়াছিল। যেন যবন হরিদাস, শ্রীচৈতন্ত ভক্তগণের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়াছেন। আমাদের এক আত্মীয়, উঁহাকে সঙ্গে লইয়া বসিয়া আমরা প্রসাদ পাইয়াছিলাম বলিয়া, অত্যন্ত বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে আমরা তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, প্রসাদ চণ্ডালের মুখ হইতে কাড়িয়া লইয়া খাইবার ব্যবস্থা আছে। কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট প্রসাদও ভক্তগণ সাদরে গ্রহণ করেন। তবে আপনার এ ক্রোধের কারণ কি? উনি প্রসাদ আমাদের সহিত একত্রে বসিয়া খাইয়াছেন মাত্র। ইহাতে আমাদের শাস্ত্র ও বিধি মতে কোনও প্রকার দোষ ঘটিতে পারে না। যদি আমার কন্তার বিবাহ সময়ে—সামাজিক কার্য্যে ঐরূপ কোনও ব্যবহার করি, তাহাতে দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা—সে সময়ে আপনি দু'কথা বলিতে পারেন, কিন্তু দেবতার প্রসাদ সম্বন্ধে এরূপ কার্য্যে প্রতিবাদ করিবার কাহারও অধিকার নাই। সেই আত্মীয় এই কথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন, আর কোনও কথা বলিতে সাহসী হন নাই।

যখন ওয়াজীজ সাহেব চলিয়া যান, আমরা তাঁহার ঠিকানা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। দুই একখানি পত্রেরও আদানপ্রাদান তাঁহার সহিত হইয়াছিল। কিন্তু শেষে তাঁহাকে পত্র দিয়াও তাঁহার নিকট হইতে উত্তর পাই নাই। যাহা হউক—তিনি যেখানেই থাকুন, তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মজীবন যে ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়াছে ও করিতেছে, তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

ষোলো বৎসর অতীত হইয়াছে, ডাক্তার সাহেবের সহিত যোগোদ্যানে আমাদের এ শুভসম্মিলন ঘটিয়াছিল। ঠাকুরের সহিত তাঁহার মিলন সংবাদ জানিতে বা শুনিতে নিশ্চয়ই ভক্ত মাত্রের বিশেষ আকাঙ্ক্ষা হইবে। তাঁহার মুখে আমরা যেমন শুনিয়াছিলাম, সেই দিনই ইহা আমরা একটী নোট্‌বুকে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। পাছে এই শুভ সংবাদ ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাই তত্ত্ব-মঞ্জরী পত্রিকায় যথাযথ প্রকাশিত করিলাম। ভক্তগণের কৌতুহল ইহাতে কিছুমাত্রও তৃপ্ত হইলে, আমাদের এ সংগ্রহ সার্থক হইবে।

সেবক শ্রীবিজয়নাথ মজুমদার।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব।

বিগত ২৩শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার হাবড়া জেলার থানা আমতা এলাকাধীন গড় ভবানীপুর গ্রামে স্থানীয় যুবক ও সেবকমণ্ডলীর উদ্যোগে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রায় চারি পাঁচ শত অভ্যাগত ভক্তবৃন্দ প্রসাদ গ্রহণে পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। ঠাকুরের পূজা, উপদেশ পাঠ, নাম গুণ গান ও সংকীর্ত্তনে উৎসব স্থান শোভিত হইয়াছিল।

বিগত ২৯শে কার্ত্তিক সোমবার, জগদ্ধাত্রী পূজার দিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় শিষ্য ও সেবক মহাত্মা রামচন্দ্রের জন্মতিথি উপলক্ষে কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে প্রায় পাঁচ ছয় শত কাঙ্গালীকে পরিতৃপ্তরূপে ঠাকুরের মহাপ্রসাদ দিয়া রামকৃষ্ণোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মহাত্মা রামচন্দ্রের জন্মতিথি উপ-লক্ষে নূতন গীত রচিত হইয়া ঐ দিবস যোগোদ্যানের নাট-মন্দিরে গীত হওয়ায় সকল ভক্তের প্রাণে এক অভিনব শান্তির ভাব উদিত হইয়াছিল। নিম্নে গীতটী প্রকাশিত হইল।

রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ সেবক-সমিতি কর্ত্তৃক মহাত্মা রামচন্দ্রের জন্মতিথির দিনে ঠাকুরের ও মহাত্মা রামচন্দ্রের বিশেষ পূজা ও ভোগরাগাদি সম্পন্ন হইয়াছিল। সেবক-সমিতি কর্ত্তৃক জন্ম দিনের একটী গীতও হইয়াছিল। অনেকগুলি ভক্ত সমবেত হইয়াছিল।

ইটালি, শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয়ে মহাত্মা রামচন্দ্রের জন্ম দিনে ঠাকুরের ও মহাত্মার বিশেষ পূজা ও ভোগরাগাদি হইয়াছিল।

গীত।

(কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে মহাত্মা রামচন্দ্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে রচিত।)

ভবে রামকৃষ্ণ নাম বিলাতে উদয় দয়াল রাম।
পতিত জনের দশা হেরি নয়ন ঝরে তাঁর অবিরাম॥
রামকৃষ্ণ অবতার,　　　　কে জানিত তত্ত্ব তার,
(আপনি জানি সবে জানায়)　(আপনি চিনি সবে চিনায়)
(আপনি পূজি সবে পূজায়)
তাই শাস্ত্রীয় মীমাংসা দিয়ে প্রচারিল গুণধাম।
তাই প্রত্যক্ষ মীমাংসা দিয়ে প্রচারিল গুণধাম।
তাই পূর্ণব্রহ্ম রামকৃষ্ণে প্রচারিল গুণধাম॥
যত দীন হীনে ডাকি ডাকি,　　বলে তোদের ভাবনা কি,
(স্বয়ং পতিতপাবন এসেছে রে) (আর সাধন ভজন নাই প্রয়োজন)
এবার কল্পতরু কৃপা বিলায় কভু কারেও নহে বাম।
ও সে হোক্ না কেন যেমন তেমন তবু তারেও নহে বাম॥
যাঁর কৃপায় নাম পাই সবে, আজি তাঁরই জন্মোৎসবে,
(এমন দয়াল আর কে ভবে)　(সবার দায়ে দায়ী হবে)
(রাম বিনে ভায় কে আর সবে) (মাত জয় রাম জয় রাম রবে)
বল জয় গুরু জয় রামচন্দ্র নামে শান্তি প্রাণারাম।
গুরু ইষ্ট অভেদ জ্ঞানে গাহ রামকৃষ্ণ নাম।
যেই গুরু সেই ইষ্ট অভেদাত্মা আত্মা রাম॥

শ্রীকৃষ্ণধন পাল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সমাধি-মন্দির ফাণ্ড।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, বিগত নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত সহৃদয় ভদ্র মহোদয়গণের নিকট হইতে, কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমাধি স্থানে নূতন মন্দির নির্ম্মাণের জন্য সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্রীমতী প্রতিভা সুন্দরী দাসী, কলিকাতা	১৲
" শরৎকুমারী মিত্র, শাঁখারিটোলা, ঐ	৫৲
জনৈক ভক্ত	২৲
শ্রীমতী শরৎকুমারী বসু, নরেন্দ্রপুর, হাবড়া	২৲
শ্রীযুক্ত বাবু অরুণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, চাতরা, শ্রীরামপুর	২৲
শ্রীযুক্তা রাণী দিনমণি চৌধুরাণী, সন্তোষ	১০৲
শ্রীযুক্ত বাবু অতুলকৃষ্ণ দে, ডাক্তার, গৌরীবেড়িয়া, কলিকাতা ...	৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু রাধারমণ পাল, পটলডাঙ্গা ঐ	১৲
" " ক্ষগেশচন্দ্র ঘোষ, শাকৃচি সিংহভূম	১৲
" " ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিয়ালদহ, কলিকাতা, ৪র্থ দফে	৪৸০
মারফৎ শ্রীযুক্ত বাবু সুশীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঝিনাদহ, যশোহর ..	৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু প্রভাসচন্দ্র সাহা, কুমারটুলী, কলিকাতা	১৲
" " লক্ষ্মীনারায়ণ জানা, শাসাটী, হুগলী	১৲
শ্রীমতী স্বর্ণময়ী বিশ্বাস, দিনাজপুর	৩৲
পূর্ব্বে প্রাপ্তি স্বীকার করা হইয়াছে	২০৫৪৲
মোট	২০৯৭৸০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমাধি স্থানে মন্দির নির্ম্মাণের জন্য উৎসাহান্বিত হইয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যিনি যাহা কিছু সাহায্য করিবেন, তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে। মন্দির নির্ম্মাণের এখনও অর্দ্ধেক অর্থ সংগৃহীত হয় নাই, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তগণ যিনি যাহা পারেন, সাহায্য করিলে শীঘ্রই সমস্ত টাকা উঠিয়া যাইবে, এইরূপ আশা করি।

যোগবিনোদ

শ্রীরামকৃষ্ণ-সমাধি-মন্দির মঠ,

যোগোদ্যান, কাঁকুড়গাছী, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীচরণ ভরসা

জয় গুরুদেব !!

তত্ত্ব-মঞ্জরী

উনবিংশ বর্ষ, দশম সংখ্যা।

মাঘ, সন ১৩২২ সাল।

যুগাবতার
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব
ও
হিন্দুশাস্ত্র।

নবম উপদেশ।

ভক্তি-তত্ত্ব।

বিজয়। মহাশয়! ঈশ্বরলাভ ক'র্‌তে গেলে, তাঁকে দর্শন ক'র্‌তে গেলে, ভক্তি হ'লেই হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, ভক্তি দ্বারাই তাঁকে দর্শন হয়; কিন্তু পাকা ভক্তি, প্রেমাভক্তি, রাগভক্তি চাই। সেই ভক্তি এলেই তাঁর উপর ভালবাসা আসে। যেমন, ছেলের মার উপর ভালবাসা, মার ছেলের উপর ভালবাসা, স্ত্রীর স্বামীর উপর ভালবাসা।

"এ ভালবাসা, এ রাগভক্তি এলে স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় কুটুম্বের উপর সে মায়ার টান থাকে না, দয়া থাকে। এ ভালবাসা এলে, সংসার বিদেশ বোধ হয়, একটী কর্ম্মভূমি মাত্র বোধ হয়। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ী কিন্তু কল্‌কাতা কর্ম্মভূমি। কল্‌কাতায় বাসা ক'রে থাকৃতে হয়, কর্ম্ম কর্‌বার জন্য। ঈশ্বরে ভালবাসা এলে সংসারাসক্তি—বিষয় বুদ্ধি একেবারে যাবে। বিষয় বুদ্ধির লেশ-মাত্র থাকৃলে তাঁকে দর্শন হয় না। দেশলায়ের কাঠি যদি ভিজে থাকে, হাজার ঘষো, কোন রকমেই জ্বলবে না—কেবল একরাশ কাঠি লোকসান হয়। বিষয়াসক্ত মন ভিজে দেশলাই।

"আর এক রকম ভক্তি আছে; তার নাম বৈধী-ভক্তি। এতো জপ ক'রতে হবে, উপোস ক'রতে হবে, তীর্থে যেতে হবে, এতো উপচারে পূজা ক'রতে হবে, এতগুলি বলিদান দিতে হবে—এ সব বৈধী-ভক্তি। এ সব অনেক ক'রতে ক'রতে ক্রমে রাগভক্তি আসে। কিন্তু রাগভক্তি যতক্ষণ না হবে, ততক্ষণ ঈশ্বরলাভ হবে না। তাঁর উপর ভালবাসা চাই। সংসারবুদ্ধি একেবারে চলে যাবে, আর তাঁর উপর ষোল আনা মন হবে, তবে তাঁকে পাবে।

যতক্ষণ না তাঁর উপর ভালবাসা জন্মায়, ততক্ষণ ভক্তি কাঁচা ভক্তি। তাঁর উপর ভালবাসা এলে, তখন সেই ভক্তির নাম পাকা ভক্তি।"

গীতাতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

শুন কুন্তীসুত, এই ভূতগণ যত
রহিয়াছে চিরদিন যাঁতে অবস্থিত,
বিশ্বব্যাপ্ত যিনি, সেই পুরুষরতন
একান্ত ভক্তির বলে দেন দরশন।

(গীতা ৮ম অঃ ২২ শ্লোক)

শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে, শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "হে উদ্ধব! যেমন অগ্নি কাষ্ঠসমূহকে ভস্ম করে, তেমনি মদীয়াভক্তি পাপরাশিকে ভস্ম করে। মদ্বিষয়ে পরিবর্দ্ধিতাভক্তি যেরূপ আমাকে লাভ করে, যোগ, বিজ্ঞান, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা এবং দানও সেরূপ আমাকে লাভ করিতে পারে না। শ্রদ্ধাই ভক্তি, ভক্তিতেই আমাকে পাওয়া যায়। মদ্বিষয়াভক্তি চণ্ডালকেও পবিত্র করে।

পাপ বংশে জন্ম যার বৈশ্য, শূদ্র, নারী,
মুক্তি পায়, ধরে যদি মোরে ভক্তি করি।

(গীতা ৯ অঃ ৩২ শ্লোক)

সত্য ও দয়া সংযুক্ত ধর্ম্ম বা তপস্যাযুক্ত বিদ্যা ঈশ্বরভক্তিহীন আত্মাকে পরিশোধিত করিতে পারে না। রোমাঞ্চ ও চিত্তদ্রব হেতু আনন্দাশ্রু ভিন্ন ভক্তি জানা যায় না। ভক্তি ভিন্ন চিত্ত শুদ্ধ হয় না। চিত্ত শুদ্ধ হইলেই গদ্‌গদ স্বর হয় ও হৃদয় দ্রবীভূত হয়। তাহা হইলেই তিনি পুনঃ পুনঃ কথন হাস্য, কথন ক্রন্দন, কথন নৃত্য, কথনও বা নির্লজ্জ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করেন। এইরূপ ভক্ত দ্বারাই জগৎ পবিত্র হয়, (ইহাকেই ঠাকুর 'রাগভক্তি' কহিয়াছেন)। মদীয় ভক্তিযোগে আত্মা কর্ম্ম-বাসনা সকল পরিত্যাগ করিয়া মৎ স্বরূপতা লাভ করে। মদীয় পুণ্যময় কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া আত্মা পবিত্র হয় এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্তু সকল দর্শন করে। যিনি বিষয় সকল চিন্তা করেন, তাঁহার আত্মা বিষয়েই নিবিষ্ট হয়, যিনি আমাকে চিন্তা করেন, তাঁহার আত্মা আমাতেই নিবিষ্ট হয়।" (এই জন্য ঠাকুর বলিয়াছেন, 'বিষয়বুদ্ধির লেশমাত্র থাক্‌লে তাঁকে দর্শন হয় না।') প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন;—

যাঁহার জীবের প্রতি দ্বেষ নাই মনে,
সতত মিত্রতা যাঁর সকলের সনে,
করুণা সকল জীবে, নাহি অহঙ্কার,
মায়া ঘোরে যে না করে "আমার আমার"
সুখে দুঃখে সমজ্ঞান, সংযত স্বভাব,
স্থিরলক্ষ্য ক্ষমাশীল, সদা তুষ্ট ভাব,
আমাতেই মন বুদ্ধি দিয়াছেন যিনি,
নিঃসংশয় ধনঞ্জয় মম প্রিয় তিনি।
যেইজন হ'তে কেহ উদ্বিগ্ন না হন,
লোক হ'তে উদ্বিগ্ন না হন যেইজন,
পরশ্রীকাতর নহে, ভয় শূন্য যিনি,
হর্ষ ক্ষোভ নাই যাঁর মম প্রিয় তিনি।

কোন বিষয়েতে কিছু স্পৃহা নাই যার
সতত আলস্যশূন্য সুপবিত্র আর,
সর্ব্ব চিন্তা দূর করি উদাসীন যিনি,
সংকল্প-বিকল্পশূন্য মম প্রিয় তিনি।
ইষ্ট লাভে হৃষ্ট নহে যাঁহার অন্তর,
অনিষ্টে বিদ্বেষ নাই সম নিরন্তর,
ইষ্ট নাশে শোক নাহি করেন যে জন,
লাভের বিষয়ে যাঁর লোভ শূন্য মন,
শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান যিনি,
নিঃসংশয় ধনঞ্জয়, মম প্রিয় তিনি।
শত্রু-মিত্রে, সুখ-দুঃখে, মান অপমানে,
সম ভাব থাকে যাঁর অনাসক্ত মনে,
স্তুতি নিন্দা সম জ্ঞান, অল্প কথা কন,
সামান্যে সন্তোষ পূর্ণ সর্ব্বদা যে জন,
অতুল ঐশ্বর্য্যে থাকি গৃহ হীন যিনি,
স্থিরমতি ভক্তিমান, মম প্রিয় তিনি।
হেন ধর্ম্মামৃত যাঁরা করে আচরণ
পার্থ, মম প্রিয়তম সেই ভক্তগণ।

(গীতা ১২ অঃ ১৩-২০ শ্লোক)

এক্ষণে ভক্তজনগণ মধ্যে দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রথমতঃ প্রহ্লাদকে গ্রহণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রহ্লাদের ভক্তি বাল্যকাল হইতেই (গীতোক্ত-লক্ষণানুযায়ী বা ঠাকুরের উক্তি মত) পাকা ভক্তি, প্রেমাভক্তি বা রাগভক্তি ছিল। কারণ, প্রহ্লাদ বাল্যকালে কখন কখন ভগবানের চিন্তায় এত মগ্ন হইতেন যে, তাঁহাকে জড়ের ন্যায় বোধ হইত। শয়নে, স্বপনে, ভোজনে এবং অধ্যয়নে সকল কার্য্যেই তাঁহার মন সর্ব্বদা নারায়ণে নিরত থাকায় এই সকল কার্য্যে তাঁহার আদৌ আসক্তি ছিল না। তিনি ভগবানের চিন্তা করিতে করিতে কখন রোদন, কখন হাস্য, কখন গান করিতেন ও কখন নিস্তব্ধভাবে ভগবদ্ভাবনায় চিত্ত নিবেশপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেন। কখন কখন তাঁহার নয়নযুগল হইতে আনন্দ-

বারি নির্গত হইত। প্রহ্লাদ অসুরবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ও নিকৃষ্ট সংসর্গে থাকিয়াও সতত ভগবান হরির পাদপদ্ম সেবায় আত্মোন্নতি সাধন করিতেন। যে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর ভয়ে অমরগণ সদা সশঙ্কিত এবং যজ্ঞভাগে বঞ্চিত, ঋষিগণ তপজপবিরহিত, যক্ষগণ বাহক, কিন্নরগণ অবৈতনিক ভাবে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন; সেই শমন সদৃশ দৈত্যরাজ যখন বালক প্রহ্লাদকে ক্রোড়ে বসাইয়া আহ্লাদ সহকারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বৎস প্রহ্লাদ! এতকাল গুরু গৃহে যাহা যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি, তাহা আমাকে বল।" তখন পঞ্চমবর্ষীয় বালক প্রহ্লাদ, নির্ভয়চিত্তে বলিয়াছিলেন, "হে পিতঃ! হরিকথা শ্রবণ, তাঁহার গুণ কীর্ত্তন, তাঁহার স্মরণ, পাদ সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং তাঁহাতে আত্মসমর্পণ, এই নব লক্ষণাক্রান্ত ভক্তি* অনুষ্ঠান করাই উৎকৃষ্ট অধ্যয়ন বলিয়া বোধ হয়।" এই কথা শুনিয়া দৈত্যরাজ ক্রোধানলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া অধ্যবসায়সহকারে হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ, কূপাদিতে নিরোধ, খাদ্যদ্রব্যের সহিত বিষ দান, অগ্নিতে পাতন ও পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে অধঃক্ষেপণাদি বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াও নিষ্পাপ প্রহ্লাদকে বধ করিতে সমর্থ হইল না এবং ভীত হইয়া প্রহ্লাদের ভক্তিও কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইল না অথবা শাসনকর্ত্তা পিতার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন না। প্রহ্লাদ তাঁহার সহাধ্যায়ী বালকগণকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে ভগবদ্ধর্ম্মের উপদেশ দিতে লাগিলেন। "হে বয়স্যগণ! তোমরা আসুরভাব পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বভূতে দয়া প্রকাশ কর ও সকল প্রাণীর প্রতিই সুহৃদের ন্যায় আচরণ কর, তাহা হইলে ভগবান্ তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন। তিনি সন্তুষ্ট হইলে পুরুষের আর কিছুরই অভাব থাকে না, সকল বিষয়ই হস্তগত বোধ হয়। বিনা যত্নে লব্ধ যে ধর্ম্মাদি, তাহাতে আমাদিগের প্রয়োজন নাই।

* উক্ত নববিধা-ভক্তি সাধনের ত কথাই নাই। অধিকন্তু এক একটী ভক্তি সাধনেই ভগবৎ প্রাপ্তি করায়। যথা,—গুণলীলা চরিত্রাদি শ্রবণে মহারাজা পরীক্ষিতের, গুণ কীর্ত্তনে শুকদেবের, স্মরণে প্রহ্লাদের, পাদ সেবনে লক্ষ্মীর, অর্চ্চনা দ্বারা পৃথুর, বন্দনা দ্বারা অক্রুরের, দাস্যকার্য্য দ্বারা হনুমানের, সখ্যভাবে অর্জ্জুনের এবং আত্ম-সমর্পণ দ্বারা বিরোচন পুত্র বলির শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি হইয়াছিল। উক্ত নববিধা ভক্তি সাধন দ্বারাই তাঁহার উপর ভালবাসা জন্মে। এই ভালবাসা আসিলেই তাঁহার দর্শন লাভ হয়। সেই জন্য উক্ত নববিধা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

আমরা সর্ব্বদা ভগবান্ হরির গুণ গান করিতেছি ও তাঁহার পাদপদ্মের সুধা পান করিতেছি, আমাদিগের মোক্ষেরও প্রয়োজন নাই। ত্রিবর্গ সাধনোপযোগী ধর্ম্ম বা বেদোক্ত অন্যান্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নাই; অন্তর্যামী পরমপুরুষ পরমেশ্বরে আত্ম-সমর্পণই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।" ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, প্রহ্লাদ ধর্ম্মাদি অথবা মোক্ষের প্রার্থনা করিতেছেন না। তিনি কেবলমাত্র হরিগুণ গান ও তাঁহার পাদপদ্ম সুধা পান করিতে চান। এইরূপ ভক্তিকে ঠাকুর 'অহৈতুকী ভক্তি' বলিতেন। আর বলিতেন, "এইরূপ ভক্তিতে ভক্ত বলে, 'হে ঈশ্বর! আমি ধন, মান, দেহসুখ এ সব কিছুই চাই না। এই কর যেন তোমার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধাভক্তি হয়।" এইরূপ ভক্তি হইতে প্রেম জন্মে। এই প্রেমোন্মাদ হইলেই ভক্ত হাসে, কাঁদে, নাচে, গায় এবং এই প্রেমোদয় হইলেই তাঁহার দর্শন হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে, শ্রীভগবান কপিলদেবকে বলিয়াছেন, "আমার কতকগুলি ভক্ত আছেন, তাঁহারা মুক্তি কামনা না করিয়া সর্ব্বদা কেবল আমার সেবা করিতেই ভালবাসেন, আমাকে উদ্দেশ করিয়া তাঁহারা সকল কার্য্যই সম্পন্ন করেন এবং পরস্পর একত্র মিলিত হইয়া আমারই গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আমার যে সকল দিব্য রূপের মুখশ্রী সুপ্রসন্ন ও মনোহর এবং লোচন অরুণ বর্ণ, তাঁহারা সেই সকল রূপ বর্ণনা করিতেই ভালবাসেন এবং তাঁহারা আমার মনোহর 'গুণ কীর্ত্তন' করিয়া সুখী হন। ফলতঃ আমার সেই সুন্দর আকৃতি, উদারচরিত, সহাস্য আস্য, সুমধুর বাক্য ও ইঙ্গিত প্রভৃতি তাঁহাদিগের আত্মা প্রাণ ও মন হরণ করিয়া লয়। তজ্জন্য তাঁহারা ইচ্ছা না করিলেও তাঁহাদিগের অহৈতুকী (স্বাভাবিকী) ভক্তি আপনিই তাঁহাদিগকে মুক্তি প্রদান করে।"

এক্ষণে প্রেমাভক্তি বা পাকা ভক্তির দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা ব্রজগোপীদিগের ভাব গ্রহণ করিলে বুঝিতে পারি যে, ব্রজগোপীগণ একমাত্র কৃষ্ণগতপ্রাণা ছিলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকেই পতি পুত্র জ্ঞানে সেবা করিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণ দর্শনেই সুখ অনুভব করিতেন। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন তাঁহাদের আর পতি, পুত্র, ধন, মান, দেহসুখ কিছুতেই স্পৃহা ছিল না। শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন, "হে প্রভো! আমাদিগকে তুমিই এইমাত্র উপদেশ দিলে যে, পতি, পুত্র ও বন্ধুগণের সেবা করাই স্ত্রীদিগের একমাত্র

ধর্ম্ম; হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমরা তাহাই করিব। যেহেতু তুমিই যখন সকলের ঈশ্বর ও সর্ব্বময়, তখন এক তোমার সেবা করিলেই আমাদিগের সকলের সেবা করা হইবে। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ তোমাকেই একমাত্র প্রিয় বলিয়া জানেন। পতিপুত্রাদি দুঃখদায়ক, তাহাদিগের প্রয়োজন কি? অতএব হে নাথ! আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও।" সেই জন্য ঠাকুর বলিয়াছেন, "প্রেমাভক্তি বা রাগভক্তি এলে স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় কুটুম্বের উপর মায়ার টান থাকে না। সংসারাসক্তি—বিষয়বুদ্ধি—একেবারে যাবে।" আবার ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন লীলার কথা বলিতে বলিতে যখন দেখিতেন, ইংরাজী শিক্ষিত নব্য যুবকবৃন্দের রুচিকর হইতেছে না, তখন বলিতেন, "তোরা ঐ লীলার ভিতর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতির মনের টানটাই শুধু দেখ্‌না, ধর্‌না—ঈশ্বরে মনের ঐরূপ টান হ'লে তবে তাঁকে পাওয়া যায়। দেখ্‌দেখি গোপীরা স্বামী পুত্র, কুল শীল, মান অপমান, লজ্জা ঘৃণা, লোকভয়—সমাজভয়—সব ছেড়ে শ্রীগোবিন্দের জন্য কতদূর উন্মত্তা হ'য়ে উঠেছিল!—ঐরূপ করতে পার্‌লে, তবে ভগবান লাভ হয়।"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত আছে যে,

রোগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
'বৈধী ভক্তি' বলি তারে সর্ব্ব শাস্ত্রে গায়॥
দাস-সখা পিত্রাদি প্রেয়সীরগণ।
'রাগ' মার্গে এই সব ভাবের গণন॥

ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, যাঁহারা 'বৈধীভক্তি' সাধন করেন তাঁহাদের ভক্তি 'রাগ'হীন। দাস, সখা, পুত্র, পিতা, স্ত্রী আদির ভাব আরোপ দ্বারাই রাগভক্তির লক্ষণ প্রকাশিত হয়। আবার ভক্তিরসামৃতে উক্ত আছে, যে ভক্ত হরিকে পতি, পুত্র, সুহৃদ, ভ্রাতা, পিতা ও মিত্রবৎ ধ্যান করে, সেই ভক্তকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। এই জন্যই ঠাকুর বলিয়াছেন, "রাগভক্তি এলেই তাঁর উপর ভালবাসা আসে। যেমন ছেলের মার উপর ভালবাসা, মার ছেলের উপর ভালবাসা, স্বামীর স্ত্রীর উপর ভালবাসা ইত্যাদি।" অতএব বৈষ্ণব শাস্ত্রোক্ত শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরাদি পঞ্চবিধ ভাবও রাগভক্তির অন্তর্ভূত। কারণ দেখা যায়, সংসারে আমরা পিতা, মাতা, সখা, সখী, স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, প্রভু, ভৃত্য, গুরু, শিষ্য, রাজা, প্রজা প্রভৃতির সহিত এক একটা বিশেষ

সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়া থাকি। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ঐ সম্বন্ধ সকলকেই শান্তাদি পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। কারণ শান্তাদি পঞ্চ ভাবের সহিত জীব সংসার সম্বন্ধে নিত্য পরিচিত থাকায় তদবলম্বনে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে অগ্রসর হওয়া তাহার পক্ষে সহজসাধ্য হইবে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—

অধিকারী ভেদে রতি পাঁচ প্রকার।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রতি আর॥
এই পঞ্চ স্থায়িভাব হয় পঞ্চ রস।
যে রসে ভক্ত সুখী—কৃষ্ণ হয় বশ॥

এক্ষণে উক্ত শান্ত দাস্যাদি পঞ্চবিধ ভাবাবলম্বনে ইষ্টের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে সাধকের যে অবস্থা হয়, তাহাকে প্রেম কহে। ঠাকুর বলিতেন, "ভাব পাকিলে প্রেম বলে।" এই প্রেম আসিলেই সাধকের ঈশ্বর দর্শন হয়।

ঠাকুরপূজা, জপ, তীর্থগমন, বলিদান, এবং উপবাসাদি 'বৈধীভক্তি'র যে সকল লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা উপরোক্ত শাস্ত্রীয় বিষয় সমূহ হইতে এক্ষণে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, উক্ত 'প্রেমাভক্তি' হইতে 'বৈধীভক্তি' অনেক তফাতে থাকে। যদিও বৈধীভক্তি দ্বিবিধা ভক্তির অন্যতম ভক্তি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি 'বৈধীভক্তি'র অনুষ্ঠিত বিষয়গুলি কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত বলিতে হইবে। যেহেতু ঠাকুর বলিয়াছেন, "ঈশ্বরে ফল সমর্পণ ক'রে পূজা, জপ প্রভৃতি কর্ম্ম করার নাম কর্ম্মযোগ।" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উহাও নিষ্কামভাবে এবং 'ভাবের ঘরে চুরি' না করিয়া অর্থাৎ বাহ্যিক লোক দেখান ভাব পরিত্যাগ করিয়া আন্তরিকভাবে অনুষ্ঠিত না হইলে প্রত্যক্ষ ঈশ্বর দর্শনরূপ বাসনা সহজে সিদ্ধ হইবে না। একে কলিযুগ, তাহাতে নানাবিধ বাসনা-জালে জড়িত কামিনী-কাঞ্চনাসক্ত অল্পায়ু মানবগণের উক্তরূপ 'বৈধীভক্তি' সাধনে সহজে অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে না। ঠাকুর বলিয়াছেন, "কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। শাস্ত্রে যে কর্ম্ম ক'রতে ব'লেছে, কলিকালে করা বড় কঠিন। কলিতে আয়ু কম এবং অন্নগত প্রাণ। সুতরাং বেশী কর্ম্ম চলে না। তার পর অনাসক্ত হ'য়ে ফল কামনা না ক'রে কর্ম্ম করা ভারি কঠিন। সেই জন্য কলিযুগে ভক্তিযোগ, ভগবানের নাম গুণ গান আর প্রার্থনা।" দৃষ্টান্ত

স্বরূপ এক একটী বিষয় লইয়া আলোচনা করিলে এ বিষয় আরও বিশদরূপে বুঝা যাইবে। একজনের এক সময় সামান্তরূপ একটুকু বৈরাগ্যোদয় হওয়ায় তিনি স্থির করিলেন, প্রত্যহ শিবপূজা না করিয়া জল গ্রহণ করিবেন না। এইরূপ কিছুদিন করিতে করিতে সাংসারিক নানাবিধ ঘাত প্রতিঘাতে যখন তাঁহার চিত্ত বিচলিত হইয়া বৈরাগ্য স্ফুলিঙ্গটুকু নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল, তখন তাঁহার উক্ত কার্য্য নিত্য দায়িক কার্য্যের ভাবে পরিণত হইল। কোন সময় মোকদ্দমা উপলক্ষে হয় ত ৯টার সময় ট্রেনে আদালত যাইতে হইবে। সুতরাং উহারই মধ্যে তাহাকে মোকদ্দমা সংক্রান্ত কাগজপত্র ও তদ্বিরাদি ঠিক করিয়া স্নানাহার করিয়া যাইতে হইল এবং বাড়ীতে বলিয়া গেলেন, 'অমুক ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া শিবপূজাটী করাইয়া রাখিবে।' এইরূপ একজন নিয়ম করিলেন, প্রত্যহ লক্ষ নাম জপ করিবেন। কিন্তু বিষয় সংক্রান্ত কার্য্যবশতঃ হয় ত জপ করিতে করিতে টাকার সুদের হিসাব, খাজনা বাকির হিসাব, মোকদ্দমার তদ্বিরাদি সমস্ত কার্য্যই হইতে লাগিল, পরে স্নানাহারের সময় হইলে উঠিয়া গেলেন। আবার কেহ কেহ বলেন, আজ কার্য্যবশতঃ সমস্ত নাম জপ হইল না, কাল্‌কে অবশিষ্ট নাম জপ করিতে হইবে।' এইরূপ নাম জপের আয়ো ওয়াশীল বাকি টানাও হয়। কেহ হয় ত তীর্থে গিয়াছিলেন, তিনি বাড়ীতে আসিয়া তীর্থস্থ দেবদেবীগণের রূপাদি কোথায় চিন্তা করিবেন! না, তাহা না করিয়া হয় ত আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব অথবা প্রতিবেশীগণের নিকট 'অমুক তীর্থে অমুক জিনিষগুলো খুব সস্তা, অমুক বাড়ীটী খুব ভাল' ইত্যাদি গল্প করিয়া কাটাইতে লাগিলেন। আরও দেখা যায়, কেহ বা পুত্র কামনায় 'শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী' পূজা অথবা তীর্থ গমন করেন। কেহ সন্তানের অথবা নিজের রোগ আরোগ্য কামনায় 'বলিদান' মানস করেন। এইরূপে বৈধীভক্ত্যুক্ত ক্রিয়াকলাপাদি সাধন করিতে যাইয়া আমরা টাকা, কড়ি, মান, সম্ভ্রম, দেহসুখ ইত্যাদি বিবিধ কামনাজালে জড়িত হইয়া উদ্দিষ্টপথ হইতে ভ্রষ্ট হই। এই জন্যই ভগবান কলিযুগে শ্রীশ্রীচৈতন্যাবতারে নাম ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন।

কলিযুগে যুগধর্ম্ম নামের প্রচার।
তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার॥

ব্যক্ত করি ভাগবতে কহে আর বার।
কলিযুগে ধর্ম্ম—নাম সংকীর্ত্তন সার॥

শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধে শুকদেব বলিয়াছেন, "কলিকাল দোষের সমুদ্র, তথাপি কলির এক মহৎ গুণ আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের নামোচ্চারণ করিলেই বন্ধন মুক্ত হইয়া পরম পুরুষকে লাভ করা যায়। সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যানে, ত্রেতায় যজ্ঞ দ্বারা অর্চ্চনায়, দ্বাপরে পরিচর্য্যায় ও কলিতে নামোচ্চারণেই লোকের মুক্তি হয়।" ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবও বলিয়াছেন, "কলিযুগের পক্ষে নারদীয় ভক্তি। ঈশ্বরের নাম গুণ গান করা ও ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা করা; 'হে ঈশ্বর! জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, আমায় দেখা দাও।" যে যুগের লোকে যুগধর্ম্মের প্রবল তাড়নায় ভগবৎ নির্দ্দিষ্ট এত সহজ পন্থাও অবলম্বন করিতে পারে না, সে যুগে 'বৈধীভক্তি' দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধি হওয়া নিতান্তই অসম্ভব। প্রকৃতপক্ষে কলিযুগে যে সকল সাধক আত্মোন্নতি করিয়াছেন, দেখা যায়, তাঁহারা প্রেমাভক্তির উদ্দীপক স্বরূপ কেবলমাত্র নাম গুণ গান দ্বারাই চিরশান্তির অধিকারী হইয়াছেন। গানে আছে—

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী ব'লে আমার অজপা যদি ফুরায়॥
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়॥
দান ব্রত যজ্ঞ আদি আর কিছু না মনে লয়।
মদনের যাগ যজ্ঞ, ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায়॥
কালী নামের এত গুণ কেবা জানতে পারে তায়।
দেবাদিদেব মহাদেব যাঁর পঞ্চ মুখে গুণ গায়॥

বর্ত্তমান যুগে কাম-কাঞ্চনাসক্ত মানবগণকে ইহাতেও অসমর্থ দেখিয়া করুণাবতার দয়াল ঠাকুর ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে 'বকল্‌মা'* দিতে বলিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী কথা এখানে বলা যাইতে পারে†। ঠাকুরের গৃহীভক্ত নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়, ঠাকুরের

* এই বকল্‌মার অর্থ—অত্র প্রবন্ধের চতুর্থ উপদেশে বিবৃত হইয়াছে।

† এই দৃষ্টান্তটী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব পূর্ব্বার্দ্ধ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

নিকট কয়েকবার আসা যাওয়ার পর একদিন তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে আত্ম-সমর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'এখন থেকে আমি কি ক'রব ?' ঠাকুর বলিলেন, 'এখন যা ক'রচ, তাই ক'রে যাও। এখন এদিক ওদিক অর্থাৎ ভগবান ও সংসার দুদিক রেখে চল, তারপর যখন একদিক ভাঙ্গবে, তখন যা হয় হবে। তবে সকাল বিকালে তাঁর স্মরণ মননটা রেখো।' নানাবিধ কার্য্যবিজড়িত গিরিশবাবু ঠাকুরের উক্ত আদেশ প্রতিপালন করিতে অর্থাৎ সকাল বিকালে তাঁর স্মরণ মনন করিতে অবকাশ পাইবেন কি না ভাবিয়া নীরব রহিলেন। ঠাকুর গিরিশ বাবুকে ঐরূপ নীরব দেখিয়া তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন— 'আচ্ছা, তা যদি না পারত খাবার শোবার আগে তাঁকে একবার স্মরণ ক'রে নিও।' এবারেও গিরিশ বাবু ঠাকুরের এত সোজা আদেশ প্রতিপালন করিতে পারিবেন কি না ভাবিয়া লজ্জিত হইয়া নীরব রহিলেন। ঠাকুর গিরিশ বাবুর দিকে আবার চাহিয়া হাসিতে হাসিতে এইবার বলিলেন—"তুই ব'ল্‌বি, 'তাও যদি না পারি'—আচ্ছা, তবে আমায় বকল্‌মা দে। এইবারে কথাটী গিরিশ বাবুর মনের মত হইল। গিরিশ বাবু তাহাই করিলেন। উক্তরূপ কার্য্য দ্বারা স্বেচ্ছাচারী গিরিশ বাবু ধর্ম্মপথের পথিক হইয়া, পরে একজন প্রধান ভক্ত হইয়াছিলেন এবং ভক্তবীর উপাধি পাইয়াছিলেন।

আহা! ধন্য কলিযুগ! ধন্য কলির মানব আমরা! জীবের দুঃখে কাতর কৃপাবতার শ্রীভগবান পুনঃ পুনঃ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগের উদ্ধারের জন্য কত সহজ পন্থা আবিষ্কার করিতেছেন। (এই হেতু শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত আছে যে, দেবগণও কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন।) কিন্তু অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন ভ্রান্ত জীব আমরা। আমাদের কিছুতেই মোহ নিদ্রা ভাঙ্গিতেছে না। আমরা পশুবৎ আহার নিদ্রা মৈথুনেই নিরত। পশুজীবনের সহিত মানব জীবনের আমরা কোনও পার্থক্য বিচার করিতেছি না। মুক্তির চাবি 'ধর ধর' বলিয়া ভগবান আমাদিগের নিকটে আসিয়া দিতে চাহিতেছেন, কিন্তু আমরা ঘুমের ঘোরে, বিকারগ্রস্ত রোগী যেমন ঔষধ খাইতে চাহে না, তদ্রূপ দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছি। হায়! আমাদের কি হবে? কিসে আমাদের এই মোহনিদ্রা ভাঙ্গিবে? কিসে আমরা এই ভবকূপ হইতে উদ্ধার হইব? যেহেতু ভক্তিহীন, সাধনহীন, ভজনহীন আমরা। অতএব হে প্রভো! হে সাধকবেশধারী রামকৃষ্ণ-

রূপী নারায়ণ! হে হরি! ভবকূপে পতিত এই অধম জীবগণকে কৃপা করিয়া উদ্ধার করুন। যে হেতু, আপনার কৃপা ভিন্ন উপায় নাই, শক্তি নাই, সামর্থ্য নাই। হে প্রভো! বল দাও, শক্তি দাও, কৃপা কর। এবং প্রার্থনা করিতেছি, 'তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধা, নির্ম্মলা, নিষ্কাম, অহৈতুকী ভক্তি দাও, দর্শন দাও; তোমার যেন ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। মন মত্তকরীকে বশ কর, চিত্তশুদ্ধি কর। যেহেতু আপনি শক্তি না দিলে জীবের কোন ক্ষমতা নাই।

দাও শক্তি শক্তিধর, যেন এ জীবন।
তব উপদেশ পথে করে বিচরণ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিপদ নন্দী।

রক্ষ পরমেশ।

(১)

আজি বুঝি ভেসে যায় সকল পৃথিবী
আজি বুঝি ডুবে যায় পৃথিবী সাগরে,
আজি বুঝি শত বজ্র হুঙ্কারি সবেগে
পড়িতেছে দুর্ভাগিনী পৃথিবীর শিরে॥

(২)

তাই কি বিধির ইচ্ছা? তবে এ সৃজন
কেন হে সৃজিলে বিধি? ধ্বংশিবার তরে;
গড়িলে কি এ পৃথিবী অতি সুশোভন
নয়নরঞ্জক বস্তু দিয়া থরে থরে?

(৩)

লক্ষ লক্ষ জীব কেন সৃজিলে ঈশ্বর
কোটী কোটী প্রাণ কেন সৃজিলে ধরায়;

দিয়া নাও এ কেমন রীতি গো তোমার
এতগুলি প্রাণ যাবে ঝরিয়া কি হায় ?

(৪)

পূর্ণ না হইতে হায় জীবনের সাধ
সব আশে জলাঞ্জলি দিয়া রে অভাগা
কোথা যাস চলে আহা ! এ কি পরমাদ
পিতা মাতা পতি পুত্র হৃদে দিয়া দাগা ?

(৫)

অকারণ প্রাণ নাশ আত্ম বলিদান
পার কি সৃজিতে বল একটী পরাণ ?
সেই প্রাণ নাশিবারে এত যত্নবান
হা ধিক্ সহস্র ধিক্ তোমরা পাষাণ ॥

(৬)

এই যে শোণিত স্রোত ভাসায় পৃথিবী
রক্ত স্রোত কলরবে বেগে বহে যায়।
এই শোক দুঃখ মাখা উচ্ছ্বাসের ছবি,
দেখে সব লোক আজ করে হায় হায় ॥

(৭)

ভেবে দেখ হে সুসভ্য নরপতি সবে
যাদের গিয়াছে ছেড়ে আত্মীয় স্বজন,
তাদের করুণ স্বর কি দুখার্দ্র ভাবে
কাঁপিয়া কাঁপিয়া ঐ পশিছে গগন ॥

(৮)

ঐ হের পত্নি স্বামী হারাইয়া হায়
কাঁদিতেছে ; একমাত্র পুত্র হারা হয়ে
কাঁদিছে জননী ; কন্যা পড়িয়া কোথায়
পিতা হারা, রবে তারা কত দুঃখ সয়ে ॥

(৯)

সম্বর সম্বর রণ হে সভ্য-নিচয়
সম্বর হে ক্রোধরাশি নিবাও অনল,
তোমাদের ক্রোধে হের বিশ্ব দগ্ধ হয়
ভস্মে পরিণত হয়—আজি জল স্থল ॥

(১০)

কোথা বুদ্ধ—কোথা বুদ্ধ রয়েছ এখন
হে পিতা থামাও আজি তুমি হে সমর
হের শোণিতের স্রোত বহে অকারণ—
হের বিশ্বব্যাপী উঠে মহা হাহাকার ॥

(১১)

কোথা (প্রভু) রামকৃষ্ণদেব রয়েছ এখন
তোমার অমৃত বাণী রয়েছে কোথায়,
শিখাইতে মূঢ় নরে পুনঃ তত্ত্ব জ্ঞান
ওগো পিতঃ পুনঃ আসি হও গো উদয় ॥

(১২)

শিখাও আবার পুনঃ দাও সেই জ্ঞান
অহিংসা পরম ধর্ম্ম এই নীতি বাণী—
নহে বিশ্বব্যাপী বহ্নি দহিবে পরাণ
ছারেখারে যাবে বিশ্ব না বাঁচিবে প্রাণী ॥

(১৩)

সম্বর সম্বর রণ নৃমুণ্ডমালিনী
শোণিত পিয়াসা এত কেন মা তোমার ?
সম্বর সম্বর তৃষা করাল বদনী
তুমি নাহি নিবারিলে কে রাখিবে আর ॥

(১৪)

আর কত রক্ত পান করিবে গো তুমি
এত রক্তপানে কি গো মেটেনি পিপাসা ?

হায় মা গো রক্তে সিক্ত হোল দেখ ভূমি,
সর্ব্বনাশি! কত রক্ত পানে তোর আশা?

(১৫)

সম্বর জননী ক্রোধ কর পরিহার
আবার শান্তির স্রোত বহাও ধরাতে
মায়ের অপার দয়া কর মা প্রচার
শান্তিময়ী হয়ে মাগো শান্তি ঢাল চিতে॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীচরণাশ্রিতা
দাসী—শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী।

পরমার্থ-ব্যাখ্যানমালা।

(২১৫ পৃষ্ঠার পর।)

"যং হিন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সম দুঃখ সুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে।"

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, এই সকল বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ যাঁহাকে ব্যথিত করিতে না পারে, সেই ধীর ব্যক্তিই অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভের যোগ্য।

অতএব এই উৎকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত মুমুক্ষুগণ তদুপযুক্ত যত্ন করিবেন। তিতিক্ষা যে কেবল পরমার্থ প্রাপ্তির জন্য আবশ্যক, এমন নহে, সংসারেও ইহার অত্যন্ত প্রয়োজন হয়। যিনি ধৈর্য্য সহকারে সকল দুঃখ সহ্য করিতে পারেন এবং দুঃখে যাহার উদ্যম ও শান্তির ব্যত্যয় ঘটে না, তিনি লৌকিক সংসারেও বিশেষ ফল লাভ করিয়া থাকেন। সকলেরই তিতিক্ষা আবশ্যক, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে তিতিক্ষা অভ্যাস করা সহজ নহে। সাধকের অশেষবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া ইহা লাভ করা উচিত; তল্লাভের কতকগুলি যুক্তি নিম্নে লিখিত হইল।

দুঃখ উপস্থিত হইলে তদ্বিষয়ে বিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে মন সমাহিত হইবে ও উহা আর তত তীব্র বলিয়া বোধ হইবে না; সাধক এই জন্য সদা দুঃখের বিচার করিবেন। জগতের ঘটনাবলী আলোচনা করিলে ইহা সহজেই অনুমেয় হইবে যে, দুঃখ সতত ভোগ করিতে হয় না।

"সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখং।
সুখ দুঃখে মনুষ্যাণাং চক্রবৎ পরিবর্ত্তিনঃ॥"

সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ; এইরূপ ক্রমান্বয়ে মনুষ্যের সুখ দুঃখ চক্রবৎ ঘুরিতেছে। উপস্থিত দুঃখ স্থায়ী নহে, পুনশ্চ সুখ আসিবে, এই ভাবিয়া ধৈর্য্যসহকারে দুঃখ ভোগ অভ্যাস করিবে।

খেদ করিয়া ফল কি? খেদ দ্বারা আগত দুঃখের লাঘব হয় না, বরং দেখা যায় উহার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে এবং অবশেষে উহা অসহ্য হইয়া পড়ে। তজ্জন্য সাধক ধর্ম্ম ও নীতি অনুসারে সেই দুঃখের অবসানের জন্য অবশ্য চেষ্টা করিবেন। অবসান হয় ভালই, নতুবা দৈব বলবান ও প্রতিকার অসম্ভব বিবেচনা করিয়া সেই দুঃখ ধৈর্য্য সহকারে সহ্য করাই উচিত। বিজ্ঞ ব্যক্তি কখনও বিলাপ করেন না।

"অপরিহার্য্যার্থে ন ত্বং শোচিতু মর্হসি।"

অপরিহার্য্য বিষয়ে তোমার শোক করা উচিত নহে।

দুঃখ সকলকেই ভোগ করিতে হয়। আমরা যাঁহাকে মহা ভাগ্যবান্, পূজ্য ও সুখী বলিয়া অনুমাণ করি, দুঃখ ও দুর্দ্দৈব হইতে তাঁহাদেরও পরিত্রাণ নাই। দেবগণেরও কখনও কখনও কিরূপ দুর্দ্দশা হয় দেখুন।

"নেতা যস্য বৃহস্পতিঃ প্রহরণং বজ্রং সুরাঃ সৈনিকাঃ।
স্বর্গো দুর্গম্ অনুগ্রহং হরৈরাবতো বারণঃ
ইত্যাশ্চর্য্য বলান্বিতোহপি বলভিদ্ ভগ্নঃ পরৈ সঙ্গরে॥"

বৃহস্পতি যাঁহার গুরু, বজ্র যাঁহার অস্ত্র, সুরগণ যাঁহার সেনা, স্বর্গ যাঁহার দুর্গ, যাঁহার উপর বিষ্ণুর পূর্ণ কৃপা ও যাঁহার হস্তী ঐরাবত, এবম্বিধ বলশালী ইন্দ্রও শত্রুর সহিত সংগ্রামে পরাজিত হইয়াছিলেন। কেবল পরাজিত নহে, রাবণগৃহে ভৃত্যভাবে তাঁহাকে হেয় কর্ম্মও করিতে হইয়াছিল। দেবরাজের ত এই দশা। আবার দেবদেব মহাদেবের অবস্থার কথা শুন :—

"স্বয়ং মহেশঃ শ্বশুরো নগেশঃ।
সখা ধনেশ স্তনয়ো গণেশঃ।
তথাপি ভিক্ষাটনমেব শম্ভোঃ।
বলীয়সী কেবলমীশ্বরেচ্ছা॥"

নিজে মহেশ, শ্বশুর গিরিরাজ হিমালয়, ধনাধিপতি কুবের সখা, মঙ্গল বিধায়ক গণেশ তনয়, তথাপি শম্ভুর ভিক্ষা ভ্রমণ ঘুচিল না ; অতএব ঈশ্বরেচ্ছাই বলবতী।

দেবতাদের যখন এমন দশা, তখন ক্ষুদ্র মানুষের দুঃখের আর কথা কি ?

দুঃখভোগ জগতের সকলকেই করিতে হয়, ইহা বিচার করিয়া সাধকগণ চিত্ত সমাহিত করিবেন ও অসন্তোষ প্রকাশে বিরত থাকিবেন। এবম্বিধ বিচার-পরায়ণ হইলে সাধক ধৈর্য্য সহকারে সকল দুঃখ সহ্য করিতে পারিবেন।

পরমার্থের জন্য যত্ন করিলেও প্রারব্ধ কর্ম্ম খণ্ডিত হয় না, সুতরাং তাহার ফলে সুখ দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে, তবে বিবেক অবলম্বন করিয়া দুঃখ ভোগ করিলে মন শান্ত থাকে ও দুঃখ ভোগে ততটা যাতনা বোধ হয় না। অবিবেকী ব্যক্তি মূর্খের ন্যায় অধীর ভাবে বিলাপ করে, জ্ঞানী ও অজ্ঞানের ইহাই প্রভেদ।

"জ্ঞানিনোঽজ্ঞানিনশ্চ সমেপ্রাবব্ধ কর্ম্মণী।

ন ক্লেশো জ্ঞানিনো ধৈর্য্যামূঢ়ঃ ক্লিশ্যত্যধৈর্য্যতঃ।

জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর উভয় পুরুষের প্রারব্ধ কর্ম্ম সমান থাকিলেও জ্ঞানীর ধৈর্য্য থাকায় ক্লেশ হয় না, আর মূর্খ অধৈর্য্যবশতঃ ক্লেশ ভোগ করে।

তিতিক্ষার অভ্যাস করা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তাহাতেই ইষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে। সাধকগণের ক্রমে ক্রমে সহ্য করিবার ক্ষমতা বর্দ্ধিত করা উচিত।

"ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য বাপ্রিয়ং।"

প্রিয় বস্তু লাভে প্রহৃষ্ট হইবে না, অপ্রিয় লাভেও দুঃখিত হইবে না।

স্বভাবতঃ প্রিয় বস্তুলাভে মনুষ্যের অত্যন্ত আনন্দ হয় ও অপ্রিয় ঘটিলে দুঃখ হয়, কিন্তু সাধকগণ হর্ষ বা দুঃখ কাহারও বশীভূত হইবে না, ইহারা উভয়েই অহিতকারী, সুতরাং সাধকের ত্যজ্য। তাঁহার মন নিরন্তর শান্ত ও নির্ব্বিকার থাকা আবশ্যক। যদি সামান্য সুখ দুঃখ দ্বারা তাঁহার মন বিচলিত হয়, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা ঈশ্বর চিন্তা কিরূপে সম্ভব হইবে? তজ্জন্য অভ্যাসের দ্বারা ক্রমে ক্রমে চঞ্চল মনকে স্থির করিতে হইবে। আরও স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রিয় বস্তুদ্বারা অতিমাত্র হৃষ্ট না হইলে, তবে অপ্রিয় ঘটনায় দুঃখে অবিচলিত থাকিতে পারিবেন, নচেৎ নহে। সুখের সময় সুখ অনুভব করিব কিন্তু দুঃখ কালে দুঃখ অনুভব করিব না, এরূপ আশা করা ভ্রম মাত্র। সুখে দুঃখে উভয় অবস্থাতেই মনকে স্থির রাখা আবশ্যক, তাহা হইলে মনের উপর অধিকার জন্মিবে;

যে ভাগ্যবান সাধক একাগ্রনিষ্ঠার সহিত শম, দম, উপরতি ও তিতিক্ষা এই চারি সাধনার উত্তমরূপে অভ্যাস করিয়াছেন, তিনিই সম্পূর্ণরূপে মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিবেন এবং মন বশীভূত হইলেই তাঁহার বিশেষ উন্নতি লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। চিত্তচাঞ্চল্য দমন করা সামান্য ব্যাপার নহে।

"অপ্যাবিধপানান্ মহতঃ সুমেরুন্মূলনাদপি।
অপিবহ্ন্যশনাৎ সাধো বিষমশ্চিত্তনিগ্রহঃ॥"

হে সাধো, মহাসমুদ্র শোষণ বা সুমেরু-পর্ব্বত উৎপাটন বা অগ্নি ভক্ষণ করা অপেক্ষাও চিত্তনিগ্রহ কঠিন।

সাধক এ সকল বিষয় কৃতকার্য্যতা লাভ করিলে মোক্ষ প্রাপ্তির বিষয়ে আর বিশেষ বাধা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। যিনি সম্পূর্ণরূপে চিত্ত জয় করিয়াছেন, জ্ঞান ও মোক্ষ তাঁহার করতলগত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

"মনসো নিগ্রহায়ত্তমভয়ং সর্বযোগিনাং।
দুঃখক্ষয়ঃ প্রবোধশ্চাপ্যক্ষয়া শান্তি রেবচ॥"

মনের নিগ্রহ দ্বারা যোগীগণের ভয় ও দুঃখ বিদূরিত হইয়া জ্ঞান ও অক্ষয় শান্তি লাভ হয়।

পঞ্চমঃ—শ্রদ্ধা,—পরম বস্তু ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ীভূত নহে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে বা দেখাইতে পারা যায় না, এইহেতু তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মুমুক্ষুগণের সংশয় হইতেই পারে। ঈশ্বর সাক্ষাৎকার ব্যতীত এ সংশয় নিরাকরণের উপায় নাই; কিন্তু সাধক নাস্তিকের ন্যায় অবিশ্বাসী হইলে কখনই ইষ্ট সিদ্ধি হইবে না, পরন্তু শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে নির্ভর করিয়া "ঈশ্বর আছেন ও যথাযোগ্য যত্নদ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায়" ইহাই সত্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহারই নাম শ্রদ্ধা, ইহাই ষট্ সম্পত্তির পঞ্চম সাধন।

"শাস্ত্রস্য গুরুবাক্যস্য সত্যবুদ্ধ্যাবধারণং।
সা শ্রদ্ধা কথিতা সদ্ভির্যয়া বস্তূপ লভ্যতে॥"

শাস্ত্র ও গুরু বাক্যকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাকেই পণ্ডিতগণ শ্রদ্ধা নামে অভিহিত করেন। এই শ্রদ্ধা দ্বারা পরমবস্তু লাভ করা যায়।

পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য বলেই হউক, দৈবানুগ্রহেই হউক, আর ঈশ্বর কৃপাতেই হউক, যিনি এই শ্রদ্ধা অনায়াসে প্রাপ্ত হন, তিনি ভাগ্যবান; তাঁহার ঈশ্বর

সাধন পথে একটী মহা বিঘ্ন বিনষ্ট হইয়াছে এবং ব্রহ্ম প্রাপ্তি তাঁহার পক্ষে সুসাধ্য।

"শ্রদ্ধাবাল্লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেনাধিগচ্ছতি॥"

শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি ব্রহ্ম নিষ্ঠ ও সংযতেন্দ্রিয় হইলে জ্ঞান লাভ করেন এবং জ্ঞান লাভ করিয়া অচিরাৎ পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়েন।

কিন্তু যদি দৈববশে সাধকের শ্রদ্ধার কিঞ্চিৎ অভাব থাকে, তাহা হইলে সেই শ্রদ্ধার বৃদ্ধি সাধন কিরূপে করা যাইতে পারে, তাহাই দেখা যাউক।

প্রথমে মুমুক্ষুগণ এইরূপ বিচার করিবেন :—বশিষ্ঠ, ব্যাস, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহা মনস্বীগণ কেন সত্য ত্যাগ করিয়া মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন? তাঁহারা কাহারও মুখাপেক্ষা করিবেন না এবং কাহাকেও মিথ্যা দ্বারা সন্তুষ্ট করিবারও তাঁহাদের প্রয়োজন নাই। তাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, কোনও বস্তুরই অভাব ছিল না, কেবল জগতের মঙ্গল সাধনই তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল; এবং তজ্জন্য করুণাদ্রচিত্তে তাঁহারা উত্তম উপদেশই প্রদান করিয়াছিলেন। প্রাণান্ত হইলেও তাঁহাদের মিথ্যাচরণের বাসনা মনোমধ্যে উদিত হওয়া অসম্ভব; সুতরাং তাঁহাদের কথিত উপদেশ সত্য ও জীবের কল্যাণকর, ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে। আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানে বিভূষিত বিদ্বান ব্যক্তি অবশ্য বিশ্বাস করিবেন না। তিনি বলিবেন, "হইতে পারে মহাপুরুষগণ ইচ্ছা পূর্ব্বক মিথ্যা বলেন নাই, কিন্তু তাঁহাদের সিদ্ধান্তে যে ভ্রম হয় নাই, এ কথা কে বলিতে পারে? এবম্বিধ সংশয় স্বাভাবিক, সেই জন্য সাধক শাস্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ তর্ক ও অনুভব দ্বারা সত্য কি মিথ্যা তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন। আধুনিক পদার্থ বিদ্যায় সিদ্ধান্তের ন্যায় পরমার্থ বিষয়ক সিদ্ধান্ত প্রমাণ করিয়া দেখান যায় না। তাহার কারণ এই যে, মুমুক্ষুগণের ব্যাপার অপার্থিব, আর আধুনিক বিজ্ঞান জড় সম্বন্ধীয়। সুতরাং এক বিষয়ের সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রণালী অপর বিষয়ের সিদ্ধান্তের প্রণালীর ন্যায় নহে। আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক সিদ্ধান্ত উপযুক্ত মন্ত্রাভাবে সকল সময়ে প্রমাণ করা যায় না, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাতে কেহ অবিশ্বাস করেন না। তবে আপ্তবাক্য প্রমাণ করিবার অন্য ভিন্ন উপায় আবশ্যক বলিয়া উহাতে বিশ্বাস না করিবারই বা কারণ

কি? যেমন অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসের মিশ্রণে জল হয়, ইহা সকলেই বিশ্বাস করেন, কিন্তু এই প্রকারে জল প্রস্তুত হইতে সকলেই কিছু দেখে নাই; সেইরূপ সিদ্ধ পুরুষগণ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার বিষয় যে প্রণালীর কথা বলিয়াছেন, তাহাতে মুমুক্ষুগণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করা আবশ্যক।

"ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা যো জীবো ব্রহ্ম এব সঃ।"

ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এবং যে জীব সেই ব্রহ্ম। মুমুক্ষুগণের এই সিদ্ধান্তে শ্রদ্ধা থাকা আবশ্যক। ফলে কিন্তু ইহার বিপরীত ধারণাই হইয়া থাকে, অর্থাৎ জগৎ সত্য ও ব্রহ্ম মিথ্যা ইহাই প্রতীয়মান হয়। বহু জন্মব্যাপী মায়াজনিত এই ভ্রান্তবিশ্বাস আমাদের মজ্জাগত হইয়াছে।

"বহুজন্মদৃঢ়াভ্যাসাদ্দেহাদিষ্বাত্মধীঃ ক্ষণাৎ।
পুনঃ পুনরুদিত্যেবং জগৎ সত্যত্বধীরপি॥"

বহু বৎসরের দৃঢ় অভ্যাস দ্বারা এই দেহই আত্মা এইরূপ বুদ্ধি হয়, সেই-প্রকার এই জগতই সত্য এই ধারণা পুনঃ পুনঃ উদিত হয়।

ইহাই বিপরীত বুদ্ধি, ইহার নাশ হইলেই শ্রদ্ধা বলবান হইবে। কি প্রকারে এই ভ্রম বুদ্ধির বিনাশ হয়, বিদ্যারণ্য স্বামী তাহার দুইটী উপায় বলিয়াছেন,

"বিপরীতা ভাবনেয়মৈকাগ্রৎসা নিবর্ত্ততে।
তত্ত্বোপদেশাৎ প্রাগেব ভবত্যেতদুপাসনাৎ॥"

এই বিপরীত ভাবনা একাগ্রতার দ্বারা নিবৃত্ত হয়, এই একাগ্রতা তত্ত্বোপ-দেশের পূর্ব্বেই উপাসনা দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা মনের একাগ্রতা উৎপন্ন হয়, তাহার পর মুমুক্ষুর এই বিপরীত ভাবনা বিনষ্ট হইয়া তত্ত্ব সিদ্ধান্তের উপর পূর্ণ শ্রদ্ধা জন্মিবে।

দ্বিতীয় উপায় এই যে, এই বিপরীত ভাবনার নিবৃত্তির জন্য বারম্বার তত্ত্ব-চিন্তা করিতে হয় এবং ক্রমে ইহা নষ্ট হইয়া তত্ত্ব সিদ্ধান্তে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়।

তত্ত্বভাবনয়া নশ্যেৎ সাতো দেহাতিরিক্ততাম।
আত্মনোভাবযেৎ তদ্বন্মিথ্যাত্বং জগতোহনিং॥"

উহা তত্ত্ব ভাবনাদ্বারা বিনষ্ট হয়, অতএব দেহ হইতে আত্মার শ্রেষ্ঠতা ও জগতের মিথ্যাত্ব বিষয়ে বারম্বার চিন্তা করিবে।

ব্রহ্ম প্রাপ্তির জন্য যেরূপ শ্রদ্ধার আবশ্যক তাহা দুর্লভ জানিবে, উহা উপযুক্ত

সাধক ব্যতীত অন্যে প্রাপ্ত হয় না। এই শ্রদ্ধা "বিদ্বানের দুষ্প্রাপ্য কিন্তু সরল-ভাবুক ব্যক্তির মধ্যে ইহা দেখা যায়।" যদি কেহ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বর অতি পূজ্য, অতি শুদ্ধ, দয়ালু ও সর্ব্বশক্তিমান, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে সদ্গতি হয় ও অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে সমস্ত লৌকিক কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া একাগ্রচিত্তে তিনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা কি না করিয়া থাকিতে পারেন? পরমহংসদেবের পার্শ্বের ঘরে ধন ও চোরের গল্প সকলেই জানেন। চোরের ধন প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষার ন্যায় মুমুক্ষুর ঈশ্বর লাভের ইচ্ছা আবশ্যক। কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যেও এরূপ লোক একজনও দেখিতে পাওয়া যায় না, যিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব বাস্তবিক বিশ্বাস করেন। কারণ, ঈশ্বর আছেন বলিয়া যাঁহার বিশ্বাস আছে, তিনি কি তাঁহাকে লাভ না করা পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারেন? সগুণ ব্রহ্মের বিশ্বাসী যদি এতই বিরল, তাহা হইলে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা না জানি আরও কতই বিরল।

ষষ্ঠ:—সমাধান,—এক্ষণে ষট্ সম্পত্তির শেষ সাধন সমাধান সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাউক। মনে কোনরূপ চিন্তা বা দুঃখ না থাকিয়া কেবল সুখময় হইয়া থাকিতে পারিলেই ব্যবহারিক অর্থে উহাকে সমাধান বলিয়া থাকে; কিন্তু প্রকৃত সমাধান ইহা নহে।

"নিয়তং স্থাপনং বুদ্ধেঃ শুদ্ধে ব্রহ্মণি সর্ব্বদা।
তৎসমাধানমিত্যুক্তং নতু চিত্তস্য লালনং॥"

শুদ্ধ ব্রহ্মে সর্ব্বদা একনিষ্ঠার সহিত বুদ্ধিকে সংযোজিত করাকেই সমাধান বলে, চিত্তের লালন বা সুখ সম্পাদন সমাধান নহে।

অদ্বৈত সিদ্ধান্ত প্রমাণে এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময়।

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।"

এই সমস্ত দৃশ্য (জগৎ) ব্রহ্ম, ইহাতে বহু কিছুই নাই। কিন্তু জগতই দৃষ্ট হয়, ব্রহ্ম কখনও দৃষ্ট হন না। পৃথিবীতে এমন ধর্ম্মও আছে, যাহাতে ব্রহ্মের অস্তিত্বই স্বীকার করে না।

তদ্ভিন্ন জগতে বহু ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ দৃষ্ট হয়, তজ্জন্য সহজেই বোধ হয় যে, ইহাতে ব্রহ্ম ব্যতীত আরও অনেক বস্তুর সংযোগ বা মিশ্রণ আছে। এই মিশ্রণ ও বিভিন্নতা মায়ার কার্য্য। মায়া ব্রহ্মের সহিত মিশ্রিত হইয়া জগৎরূপ ধারণ

করিয়াছে, তজ্জন্য জগতের সকল পদার্থে ব্রহ্ম ও মায়া, এই উভয় স্বরূপের মিশ্রণ রহিয়াছে। ব্রহ্ম ও মায়ার রূপ পৃথক করা আবশ্যক।

সত্তাচিতিঃ সুখং চেতি স্বভাবা ব্রহ্মণত্রয়ঃ

সত্তা, চিৎ ও সুখ এই তিন ব্রহ্মের স্বভাব; ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময়। আর মায়ার স্বরূপ কি? ঠিক তাহার বিপরীত।

অসত্তা জাড্য দুঃখে দ্বে মায়ারূপং ত্রয়ংত্বিদং ॥
অসত্তা নরশৃঙ্গাদৌ জাড্যং কাষ্ঠশিলাদিষু।
ঘোর মূঢ়ধিয়োর্দুঃখমেবং মায়া বিজৃম্ভিতা ॥

অসত্তা, জড়তা ও দুঃখ এই তিন প্রকার মায়ার রূপ; অসত্তার দৃষ্টান্ত নরশৃঙ্গ প্রভৃতি অসম্ভবনীয় বস্তু; জাড্য কাষ্ঠাদি জড় বস্তুতে দ্রষ্টব্য; এবং দুঃখ ঘোর ও মূঢ় (রজঃ ও তমোগুণ সম্পন্ন) ব্যক্তির বুদ্ধিতে অনুভূত হয়।

এই বিপরীত গুণসম্পন্ন ব্রহ্ম ও মায়ার সংযোগে জগতের উৎপত্তি। ইহার মধ্যে ব্রহ্মকে চিনিয়া লইয়া সাধক তাহারই অনুসন্ধান করিবেন। মায়ার চিন্তায় কিছুই লাভ হয় না। তজ্জন্য মায়ার দিকে লক্ষ্য না করিয়া জগতের সমস্ত বস্তুতে যে ব্রহ্ম বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাঁহারই চিন্তা আবশ্যক। সংসারে থাকিয়াও ব্রহ্মচিন্তা কিরূপে করা যায়, পঞ্চদশীর বিষয়ানন্দে তাহা উক্ত আছে :—

শিলাদৌ নামরূপে দ্বেত্যক্তা সন্মাত্র চিন্তনং।
ত্যক্তা দুঃখং ঘোর মূঢ়ঃ ধিয়োঃ সচ্চিদ্বিচিন্তনং ॥
শান্তাসু সচ্চিদানন্দাং স্ত্রীনপ্যেবং বিচিন্তয়েৎ।
কনিষ্ঠ মধ্যমোৎকৃষ্টা স্ত্রিস্রশ্চিন্ত ক্রমাদিয়াঃ ॥

শিলাদি জড় পদার্থের নাম রূপাত্মক মায়ার অংশ ত্যাগ করিয়া কেবল সত্ত মাত্র চিন্তা করিবে; বুদ্ধিবৃত্তির ঘোর ও মূঢ় (রজস্তমঃ) এই দুই দুঃখের ভাগ ত্যাগ করিয়া সত্তা ও চৈতন্য চিন্তা করিবে, এইরূপে ক্রমে ক্রমে কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উৎকৃষ্ট ত্রিবিধ চিন্তা আছে।

যাঁহার এইরূপ অভ্যাস করিবার ইচ্ছা, তিনি জগতের সমস্ত পদার্থেই ব্রহ্মের স্বরূপ অনুসন্ধান করিবেন; অভ্যাস দৃঢ় হইলে শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ নিশ্চয় জানিয়া তাঁহার অনুসন্ধানেই রত থাকিবেন; এবং অবশেষে সমাধান সাধনে সিদ্ধিলাভ হইবে। ষট্ সম্পত্তিযুক্ত হওয়ার পর যাবৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার না হয়, সাধক তাবৎ-

কাল অভ্যাসরত থাকিবেন, ঔদাস্য করিলে চলিবে না। একবার ঈশ্বর সাক্ষাৎকার ঘটিলে আর কিছুরই আবশ্যক হয় না। তখন :—

ভিদ্যন্তে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মানি তস্মিনদৃষ্টে পরাবরে॥

সেই পরম শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইলে হৃদয়গ্রন্থি সকল কাটিয়া যায়, সংশয় সকল ছিন্ন হয় এবং কর্ম্ম সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের পর সাধকের আর কোন অভ্যাসের প্রয়োজন নাই, তিনি সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন এবং তাঁহার অবিশ্রান্ত যত্নের ফল সম্পূর্ণরূপেই পাইয়া থাকেন। তখন তাঁহাকে আর কোনও বিষয়েই চেষ্টা করিতে হয় না এবং তিনি শুধুই যে, মরণান্তে মুক্তির অধিকারী হন, তাহা নহে। ইহজীবনেই মুক্তির উত্তম সুখ অনুভব করিতে থাকেন। তাঁহার অপ্রাপ্য কিছুই রহিল না, সুতরাং তাঁহার নিজের কর্ত্তব্যও কিছুই থাকেনা। ইহার এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আছে। লৌহ-পাত্র প্রত্যহ ঘর্ষণ করিলেই উজ্জ্বল থাকে, সামান্য অবহেলা করিলেই মলিন হয়; কিন্তু যখন ইহা স্পর্শমণি সংযোগে স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন আর তাহাকে প্রত্যহ মাজিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিতে হয় না, ইহা স্বভাবতঃই উজ্জ্বল থাকিয়া যায়। মুক্তপুরুষের অবস্থা স্বর্ণের ন্যায়, স্বভাবতঃই নির্ম্মল ও স্বচ্ছ। কিন্তু সাধকের তাহা নহে। সাধক অবস্থায় নিয়ত অভ্যাস আবশ্যক। অভ্যাসের দ্বারাই মুমুক্ষুগণ উন্নতি লাভ করেন। প্রথমতঃ তাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধ ও বিষয় বিরত রাখিয়া জাগ্রতাবস্থায় সমস্ত বাক্য আচরণ ও বিচারে পবিত্রতা রক্ষা করা আবশ্যক; বিষয় বাসনা যেন তাহাদিগকে বশীভূত না করে, এবং মনেও যেন তাহা স্থান না পায়। সাধকের এইরূপ অবস্থা হইলেই অনেক উন্নতি হইল।

কিন্তু ইহারও উপর একটু আবশ্যক। মনও ইন্দ্রিয় বশীভূত থাকায় সাধক জাগ্রতাবস্থায় যেমন শুদ্ধ থাকিবেন, স্বপ্নাবস্থায়ও তদ্রূপ থাকা আবশ্যক। এ অবস্থায় শুদ্ধাশুদ্ধের বিচার করিবার শক্তি থাকে না; সুতরাং যাঁহার স্বভাব শুদ্ধ হইয়াছে, কেবল তাঁহারই স্বপ্নেও অপবিত্রভাব কিম্বা গর্হিত আচরণ মনে স্থান পাইবে না। এইরূপ সাধনায় যত্নবান হইলে সাধক আশু কল্যাণ লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিপদ মিত্র।

উত্তরাখণ্ডে ভ্রমণ ও স্থিতি।

(১৮)

প্রাতে নামের জয় ধ্বনী দিয়া মধুর মধুর প্রাণে সব উঠিলাম। সাজসজ্জা সেরে সব যষ্টিবন্ধুকে আদরে লইয়া উঠিয়া পড়িলাম। পথে আসিতে আসিতে বৈতরণী ইত্যাদি সমস্ত নদীতে স্নানকার্য্য তীর্থকার্য্য সারা হইল। কতকগুলি চটি বাদে, লাল গঙ্গায় আসিয়া পড়ি। লাল গঙ্গা বেশ সহরমত। হাঁসপাতাল, ডাকবাংলা সব আছে। অত্যন্ত গরম ঠেকিল, জল কষ্টও কিছু ঠেকিল। সেদিন দেহটা একটু খারাপ হয়। পাণ্ডাজী বুঝতে পেরেই সকল যাত্রীদের সেদিন আর হাঁটালেন না। রাত্রে সেই চটিতে থাকার ব্যবস্থা হইল। বৈকালে সন্তান শঙ্কর পাণ্ডাজীর লোক হাঁড়ী লইয়া, থালা লইয়া নদীতে পড়িয়া যায়। সমস্ত-গুলি হারিয়ে গেল, শঙ্করেরও প্রাণ হারিয়ে যাচ্ছিল, খুব সাম্‌লে গেল দেখে সকলেই ভীত ও হর্ষান্বিত হোয়ে খুব সিন্নি দেওয়া হোলো ঠাকুরের নামে। সে রাত্রি সেই চটিতে থাকা গেল। পরদিন প্রাতঃকালে কতকগুলি চটিঅন্তে জ্যোশিমঠ বা জ্যোতিমঠে আসিলাম। যাত্রী সমাগমে স্থানের বড় কষ্ট হইল। অনেকক্ষণ পরে একখানি উপরের ঘর মিলিল। সেদিন একাদশী ছিল, রন্ধনের আবশ্যক হইল না, সব সময় সেই চটিতে থেকে বেড়ান গেল। জ্যোশিমঠ বেশ সহরমত। সরকারি হাঁসপাতাল, ডাকবাংলা সবই আছে। এখানে শ্রীশ্রী৺ বদরীনাথের গদি আছে ও বৎসরে ৬ মাস যখন ঠাকুর বরফে ঢাকা থাকেন, সেই সময় এইখানে তাঁর উদ্দেশ্যে পূজা ভোগরাগ হয়। কিছু অতিথি অভ্যাগতে প্রসাদ দেওয়া হয়। বেশ স্থান, বড় বড় গোলাপ ফুল দেখে বড় আনন্দ হোলো। জ্যোশিমঠে আমরা আর একদিন বিশ্রাম করিলাম, কেননা যাত্রী অনেক দেখিয়া পাণ্ডাজী বলিলেন, কতক আগে আগে যাক। পরদিন অনেক যাত্রী চলে গেল। আমরা রহিলাম।

পরের দিন প্রাতে দলবলে ঠাকুরের নাম জয়পূর্ব্বক নামিতে লাগিলাম। সেদিন বড় কষ্টই সব হোলো। সাধন অন্তে সিদ্ধি, ঠাকুর বক্ষ কোরে কোরে নিয়ে যাচ্ছেন। পথে প্রাণ যায় যায় হইল। স্থানে স্থানে বসিয়া বসিয়া চলি-লাম। কে যে কোথা ছড়াইয়া পড়িল, কেহই কাহার ঠিক পেলে না। মাঝে

মাঝে সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। কি হোলো মরিতে এক স্থানে উর্দ্ধদিকে চাহিতে গেলাম, হঠাৎ হাতের লাঠি অতলতলে মন্দাকিনীতে পড়িয়া গেল, ব্রহ্মচারিণী আমায় ধরিয়া ফেলিল। দুজনেই ভয়ে একখানা পাথরে বসিয়া পড়িলাম। এদিকে ভেড়ার দল আসিল, তাহাদের পিঠে বাঁধা সব মাল যাচ্ছে। দেখে কত হাসি পায়। বালিসের মত বাঁধা, তাতে চাল, দাল, আটা, নুন, ও আর আর মসলা সব। ভেড়ারা এসে দু'জনকে বড় ব্যস্ত করিল। আবার ভয়ে ভয়ে উঠিয়া এক উচ্চ পাথরে বসিলাম। লাঠি নাই কি হবে। ব্রহ্মচারিণী বড়ই ভাব্‌লে, প্রাণটায় দুঃখ আস্‌ছে দেখে প্রাণ খুলে পাখীর মত ঠাকুরকে ডাকিতে লাগিলাম।

পাণ্ডাজী এসে পোড়্‌লেন, ব্রহ্মচারিণী ব্যস্ত হইয়া সংবাদ দিল সুশীলা মা আজ মরিবার মত হয়েছিল, লাঠি ভাঙ্গিয়া গেছে। অত্যন্ত ভীত হইয়া পাণ্ডাজী আস্তে আস্তে অতি মিষ্ট কণ্ঠে আমাকে বলিতে লাগিলেন, "মাগো একি শুনি, আস্তে আস্তে চ মা, আমার কাছে কাছে যাবে, আজ শঙ্কর শালাকে আমি মারবে। "আমি বলিলাম, তাকে মেরে আর কি হবে বাবা, ভগবৎ ইচ্ছায় আমার লাঠি ভাসিয়া গেল, আমি তাঁর ইচ্ছায় আছি, এখন কি হবে?" পাণ্ডাজীর লাঠি আমাকে দিলেন, আমি দেখিলাম, তিনি সুদক্ষ, বেশ যাইতে পারিবেন। আমার লাঠি চাইই। কাজেই উহা লইয়া পুনরায় উঠিলাম।

বেলা ১৷৷৹ টার সময় পাণ্ডুকেশর চটিতে আসিয়া পড়ি। সে চটিতে ২ দিন খুব বৃষ্টি হইল। আমরাও বসিয়া রহিলাম। দু'দিন পরে সকলে হনুমান চটিতে অগ্রসর হইলাম। সেখানে বরফ মিলিল, একস্থানে এসে সকলে বসিয়া পড়িলাম। সর্ব্বনাশ, মাথার উপর তুলার মত বরফবৃষ্টি আরম্ভ হইল, সম্মুখের পুল একেবারে ভেঙ্গে পেড়ে গেছে, পাহাড় ভেঙ্গে পোড়ে রাস্তা বন্ধ। পাণ্ডাজী কাঁদিল। সকলকেই কাঁদিতে হইল, হা অদৃষ্ট ভেবে।

এমন বরফ ১৯ বৎসর পড়ে নাই। পায়ে বরফ মাথায় বরফবৃষ্টি মাঝে মাঝে হোচ্ছে, দেহ জড়প্রায়। আর ৪ মাইল গেলেই ৺বদ্রীপুরী। পাণ্ডাজী জলবিন্দু খাইলেন না। মুখে খুব সাহস, "সকল ঠিক হবে, মা ধ্যান করগে সব।" "যাতৃগণ বলেন, বাবা পুল হোক যাব তারপর, জ্যোশিমঠে ফিরে চল।" কথাটা বজ্রের মত লাগিল।

ভাবিলাম যুগবাতী যুগবাতী দেখিব বোলে যে ইচ্ছা, এ ইচ্ছা কি ঠাকুরের

দেওয়া নয়? পাণ্ডাজীকে বলিলাম, রাউল সাহেব ও সরকারী লোকজন সব কি রকম কোরে যাবে? পাণ্ডাজী বলিলেন, "মুস্কিল আছে মা।" "তবে কি হবে বাবা?" "মা খুব ধ্যান করগে, সাহস কর সব, ঠিক হবে।" পুলে তক্তা পড়িল ২ খানা। দু'ধারে লোক ধরিল, সেই ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে নদী তলদেশে চলিয়াছে, সেই ভীষণ পথে অতি সন্তর্পণে ঠাকুরের নাম বলেই সকলে পার হইয়া ভাবিলাম, আশ্চর্য্য নাম। নামে ভরসা এল। না হোলে এ দৃশ্য হিন্দুগৃহ-বদ্ধা স্ত্রীলোকগণের দেখেই প্রাণ উড়ে যায়। এই পথে সব এসে পড়িলাম। তারপর আরো ভীষণ। পথ কই, পাহাড় ভেঙ্গে পোড়েছে? নীচে গঙ্গার উপর বরফ। ঝাম্পানওলারা বুড় বুড় মাদের কাঁধে বাঁধিয়া বরফ দিয়া চলিল। মরে মরিবে থাকে থাকিবে এই মন্ত্র মনে। আমাদের সেই ভীষণ ভাঙ্গা পর্ব্বতগাত্র ধরিয়া ধরিয়া পাণ্ডাজী লইয়া চলিলেন। আশ্চর্য্য নাম। সকলে মৃত্যু পথ অতিক্রম করিয়া একটু ভাল পথে এসে বসিয়া পড়িলাম ও সকলেই কাঁদিলাম।

এমন সময় দেখি বরফ দিয়া রাউল সাহেব আস্‌ছেন। আমাদের দেখে হাত তুলে বলিলেন, "মা আগিয়ে মা বদ্‌রীবিশাল।"

কি অপূর্ব্ব অবস্থা, ভাষাতীত! ঠিক ভবসাগর পারে যেন আনন্দ মন্দিরে সব যাচ্ছি। দূর থেকে তুষার আবৃত স্বর্ণচূড়া চিক্ চিক্ কোচ্ছে। দেখেই প্রাণ কি হোয়ে গেল। কাঞ্চনগঙ্গাপুল সমস্তই বরফে ঢাকা। বাড়ী কতক বরফে ঢাকা। আমরা এসে পড়িলাম। পাণ্ডাজী তৎক্ষণাৎ একটী বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে অগ্নি জ্বালাইলেন। দাউ দাউ শব্দে কাঠ জ্বলিল। সকলে বসিলাম, আর আগুন ছেড়ে নড়্‌বার যো নাই।

সন্ধ্যার সময় একজন মা বাইরে গিয়েছিলেন, এসে একেবারেই মৃতপ্রায়। নীল-বর্ণ শক্ত হোয়ে জিব বেরিয়ে এল। আগুনে সেঁকে সেঁকে বহুক্ষণ পরে জ্ঞান হইল। কি ভীষণ সব কম্বল। অমন শীতও দেখিনি, অমন কম্বলও দেখিনি। পশুর লোমের সে সব, নাড়া যায় না। রাত্রে সব শয়ন করিলাম। সেদিন শ্রীশ্রী৺বদ্‌রীনাথের দরজা বন্ধ। পরদিন ৩০শে বৈশাখ, অক্ষয় তৃতীয়ায় দরজা খোলা হইবে।

রাত্রে সারি সারি সব স্ত্রীলোকদের শয়ন করাইয়া গাত্রে বিশমণ ওজনের সব ঢাকা দিয়ে গেলেন, সেগুলি নাড়া দায়। সেগুলিও সব বরফ মত ঠাণ্ডা, প্রাণ যায়। বলিলাম সব অহল্যার মত পাষাণ হোয়ে রাত্রে মৃতপ্রায় থাক.

কাল প্রাতে পাণ্ডাজী পদধূলী দিয়ে এই সব পাষাণ সরুয়ে জীবিত কোরে দেখ্‌বার জিনিস দেখাবেন। মনে মনে ভাব্‌ছি না জানি কি জিনিস, বাবা কি কাণ্ড কোরে সব আস্‌ছি। মনে উৎসুক খুব, সমস্ত রাত্রি ঠাণ্ডায় সব জেগে রইলাম।

(১৯)

"জয় বদ্‌রীবিশাল রাজাকি জয়" ৩০শে বৈশাখের প্রভাতই জীবনের নূতন প্রভাত একটী। বেলা ৮'টার সময় সব উঠিলাম। দেবকরুণায় বরফবৃষ্টি থেমে রৌদ্র উঠ্‌ল। সকলে আনন্দে পরিপূর্ণ, কাহার উপর কাহার দ্বেষ নাই, আশ্চর্য্য স্বভাব সব। দেখে মনে হোলো কি একটা মধুর নেশাচ্ছন্ন। উঠে তপ্তকুণ্ডে চলিলাম। গরম ফুটন্ত জলের ঝর্‌ণা। ঠিক কলের মত মুখ দেওয়া একটা কুণ্ড বড় রকমের পাথরের গাঁথন্, মাথার উপর ছাত ঐ পাথরের। গলা পর্য্যন্ত জল হয় আবার বেরিয়ে যায়। সেই হিমরাজ্যে কি করুণার উষ্ণ ধারা! মরি মরি বিশ্বরাজের কি ব্যবস্থা! ভাবিলে আনন্দ-অশ্রু সম্বরণ করা অসম্ভব।

বদ্‌রীকাশ্রমটি তখনও সব বন্ধ। দোকান বসে নাই। সেই দিন ৯৷৷০।১০ টায় দেশটায় মানুষ এল। দরজা খোলা হবে। সরকারী লোক সব এল, যেদিন আমরা এসেছি। যাত্রীরা সব পরে পরে আস্‌বে। কতকগুলি সাধু এসেছেন ও কতকক বাঙ্গালীও এসেছেন। ৫০০ শত যাত্রী আন্দাজ হবে। তপ্তকুণ্ডে স্নান অন্তে দিব্য করিয়া বস্ত্রাদি আচ্ছাদিত হইয়া চলিলাম। মন্দির-গাত্রে আসিয়া পাণ্ডাজী সব সার করিয়া বসালেন। এক মধুর ভাবপূর্ণ সময়। দক্ষিণে বামে নর ও নারায়ণ উভয় পর্ব্বত গগন স্পর্শে দাঁড়াইয়া আছে, ঘূর্ণিবায়ু। আর এক মধুর আনন্দ গুঞ্জন শুনিলাম। চারিদিকে হরিধ্বনি পড়িয়া গেল। সব স্তোত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল। ধার্য্য সময় সরকারী লোক থেকে ৬ মাস পরে ঐ লোহকপাট খুলিল। যাত্রীরা সবাই একটু চঞ্চল, ক্রমশঃ হুড়াহুড়ী আরম্ভ করিল। তারপর ক্রমশঃ ক্রমশঃ সব দর্শন হোতে লাগ্‌ল। মন্দিরে ৩টী দরজা। এক দরজা দিয়া প্রবেশ করাইয়া অন্য দরজা দিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হইতে লাগিল। পাণ্ডাজী আমাদের জন্য আধ ঘণ্টা মন্দির পাশ করিয়া রইলেন। আমরা বড় মনানন্দে আসিয়া দাঁড়াইলাম। যুগবাতী জ্বলিতেছে ৬ মাসের প্রদীপ, আশ্চর্য্য কই? দেখ্‌বার আত্মহারা বস্তু কই? কাল প্রস্তর

শিলা, মাণিকের চোক, সম্মুখে বৃহৎ রৌপ্য পদ্ম। ধাতুমূর্ত্তি লক্ষ্মী ও অন্য অন্য ৭টী মূর্ত্তি। মধ্যে যোগধ্যানী বদ্রীনাথ, বামে সেবাপরায়ণা লক্ষ্মীদেবী চামর হস্তে দণ্ডায়মানা। তাঁর পাশে নর ও নারায়ণ দুটী ধাতুমূর্ত্তি। দক্ষিণে গণেশদেব বসিয়া ও কুবের দণ্ডায়মান।

পদনিম্নে গরুড় ও দুটী মূর্ত্তি। নারদও হাতজোড় করিয়া রহিয়াছেন। সম্মুখে প্রস্তরের পাদুকা দর্শনে আমার মনে হইল, এইত আমার ঠাকুর পারিষদ পরিবেষ্টিত, এত শ্রীশ্রীমা সেবাপরায়ণা। রাশেশ্বরী প্রেমিকা রাধা নন ত। এযে সেবা পরায়ণা, ঠাকুর যোগধ্যানী। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই দেখিলাম না। সেই যোগাসন। কেবল দুটী হাত বেশী। আর মাথার উপর ছত্রটি বেশী। দুটী হাত ঐ ঠাকুরের মত। আর দুটী হাত তোলা, একটীতে শঙ্খ, অপরটিতে পদ্ম। ভাবলুম এই হাত দুটী আর এ ছত্রটি শেষের দিনে দেখাবেন। ভাব খুব মধুর পাওয়া গেল, মূর্ত্তিতে মন তত মজ্‌লো না।

কামনা কোর্ত্তে ভুল হোয়ে গেল। ফিরে আস্‌বার সময় পাণ্ডাজী হাতে তপ্তকুণ্ডুর জল দিয়া বলিলেন, "মাগো এক মন হ মা, যা চাবে তা সিদ্ধি হবে গো, চল্‌ মা।" আমি আসিয়া বলিলাম, "ঠাকুর! আমার যেন কৃষ্ণভক্তি হয়।" কে যেন সব ভুলিয়ে দিলে, কিছুই চাওয়া আর হোল না। যদি হিন্দু বালবিধবাদের জন্য একটী তপবনমত আশ্রম ভিক্ষা করিতাম, ভাল হইত। তখন আর কিছুই বল্‌তে ইচ্ছেই হোল না। কৃষ্ণলাভ হউকও বল্‌লুম না, বোকা হোয়ে গেলুম। কেঁদে কেঁদে মরবার জন্য ভক্তি চাওয়ালেন। আর বদ্রীনাথের দুটো চোক দেখেই আমার মনে হোতে লাগ্‌লো, যেন তিনিই প্রাণটা দেখ্‌ছেন। ভেতর ভেতর সব বোলে দিচ্ছেন।

ভাব্‌লুম—

"আপ্‌নাতে মন আপ্‌নি থাক
যেওনাক কার ঘরে
যা চাবি তাই বসে পাবি
খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।'

বন উপবন পাহাড় নদী মধুর হিমালয়ের বাতাস সকলি উপভোগ্য। ঠাকুরের কিছুই বিশেষত্ব নাই। জপ, শুধু ঐ স্থানে আপনাকে জাগ্‌রে নাও এই

কথা। মন্দিরদ্বারে জয় ও বিজয় দ্বারী দাঁড়াইয়া আছে। প্রস্তর নির্ম্মিত। পাণ্ডাজী একটী মধুর স্তোত্র গাহিলেন।

পবন মন্দ সুগন্ধ শীতল
হিমমন্দির শোভিতম্।
শ্রীনিকট গঙ্গা বহত নির্ম্মল
শেষ সমীরণ বহত নিশিদিন।
ধরত ধ্যান মহেশ্বরম্
শ্রীবদরীনাথ বিশ্বম্ভরম্।
শ্রীলছমী কমলা চামর ঢুলায়
শ্রীবদরীনাথ বিশ্বম্ভরম্।
ইন্দ্রচন্দ্র কুবের ধুনীকর
ধূপদীপ প্রকাশিতম্।
শ্রীবদরীনাথ বিশ্বম্ভরম্। ইত্যাদি

(২০)

বিদধতু মতিমন্তো বাঞ্ছিতাবাপ্তি হেতো
রত ইহ বদরীশক্ষেত্রে মুখ্যেহংস বাসং
ভজনমপি পিনাক্যম্ভোজনাভৈকবুদ্ধ্যা
নিগদিতনিজবর্গ্যে নাস্তিকা বৈষ্ণবাগ্রাঃ।

অর্থ:—

শ্রীবদরীক্ষেত্রে বাসনার সিদ্ধি হেতু বলিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ শ্রীবদরীক্ষেত্রে বাস করুন, কেদারনাভ ও পদ্মনাভ নারায়ণ উভয়কে অভিন্ন বোধে ভজন করুন। এই সমস্ত উপদেশ বাক্যে যাঁহাদের শ্রদ্ধা আছে, তাহারাই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ।

এইত বেদের কথা। ৩ দিন থাকিয়া পরমানন্দ উপভোগ করা গেল। পরের দিন অনেক যাত্রী এল, দোকান বসিল, বৃষ্টি আর হোল না। বরফ রাস্তায় জমাট বাঁধিয়া রহিল। বদরীনাথটি একটী পল্লি। সমস্ত রকম জিনিস পাওয়া যায়। খাবার জিনিসের মধ্যে আলু ও কুমড়া মেলে। দাল ভাল সিদ্ধ হয় না। দালের কথা বলিলেই, আনন্দময় সন্তান পাণ্ডাজী হাসিতে হাসিতে বলিতেন, "কোন তোর দাল মন তোর পানী, ভজ বদরীনাথ যোগধ্যানী।"

যে ৩ দিন রহিলাম, সন্ধ্যার সময় ঠাকুরের প্রসাদ পাওয়া যেত। দোকানে পুরী হালুয়া ইত্যাদি খাবারও মিলিত।

বসুধারার পথ একেবারেই বন্ধ। বদরীকাশ্রম স্বর্গতুল্য পবিত্র স্থান ও শান্তিপূর্ণ সাধু স্থান।

৩ দিন থেকে পাণ্ডাজীর কাছে বিদায় লইয়া সকলে কাঁদিলাম। বলিলাম ব্রহ্মচারিণী, আমি আর যাব না, এই শান্তিপূর্ণ রাজ্যেই বোসি। ব্রহ্মচারিণী ব্যস্ত হোয়ে উঠ্‌লো, বোল্লে মাথা ঠিক কর, বালক পুত্রকে স্মরণ কর, কার্য্য আছে চল উঠ। প্রাণের মধ্যে যেন তার বাক্যগুলি জ্বলন্ত কঠোর সত্য সুতীক্ষ্ণ ছুরীর মত লাগ্‌ল। ভাবিলাম প্রারব্ধ ভোগ। অজ্ঞানে অযাচিত দণ্ড স্বরূপ এক পুত্র দিয়ে ভোগ করানই ভগবৎ ইচ্ছা, এ নিতেই হবে। যে সংসারের নয়, যে স্বামী যে কি তা জানিল না, তার সন্তান হোলেই এমন কদর্য্য ঠেকে। ১১ বৎসরের কন্যার সন্তান হয়। মাতৃভাব না জাগিতে জাগিতে বুদ্ধি বিকাশ না হইতে হইতে শৃগাল কুকুরের মত সন্তান হয়। স্বামী যে চেনে না তার সন্তান হয়। ভারতে এ দিন কতদিনে ঘুচিবে। ভারত সন্তান কত দিনে স্ত্রীকে শিষ্যার মত পবিত্র চক্ষে দেখিতে শিখিবেন। উপযুক্ত বুদ্ধিগুণ-শালিনী ভক্তিমতী আনন্দময়ী করিয়া গ্রহণ করিতে শিক্ষা করিবেন, সেইদিন ঘরে ঘরে যথার্থ উপযুক্ত সন্তান হইবে। সবই তাঁর ইচ্ছা, বৃথা আক্ষেপ। উঠিলাম, কাঁদিতে কাঁদিতে চলিলাম। হঠাৎ ৺বদরীপুরীর পুলের বরফটা শেষ করিয়াই বাধা লাগিয়া বরফে পড়িয়া গেলাম। ব্রহ্মচারিণী তখন এগিয়ে গেছে। অন্য মা ছিলেন, শঙ্কর ছিল।

ভাবিলাম বাধা পড়িল। উপায় নাই, চলিলাম। পথে পাণ্ডাজী কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে চোলে গেলেন। ১০ মাইল হাঁটিয়া পুনঃ পাণ্ডুকেশর চটিতে আসিলাম।

এসে বেলা ৩টার সময় স্নান কোরে সন্ধ্যার সময় সামান্য সামান্য খিচুড়ী খেয়ে রাত্রে ব্রহ্মচারিণী ও আমার খুব জ্বর হইল। বুক সর্দ্দি, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, জ্বর। বুড়দিদি অত্যন্ত ভীত হইলেন। শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম, পাণ্ডাজী যেন এসে বোল্‌ছেন, "মা কিছু ভাব্‌না কোরনা গো, সকল ঠিক হবে।" সকালে পাণ্ডাজীর গোমস্তা মহানন্দজী এসে ঔষধ দিলেন। সেই জ্বর শুদ্ধই লাঠি ধরিয়া আস্তে আস্তে দু'জনে চলিলাম। ঝাম্‌পান মিলে না ও ইচ্ছা নয় যে, ব্রাহ্মণের

স্কন্ধে সাধ্য মত্তে উঠা। পথে আসিতে শুনিলাম সাধু ছেলেটিরও খুব জ্বর। অগত্যা ১৩ মাইল হেঁটে একটা চটিতে এসে পড়িলাম। শুক্‌ শুক্‌ গজা পাওয়া গেল, তাই দু'চার খানা দু'জনে খেয়ে পোড়ে রহিলাম। মনে আনন্দশূন্য। সন্ধ্যার সময় ৩ মাইল হাঁটিয়া অন্য চটিতে আসিলাম, দেখি সারি সারি সব অসুখ।

শাস্ত্রে আছে আড়াই পা অগ্রসর হইলেই মিত্র বন্ধন হয়। পাণ্ডাজী এ পথে ক্রমান্বয় জীবন রক্ষা করিতে করিতে সযত্নে আজ দেড় মাস লইয়া গিয়াছেন, কত খানি গভীর মায়া জন্মিয়াছে, সকলেই কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বুঝিলাম পাণ্ডাজীর প্রাণ করুণার্দ্র। তিনিও বহু মিষ্টভাষে ও আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিয়াছিলেন। কতকটা সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিলেন। সঙ্গে লোক দিয়াছিলেন সব, তাঁদের সঙ্গেই আমরা রামনগরে এসে ট্রেন পাব। এখন পাহাড় থেকে নামতে নামতে যত দিন লাগে, তাঁরা সঙ্গে যাবেন। সহরে এসে ট্রেনে তুলে দিয়ে যাবেন।

বদরীনাথ থেকে বিদায় হোতে প্রাণটায় গভীর বিষাদ এল। মনে হোলো কোন অপবিত্র স্থানে আবার ফিরে যাচ্ছি কেন? একস্থানে বসিয়া জীবন অন্ত হউক।

পরদিন প্রাতে ৭ মাইল হাঁটিয়া একটা চটিতে আসিয়া, দেহ কিছু সুস্থ বোধ হোলো। দু'জনেই ভাত খাইলাম। বৈকালে অন্য চটিতে গেলাম। এইরূপে নাম্‌তে নাম্‌তে ১৫ দিন পরে আমরা রামনগরে এসে পড়িলাম।

রামনগরে এসে মনে হোলো, স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। সেই স্বর্গ পথে আর সেই মধুর নাদিনী অলকনন্দা ভাগিরথী মন্দাকিনী নদী সকল প্রাণে জাগিতে লাগিল।

৩ দিন ট্রেনে এসে পুনঃ বাড়ী সহরে আসিলাম। প্রাণ উদাস। ব্রহ্মচারিণী হাবড়ার পুলে গাড়ী হইতে বলিল, "দেখ দেখ গঙ্গা দেখ সুশীল।" দেখিলাম বিলাসিতাময়ী গঙ্গা, কর্ম্মকুশলা গঙ্গা, সংসারী গঙ্গা। সে অপূর্ব্ব রমণীয় মূর্ত্তি বিশুদ্ধা অলকনন্দা নয়। দেখিলাম পথে রাস্তায় যেন, কি একটা ভুল বুঝেছে সব, হৈ হৈ কচ্চে সব, যেন উন্মাদ মূর্ত্তি।

বাড়ী আসিয়া মনে হোলো কি হোলো? ছেলে দেখে মনে হোলো সংসারেরই একজন। দুটী মাস ঐ গল্প, ও ঐ চিন্তা। ইতিমধ্যে একদিন যোগোদ্যানে গেলাম, প্রাণটা জুড়ুলো। ভাবিলাম থাক্‌তে পারবো। তারপর ৩রা জানুয়ারী ইটালীতে স্বামী প্রেমানন্দজীর দর্শন ঘটিল, বড় শান্তি পেলাম। তারপর ১৩২২ সালে পৌষ মাসে পূজ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের পদে একদিন গিয়া বসিলাম, পুণ্যময় বেলুড় ধামে। বড় আনন্দ হোলো। পিতার কাছে কন্যা যেমন সহজভাবে কথা কহিয়া প্রাণ জুড়ায় তাহাই হইল। এখন কই, জীবনবন্ধু তুমি কই? জাগস্বরূপ কই? আর কেন বিচ্ছেদ ঠাকুর! আর দুটি দুটি নয়, স্বস্বরূপে মিশিয়ে নাও, কৃপা কৃপা কৃপাতেই সব হউক নাথ।

জীবনের পথে ধরি ধরি করি
ধরাধরি নাথ হয় না,
তোমাতে ডুবিয়ে তোমাময় হব
আমি আমি আর রব না।
দিয়ে মন প্রাণ তোমারি ভিতরে
জুড়াব প্রাণের যাতনা
খেলা চুকে যাক বেলা হোয়ে এল
এত দূরে আর রব না।
হোয়ে থাক সখে প্রাণারাম ধর্ম্ম
যা হবার শেষ কর না,
কে তুমি কে আমি অন্তরতম
ঘুচেযাক ভুল ভাবনা।

(সমাপ্ত)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভক্তকিঙ্করী।

নিবেদন।

ধূলায় জনম মোদের, ধূলায় অন্ধ দুটী নয়ন।
তাই নিত্য অনিত্য চিনিতে নারি ওহে দীনশরণ॥
আমি অবোধ অজ্ঞান শিশু, বেড়াই সদা ধূলা খেলে।
ছুটায়ে দিয়ে খেলার নেশা, লইবে নাকি কোলে তুলে॥
তা না হ'লে প্রভু, আর কভু এ নেশা ছাড়িতে নারিব।
হ'য়ে অচেতন সারাটী জীবন মায়ায় বদ্ধ রব॥
আমি অতি মূঢ় জন, না জানি কিবা কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান।
আপন দোষে যাইগো ভেসে মায়াপাশে হ'য়ে অজ্ঞান॥
(তুমি) ক'রে কর্ম্মক্ষয় ওহে দয়াময়, বিতর শান্তি প্রাণে।
যেন শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, না ভুলি তোমা ধনে॥
নাহি জানি তন্ত্র, মন্ত্র, তুমিই আমার সাধনমন্ত্র।
যা করাওগো প্রভু করি আমি, তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র॥
জানি তুমি পতিত পাবন, পতিতেরে ক'রে তারণ।
অভয়পদে দাও(গো) স্থান, এই শুধু মোর নিবেদন॥

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীচরণ ভরসা।

জয় গুরুদেব !!

তত্ত্ব-মঞ্জরী

উনবিংশ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা।

ফাল্গুন, সন ১৩২২ সাল।

প্রাণের কথা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, কাঙ্গালের সখা, পাতকীতারণ, দীনবন্ধু, দয়াময় দয়া কর দেব—এই পাপ পঙ্কিল সরোবর হইতে উদ্ধার কর, মায়া মোহ পঙ্কে দিন দিন ডুবিয়া যাইতেছি, ইহা হইতে তুমি উদ্ধার না করিলে কেমন করিয়া উদ্ধার হইব দেব ?

প্রাণের ঠাকুর, দয়াময়, তোমার দয়াতে কত পাপী উদ্ধার হইয়াছে, কত লোক সংসার অরণ্যে পথ পাইয়াছে, আমাকেও পথ দেখাও।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

জগৎগুরু, তুমি জ্ঞান অঞ্জন দ্বারা আমার অজ্ঞান অন্ধকার চক্ষু আলোকময় করিয়া দাও, যেন তোমার পাদপদ্ম দর্শন করিতে পারি। তুমি যদি কৃপা করিয়া মোহ, সৌন্দর্য্য, রঙ্গপ্রিয়তা প্রভৃতি চক্ষু রোগ বিনাশ না করিয়া দাও, সাধ্য কি আমার, যে তোমার অনাদি অনন্ত রূপ (এই চর্ম্ম চক্ষে) দেখিব ?

যাঁহারা ভক্ত, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কেন না, শম, দম, শ্রদ্ধা, সমাধান,

উপরতি, তিতিক্ষা এই ষট্ সম্পত্তি তাঁহাদের আয়ত্ত, নির্লিপ্ত আজন্ম তোমাগত প্রাণ (যাঁহার যেরূপে ভক্তি) গভীর বিশ্বাস, ঘোর একাগ্রতা, তাঁহারা ত নিজেই পথ চিনিয়াছেন, নিজের উদ্ধার নিজেই করেন, কিন্তু দেব, আমি যে একেবারে নিঃস্ব, আমার উন্নত কর্ম্মফল কিছুই নাই, এই দেহ আজন্ম ষড়রিপুর (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য) অধীন, মন পদ্ম পত্রের জলের ন্যায় চঞ্চল, আমার গতি কি হইবে ?

সাধু লোকে তরাইতে সর্ব্বদেবে পারে।
পাপীরে তরাব যিনি ঠাকুর বলি তাঁরে ॥

প্রাচীন কবি কৃত্তিবাস, আন্তরিক আস্থার সহকারে তাঁহার রামায়ণের শেষ ভাগে উক্ত কথা কয়টি শ্রীশ্রীরামকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিয়াছেন, আমিও তাঁহারই নিদর্শন লইয়া তোমার শ্রীচরণ ভরসা করিয়াছি, শরণাগত পালক মহান্ হৃদয় দেবতা আমার, দীনহীনা আশ্রিতাকে রক্ষা কর।

যো যাকু শরণ নিয়ে
সো রাখে তাকু লাজ।
উলট জলে মছলি চলে
বহি যায় গজরাজ ॥

মহাত্মা তুলসী দাস তাঁহার প্রাণের ভাব কেমন কবিতায় ফুটাইয়া দিয়াছেন, যে যাহার শরণাগত সে তাহাকে রক্ষা না করিয়া থাকিতে পারে না। বলশালী উন্মত্ত হস্তীও যে স্রোতস্বিনীতে ভাসিয়া যায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য সকল আশ্রয়লব্ধ ও শরণাগত বলিয়া তাহাতে ইচ্ছামত বিচরণ করে।

ভবকাণ্ডারী, আর ভব-সমুদ্রে হাবুডুবু খাওয়াইও না, কূলে তুলিয়া লও। আমি পতিতাধম বলিয়া পতিতপাবন তুমি বিমুখ হইও না।

আমি একদিনও ভাবি নাই যে, কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা বেঠিক পথ, সে প্রবৃত্তিও তুমি দাও নাই। কেমন করিয়া তোমাকে পূজা করিলে তোমার কৃপা লাভ করিতে পারিব, কেমন করিয়া ডাকিলে তুমি কাণে শুন, তাহা ত আমি কিছুই জানি না।

তোমারই জনৈক জ্ঞানী ভক্ত গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়া তাঁহার ভক্তিমূলক কবিতা পুস্তকে প্রথম স্তরেই লিখিয়াছেন,—

বিশ্বাস থাকিলে ভক্তি হয় ভরপুর।
ভক্তিতে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর॥

বিশ্বাস ও ভক্তি অনেক তফাৎ, কিন্তু দুইটিতে বড় সুন্দর সংমিশ্রণ? প্রথমটী থাকিলে দ্বিতীয়টিকে আসিতেই হইবে। আর দ্বিতীয়টি থাকিলে প্রথমটি আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। কৃপাময়, কৃপা করিয়া এই দুইটির একটি রত্ন (গাঢ়তা সহকারে) আমার হৃদয়ে জাগাইয়া দাও, আশায় বঞ্চিত করিও না। আমার ভরসা কেবল তুমি, কেমন করিয়া প্রাণের কথা নিবেদন করিতে হয় আমি তাহা জানি না। ভিতর হইতে তুমি যাহা বুঝাইয়া দাও তাহাই বুঝি, তুমিই বুঝাইয়াছ—

যেতু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎ পরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ মর্য্যাবেশিত চেতসাম্॥

গীতা ১২ অঃ ৬।৭ শ্লোক।

তুমি ভিন্ন আমি আর কিছুই জানি না, তোমাকে জানি (ভরসা করি) কিন্তু তুমি কিসে সদয় কিসে নির্দ্দয় তাহা জানি না। আমার মন্ত্রতন্ত্র, বিল্বদল, গঙ্গাজল কিছুই নাই। প্রেম, ভক্তি, অশ্রুজল নাই, আমি অতি দীনহীনা। দীনতারণ, আমাকে শিখাইয়া দাও কেমন করিয়া তোমাকে ডাকিব, সংসার সমুদ্রে ডুবিয়া মরি, চরণতরি দিয়া উদ্ধার কর।

নিখিলজনহিতার্থং ত্যক্তবৈকুণ্ঠবাসং।
ধৃতনবনরদেহং দিব্যভাতপ্রকাশং॥
বিজিতবিষয়চেষ্টং দুঃখসৌখ্যেনিরাশং।
ত্রিভুবনজনপূজ্যং রামকৃষ্ণং নমামি॥

ভক্তপদাশ্রিতা বিনীত সেবিকা
শ্রীমতী গোলাপবাসিনী দেবী।

যোগোদ্যানে শ্রীরামচন্দ্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২৩৪ পৃষ্ঠার পর।)

রামচন্দ্র যোগোদ্যানে যাইয়া বাস করিবার প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্ব হইতে রিপণ কলেজের কতকগুলি ছাত্র ধর্ম্মজিজ্ঞাসু হইয়া রামচন্দ্র ও মনোমোহনের নিকট আসা যাওয়া করিতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম তাঁহারা কাশীপুরে মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আশ্রমে যাতায়াত করিতেন, পরে তাঁহারা ক্রমশঃ রামকৃষ্ণ সমাচার অবগত হন। ভক্তবর মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় ঐ সময়ে রিপণ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহার নিকটেও ইঁহারা ঠাকুরের কথা শ্রবণ করিতেন। এই যুবকগণ মাছ, মাংস খাইতেন না, তেল মাখিতেন না, কাহারও মাথায় চুল, কাহারও হাতে পায়ে নখ, এবং ব্রহ্মচর্য্যে ও সৎকার্য্যে ইঁহাদের বিশেষ অনুরাগ দেখা যাইত। রামচন্দ্র ও মনোমোহনের সহিত যখন তাঁহাদের পরিচয় হয় নাই, সেই সময়ে তাঁহারা এক রবিবারে ভিক্ষা করিয়া কিছু চাউল সংগ্রহ করিলেন, এবং নারিকেলডাঙ্গা মেন রোডের শেষ প্রান্তে একটী উদ্যানে তাঁহারা রামকৃষ্ণদেবের ভোগরাগ দিয়া একটা ছোট উৎসবের আয়োজন করিলেন (১২৯৬ সালে যোগোদ্যানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উৎসবের পূর্ব্বে)। এই যুবকগণ যদিও রামচন্দ্রাদির নাম অবগত ছিলেন, কিন্তু সাহস করিয়া তাঁহাদিগকে উৎসবে নিমন্ত্রণ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা কতকগুলি কাঙ্গালী খাওয়ানর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। উৎসব একটী রবিবারেই ধার্য্য হইয়াছিল। ঐ দিনে রামচন্দ্র, মনোমোহন এবং আরও ২।৪ জন ভক্ত যোগোদ্যানে প্রাতেই গিয়াছিলেন। তাঁহারা লোকপরম্পরায় শ্রবণ করিলেন যে, নারিকেলডাঙ্গায় কতকগুলি যুবকে মিলিয়া ঠাকুরের উৎসব করিতেছেন। এই সংবাদে তাঁহাদের অন্তরে আনন্দ উথলিয়া উঠিল এবং ঐ যুবকগণকে দেখার সাধ হইল। প্রভু নিত্যানন্দ যে বলিয়াছিলেন, "যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই আমার প্রাণ রে" এ কথার সত্যতা আমরা রামচন্দ্রের জীবনে শত শত ঘটনায় প্রত্যক্ষ করিয়াছি। রামকৃষ্ণ নাম কেহ মুখে লইলেই, রামচন্দ্রের সে ব্যক্তির নিকট আর কোনও দ্বিধা থাকিত না। সুতরাং রামচন্দ্র ও মনোমোহন, মাধব (ভৃত্য) সহ সন্ধান করিতে করিতে বেলা প্রায় ১॥০টার সময় তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া যুবকগণের আনন্দের

আর পরিসীমা ছিল না। উদ্যানটীতে ধান্যক্ষেত্র ছিল, তাহার উপর দিয়া চলিতে চলিতে রামচন্দ্র ও মনোমোহনের পায়ে যে কর্দ্দম লাগিয়াছিল, তাহা যুবকগণের প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণেই অপসৃত হইয়া গেল, জলদ্বারা ধৌত করিবার আর বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। ইঁহাদিগের উৎসাহে যুবকগণ পরম উৎসাহিত হইয়া উৎসব কার্য্যে নিযুক্ত হইল। কাঙ্গালীগণকে পরিতোষ রূপে প্রসাদ খাওয়াইল। যখন সব শেষ হইল, তখন রামচন্দ্র ও মনোমোহন যুবকগণকে সঙ্গে লইয়া প্রসাদ পাইতে বসিলেন। ধন্য যুবকগণ! ধন্য তোমাদের ভক্তি ও অনুরাগ! আজ যে রামচন্দ্র ও মনোমোহন তোমাদের নিকট খুঁজিয়া খুঁজিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, জানিও ইহা শ্রীশ্রীঠাকুরেরই সাক্ষাৎ আগমন। কারণ কোন্নগর হরিসভায় ঠাকুরের যখন একবার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, তখন তিনি তথায় স্বদেহে না যাইয়া রামচন্দ্র ও মনোমোহনকে ডাকিয়া কহিয়াছিলেন যে, তোমরা দুভাই তথায় যাও, তোমরা গেলেই তথায় আমার যাওয়া হইবে। আজ সেই দুই ভাই তোমাদের মধ্যে আসিয়া, তোমাদের সহিত একসঙ্গে বসিয়া ঠাকুরের প্রসাদ পাইতেছেন ও জয়ধ্বনি করিতেছেন। তোমরা পরম সৌভাগ্যবান! তোমাদের চরণে এ দীন শত শত বার নত হইয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছে, কৃপা করিয়া বর দাও, যেন তোমাদের ভক্তি ও অনুরাগের কণাও এ জীবনে লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারি।

সেই দিন হইতে এই যুবকগণ* রাম ও মনোমোহনের বিশেষ প্রিয় হইলেন। তাঁহারা কখন সিমুলিয়ায় রাম ও মনোমোহনের বাড়ী যাইয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন, কখনও বা রবিবারে যোগোদ্যানে যাইতেন।

যোগোদ্যানে এই যুবকগণ ঘনিষ্ঠভাবে যাতায়াত আরম্ভ করিলে, ক্রমশঃ ইঁহাদের সহপাঠী এবং বন্ধুগণও তথায় যাইতে আরম্ভ করেন। ক্রমে ক্রমে কুঞ্জ, যদুপতি, শিবনারায়ণ, ত্রৈলোক্য, হরিমোহন, সুরেশ, বিপিন, শশী, শরৎ, সুরেন, দেবেন, শ্যাম, বিজয়, বিধু, অনুকূল, কিরণ, অবিনাশ, ললিত, রাজেন, উপেন্দ্র, ভুদেব, নন্দ, বরেন, অক্ষয়, খগেন, কালী, উপেন, কৃষ্ণ প্রভৃতি যুবকবৃন্দ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই একে একে আসিয়া জুটিলেন। এই সকল যুবক-

* খগেন, সুধীর, কালী, শশী, হরিপদ, খেলাৎ, প্রিয়নাথ, উপেন, সুশীল, বিজয় প্রভৃতি।

গণের নবানুরাগের সেইকালের মূর্ত্তি স্মরণ হইলে সত্য সত্যই প্রাণ ঈশ্বর পথে ধাবিত হইবার জন্য ব্যাকুল হয়। কেহ কেহ শনিবার অপরাহ্ণেই যোগোদ্যানে আসিতেন। কেহ কেহ বা এইরূপ করিতে করিতে শেষে যোগোদ্যানে রহিয়াই গেলেন। ১২৯৮ হইতে যোগোদ্যান, মহর্ষির পবিত্র পুণ্যাশ্রম বলিয়া সকলের ধারণা হইল। যেন সেই সত্যযুগের গুরু ও শিষ্যবৃন্দের অপূর্ব্ব প্রেম ও শিক্ষার মধুর সম্মিলন।

১২৯৬ সালের জন্মাষ্টমীতে যোগোদ্যান হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের লিথো প্রতিমূর্ত্তি সাধারণ মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল। আমাদের জনৈক বন্ধু (প্রিয়নাথ) তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসগৃহে ঐ ছবি একখানি সযত্নে বাঁধাইয়া টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিলেন। একদিন আমরা তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়া ঐ ছবিখানি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ কি? এ কাহার ছবি? রামকৃষ্ণ পরমহংস কে?"* তিনি আমাদের প্রশ্ন যেন শুনিয়াও শুনিলেন না। ও এক খানা ছবি এরূপ বলিয়া কথা চাপিয়া রাখিলেন। পাছে আমরা শুনিয়া ঠাট্টা করিয়া তাঁহাকে উপহাস করি, এইজন্য কোনও কথা প্রকাশ করিলেন না। প্রিয়নাথ আমাদের স্বদেশবাসী ও আত্মীয়। ১২৯৬ সালের স্কুলের গ্রীষ্মাবকাশে যখন বাড়ী যাওয়া গেল, তখন প্রিয়নাথের ভাব আমাদের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল, অর্থাৎ আমরা প্রিয়নাথের মুখে শুনিলাম যে, তিনি ইঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং পূজা করিয়া থাকেন। আমাদের বেশ মনে আছে, তাঁহার মুখে এই কথা শুনিয়া, আমরা তাঁহার সহিত বিদ্রূপসূচক কথাবার্ত্তাই কহিয়াছিলাম। কিন্তু প্রিয়নাথ তাহাতে কোনওরূপ বিচলিত ভাব দেখান নাই। আশ্চর্য্য রামকৃষ্ণ মহিমা! ক্রমশঃ আমাদের মন যেন রামকৃষ্ণ পানে টানিতে লাগিল। আমরা প্রিয়নাথের নিকট একটু আধটু করিয়া রামকৃষ্ণকাহিনী শুনিতে লাগিলাম। ছুটী ফুরাইয়া গেলে আবার যখন কলিকাতায় আসিলাম, তখন প্রিয়নাথ সহ একবার 'বরাহনগর মঠে' যাওয়া গেল, একদিন মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের বাসাবাড়ী হাতিবাগান, রাজাবাগান ষ্ট্রীটে যাওয়া গেল, এবং একদিন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে যাওয়া গেল। রবিবার বা অবকাশ দিবস

* ছবিতে 'রামকৃষ্ণ পরমহংস' নামটী লেখা ছিল।

হইলেই এইরূপ কখন তাঁহার সহিত কখনও বা নিজদের সুবিধামত এই সকল স্থলে যাতায়াত করা যাইত। সেই সময়ে মঠস্থ শশী মহারজ ও বাবুরাম মহারাজের সেই সস্নেহ ভালবাসা ও আলাপ এখনও মনে পড়ে। উঃ, সে আজ ২৫ বৎসরের কথা। সেই মুন্সীবাবুদের ভাঙ্গা বাড়ীতে মঠ; তখন প্রায় কেহ গেরুয়া বসন পরেন না। ঠাকুরের উপদেশ ও ধর্ম্মভাব জীবনে পালন করিবার জন্য সকলেরই বিশেষ আগ্রহ। আমাদের বয়স তখন ১৬ বৎসর হইবে। ধর্ম্মের বিশেষ তত্ত্ব কিছু বুঝিতাম না, তবে এই সব সঙ্গ এবং প্রসঙ্গ বেশ ভাল লাগিত।

বন্ধু প্রিয়নাথ এই সব স্থল যদিও দেখাইলেন, কিন্তু যখনই তাঁহাকে যোগোদ্যানে যাইবার জন্ম বলিতাম, তিনি বলিতেন "সে, সময় হইলেই হইবে, ব্যস্ত হওয়ার আবশ্যক নাই।" এইরূপে যখন ১২৯৮ সালের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসবের সময় (জন্মাষ্টমী ১০ই ভাদ্র, বুধবার) আসিল, সেই সময়ে প্রিয়নাথ সঙ্গে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন। সেটী যোগোদ্যানে ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসব। আমরা ঠিক প্রাতে ৯ ঘটিকায় সেবক রামচন্দ্রের মধুরায় লেনস্থ ১১ নং (উপস্থিত ২৬ নং হইয়াছে) বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। আমরা যাইয়া দেখি, সংকীর্ত্তন সম্প্রদায় রামচন্দ্রের গৃহ হইতে বাহির হইয়া দ্বারদেশে সমবেত হইতেছেন। সম্প্রদায়ের মধ্যস্থলে যিনি দাঁড়াইয়া আছেন, শুনিলাম, উনিই রামবাবু। তাঁহার পরিধানে একখানি থানের ধুতি, গায়ে একখানি মোটা মুড়ি সেলাই করা চাদর। কীর্ত্তন আরম্ভ হইল,—

"বিষম বিষয় তৃষা গেল না, হল না দীনের উপায়।
পেয়ে শ্রীচরণ, করি নাই হে যতন, পরম রতন হারালাম হেলায়"

খাদ ও মহড়া করিয়া গান গীত হইতে লাগিল। গোষ্ঠ,* তাহার সহযোগী বায়েন সহ মধুর ধ্বনিতে খোল সঙ্গত করিতে লাগিল। তালে তালে করতালি ধ্বনিত হইতে আরম্ভ হইল। এরূপ মর্ম্মস্পর্শী কীর্ত্তন জীবনে আর কখনও শুনি নাই। গান চলিতে লাগিল—

"বিবেক রহিত, বাসনা জড়িত, ভ্রমে মত্ত চিত হায়।
আশায় নিরাশ, হতাশে হুতাশ, দীর্ঘশ্বাসে দিন যায়॥

* ইনি গোয়াবাগানে থাকিতেন, ঠাকুরের কাছে বহুবার বাজাইয়াছেন। ঠাকুর ইহাকে বড় ভালবাসিতেন।

(আশা কবে বা যাবে হে, আশা গেল না গেল না,
—বিষয় লালসা আশা—আশা গেল না গেল না),

সংগীতের আঁকর মর্ম্ম ভেদ করিয়া সকলের হৃদয় বিদ্ধ করিল। গায়ক ও শ্রোতার নয়নে জলধারা বহিতে লাগিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে ভাদ্রের মেঘ ভরা আকাশে ঘন দল আরও ঘনীভূত হইল। তাহারাও ভক্তগণের ব্যথায় সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া জলধারায় হৃদয় বেদনা জানাইল। ভক্তগণ আবার গাহিতে লাগিলেন—

"ব্যাপিত অবনী, রোদনের ধ্বনি, শুনিয়া শিহরে প্রাণ।
ঘুমে অচেতন, না ম্যালে নয়ন, মোহ নহে অবসান॥
(চেতন হল না হল না, আরেরে পামর মন!
গণা দিন ফুরায়ে এল—চেতন হল না হল না)"

গান হইতে হইতে ক্রমশঃ জন সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রায় ৪০।৫০ জন তখন সম্মিলিত হইয়াছেন। রামচন্দ্র স্বয়ং মহড়ায় থাকিয়া গান ধরিয়া ধরিয়া গাহিতেছেন ও গাওয়াইতেছেন। আবার গান ধরিলেন—

"ভবে ভীম দরশন, অবিরত কুস্বপন,
মায়ার নেশায় মন, জাগিতে না পারে।
পাথারে তরঙ্গ রোলে, পৈশাচিক গণ্ডগোলে,
সুখ দুঃখ মাঝে দোলে নিবিড় আঁধারে॥
(প্রাণ শিহরি উঠে হে, তরঙ্গের রঙ্গ দেখে,
প্রাণ আকুল যে হল হে, কার মুখ বা চাব হে,
কাঙ্গাল বলে দয়া করে—আর কেবা আছে হে
চরণে শরণ নিলাম, দয়া কর হে কর হে)
অকূলে না কূল পায়, দারুণ শৃঙ্খল পায়,
নিরানন্দ নিরুপায়, পলাইতে নারে—
হও হে উদয় আসি, বিকাশি প্রেমের হাসি,
ঘোর তমোরাশি নাশি নিস্তার দুস্তারে॥
(আমি জ্বলে যে মলাম হে,—ত্রিতাপ দাবানলে,
আর কেবা আছে হে—অনাথ বলে দয়া করে,

আমার হৃদয় কমলোপরে, দীন হীন কাঙ্গালে ডাকে,

কমল কুঞ্চিত আছে হে, চরণ অরুণ অদর্শনে)"

এইবার গানের মেলতা—

"তোমা ধনে, প্রভু নাহি মনে, রাখ রাঙ্গা পায় হে করুণায় ॥"

সম্পূর্ণ গানটী গাওয়া হইলে, ধীরে ধীরে সকলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গাহিতে গাহিতে ঠাকুরের শূরভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া আবার খানিকক্ষণ গান হইল। তথায় স্বর্গীয় সুরেন্দ্রবাবুর ভ্রাতাগণ উপস্থিত থাকিয়া সকলের অভ্যর্থনা করিতেছিলেন। তথা হইতে কীর্ত্তনের দল পুনঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে শুকিয়া ষ্ট্রীটের মোড়ে ডাক্তার শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু রায় বাহাদুর মহাশয়ের বাটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া আবার গান হইতে লাগিল। তথায় গান সমাপ্ত হইলে সম্প্রদায় তখন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট দিয়া মাণিকতলার রাস্তায় অগ্রসর হইলেন। সম্প্রদায় যতই চলিতে লাগিলেন, সেই সঙ্গে ক্রমশঃ জন সাধারণ সম্মিলিত হইতে লাগি-লেন। যে সময়ে শুঁড়িপাড়ায় ঠাকুরবাটীর সম্মুখে গান হইতেছিল, সেই সময়ে অতি ঘনঘটা করিয়া বৃষ্টি আসিল। সম্প্রদায়স্থ গায়কগণের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। তাঁহারা যেন তন্ময়চিত্তে গান গাহিতেছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া তাঁহাদের চক্ষে যে জলধারা বহিতেছিল, আকাশের জল সে জলে মিশিয়া ভূপৃষ্ঠে প্রবাহ বহাইয়া দিল। ভক্তহৃদয়ের পবিত্র প্রেমধারা ত্রিতাপ-তাপিত ধরাতলকে সিক্ত করিয়া তাহাকে পবিত্র করিল। বিশেষতঃ সেবক রামচন্দ্রের যে করুণামাখা মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, সে ছবি আজও এ হৃদয়-মাঝে বিশদভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। একজন শিক্ষিত, অর্থবান, মান্যমান, বৈজ্ঞানিক ডাক্তার যে, এতদূর দীনভাবাপন্ন হইতে পারেন, পূর্ব্বে আমাদের জীবনে সে জ্ঞান কখনও ছিল না। রামচন্দ্রই আমাদের সেই ছবি প্রথম দেখাইয়া-ছেন। সিক্তবস্ত্রে কর্দ্দমাক্ত পায়ে রামচন্দ্র অগ্রসর হইতে লাগিলেন—সঙ্গে সঙ্গে সংকীর্ত্তনও চলিল।

মাণিকতলা বাজারের সম্মুখে ভক্তবর পরলোকগত হরিশ্চন্দ্র মুস্তফী মহাশয়ের বসতবাটী। সেই বাটীর সম্মুখে সম্প্রদায় আর একবার দাঁড়াইয়া গান গাহি-লেন। হরিশবাবুর পুত্র তারাপদ আমাদের সহপাঠী, তাহার সহিত সাক্ষাৎ

ঘটিল। সম্প্রদায় তৎপরে সারকুলার রোড পার হইয়া মাণিকতলা মেন রোডে পড়িল। খালের পুল পার হইয়া যখন অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন চারিদিকে গাছপালা এবং নির্জ্জন দেখিয়া মনে একটু কুতূহল জন্মিতে লাগিল। এরূপ পথে ইতিপূর্ব্বে কখনও ভ্রমণ করা হয় নাই। সম্প্রদায় একটী ধুয়া ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বেলা প্রায় ১১॥০টা বা ১২টার সময় সম্প্রদায় যোগোত্থানে পৌঁছিল।

যখন যোগোদ্যানে পৌঁছিলাম, কীর্ত্তন সম্প্রদায়ে তখন প্রায় শতাধিক লোক সম্মিলিত। দেখিলাম আরও প্রায় শত জন উদ্যানে সমবেত হইয়াছেন। ক্রমশঃ সম্প্রদায় শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমন্দিরের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সে করুণামাখা কীর্ত্তনের ভাব এখনও মনে হইলে চক্ষে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়। ঠাকুরের বিরহ ব্যথায় ভক্তপ্রাণ যে কিরূপ ব্যথিত, সেই সময়কার সেই চিত্র যাঁহারা না দেখিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইতে পারিব না। ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতেছেন আর নয়নধারায় ভাসিতেছেন। অবশেষে কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভুর শ্রীমন্দির সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া সকলে প্রভুর শ্রীচরণে প্রণত হইলেন। সকলের সমবেত 'জয় রামকৃষ্ণ' নাদে গগনপ্রান্ত ছাইয়া গেল।

কীর্ত্তনান্তে ঠাকুরের ভোগ ও আরতি হইল। ঠাকুরের তিন দিক হইতে তিনজনে আরতি করিতে লাগিলেন। এরূপ আরতি পূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই। ঐ আরতির সহিত বাহিরে খোল, করতাল, কাঁসর, ঘড়ি ও গং ইত্যাদি তালে তালে বাজিতে লাগিল। ভক্তগণ সমস্বরে উচ্চরবে 'জয় জয় রামকৃষ্ণ' নাম ধ্বনিত করিতে লাগিলেন। প্রায় আধ ঘণ্টাকাল এইরূপ আরতি হইয়াছিল।

ঠাকুরের সম্মুখে এখন যে নাটমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তখন সেরূপ ছিল না। মাত্র সম্মুখের চাতালটী ছিল এবং তাহার উপরে হোগলাদ্বারা সাময়িক আচ্ছাদন নির্ম্মিত হইয়াছিল। এবং শ্রীমন্দিরের পশ্চাৎভাগে আরও একটী ঐরূপ আচ্ছাদন নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই আচ্ছাদন তলে সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণগণকে প্রসাদ পাইবার জন্য আহ্বান করা হইল। আমরা প্রায় ৭০।৮০ জন তথায় বসিয়া প্রসাদ পাইলাম। প্রসাদ প্রাপ্তান্তে যখন উঠিয়া আসিলাম, দেখি চাতালটী দুই

ভাগে বিভক্ত করিয়া, উহার পশ্চিমাংশে অন্যান্য ভক্তগণকে প্রসাদ দেওয়া হইয়াছে, সকলে আনন্দে প্রসাদ পাইতেছেন। পূর্ব্বাংশটী অর্থাৎ ঠাকুরের সম্মুখভাগ অন্যান্য কীর্ত্তন সম্প্রদায় আসিয়া তথায় গান করিবেন বলিয়া খালি রাখা হইয়াছে। আমরা আসিবার কালে যদিও পথে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি পাইয়া ছিলাম, কিন্তু যোগোদ্যানে আসার পর আর বৃষ্টি হয় নাই। সূর্য্যদেব তখন কিরণ বিস্তার করিয়াছেন। আমরা প্রায় ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত যোগোদ্যানে ছিলাম। তন্মধ্যে আরও ৪।৫টী কীর্ত্তন সম্প্রদায় আসিয়া গান করিলেন। একটী সুবিখ্যাত বংশীবাদক শ্রীযুক্ত হাবুবাবুর (অমৃতলাল দত্ত) সম্প্রদায়। অপরটী ষ্টার থিয়েটারের সুগায়ক ও শ্রেষ্ঠ অভিনেতা শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ পাঠক মহাশয়ের সম্প্রদায়। ইঁহাদিগের গানগুলি সেবকমণ্ডলীর গানের কাগজসহ একযোগে মুদ্রিত হইয়াছিল।

আমরা যোগোদ্যানে এবারে নূতন গিয়াছি। কাহারও সহিত বিশেষ আলাপ পরিচয় নাই। সুতরাং আমাদের সহযাত্রী প্রিয়নাথের সহিতই মাঝে মাঝে আলাপ হইতে লাগিল। যত লোক আসিতে লাগিল, সকলকেই সাদর আহ্বানে প্রসাদ পাওয়ান হইতে লাগিল। যতক্ষণ ছিলাম, দেখিলাম প্রায় ৫।৬ শত লোক উদ্যানে সমবেত হইয়াছিলেন। উহা ব্যতীত শ্রীমন্দিরের উত্তরাংশে একটী খোলার লম্বা চালাঘর ছিল, তথায় বিশিষ্ট স্ত্রীলোক ভক্তগণ সমবেত হইয়া শ্রীপ্রভুর কীর্ত্তনাদি দর্শন ও প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যোগোদ্যানের অতি সুন্দর ও মনোরম দৃশ্য। ফটক হইতে সমস্ত রাস্তার দুই পার্শ্বে ছোট গরাণকাষ্ঠের অতিসুন্দর বেড়া সুসজ্জিত। তাহার ধার দিয়া কোথাও ক্রোটন (পাতাবাহার) বৃক্ষের সারি, কোথাও বা তুলসী এবং পুষ্পবৃক্ষের সুদৃশ্য কেয়ারি করা। এবং বিবিধ ফলফুলের নব নব বৃক্ষে উদ্যানটী সুশোভিত। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনবৃত্তান্ত এবং তত্ত্বপ্রকাশিকা পুস্তক দুইখানি জনৈক ভক্তের নিকট হইতে দেখিয়া আসিলাম। শুনিলাম শ্রীরামচন্দ্র এবং আরও ২।৩ জন ভক্ত যোগোদ্যানে নিত্যবাস করেন। ভবিষ্যতে পুনঃ আসিয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ পরিচয় করিবার বাসনা লইয়া আমরা উদ্যান হইতে অপরাহ্ণে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। আরও অনেকে সে সময়ে যাইতে লাগিলেন। যখন আমরা যোগোদ্যান হইতে ফিরিলাম, তখন প্রায় ২০০।২৫০ ভক্ত যোগো-

দ্যানে রহিলেন। রামচন্দ্র চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলকে প্রসাদ ইত্যাদি পাওয়াইবার ব্যবস্থাদি করিতেছিলেন। যোগোদ্যান—তথাকার শ্রীশ্রীঠাকুর, সুমধুর কীর্ত্তন এবং ভক্তজীবনের এক মহান সাত্ত্বিকী ছবি আমাদের হৃদয়মধ্যে লইয়া, আমরা ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিলাম। নারিকেলডাঙ্গার মধ্য দিয়া আমরা কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলাম। পথে এই সব সংক্রান্তই আলাপ হইতে লাগিল। মনে মনে এই চিন্তা রহিল—আবার কবে যোগোদ্যানে যাইব।

(ক্রমশঃ)

সেবক শ্রীবিজয়নাথ মজুমদার।

আধ্যাত্মিকতার বিকাশ।

The mind which follows the rambling senses, makes the Soul as helpless as the boat which the wind leads astray upon the waters—Bhagabat Gita. ইচ্ছা শক্তির প্রকৃত বিকাশেই মানবের মনুষ্যত্ব। সাংসারিক কূটবুদ্ধি ও চতুরতা তাহাকে মনুষ্যত্বের পথে লইয়া যায় না; বরং বিপথেই চালিত করিয়া থাকে। আপনার বুদ্ধির মাপকাটিতে সে সকলকেই মাপিয়া থাকে। তাহার আশা ও আকাঙ্ক্ষা তাহার ইচ্ছা শক্তির অনুপাতেই। "The height of the Pinnacle is measured by the breadth of the base." মানব এই বিশাল বিশ্বের সংক্ষিপ্ত, অখিল ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্রতম অনুভূতি। ঋষিগণ বলিয়া থাকেন—আত্মাতেই বিশ্ব বর্ত্তমান। দেহ-রূপ আবরণ উন্মোচন হইলেই, ঘটাচ্ছন্ন আকাশ, মহাকাশে মিলিত হইয়া যায়। মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্যই বিধাতার মনুষ্য জন্ম প্রদান। প্রকৃতি হইতেই তাহার জড়দেহ, জড়দেহই ঘটাচ্ছন্ন আকাশের আবাস স্থল, সে প্রকৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও শক্তিমান।

মানব আপনার প্রকৃত পরিচয় লইবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হও—আত্মজ্ঞান লাভই ভারতের সনাতন ধর্ম্ম। ইহাই মহাপুরুষগণের উপদেশ। তোমার আন্তরিক অনুরাগ, অবিরাম পরিশ্রম, এই উপদেশ পালনে নিয়োগ কর। সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্নার লুকাচুরিতে মুগ্ধ হইও না। আদর্শ সৃজন করিয়া কভু

তাহার পশ্চাতে ধাবমান হইতেছ আবার পরমুহূর্ত্তেই তাহাকে বর্জ্জন পূর্ব্বক নব আদর্শ গড়িয়া তুলিতেছ, তুমি কিছুতেই তৃপ্তি পাইতেছ না। ইহা নহে, উহা নহে, নিয়ত তুমি ইহাই করিতেছ। ইহাই তোমার অবিশ্বাসের অস্বীকারের উক্তি। আত্মশক্তিতে আস্থা নাই, অবিশ্বাসে হৃদয় পরিপূর্ণ। ওগো অনন্ত শক্তিধর! তুমি বিস্মৃতি সমুদ্রের বারি পান করিয়া ও মায়ার মোহিনী জালে আবদ্ধ হইয়া আত্ম বিস্মৃত হইয়াছ। এতাবৎকাল প্রকৃতির সহিত তোমার সম্পর্ক স্থির করিয়া আসিতেছ। তুমি কি হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম নও, যে তোমার প্রকৃতির দত্ত পাঞ্চভৌতিক শরীর কেবল মাত্র আশ্রয়স্থল। ইহাকে আশ্রয় করিয়াই তোমার প্রকৃত সত্ত্বার বিকাশ। আশ্রয়স্থল ক্ষণভঙ্গুর মৃত্তিকাপাত্র, অচিরেই ধ্বংশমুখে নিপতিত হইবে। আত্মা অবিনশ্বর অনন্তকাল ধরিয়া বর্ত্তমান আছে ও থাকিবে। তুমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় এই আশ্রয়কেই ভালবাসিয়া থাক, ইহার অধিকারীর অনুসন্ধান কর না। প্রবৃত্তির চরিতার্থ সাধনের নিমিত্ত দুর্ব্বল, নিরীহ আত্মরক্ষায় অসমর্থ পশুগণের গলদেশে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে বিন্দুমাত্রও সঙ্কুচিত নও। এই নশ্বর দেহকে রক্ষা করিবার জন্য দগ্ধ, গলিত মাংস ভক্ষণ করিলেও ইহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবি। পরিপাক শক্তির বিকৃতি না ঘটিলে হয়ত মানব, মানবকেও উদরে নিক্ষেপ করিতে বিন্দুমাত্রও ইতস্ততঃ করিত না। ওহে গর্ব্বিত, অহং জ্ঞানে আচ্ছন্ন মানব! আপত্তি উত্থাপন করিয়া লাভ কি? তুমি শূকর উষ্ট্রও আনন্দে গলাধঃকরণ করিয়া থাক, হায়! মশকের প্রতি এত বিরূপ কেন? তোমার এই মরদেহের প্রতি অসীম আকর্ষণ বশতঃ তোমার আত্মা তোমার কার্য্যকলাপে সঙ্কুচিত হইয়াছে। আপনার অনন্ত শক্তিকে সসীম করিয়া ফেলিয়াছে। তোমার চতুর্দ্দিকের অবরোধ, এই দুর্ভেদ্য প্রাচীর একমাত্র তুমিই অপসারিত করিতে সমর্থ। তুমিই আপনাকে এই মোহজাল হইতে উন্মুক্ত পূর্ব্বক পূর্ব্ব গৌরবে মণ্ডিত করিয়া তুলিতে পার। ইহার সংশোধন করিতে হইলে, প্রকৃতিকে অতিক্রম পূর্ব্বক আধ্যাত্মিক বিদ্যা করায়ত্ব করিতে হইবে। আভ্যন্তরীণ প্রকৃতিকে দমন করিবার অভ্যাসের সহিত বাহ্য জগতের উপর আধিপত্য করিবারও শক্তি স্বতঃই জাগরিত হইয়া উঠিবে ও তোমার বিপুল ঐশিক শক্তির প্রকাশ পাইয়া বিশ্বে শান্তির কণা বিকীরণ করিবে।

মানবের ইচ্ছাই বিশ্বপিতার ইচ্ছা। ভগবানের নিজস্ব যাহা, তাহার অধি-

কারীও ভগবান। সেই অসীম অনন্ত পুরুষ প্রত্যেক অনুপরমাণুতে বর্ত্তমান। আপনার প্রকৃত পরিচয় পাইতে হইলে প্রথমে তাঁহাকে অবগত হইতে হইবে। তুমি অনন্ত শান্ত ও আনন্দদায়ক। সেই অসীম তুমি আবরণে আচ্ছাদিত হইয়া সসীম। তোমার অবিনশ্বর আত্মা ঊর্দ্ধে উদ্ভাসিত। তাহারই কণা যাহা শারীরিক যন্ত্রের ভিতর আবদ্ধ, মায়ার ঘোরে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় মোহাচ্ছন্ন। তত্রাচ তোমার আভ্যন্তরীণ আবেগ তোমাকে নিয়তই অগ্রসর করাইতেছে। সুখ, শান্তি পাইবার এই যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা, ইহা তোমারই সেই চিরকল্যাণকর সত্বার শারীরিক ক্ষেত্রে বিকৃত প্রতিফলন। তোমার প্রকৃত সত্বার স্বাভাবিক আকর্ষণী শক্তিই তোমাকে অবিরত চালিত করিতেছে। All things are in a scale; and begin where we will, ascend and ascend. All things are symbolical; and what we call results are beginnings :—Emerson on "Plato—The Philosopher."

যতদিন তুমি প্রবল বাসনার স্রোতে ভাসমান থাকিবে, ততদিন তোমার উন্নতির পথ নিরুদ্ধ থাকিবে। নিগড়াবদ্ধ মনিবন্ধের ন্যায় তোমার আত্মা বাহ্য-পদার্থের অধীন। আবদ্ধ শৃঙ্খল মোচনে সতত চেষ্টিত। নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে। এই ধারাবাহিক আন্তরিক প্রয়াস ভবিষ্য-তের একমাত্র আশা। জয় অবশ্যম্ভাবি। নির্ব্বোধের ন্যায় বলিওনা 'ইহা আমার সাধ্যাতীত, আমি ইহা সম্পাদনে অপারক।' প্রবল শক্তিশালী পুরুষের ন্যায় বল আমি ইহার সম্পাদনে সক্ষম। আমিই শক্তিধর। জয়লাভ তোমার ভাগ্যে ঘটিবেই ঘটিবে। আধ্যাত্মিক চৈতন্যের বিকাশে তোমার আত্মার আবরণ উন্মোচন হইবে। ইহা অলৌকিকবাদ ও প্রতিভার কার্য্য নহে। নিয়মিত চিন্তা-শক্তির কার্য্যতৎপরতা ও কৃতসঙ্কল্প ইচ্ছাশক্তির অনুশীলন প্রবল রাখিয়া আধ্যা-ত্মিক ক্ষেত্রে দ্রুত ক্রমোন্নতি। ইহা মানবের জীবনীশক্তিকে কেন্দ্রীভূত ইচ্ছা-শক্তির অনুশীলনের ঊর্দ্ধসীমা অভিমুখে প্রেরণ করিয়া থাকে। নির্ব্বিবাদে সম্পাদন করিবার কার্য্য নয়। সারা জীবন উৎসর্গ করিলে হয়ত সুসম্পন্ন করিতে সক্ষম হইবে। তোমারই উপযুক্ত কর্ম্ম! পূর্ণতাই তোমার লক্ষ হউক। এই সব প্রস্তাবগুলি ধীর ভাবে আলোচনা কর। স্বপ্নাবস্থায়ও তাহারা তোমার মস্তিষ্কে জাগ্রত থাকুক। কার্য্যে তাহাদিগকে পর্য্যবসিত কর। সয়তানের

সিংহাসনের উচ্ছেদ ও করুণাময় জগৎপিতার সিংহাসনের প্রতিষ্ঠা, ইহাই তোমার লক্ষ্য ও আদর্শ হউক। ইন্দ্রিয়ের অধীনতা হইতে মুক্ত হইতে পারিলে, জড় সম্বন্ধ অতিক্রম পূর্ব্বক আভ্যন্তরীণ জ্যোতিঃ প্রতিভাত করিয়া আপনার প্রকৃত পরিচয় পুনঃপ্রাপ্ত হও।—ইহাই সত্যের উপলব্ধি। ইহাই মানবকে ভয় ও মৃত্যুর বহির্ভূত রাজ্যে লইয়া যায়। নব জীবন দান করে।

এক সময়ে একই বিষয়ে হস্ত নিক্ষেপ কর ও প্রাণপণ নিয়োগ পূর্ব্বক তাহা সম্পন্ন কর। তুমি যে আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছ, তোমার উন্নত শক্তির দ্বারা তাহাকে সতেজ কর। কীলকের সূক্ষ্ম ধার দিয়া কার্য্য করিতে থাক। প্রত্যেক আঘাত গভীর হইতে গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করাইবে। তোমার উৎসাহকে বিচ্ছিন্ন করিও না। বর্ত্তিকাকে উভয়দিকে দগ্ধ করিও না। সিদ্ধির একমাত্র প্রচ্ছন্ন কারণ—কেন্দ্রীভূত কর্ম্ম। মানব সর্ব্বভুক পাঠক হইতে পারে, Encyclopaedia তাহার কণ্ঠস্থ থাকিতে পারে, তাহার মস্তিষ্ক Bodliau পুস্তকাগারে পরিণত হইতে পারে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ চরিত্র শক্তিবিশিষ্ট মানবের মহান গৌরবের তুলনায় তাহার মূল্য অতি নগণ্য। স্মরণ রাখিও, তুমি জন্মমৃত্যুর অতীত। তুমি অনাদি অনন্ত। জীবনের পরিমিত কাল অতীব অল্প; অতএব তোমার আভ্যন্তরীণ শক্তিকে একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত করিয়া, নদী যেমন নিয়ত সাগরেই ধাবিত হয়, তদ্রূপ একই আদর্শের সাধনের পথে প্রবাহিত কর। প্রাণমন একীভূত পূর্ব্বক নীরবে, তোমার আদর্শানুযায়ী কর্ম্ম করিয়া যাও। নানাবিধ অনৈক্য হইতে রক্ষা পূর্ব্বক, নির্ম্মল, অটল মস্তিষ্কের সৃজন কর।

Education is a man making, life building assimilation of ideas.—Vivekananda. ধীর ভাবে সুবিবেচনা পূর্ব্বক আদর্শকে গড়িয়া তুল। আদর্শ প্রতিষ্ঠা হইলে আর অলীক কল্পনা, আসমানে অট্টালিকা নির্ম্মাণ চলিবে না, তখন কর্ম্মের আরম্ভ হইবে। কর্ম্মে সাফল্য লাভ করিতে হইলে ত্রিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। অন্তঃকরণ বিনিঃসৃত ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষার প্রবল আবশ্যক। তোমার হৃদয় অযুত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্থিব আকর্ষণে আবদ্ধ। এই অসংখ্য আকর্ষণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইলে সুদৃঢ় চির-প্রণোদিত শক্তির অত্যাবশ্যক। পবিত্রতার সুদৃঢ় সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য হৃদয় ও মন একীকরণ পূর্ব্বক গভীর আকাঙ্ক্ষার সৃজন কর। এতদ্ভিন্ন

পথের বাধা, বিঘ্ন, অতিক্রম করা তোমার পক্ষে অসাধ্য। আপনাকে এই মহাশক্তির অঙ্গত্রাণে আবরিত কর, প্রতিকূল ভাগ্যলক্ষ্মীর নিক্ষিপ্ত শর তোমার দুর্ভেদ্য অঙ্গত্রাণের সংস্পর্শে প্রতিহত হইবে। মনুষ্যত্ব লাভে বঞ্চিত হইলে ইহার অধিকারী হওয়া অসম্ভব। যাহারা অধঃপতনের নিম্নস্তরে অবতরণ করে, তাহারাই আবার উন্নতির শীর্ষস্থানে আরোহণ করে। এই শক্তির অনধিকারীর সমস্ত সৎপ্রবৃত্তি নীরবে বিলীন হইয়া যায়। সে নির্বীর্য্য হইয়া পড়ে। নির্ভীক হৃদয়ে সে পাপ বা পুণ্য কোন পথেই অগ্রসর হইতে পারে না। তমসাচ্ছন্ন প্রকৃতির মানবের অবস্থাই এইরূপ। সে নিস্তেজ, অলস ও উদ্যমহীন। মেরুদণ্ডহীন জড়ের ন্যায়।

যদিও তুমি এই শ্রেণীবিশিষ্ট হও, তত্রাচ হতাশ হইও না। তুমিও এই শক্তির অনুশীলন করিতে সমর্থ। যে মুহূর্ত্তে তোমার হৃদয়ে এই প্রকার হীনাবস্থা হইতে উন্নত হইবার আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইবে, তখনই মুক্তির পথ আপনা হইতেই তোমার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইবে। তোমার কল্পনাই তোমার সৃষ্টিশক্তি। চিন্তা ও কল্পনায় অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। চিন্তার স্বাধীন অবস্থাই কল্পনার রাজ্য। ইচ্ছাবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে, চিন্তার সহায়তা আবশ্যক। ইচ্ছাবৃত্তির দ্বারা ইচ্ছাশক্তিকে সুগঠিত করা সম্ভবপর নয়। তুমি আপনার ইচ্ছাবৃত্তির সঙ্কীর্ণ সীমার ভিতরে সম্পূর্ণ নিঃসহায়। ইচ্ছাপ্রবৃত্তিকে সুপথে চালিত করিতে সক্ষম হও ভালই, নচেৎ ইহার আদপেই ব্যবহার করিও না, একমাত্র চিন্তারাশিই তোমাকে সহায়তা করিতে সক্ষম। 'There is no thought in any mind but it quickly tends to convert itself into a power, and organize a huge instrumentality of means—Emerson. একই চিন্তার দিনের পরদিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর আবৃত্তি হইতে থাকিলে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিবে। ইহা হইতে মহান শক্তির জাগরণ হইবে। ইহাই তোমার নিয়তিকে গঠিত করিয়া তুলিবে। Allow the thought, and it may lead to a choice, carry out the choice, and it will be the act, repeat the act and it forms the habit, allow the habit and it shapes the character; continue the character, and it fixes the destiny.' চিন্তা সূক্ষ্ম কারণ। মানসপটে ইহাকে দৃঢ়-

ভাবে অঙ্কিত কর। ক্রমশঃ কুপ্রবৃত্তিনিচয়ের দমনের সুফল প্রতিভাসিত হইতে থাকিবে। অন্তরে পাপ পুণ্যের দ্বন্দ্বকোলাহল নীরব হইবে। পুণ্যের জয় হইবে। পাপ অচিরে অন্তর্ধান হইবে।

যাহারা চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যে পবিত্রতার আকর, নিজ মনে বাসনার দ্বন্দ্ব-কোলাহল তাহাদের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া স্বতঃই ম্রিয়মান হইয়া পড়ে। সে পবিত্রতার বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইয়াছে। সেখানে অন্যের স্থান নাই। আভ্যন্তরীন নির্ম্মল প্রকৃতির মানবের পক্ষে বাহ্যিক পবিত্রতা দর্শন অনাবশ্যক। হৃদয়কে উন্নত করাই প্রধান কর্ম্ম। সেই উন্নতি লাভ করিবার জন্যই বাহ্যিক আচার ব্যবহার। যে, সে নির্ম্মলতার অধিকারী তাহার পক্ষে কিছুই আবশ্যক করে না। সে প্রত্যভিজ্ঞার নিমিত্ত উৎগ্রীব নহে। যে ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, আপন ইচ্ছামত যে আপনাকে পরিচালিত করে, আপনার মনের উপর যাহার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব, তাহার পক্ষে অপরের উপর কর্তৃত্ব করা অতীব সহজ ও অনায়াসসাদ্ধ। তাহার উপস্থিতি শোকতাপদগ্ধ মানবের প্রাণে শান্তি আনয়ন করে, তাহার বাক্যসুধা তোমার নীরস প্রাণ সরস করিয়া তুলিবে। তোমার সব জ্বালা দূরীভূত হইবে। জীবন মধুময় হইবে। তাহার সঙ্গলাভে তোমার হৃদয় প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে। তাহার বাক্যসুধায় হৃদয় কুসুম বিকশিত হইয়া সৌরভে আপনি মাতিয়া উঠিবে। স্বতঃই তাহার চরণে তোমার মস্তক অবনত হইবে ও নিয়তই তোমার হৃদয় তাহার বাক্যসুধা পানে উৎসুক, উৎগ্রীব থাকিবে। প্রতি মুহূর্ত্তে জীবনের উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, সব মলিনতা দূর হইয়া নবশক্তির উন্মেষ হইবে, তখন তোমার নিকট কিছুই অসাধ্য থাকিবে না। আপনাকে নূতন জগতের অধিবাসী বলিয়া অনুভব করিবে। উন্নত ব্যক্তির সংস্পর্শ তোমার জীবনে অসাধ্য সাধন করিবে, প্রস্তরসদৃশ তোমার হৃদয়কে দ্রবীভূত করিয়া ফেলিবে। তোমার অজানিত শক্তি জাগিয়া উঠিবে। পবিত্রাত্মার নিশ্বাস প্রশ্বাসে চতুর্পার্শ্বস্থ বায়ুমণ্ডলও পবিত্র হইয়া উঠিবে। তাহার হৃদয় কি নির্ভীক। ধন্য তাহার সাধনা। পরার্থে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে। মনুষ্যসমাজ কি প্রকারে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে? তাহার দর্শন লাভেই কতশত মানব নবশক্তি, নবজীবন লাভ করিয়া থাকে। জগতের কল্যাণ সাধনের জন্য তাহার শক্তির ভাণ্ডার সদাই উন্মুক্ত ও অফুরন্ত। এই

ভাবে পবিত্রতা লাভের নানাবিধ সুফল ক্রমান্বয়ে দৃঢ়রূপে হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে থাকে। দর্শনেন্দ্রিয়ের প্রকৃত ক্রমিকগতি, ইহাই মানসিক আলোক প্রভাবে চিত্রাঙ্কন বিদ্যা।

যদি তুমি এই ভাবে অগ্রসর হইতে অক্ষম হও, যদি তুমি আপনার অবস্থা ইহাপেক্ষা হীন বলিয়া অনুমিত কর, তাহা হইলে তোমার পক্ষে বিপরীতার্থক উপায় অবলম্বন করাই শ্রেয় বলিয়া অনুমিত হয়। গভীর নৈরাশ্য আধ্যাত্মিক শক্তির নাশ, অবসাদ ও নিরানন্দ, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির নীচ ও জঘন্য ধারা, জগতের উপ-হাস ও বিদ্রূপ, হতাশার নির্ম্মম নিষ্পেষণ, তোমার আশ্রিত জনের দারুণ দরিদ্র-তার নিপীড়ন, বিভীষিকাময় মৃত্যু ও ভবিষ্যজীবনে তাহার দারুণ দুর্ব্বিসহ ফলভোগ, পতনের শেষ সীমা, ঘৃণিত জীবন ও দুর্ব্বিনীত চিন্তারাশির বিষময় ফল হৃদয়ে অঙ্কিত কর। তোমার সমস্ত অতৃপ্ত বাসনার পরিতৃপ্তি হইবে। ইহাই বিপরীতা-র্থক প্রণালী। কর্কট রোগে যখন জীবন বিপন্ন হইয়া উঠে, ভীষকের দারুণ অস্ত্র প্রয়োগ ব্যতিরেকে যখন তাহার হাত হইতে মুক্তিলাভ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, ইহাও তদ্রূপ। অন্যথা অন্য উপায় অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর। দিনের পর দিন যেমন তোমার আদর্শকে উপলব্ধি হইতে থাকিবে, চুম্বক শলাকার ন্যায় ইহার আকর্ষণী শক্তিও অদ্ভুত রূপে প্রকাশ হইতে থাকিবে। তোমার হৃদয় প্রকৃত শক্তির অধিকারী হইয়া উঠিবে। জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তেই আদর্শকে করায়ত্ত করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া থাক। জীবনে নব উৎসাহের উৎস খুলিয়া যাইবে। তখন তোমার অগ্রসর হইবার পথে এক নূতন বাধা আসিয়া উপস্থিত হইবে। সতত অনুভব করিবে যে, যেন উৎসাহ ও চিন্তাশক্তির প্রবাহ তোমার সমস্ত হৃদয় ছাপাইয়া উঠিতেছে। নিয়ত পুনরাবৃত্তিতে তোমার চিন্তাশক্তি অতীব শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। তোমার হৃদয়কে নবভাবে গঠিত করিতে হইবে, যাহাতে নবশক্তির জাগরণে ও অধিক ভারে ভাসিয়া না যায়। হৃদয়কে অচঞ্চল রাখিতে হইবে। শক্তির বিকাশে চঞ্চল হইলে চলিবে না। শক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া সাধন পথে অগ্রসর হইতে হইবে, নচেৎ অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। শক্তির বিকাশে মুগ্ধ হইয়া তাহার অযথা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেই অচিরে অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। ইহাকে ধীর ভাবে উপেক্ষা করিয়া নিয়ন্ত্রিত কর, শান্তির অধিকারী হইতে সক্ষম হইবে। আদর্শের

উপলব্ধির সহিত যে তরঙ্গরাশির বিকাশ হইবে, তাহাকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিতে হইবে। নচেৎ ইহার তরঙ্গ বিক্ষেপে হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিবে। ইহা এক প্রকার মদোন্মাদ ও প্রতিষ্ঠিত আদর্শের অদমনীয় তেজ।

অগ্রসর হইবার ইহাই পথ। ইচ্ছাশক্তির ক্রমোন্নতিই প্রথম স্তর। কেমনে ইহাকে সাধিত করিতে হইবে?—অনুশীলন। বর্ত্তমান জগতে মহাশ্চর্য্যের ন্যায় রামমূর্ত্তি কি প্রকারে তাহার শারীরিক উন্নতি সাধন করিলেন?—অনুশীলন। বিবেকানন্দ কি প্রকারে তাঁহার ভীষণ আকর্ষণী শক্তি জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন, যাহার দ্বারা চিকাগোর ধর্ম্ম-মহাসভা প্লাবিত হইয়াছিল?—অনুশীলন। অনুশীলনই উন্নতির প্রথম, শেষ ও একমাত্র উপায়। চৈতন্যরাজ্যের নানাবিধ জটিল কর্ম্মের মধ্যে ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ বিকাশই মানবের উন্নতির চরম সীমায় আরোহণ। মানবের ইচ্ছাশক্তি বিধাতার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দান। ইহার প্রভাবে মানব আপনাকে অতীব নিম্ন স্তর হইতে উচ্চ স্তরে লইয়া গিয়া, পবিত্রতায় অনুন্নত সিংহাসনে উপবেশন করাইতে পারে। আপনি ইহার প্রকৃত অধিকারী হইলে, ইহার প্রভাবে অপরকেও এই পথের বিপদে সাহায্য করা সম্ভব। অজ্ঞানান্ধ মানব অনেক সময় ইহার বিকাশে আত্মহারা হইয়া কর্ত্তব্য বিস্মরণ হইয়া যায় ও ইহার অপব্যবহার করিয়া পুনরায় আপনাকে অধঃপতনের নিম্নস্তরে নিক্ষেপ করে। যাহারা ইহার প্রভাবে মুগ্ধ না হইয়া, ক্রমশঃ ধীর ভাবে সাধনার পথে অগ্রসর হইয়া যায়, তাহারা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে ও হৃদয়-দেবতার দর্শন লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিয়া অমরত্ব প্রাপ্ত হয়।

শক্তির আবির্ভাবের সহিত মানসিক চাঞ্চল্যেরও আবির্ভাব হইয়া থাকে। চাঞ্চল্যকে দমন করিবার জন্য কেন্দ্রীভূত মনের আবশ্যক। মনকে কোন বিশেষ লক্ষ্যে আবদ্ধ করার নাম কেন্দ্রীকরণ। শক্তির আগমনেও যদি মন সেই কেন্দ্রেই আবদ্ধ থাকে, (অর্থাৎ বিশ্বপিতার চরণেই সংযুক্ত থাকে) ও তাহার প্রাপ্তির জন্যই নবশক্তিকে সেই পথে চালিত করা হয়, তাহা হইলে আর কোন প্রকার আশঙ্কা থাকে না। মনকে কেন্দ্রীভূত করিবার দুই প্রকার উপায় আছে। আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল চিত্তের পক্ষে প্রথমই প্রযোজ্য। দ্বিতীয় সাধনের উপযুক্ত কে?—যাহার অপরের উপদেশের আবশ্যক নাই ও যাহার আত্মোন্নতি একটা স্বাভাবিক ঘটনার ন্যায়। তাহারা আপনিই আপনার উপদেষ্টা। মনকে কোন

মানসিক কার্য্যে আবদ্ধ পূর্ব্বক দৈনিক অর্দ্ধ ঘণ্টা সেই কার্য্য কর। প্রত্যহ ইহা নিরূপিত সময়ে সম্পন্ন কর ও ক্রমশঃই ইহার স্থায়িত্ব বর্দ্ধিত কর। যদি কোন মানসিক কর্ম্ম তুমি খুঁজিয়া না পাও, নিম্নে ইহার যৎকিঞ্চিৎ বিবৃত করা হইল :—

প্রথমে শারীরিক ও মানসিক চাঞ্চল্যতা দূরীভূতপূর্ব্বক প্রশান্ত ভাব আনয়ন কর, কিন্তু সতত অটল ও সতর্ক থাকিবে। প্রথমে যে কোন একটি উচ্চ ভাব গ্রহণ কর। পবিত্রতা। পবিত্রতা সম্বন্ধে নানাবিধ গ্রন্থ পাঠ করিতে থাক, ইহা তোমাকে আবশ্যকীয় সংবাদ সরবরাহ করিবে। শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ইহা অধ্যয়ন কর। অতঃপর স্থিরভাবে উপবেশন পূর্ব্বক ইহার সম্বন্ধে চিন্তামগ্ন হও। ইহা কি? কেমনে ইহা অভ্যাস করা যায়? মনুষ্যসমাজে ইহার উপকারিতা ও মর্য্যাদা, ইহার উন্নত ও নির্ভীক করিয়া তুলিবার প্রচ্ছন্নশক্তি, এবং দ্রুত ক্রমোন্নতির নিমিত্ত ইহার প্রয়োজনীয়তা। মনকে ইহার এবম্বিধ উপকারিতা সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করাইয়া অনুধ্যান করিতে থাক। ইহাতেই বাস কর। প্রগাঢ় আন্তরিকতার সহিত ইচ্ছাশক্তিকে জাগরিত করিয়া যাহাতে ইহা তোমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়, তাহার উপায় কর। যে সময় তুমি এইভাবে উপবেশন করিয়া এই প্রকার চিন্তায় নিমগ্ন হইবে, তোমার কেন্দ্রীভূত ইচ্ছাশক্তি ও অপরাপর শক্তিসমূহও পবিত্রতার পথেই চালিত হইবে। তোমার মস্তিষ্কে এক প্রবল শক্তির উন্মেষ হইবে ও কুচিন্তা, কুপ্রবৃত্তিকে ভীষণ বাধা প্রদান করিবে। তোমার সারা প্রকৃতি নবভাবে স্পন্দিত হইতে থাকিবে। প্রবৃত্তিনিচয় ধীরে ধীরে হতবল হইয়া তোমার নবজাগরিত মন হইতে অপসারিত হইয়া যাইবে। ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক চৈতন্যের বিকাশ লাভ হইতে থাকিবে। তোমার ইচ্ছাশক্তি সবল হইবে। শরীর তোমার ইচ্ছাশক্তির দ্বারা পরিচালিত হইবে। আভ্যন্তরীণ শক্তি ও তেজ ক্রমশঃ উন্মেষিত হইবে।

ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে তোমার অভিলষিত যে কোন পথে তোমার মনকে চালিত করিতে পারিবে। এক দিবসে, এক সপ্তাহে ইহার অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়। মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর গভীর অধ্যবসায় সহকারে সাধন করিতে থাকিলে তবে সাধনায় সিদ্ধিলাভ সম্ভব। যদি কার্য্যে যথার্থ প্রাণ মন সমর্পণ কর, প্রারম্ভেই গভীর আত্মবিশ্বাস ও শক্তির সাড়া পাইবে।

তিতিক্ষা ও অধ্যবসায় দ্বারা তুমি সফলকাম হইবেই হইবে। এই ভাবে অগ্রসর হইলে, প্রতি দিবস ক্রমোন্নতির পথে এক এক পদ অগ্রসর হইবে। এক পক্ষের অভ্যাসে ইহার সুফল তুমি আত্মজীবনে সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিবে। বিষয়-বাসনায় আকণ্ঠনিমজ্জিত মানবের পক্ষে প্রতি মুহূর্ত্তই মহা মূল্যবান। যাহা একবার অস্তগত হইতেছে, আর তাহা উদিত হইবে না। সত্বর হও। বৃথা কাজে দিনগুলি আর অতিবাহিত করিও না। কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেল। আপন পথ চিনিয়া লও। লোকের নিন্দা ও বিদ্রূপে আত্মবল হারাইও না। কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইও না। যাহাকে ভাল বলিয়া বিবেচনা করিবে, কর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণয় করিবে, জীবন-যুদ্ধে তাহা হইতে আপনাকে দূরে লইয়া যাইও না। কে বলিতে পারে, কোন মুহূর্ত্তে কালের বিষাণ বাজিয়া উঠিবে। সংসারে কোন আকর্ষণ, কোন আত্মীয় পরিজন, তোমাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। তোমাকে যাইতেই হইবে। সব কাজ অসমাপ্ত রাখিয়া বাসনাকে, অতৃপ্ত রাখিয়া তোমাকে কালের অনুসরণ করিতেই হইবে। ব্যর্থ জীবনের ব্যর্থ দিনগুলি অতিবাহিত করিয়া তোমাকে চলিয়া যাইতে হইবে। একাগ্রচিত্ত হও, স্থির-প্রতিজ্ঞ হও, ডালকুত্তার ন্যায় নাছোড়বান্দা হও। অন্যের সহিত তর্ক বিতর্কের আবশ্যক নাই। নীরবে, নির্জ্জনে, লোকচক্ষুর অন্তরালে স্বকর্ত্তব্য সাধন করিয়া যাও। আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করিয়া তোমার সব অসুবিধা, সব ক্লেশ সফল হইবে। তোমার আত্মসুখ লাভের জন্য জগতের স্তুতিবাদ বা প্রশংসার আবশ্যক নাই; তোমার আভ্যন্তরীণ শক্তির বিকাশের বিমল আনন্দই তোমার যথেষ্ট। তুমি আপনাকে প্রকৃত উন্নত করিতে সক্ষম হইলে জগতেও তোমাকে সম্মান দেখাইতে বাধ্য হইবে। আপনার ভাবেই নিমগ্ন থাক। অগ্রে আপনাকে উন্নত কর, পরে অপরের জন্য ভাবিও। আপনাকে পশ্চাতে রাখিয়া অপরের জন্য ভাবিতে গেলে হাস্যাস্পদ হওয়া ভিন্ন আর কিছুই লাভ হইবে না। অতিরিক্ত বাহাদুরী দেখাইবার প্রয়োজন কি? আপনি প্রবৃত্তির পঙ্ক হইতে উত্থিত হও, তোমার দৃষ্টান্তজগতের অনেক উপকার সাধন করিবে। নচেৎ একুল ওকুল দুকুলই যাইবে। আদর্শে মনকে কেন্দ্রীভূত করিয়া অগ্রসর হও। অপরকে জোর করিয়া তোমার আদর্শ দিতে উৎকণ্ঠিত হইও না অথবা অপর কর্তৃক দত্তও গ্রহণ করিও না:—

"To your own self be true,
And it must follow, as the night the day,
Thou can'st not then be false to any man."

সূক্ষ্ম, গভীর, বুদ্ধিমত্তা আবশ্যক। অদৃষ্টবাদের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। অচ্ছেদ্য কঠিন প্রস্তর খণ্ডের উপর লৌহশলাকা গ্রথিত করিতে সচেষ্ট হইও না। ধীর ও গম্ভীর চিন্তার দ্বারা তোমার এই শক্তির বিকাশ হইবে। সামান্য অধ্যয়ন কর—কিন্তু তৎ সম্বন্ধে গভীর চিন্তা করিতে থাক। অধ্যয়িত বিষয়ের অন্তস্থল পর্য্যন্ত তোমার হৃদয়ে প্রতিফলিত হউক। পবিত্রাত্মা মহাপুরুষগণের সংস্পর্শে তোমার বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিপুষ্ট করিবে। পবিত্রতার সূক্ষ্ম ও শক্তিময় আলোকরশ্মি তোমাতে প্রবেশ করিবে।

উন্নত মনের স্পন্দন তোমার গ্রহণক্ষম চৈতন্যের উপর আঘাত করিবে। ইহার অশিষ্টতাকে কম্পিত করিয়া তুলিবে। বীজ নিহিত করিবে, সুদূর ভবিষ্যতে যাহার উন্মেষ হইয়া তোমার চৈতন্যের জাগরণে সাহায্য করিবে। সর্ব্বদা সাধু সঙ্গে (সৎ সঙ্গে) বাস করিতে সচেষ্ট হও। তাহাদের চিন্তার আকর্ষণী শক্তি তোমাকে পরিবেষ্টন করুক। নিগূঢ় আধ্যাত্মিক প্রভাব সূক্ষ্মভাবে তোমাতে কার্য্য করুক। কেবলমাত্র তাহাদের সাহায্য তোমার অদৃশ্য শক্তিকে জাগাইয়া তুলিবে। তাহাদের স্পর্শে তোমার শরীরে নব ভাব সঞ্চারিত হইবে। আধ্যাত্মিকতা শারীরিক ব্যায়াম নহে।

ইহাই জীবনাশক্তি, জীবনই ইহা বহন করিতে পারে। দূরে অতি দূরেও তোমার কর্ণে তাহার বাক্যসুধা নিয়ত ধ্বনিত হইতে থাকিবে। তাহার মূর্ত্তি সতত তোমার হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে ও তোমাকে নব ভাবে অনুপ্রাণিত করিবে। তাই ভারতে ধর্ম্মোপদেষ্টাগণের এত সম্মান, এই নিমিত্তই তাঁহারা সকলের নিকটেই পূজা পাইয়া থাকেন। এই ভাবে যখন তোমার এই সরল অভ্যাসের অধ্যায় সমাপ্ত হইবে, তোমার আভ্যন্তরিক জাগ্রত চৈতন্য সমস্ত কার্য্যকলাপ তোমার আদর্শানুযায়ী গড়িয়া তুলিবে। বাধা বিঘ্ন দূরে নিক্ষিপ্ত হইবে। কণ্টকাকীর্ণ পথ ক্রমশঃ সরল ও সহজসাধ্য হইয়া আসিবে। তোমার বাক্য, চিন্তা ও কার্য্যকলাপে তোমার মোহাচ্ছন্ন চৈতন্যের জাগরণের সাড়া পাইবে। আপনাকে জাগাইয়া তুলিয়া তুমি জগতের সম্মুখে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করিবে।

মৃত্যুর ভয়াবহ ছবি আর তোমার মানসপটে উদিত হইয়া তোমাকে ম্রিয়মান করিয়া তুলিবে না। জীবন ধারণ স্বার্থক জ্ঞান করিবে। ভালবাসা, প্রেম ভক্তি ও শান্তিবারি তোমা হইতে প্রবাহিত হইয়া শত শত ব্যক্তিকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। ইহাকে সাবধানে রক্ষা কর ও সৎ উদ্দেশ্যেই ইহাকে নিয়োজিত কর। তোমার দেহ মন পবিত্র হইয়া তোমাকে দেবতায় পরিণত করিবে। বিশ্বপিতা সতত তোমার হৃদয়পটে উদিত থাকিবেন। জগতের কোন বন্ধনই আর তোমাকে বাঁধিতে পারিবেঁ না। ওঁ শান্তিঃ।

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র বিশ্বাস।

সংসার।

সংসার ভীষণ তুমি অতি ভীমকায়
কে বলে সুন্দর তোমা সব ভ্রম হায়।
সংসার তোমার রূপ যদিও সুন্দর
ভিতরে গরল ভরা বহির্মনোহর।
কিনা পার এ জগতে করিতে সৃজন
ভুলাইয়া দাও তুমি শ্রীমধুসূদন।
সংসার সুন্দর তুমি সংসারীর পক্ষে
সংসার গরল তুমি বিবেকীর চক্ষে।
কে না জানে হে সংসার তোমার মহিমা
উদরে সঞ্চিত যাহা নাই তার সীমা।
তুমি পার সৃষ্টি স্থিতি করিবারে লয়
তোমার কুহকে সাধু পথভ্রষ্ট হয়।
সংসার তোমার পদে কোটী নমস্কার
হেথা নাই কিছু ওগো অসাধ্য তোমার।
সাধুর সাধনা যাহা পরমার্থ ধন
অনায়াসে পার তাহা করিতে হরণ।

সংসার ছলনা তব কে বুঝিতে পারে?
মোহেতে আচ্ছন্ন কর জ্ঞানহীন নরে
হে সংসার তব রাজ্যে এ কি অত্যাচার?
জীব করে জীবনাশ ভীষণ আচার!
হে নৃপতি! নাহি শক্তি রক্ষিতে কি জীবে
সংসার পাপের রাজ্য চির দিন রবে?
অর্থ অর্থ এই বাক্য এ সংসারময়
অর্থের কারণে বল কিবা নাহি হয়।
যে সন্তান মাতৃ স্তনে হয়েছে বর্দ্ধিত
সে আজ প্রহারে মায়ে নাহি হয় ভীত
নৃপতি ভিখারী হয়, ভিখারী নৃপতি
অল্পেতে মিটেনা আশা, অর্থে বড় মতি।
যে মানব স্বীয় করে হতভাগ্য জীবে
নিধন করেছে পাপ ছাপা আছে ভবে।
অথবা প্রকাশ হলে কি ভয় তাহাতে
আনিত রৌপ্য মুদ্রা আছে তার হাতে।
কুলবতী নারী যায় কুলতেয়াগিয়া
মাতা করে পুত্র নাশ পাপেতে মজিয়া
হে সংসার তব পদে কোটী নমস্কার
জগতে কিছুই নাই অসাধ্য তোমার!
আমারে মুকতি দাও উদর হইতে
এই শুধু ভিক্ষা চাই তোমার পদেতে॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণাশ্রিতা
সেবিকা শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী।

আত্ম-প্রসাদ।

ঠাকুরের ভক্ত "কাঙ্গালের" নিকট শুনিয়াছিলাম যে, কাশীতে এক মহাত্মাকে তিনি দেখিয়াছিলেন। তিনি থমাস্ এ, কেম্পিস্ (Thomas A Kempis) লিখিত "খ্রীষ্টের অনুকরণ" (Of the imitation of Christ) বহিখানির কোন না কোন অংশ রোজই একবার পাঠ করিয়া থাকেন। আমি কৌতূহল ক্রমে ঐ বইখানি পড়িয়াছিলাম। যতদূর স্মরণ হয়, উহার কোন অধ্যায়ে লিখিত আছে, "সত্য সত্যই আমরা কি পড়িয়াছি উহা দ্বারা আমাদের পরীক্ষা হইবে না—পরীক্ষা হইবে আমরা কি করিয়াছি উহা দ্বারা।"

তাই আজ ভাবিতেছিলাম, "তত্ত্ব-মঞ্জরী", "উদ্বোধন", "ঠাকুরের জীবনী", "মহাত্মা রামচন্দ্রের জীবনী", "স্বামিজীর জীবনী" "কথামৃত", "মহাত্মা রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী", "স্বামিজীর বক্তৃতাবলী" এ সব তো পড়িলাম। কিন্তু বলিতে লজ্জা বোধ হয়—আমার চক্ষু ফুটিল না। যে সকল গ্রন্থের এক বর্ণ পড়িয়া মানুষ জীবনের দিক ঠিক করিয়া লয়—স্রোত ফিরাইয়া দেয়, তাহার সব পাঠ করিয়াও এ হতভাগ্যের কিছুই হয় না, ইহা সামান্য পরিতাপের বিষয় নহে।

পৌষের তত্ত্ব-মঞ্জরীতে (২৭৭ পৃষ্ঠা) কোন ভক্তবীর লিখিয়াছেন:—

"কত জ্ঞানী চূড়ামণি, বিবেকীপ্রবর,
কত ভক্ত, উদাসীন, সাধু, যোগীবর,
কত শত অবিবেকী নীচাসক্ত নর,
গৃহী, দণ্ডী, ধর্ম্মী, কর্ম্মী আদি সর্ব্ব নর
লভিয়া ধরম শিক্ষা তোমার গোচর।"

* * * * *

"পশু প্রকৃতির কত অসংখ্য পামর,
মদ্যপ, দুষ্কৃতাচারী, বেশ্যাসক্ত নর,
নরাকারে প্রেতরূপী সঙ্কীর্ণ অন্তর,
শত শত জীবঘাতী নির্ম্মম বর্ব্বর
লভিলা মানব নাম কৃপাতে তোমার।"

আমি উপরোক্ত লাইন কয়েকটী বেশ করিয়া পড়িলাম। ষোলাটা কাছেই

আছে—ইচ্ছা হইল একবার হাতড়াইয়া দেখি—দেখিলাম ঝোলাটার সেলাই খুলিয়া গিয়াছে, তলদেশ ফাঁকা, ধারণ করিবার শক্তি নাই।

আর একবার, ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে, ঝোলা হাতড়াইবার আবশ্যক হইয়াছিল। সেবারেও ঝোলায় হাত ডুবাইয়া দিয়া দেখিলাম, তলদেশ ফাঁকা—মুখও যেমন খোলা—তলাটাও তেমনি। কথাটা খুলিয়া বলা যাউক। ঠাকুরের কোন ভক্ত তত্ত্ব-মঞ্জরীতে আমার দুই একটী প্রবন্ধ পড়িয়া আমাকে একজন "কেষ্টা-চোমরা" ঠাওরাইয়া আমাকে একখানি চিঠি লেখেন। যতদূর স্মরণ হয়, তিনি ঐ চিঠিতে আমার নিকট কিছু উপদেশ চাহিয়াছিলেন। আমি তাঁহার পত্রের উত্তর দিয়াছিলাম কিন্তু উপদেশের কথা বিশেষ কিছুই লিখি নাই। কারণ তাঁহার চিঠিখানিতে বড়ই উৎকণ্ঠা ছিল—আমি দেখিলাম আমি তাঁহাব পদ লেহনেরও যোগ্য নহি—উপদেশ কি দিব? ভক্তটী পাছে দুঃখিত হ'ন এই আশঙ্কায় ঝোলাটায় হাত দিলাম, কিন্তু ঝোলাটা ঝাড়িতে গেলেই আমার বড় মুস্কিল হয়—ঝোলাকে বারম্বার এ পাট সে পাট করিয়া আছড়াইলেও কিছু বাহির হয় না। ঝোলাটা কাঁধের সঙ্গে ঝুলান আছে—এই পর্য্যন্ত। ভাষায় স্বর বর্ণের (৯) ৯কারের মত আমার ঐ ঝোলাটা কাঁধের সঙ্গে ঝুলান আছে বটে, কিন্তু কোন দিন উহা দ্বারা বিশেষ কোন কাজ হয় নাই, আমি উহাতে কিছু জমা রাখিতে পারি নাই। ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু পাই, তা' আমি তখনই খাইয়া ফেলি, জমার ঘরে থাকে কেবল ঐ অপদার্থ (০) শূন্যটা। তবে শূন্যটাকে আমি ফেলিয়া দিতে কুণ্ঠিত—কারণ ভাগ্যক্রমে সংসারসাগরে ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমি দাড় টানিতে পারি—সেই সময় আমি তাঁহাদের দত্ত (১) একের ডান দিকে শূন্যটাকে (০) বসাইয়া দিয়া চরিতার্থ হই! তাঁহারা যত দিন হালের কাছে থাকেন ততদিন নৌকাখানা বেশ চলে—আর তাঁরা যখন চলিয়া যান, তখন আমি ঐ শূন্যের বোঝাটাকে বা খালি ঝোলাটাকে কাঁধে ফেলিয়া চলিতে থাকি।

তার পর—যে কথাটা তুলিয়াছিলাম। কথাগুলির মধ্যে জীবনীশক্তি থাকিলে উহা যে ভাবেই বলনা কেন মর্ম্মস্পর্শী হয়। উহা অমর-কবি চণ্ডিদাসের কথায় "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশে" ও প্রাণটাকে আকুল করিয়া তুলে। গোলাপ ফুলের গন্ধ গোলাপের নাম বদলাইয়া গোবর ফুল রাখিলেও একই

থাকিবে। তাই দয়াল ঠাকুর আড়ম্বরহীন ভাষায় অতি সহজ কথায় উপদেশ দিয়া কত পাণ্ডিত্যাভিমানীর দর্প চূর্ণ করিয়াছেন। এখন ঠাকুরের ভাবটী অস্থিমজ্জাগত না হইলে অর্থাৎ ঠাকুরের কথায় "চাপরাশ না পাইলে" তুমি কি উপদেশ দিবে—আর লোকেই বা শুনবে কেন? তোমার চাপরাশ কোমরে বাঁধা থাকিলে লোকে তোমার কথা বাধ্য হইয়া শুনিবে—না শুনিলে, তুমি চাপরাশের জোরে তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে।

কথায় বলে "আপনার শোবার ঠাঁই নাই—শঙ্করাকে ডাকে।" আমি কি উপদেশ দিতে পারি? আমারই ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। আমি যে সকলের চেয়ে কুলীন! মানুষকে তো তবু বুঝাইলে বুঝে। আমাকে বুঝাইতে হইলে লোহার মুগুর হাতে নিয়া বসিতে হয়। তা আবার পিঠে মারিলে হয় না। শিরায় গ্রন্থীতে অথবা সন্ধি স্থলে মারিতে হয়। তার কারণ আমার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, ইন্দ্রিয়গুলি সকলই অসাড়। মুগুরের দুই এক ঘা মেরে আমায় তুমি পোষ মানাইতে পারিবে না। সাধারণ অগ্নির উত্তাপে আমাকে গলান অথবা দুই এক কলসী জল আমার মাথায় ঢালিয়া আমাকে প্রকৃতস্থ করিতে চাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

যোগীর শীত গ্রীষ্মে, সুখ দুঃখে সমভাব—আর আমারও—মার ধর, আদর কর, আপ্যায়িত কর, সমান ভাব। খুবই কপাল জোর—বিনা সাধনাতেই এ সব হ'য়ে পড়েছে!!! যোগীর আসন শীত গ্রীষ্ম সুখ দুঃখের উপরে, তাই তিনি কিছুতেই বিচলিত হন না। আমার স্থান ঐ গুলির (শীত গ্রীষ্ম সুখ দুঃখের) নীচে—কাজেই উহার কারণ বুঝিলেও মানে বুঝি না এবং বুঝিলেও ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। আমি অন্যায় করিতেও বেশ মজবুত আছি—কারণ ওটা আমার ধাতে বেশ সহ্য হয়, আর ভাল কাজও দুই একটা না করিতে পারি এমন নয়, ওটা ও একরূপ সহাইয়া লইয়াছি। কোনটীতেই বিচলিত নহি। খেয়ালে চলি—যখন যেটা আমার ঘাড়ে চাপে তখনই সেটা করিয়া ফেলি। তবে কি জান—এই খারাপ কাজটা ঐ খেয়াল ভায়ার চাপে যখন করিয়া ফেলি তখন ঠাকুর আমায় সহজে ছাড়েন না। অন্যের বেলা বিচারটা তিনি মুলতবী রাখেন বোধ হয়, কিন্তু আমার বেলা তিনি একেবারে "সামারি" বিচার করিয়া ফেলেন। "সামারি" বলি এই জন্য যে মানুষের মিয়াদ তিন বৎসর, তিন মাস

অন্ততঃ তিন দিন। কিন্তু আমার একেবারে নগদ কারবার—ধারে বিক্রয় নাই—ঠাকুর তখনই আসল, সুদ ও চক্রবৃদ্ধি হারে তস্য সুদ আদায় করিয়া লইয়া আমায় ছাড়েন। আমি তখন কিছুদিনের জন্য নরম কাটি, তারপরই আবার পালা আরম্ভ করি। তার কারণ আমার বড় একটা লজ্জা বা দুঃখ বোধ নাই। শাস্তি কি জন্য হইল ইহা মোটামোটি উপলব্ধি করিতে পারিলেও শাস্তি ভোগ করিতে আমি বেশ মজবুত আছি। শোক হউক, তাপ হউক, তারই ভিতর আমি বেশ চলি ফিরি—তুমি আমায় চব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় খেতে দাও, দুগ্ধ-ফেন-নিভ-শয্যায় শুইয়ে রাখ, তা আমার বেশ চলবে। আবার এক পয়সার চানাচুর খাওয়াও, আর বলে দাও ঐ গাছতলাতে শুয়ে থাকিস্, তাও আমি বেশ পুষিয়ে নিতে পারি। ওর মানে আমি পশুর ন্যায়ই চলিফিরি—কোনটা ভাল কোনটা মন্দ জ্ঞান নাই বা কখন কখন জ্ঞান হইলেও প্রকৃতি তারা দৃঢ় আকর্ষণে আমাকে তারই দিকে টানিয়া লয়।

জ্ঞান ও ভক্তির গুরুত্ব, লঘুত্ব, অপকর্ষ, উৎকর্ষ, ব্যাস, ব্যবধানের তারতম্য করিতে গিয়া দর্শন, বিজ্ঞান এবং কখন কখন জ্যামিতীর শরণাপন্ন হইতে হয়। এই ব্যাপার লইয়া স্থানবিশেষে হাঙ্গামা ও ফ্যাসাদ বাধিয়া যায়। কিন্তু ঐ ত্রৈরাশিক কশিয়া কোন ফল হয় কি? জ্ঞান ও ভক্তি স্বামী স্ত্রী। কেউ কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। যিনি জ্ঞানী তিনিই ভক্তিমান। যিনি ভক্তিমান তিনিই জ্ঞানী। ভক্তিহীন জ্ঞান জ্ঞানই নয়। আর জ্ঞান না হইলে ভক্তিই বা আসিবেন কেন? সে যে কাজলের আমসত্ত্ব হইবে। আমাকে উহারা একত্রে ভালবাসে না তাই এত বকিলাম। জ্ঞানকে ডাকিলে সে বলে আরে আমার আসিতে আপত্তি কি, দেখ ভক্তি রাজি আছে কি না? আমার একলা যাওয়া পোষায় না। ভক্তি সঙ্গে না গেলে আমি কাকে নিয়ে যাই, গেলেও যে আমি থাকিতে পারিব না। আবার ভক্তির দুয়ারে গেলে তিনিও তাই বলেন। তারা আসে না কেন? তার মানে চারিদিকে পুতিগন্ধময়, আসিয়া মুহূর্ত্তও দাঁড়াইতে পারে না। সুতরাং আমার কেবল হাঁটাহাঁটি সার হয়। মোকদ্দমার জোর না থাকিলে কৌন্‌সিল কি করিবে? রোগীর প্রাণ যখন কণ্ঠাগত তখন তুমি ধন্বন্তরীকে ডাকিয়া নাম কিনিবে মাত্র। ফল হয় কি?

ঠাকুরের নাম করি—বড় একটা বর্ম্ম পরিধান করিয়া বসিয়া আছি।

আত্মপ্রসাদ জন্মে না কেন? ঠাকুরের নামটী যখন মিঠা লাগিয়াছে, একবার দুইবার নয়, বহুবারে, আর বহুবার কেন প্রতিপলকে প্রতিমুহূর্ত্তে যখন ঠাকুরের অযাচিত করুণার উপলব্ধি করিয়াছি, তখন আমার তৃপ্তি নাই কেন? ঠাকুরকে কি তবে বিশ্বাস করি না? না! না! নিশ্চয়ই বিশ্বাস করি। কিন্তু নিজের দিকে আবার যখন তাকাই, তখন ভাবি কৈ আমি তৃপ্ত, সন্তুষ্ট বোধ করি না কেন? আবার আমার অভাব কি তাও খুঁজিয়া পাই না।

সুখ দুঃখ সমভাবে সহিতে পারিলাম ইহাতে কি পৌরুষ বেড়ে গেল? কে সহে না? অল্প বিস্তর সকলেই জগতে সহিয়াছে, সহিতেছে ও সহিবে। স্বামী স্ত্রীকে তাড়না করে। মনীব চাকরকে তাড়ায়, না সহিলে যে সমস্ত জগৎটা কক্ষচ্যুত হইত। আর ওরই শেষ পরীক্ষা হইয়াছে কোথায়? ঠাকুর অনুগ্রহ করিয়া ততদূর আনেন নাই তাই ঐ বড়াই। চানাচুর খাও আর গাছতলায় শুয়ে থাক—সেও তো একটা ব্যবস্থা বটে। দুই তিন দিন পেটে কিছু না পড়ুক, অথচ কন্‌কনে শীতে খালি গায়ে গাছের নীচে বসিয়া দেখা যাউক দেখি—তখন বোঝা যায় এই সমভাবটার দৌড় কতদূর। তবে হ্যাঁ, এইটুকু বলিতে পার আমার শরীর ধারণ করিতে যাহা অত্যাবশ্যকীয় তাহা পাইলেই আমি তৃপ্ত—আমি রাজার হালে থাকিতে চাহিনা এবং থাকিতে ঘৃণা বোধ করি, ও তৃপ্তি আসিতে পারে না, আত্মপ্রসাদ জন্মিতে পারে না। তার কারণ আমি দুই নৌকায় পা দিয়াছি।

"দ্বি দল বান্দা কলমা—চোর
না পায় ভেস্ত না পায় গোড়।"

আমি দুই দলেরই বান্দা হইয়া কলমা চুরি করিয়া বসিয়া আছি। তাই আমার কোথাও স্থান নাই। দুই পন্থার একটী অবলম্বন করিলেই সকল গোল চুকিয়া যাইত। হ'য় ঠাকুরের উপর সব ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে যাও। "অচল অটল" হয়ে বসে থাক। আর না হয় মায়ের আবদারে ছেলে হয়ে জোর করে লুটপাঠ কর। কিন্তু সে জোর করিতে হইলে মায়ের "ছেলে" হওয়া চাই। সেই শক্তি অর্জ্জন করা চাই। সে কথার উত্তর ঠাকুর নিজের শ্রীমুখেই দিয়াছেন:—

"জল জল করিয়া চেঁচাইলে তৃষ্ণা মিটিবে না, তৃষ্ণা দূর করিতে হইলে জল খাইতে হইবে।"

জগতের কোন সুখের সঙ্গে যে সুখের তুলনা হয় না, যাহা বাজারের পণ্য দ্রব্যের মত সস্তা নয়, তাহা কি হইলে পাওয়া যায়, ইহাই প্রথম বুঝা আবশ্যক। এতো বীজগণিতের ফরমুলা বা ত্রৈরাশিক নয় যে ফরমূলা বা একস্ (x) ধরিলেই মিলিয়া যাইবে। এখানে ফরমূলা বা একস্ ছাড়া আরও একটা দ্রব্যের আবশ্যক। সেটী হ'লে ফরমূলা বা ত্রৈরাশিকের ফাঁদ না পাতিলেও চলিতে

পারে। সেটা "চিত্তশুদ্ধি।" তার বেলায় তোমায় পাতিপাতি করিয়া খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, আর এর বেলায় তুমি বড় গলা করিয়া চেঁচাইবে। তুমি কাঁচা তেঁতুল খাইবে, অর বাধাইবে, আর বলিবে ঠাকুরের ইচ্ছা—কি করা যায়। আ মরি মরি! কি ভক্ত!

তোমার মনে বল নাই! নাই কেন? ঠাকুর দাতা বটে। তিনি দিয়া থাকেন—অনবরতই দিচ্ছেন। তুমি গ্রহণ কর কৈ? তোমার ঝোলাটায় যে ছিদ্র আছে উহা "টাক" করিয়া বন্ধ করিয়া লও দেখি—ওটা বন্ধ না করিলে তোমার প্রাপ্য জিনীস যে গলিয়া বাহির হইয়া যাইবে।

কেন তুমি দুর্ব্বল? তুমি সিংহ শাবক, ঠাকুর তোমার সহায়—তুমি শৃগাল নও। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" তুমি চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না—তোমাকে জাগিতে হইবে, উঠিতে হইবে তোমাকে যুদ্ধে অগ্রসর হইতে হইবে, যুদ্ধ করিতে হইবে। ঠাকুরের ভক্ত তুমি তোমার কেবল লেজ নাড়িলে চলিবে না। যুদ্ধে অপারক হও, পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিও না। কাপুরুষ পিট দেখাইওনা—মরিয়া যাও—যেখানে আছ সেখানে দাঁড়াইয়া মরিয়া যাও—শত্রুর অস্ত্রের অপেক্ষা করিও না, নিজের অস্ত্রে নিজেকে শতধা ছিন্ন কর—এ মৃত্যু আত্মহত্যা নহে। এ অমরত্ব লাভ। হৃদপিণ্ড উপড়াইয়া ফেলিয়া দাও, বিড়াল ছানার মত মিউ মিউ করিলে চলিবে না—চলিত যদি তোমার পূর্ণ আত্মসমর্পণ থাকিত। একবারে না পার দশবার চেষ্টা কর, না হয় আবার আসিও—বারবার জন্মগ্রহণ কর—ক্ষতি কি? এই ভাবে ঘোমটা দিয়া, বিছানায় আরাম লাভ করিয়া আর ঠাকুরের ব্যবস্থার উপর দোষ চাপাইয়া তোমাকে যাইতে দিতে পারি না।

তুমি খোজ শান্তি, তুমি খোজ তৃপ্তি, সন্তোষ, আত্মপ্রসাদ। কোথায় শুনিয়াছ, যজ্ঞে আত্মোৎসর্গ না হইলে আত্মপ্রসাদ জন্মিতে পারে? সুখকে—পৃথিবীর সুখকে, চাহিও না। দুঃখকে বরিয়া লইয়া যাও—গৃহে প্রতিষ্ঠিত কর—আপনাকে বলি দাও! কোথায়—বলিয়া দিতে হইবে কি? বলি দাও কামের কাছে—ক্রোধের কাছে—লোভের কাছে—মদমাৎসর্য্যের কাছে—বলি দাও কর্ত্তব্যের কাছে, দেখিবে আত্মপ্রসাদ আসিয়াছে। ঠাকুর নিজে আত্মপ্রসাদরূপে দেখা দিবেন। তোমার হৃদি-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজ করিবেন।

ভক্তপদাশ্রিত
শ্রীশ্রীবিভনাথ দাস।

মনসাদ্বীপে শ্রীরামকৃষ্ণ-তপোবন ও মহোৎসব।

সুন্দরবন অন্তর্গত গঙ্গাসাগরের সন্নিকট মনসাদ্বীপ নামক দ্বীপে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই আশ্রমের নাম রামকৃষ্ণ-তপোবন। গঙ্গাসাগর যাইতে এই আশ্রমের সম্মুখস্থ নদীর উপর দিয়া হোরমিলার কোম্পানি

নীর জাহাজ ও যাত্রীর বোট সকল গিয়া থাকে। আশ্রমটী গঙ্গার ঠিক পশ্চিম কূলে। গঙ্গা এইস্থানে এত বিস্তীর্ণ যে দেখিতে সমুদ্রের ন্যায়। এইস্থানে ব্যাঘ্রসঙ্কুল যে জঙ্গল ছিল, তাহাতে এই আশ্রমের নাম যে তপোবন দেওয়া হইয়াছে, তাহা ঐ স্থানে যে কেহ গমন করিবেন, তিনিই ইহার যথার্থতা বুঝিতে পারিবেন এবং ইহার মনোরম দৃশ্য দেখিয়া যে পরানন্দ লাভ করিবেন, সে বিষয় সন্দেহ নাই।

এই স্থানে এক-কাঠ জঙ্গল অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ-সমাধি-মন্দির কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে ঠাকুরের সেবার্থে দুই শত বিঘা জমি ক্রয় করা হইয়াছে। এক্ষণে সেই জঙ্গল কাটাইয়া ইহাকে আবাদী জমিতে পরিণত করা হইয়াছে। এ বৎসর যোগোদ্যানের সেবকগণ গত পৌষ মাসের শেষে ঐ স্থানে গমন করেন। একজন সেবক গত বৎসর হইতে অনবরত ঐ স্থানে থাকিয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ ও পুষ্করিণী খনন করাইয়া এবং জঙ্গল কাটাইয়া ইহাকে আবাস স্থলের ও আবাদীর উপযুক্ত করাইয়াছেন। জঙ্গলে ব্যাঘ্রের ভয়, জলে কুমীরের ভয়, একাকী সেই সেবক প্রাণপণ করিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও গুরু মহারাজকে জীবনের একমাত্র ভরসা জানিয়া ঐ কার্য্য করাইয়া পরমানন্দে দিন যাপন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। বাস্তবিক ঐ তপোবনে ইহা তাঁহার তপস্যাই করা হইয়াছে।

বিগত পৌষ মাসের শেষে মনসাদ্বীপের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু মদনমোহন জানা স্বজনবর্গের সহিত মনসাদ্বীপে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার বাটীতে প্রতিপালিত অনেক স্ত্রীলোক গঙ্গাসাগরে চাউল, দাল বিতরণ করিবেন বলিয়া মানস করিয়াছিলেন। ২রা মাঘ, রবিবার লোকজন সমভিব্যাহারে বোটে করিয়া তিনি মনসাদ্বীপ হইতে সাগরে গমন করেন। তথায় সেদিবস পুলিশ কাহাকেও থাকিতে দিলেন না, সকলকেই বিদায় করিয়া দিলেন এবং ঐ বোটসহ লোকজনকে নামিতে দেন নাই। ইঁহারা সন্ধ্যার সময় মনসাদ্বীপে ফিরিয়া আসেন। সন্ধ্যার সময় ইঁহারা সকলে পরামর্শ করেন যে, এখানে শ্রীরামকৃষ্ণভক্তগণ রহিয়াছেন, ইঁহাদের বলিয়া তাঁহাদের আশ্রমে ঐ চাউল, দালে এবং যাহা খরচ হয় সমস্ত দিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহোৎসব করা হউক। প্রাতঃকালে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবকগণের নিকট এই সংবাদ দেওয়া হয়। তাঁহারা যাইয়া মদনবাবুর সহিত পরামর্শ করেন ও যে যে দ্রব্যাদি লাগিবে, তাহার তালিকা প্রস্তুত করেন। কিন্তু সেই স্থানে তৈজসপত্রই বা কোথায়, রন্ধন করিবার ব্রাহ্মণই বা কোথায় এবং দ্রব্যাদিই বা কোথায় মিলিবে? স্থান ঠিক হইল যে, আশ্রমের নিকটে এ বৎসর যেখানে বারোয়ারী হইয়াছে, সেইখানে চাঁদোয়া খাটান আছে, হোগলার চালা আছে, অতএব সেই স্থানেই হউক। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এমনি মহিমা যে সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন যে, রামকৃষ্ণ নামের জোরে সকল দ্রব্যাদি আপনি মিলিবে, কোন কিছুর অভাব হইবে না। কার্য্যেও ঠিক তাহাই ঘটিল।

বুধবার ৫ই মাঘ মহোৎসবের দিন স্থির হইল। মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কোন দ্রব্যেরও যোগাড় নাই, রাঁধিবার জন্য একজন ব্রাহ্মণও পাওয়া যায় নাই। সন্ধ্যার পর সেবকগণ চিন্তিত হইয়াছেন, কি হইবে, সহস্র লোকের আয়োজন হইতেছে, লোককেও সংবাদ দেওয়া হইয়াছে অথচ কিছুই নাই, কয়েক মণ মাত্র চাল ও দাল। রাত্রি ৮টার সময় হঠাৎ বিদেশী উড়িয়া ব্রাহ্মণ ৫ জন আসিয়া বলিল, "বাবাজী! আমরা ব্রাহ্মণ ভিখারী, কিছু ভিক্ষা চাই।" সেবকগণ আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, এই ৫ জন রাঁধিবার ব্রাহ্মণ ঠাকুর পাঠাইয়াছেন! ভয় নাই! সব আপনি আসিবে। বলিতে বলিতে একজন আসিয়া সংবাদ দিল যে হঠাৎ একটা বোটে একটা মাঝি সুজি ও চিনি আনিয়া বলিতেছে, আপনারা সুজি চিনি নিবেন কি? এইরূপে প্রাতঃকালে দেখা গেল ১৩ জন ব্রাহ্মণ জুটিয়াছে, দ্রব্যাদি কোথা হইতে সব আপনি আসিতেছে। তৈজস পত্রাদি অর্থাৎ লোহার কড়া প্রায় ১২।১৪ খানি জুটিয়া গেল। খড়ের বড় জড়াইয়া তাহার ভিতর কাপড় ও পাতা দিয়া খিচুড়ী ঢালাইবার বন্দোবস্ত করা হইল। লুচি হালুয়া খিচুড়ী তরকারী অম্বল ও পায়েস প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইল। যে স্থানে দুই সের দুগ্ধ অতি কষ্টে যোগাড় করা হয়, সেইখানে দুই মণ দুধের পায়েস প্রস্তুত হইল!

ঠাকুরকে সাজাইবার জন্য অতি সুন্দর পাতালতা দিয়া একটী নিকুঞ্জবন প্রস্তুত হইল। তন্মধ্যে ফুলের ও লতাপাতার সিংহাসনোপরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার পদতলে সেবক রামচন্দ্র। রামকৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তনে দিক্ পরিপূরিত হইল। কাঙ্গালের দেশে কাঙ্গালের ঠাকুর কাঙ্গালগণের দুঃখে বিগলিত হইয়া আজ কাঙ্গালবেশে উদ্ধার করিতে আগমন করিয়াছেন, তোরা সব আয় ঠাকুর তোদের আলিঙ্গন করিয়া ক্রোড়ে স্থান দিবেন বলিয়া এই স্থানে আসিয়াছেন, এই ভাবে রামকৃষ্ণ নামে সকলে যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এক দল কীর্ত্তন সম্প্রদায় কীর্ত্তন করিতে করিতে আসিয়া রামকৃষ্ণ নাম কীর্ত্তনে যোগদান করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সে দৃশ্য অভাবনীয়।

ঐ স্থানের অনেক ভদ্রলোক যোগোদ্যানের সেবকগণকে বলিয়াছিলেন যে খিচুড়ী করাইয়াছেন, সব ফেলিয়া দিতে হইবে। এখানে একবার তাঁহারা ৭ মণ চাল রাঁধিয়া সব নষ্ট করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, জাতিবিচার লইয়া তর্কবিতর্ক হইয়া কেহই না খাইয়া চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু রামকৃষ্ণ নামের অপার মহিমার প্রায় এক সহস্র লোক বসিয়া একসঙ্গে মহাপ্রসাদ ধারণ করিয়া কৃতার্থজ্ঞান করিয়াছিল।

উৎসবান্তে সেবকগণ বলিলেন, ধন্য মদনবাবু ও ধন্য সেই স্ত্রীলোক যাঁহাদের উৎসাহে এই সুন্দরবনে আজ প্রথম রামকৃষ্ণ মহোৎসব কার্য্য সুসম্পন্ন হইল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীচরণ ভরসা।

জয় গুরুদেব !!

তত্ত্ব-মঞ্জরী

ঊনবিংশ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা।

চৈত্র, সন ১৩২২ সাল।

আনন্দে ভাসাও।

(১)

আনন্দে ভাসাও মোরে আনন্দে ভাসাও
আনন্দ তুফান মাঝে আমায় ডুবাও
আমার হৃদয় মাঝে যেথানে যা ওগো সাজে
তাই দিয়ে দয়াময় আমায় সাজাও
আনন্দে ভাসাও মোরে আনন্দে ভাসাও॥

(২)

তোমার পবিত্র আলো দেখাও আমায়
আপনা ভুলিয়া আমি নেহারি তোমায়
হোক বিশ্ব ধ্বংশময় গাহিব তোমায় জয়
দাও শক্তি দয়াময় হৃদে শক্তি দাও,
আনন্দে ভাসাও মোরে আনন্দে ভাসাও॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণাশ্রিতা দাসী
শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী

স্বামী বিবেকানন্দের সরলতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের মহৎ উদার প্রাণ কতদূর সরল হইয়াছিল, তাহা যাঁহারা তাঁহার দেবদুর্লভ অলৌকিক জীবনের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারাই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে পারেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় স্বামীজী বাদ দেওয়া কাহাকে বলে জানিতেন না, তাঁহার নিকট পরিত্যজ্য কেহ ছিল না, তিনি জলদ গম্ভীর স্বরে নিজমুখে কতবার বলিয়াছেন, "I have come for construction and not for destruction" "আমি গড়িতেই আসিয়াছি, ভাঙ্গিতে আসি নাই।" অতি বড় দুষ্টই তাঁহার সমধিক কৃপালাভ করিত। তিনি বলিতেন, "আমি এমন ছেলে চাহি না যে নিরীহ গোবেচারী হইয়া সমস্ত গীতাখানি আবৃত্তি করিতে পারে, বরং আমি ঐরূপ সাহসী বালক চাই যে অনায়াসে ব্যাঘ্রের মুখে যাইতেও পশ্চাৎপদ নহে।" ইহাই স্বামীজীর মহাপ্রাণতা ও তেজস্বীতার একটী নিদর্শন। তিনি আপন উদারতার যে জলন্ত নিদর্শন স্থাপন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার শ্রীমুখের নিম্ন উদ্ধৃত উক্তিতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, "I do not belong to any country, nation, cast or creed—I am for the whole human race—I am for the whole world" আমি কোন দেশের, জাতির বা সম্প্রদায়ের জন্য নহি, আমি সমস্ত মানব জাতির জন্য, সমস্ত পৃথিবীর জন্য। পাঠক স্বামীজীর স্বদেশ প্রেম বুঝিলে কি? তিনি সন্ন্যাসীর আদর্শ, সমস্ত জগৎ তাঁহার আপনার, তাঁহার প্রেম সঙ্কীর্ণ বা সীমাবদ্ধ নহে, তাই তিনি ইউরোপ আমেরিকাকে আপনার প্রেমাধীন করিয়াছেন, প্রেমে জগৎ জয় করিয়াছেন। ইহাই মানবজীবনের ধর্ম্ম, ভারতের ধর্ম্ম, প্রত্যেক ভারতবাসীর ধর্ম্ম। হে ত্যাগসর্ব্বস্ব ভারত! তোমার প্রাণ কত উদার, কত বিস্তৃত বুঝিলে কি? তোমারই শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন :—

মাতা চ পার্ব্বতীদেবী পিতা দেব মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশ ভুবনত্রয়ম্॥

ত্রিভুবনই যে তোমার স্বদেশ, জগৎবাসী মাত্রই যে তোমার আপনার! কাহাকে বাদ দিবে, এই জন্যই ভারতবর্ষ ধর্ম্মের মাতৃভূমি—এমন পরকে আপন করিবার

দেশ ত পৃথিবীতে আর নাই। "বসুধৈব কুটুম্বকম" বলিবার স্থান ত আর নাই। তাই বলিতেছি, হে ভারত! তোমার ধর্ম্মশিক্ষা ভুলিও না, তোমার চিরাভ্যস্ত আতিথ্যসৎকার বিস্মৃত হইওনা, তুমিই তো চিরকাল অনশনে, অর্দ্ধাশনে থাকিয়া, স্বীয় মুখের গ্রাসে অতিথীর সৎকার করিয়া ধন্য হও। ইহাতেই ত তোমার অস্তিত্ব, তোমার প্রাণ। এই বিরাট মহাপ্রাণতা লইয়া, স্বামীজী লোকমান্য পদদলিত করিয়া, ভারতের জন্য কাঁদিতেন, কিসে ভারত আবার জাগিবে, কিসে ভারত আত্মানুভূতি করিবে, ইহাই তাঁহার ধ্যানজ্ঞান ছিল। আর তাঁহার প্রেম? তাহা অসীম অনন্ত, তিনি মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসীকে আপনার কোল দিয়া ধন্য হইয়াছেন, এমন কি তাঁহার নিকট ভারতের ধূলিকণাটী পর্য্যন্ত পরমপূত, পরম আদরণীয়, পরমপবিত্র। স্বামীজী সগর্ব্বে আমেরিকায় বলিয়াছেন, আমার ন্যায় কতশত বিবেকানন্দ ভারতের প্রতি রেণুতে গড়াগড়ি যাইতেছে। ইহাই তাঁহার মাতৃভূমির প্রতি শ্রেষ্ঠ অবদান। এমন কি তিনি বহুদিবস পাশ্চাত্যে অতিবাহিত করিবার পর ভারতে প্রথম পদার্পণ করিয়াই সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়াছিলেন। পরম পূজনীয় হিন্দুরাজ সেতুবন্ধ রামেশ্বরাধিপতি তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতঃ পরম শ্রদ্ধা ও সমাদর সহকারে তাঁহার সৎকার করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন। শ্রীগুরুকৃপায় স্বামীজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে এতদূর মহা সম্মানিত হইয়াও আপনার সেই কলিকাতার বালক-ভাব ও দেবদুর্লভ সরলতা একদিনের জন্যও বিস্মৃত হয়েন নাই, ইহাই তাঁহার মনুষ্যত্ব।

পাশ্চাত্য বিজয়ের পর কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া স্বামীজী একদিন তাঁহার গুরুস্থান শ্রীরামকৃষ্ণ-সমাধি-মন্দির কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে তাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গ লাভের একমাত্র উপলক্ষ পূর্ব্ব সম্পর্কীয় দাদা মহাশয় (মাতামহীর সম্পর্কীয় ভ্রাতা, মাতামহীর আপন মাতুল পুত্র) মহাত্মা রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তখন মহাত্মা রামচন্দ্র পীড়িত এবং যোগোদ্যানেই বাস করিতেন। স্বামীজী প্রেমভরে তাঁহার রামদাদার চর্ম্ম পাদুকা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলেন। নিজে এত বড় জ্ঞানী, মহামানী তাহা ভুলিয়া গেলেন। মহাত্মা রামচন্দ্র ইহা দেখিয়া প্রেমাশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না এবং বলিয়া উঠিলেন, "বিলে! তুই কেন পাদুকা স্পর্শ করবি, আমি আপনি লইতেছি। তাহাতে স্বামীজী প্রত্যুত্তর

করিলেন, রামদাদা! তোমার শরীর অসুস্থ, আর আমি যে তোমার সেই বিয়ে” এবং উভয়ের গণ্ডস্থল বহিয়া প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেলাগিল।, আহা কি প্রেম!

পাঠক! ইহাতে কি অনুমিত হয় না শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সন্তান স্বামিজীর প্রাণ কত প্রেমপূর্ণ ও উদার, ও সরলতার আধার ছিল! অসীম লোকমান্য তুচ্ছ করিয়া আপনাকে কিরূপ সরল বালকের ন্যায় জ্ঞান করিতেন! স্বামীজী পাশ্চাত্যে কত বহু মূল্য বস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়াও কলিকাতায় একটী সামান্য গেঞ্জি এবং একখানি উত্তরীয় ব্যবহার করিতেন এবং উহাতেই কত আনন্দ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার শ্রীচরণ কমলে প্রার্থনা করি, যেন তাঁহার কৃপায় আমাদের মনুষ্যত্ব লাভ হয়।

“কাঙ্গাল।”

যোগোদ্যানে শ্রীরামচন্দ্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪২২ পৃষ্ঠার পর।)

আবার কবে যোগোদ্যানে যাইব—এই বাসনা মানসে প্রবল থাকিলেও, প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পরে, অর্থাৎ ১৮ই আশ্বিন রবিবার, বেলা দুই ঘটিকার সময় দ্বিতীয়বার যোগোদ্যানে যাওয়া ঘটিল। এই সময়ে আমি এনট্রান্স ক্লাসে পড়িতাম, এবং আমার জ্যেষ্ঠতাত এবং পিতৃব্য আমাদের প্রতি সর্ব্বদা তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতেন, সুতরাং তাঁহাদের মত না লইয়া সহজে বাহির হইতে পারিতাম না। ইতিপূর্ব্বে দক্ষিণেশ্বরে, বরাহনগরের মঠে, আমরা কয়েক বার গিয়াছি, এবং জন্মাষ্টমীতে যোগোদ্যানে গিয়াছিলাম, ইহা তাঁহারা জানিতেন, সৎসঙ্গ এবং ধর্ম্মালোচনার স্থল বলিয়া তাঁহারা কোনও দিন যাইতে নিষেধ করেন নাই। বিশেষতঃ ঠাকুর সম্বন্ধে তাঁহাদের শ্রদ্ধার ভাবই ছিল, জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় কেশব বাবুর পরিবর্ত্তনাদি সম্বন্ধে বিশেষরূপ জানিতেন এবং পিতৃব্য একবার একটী সংকীর্ত্তন সম্প্রদায়সহ দক্ষিণেশ্বরে গমন করিয়া সেই সম্প্রদায়ের কীর্ত্তনকালে খোল বাজাইয়াছিলেন। ঠাকুর গান ও বাজনায় বিশেষ আনন্দিত হইয়া সম্প্রদায় মধ্যে ভাববিভোর অবস্থায় নাচিয়াছিলেন এবং পিতৃব্যকে ‘বেশ’ ‘বেশ’—বলিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তবে যাহাতে পড়াশুনার ক্ষতি না

হয় এবং অসৎসঙ্গ না জুটে, সে বিষয়ে তাঁহারা সর্ব্বদা সাবধান করিতেন। এই সময়ে আমার বয়স প্রায় ১৭ বৎসর।

এবারেও প্রিয়নাথ সহ যোগোদ্যানে গিয়াছিলাম। উৎসব দিনে উদ্যান যেরূপ লোককলরবে এবং কীর্ত্তনাদিতে মুখরিত ছিল, আজ আর সেরূপ নাই। আজ যোগোদ্যানের অতি প্রশান্তমূর্ত্তি। আমরা ঠাকুর প্রণাম করিয়া বৈঠকখানার ঘরের দিকে অগ্রসর হইলাম। প্রিয়নাথের সঙ্গে থাকিলেও আমি বিশেষ কুণ্ঠিতভাবে বৈঠক গৃহের ভক্তগণের প্রতি সম্মান জানাইয়া প্রণত হইলাম। কাহারও সহিত আমার আলাপ পরিচয় নাই, তথাপি রামচন্দ্র আমাদের বসিতে কহিলেন। ঘরে অনেকগুলি লোক বসিয়াছিলেন, তথায় স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায়, দেখিলাম বারাণ্ডায় মাদুর বিছাইয়াও অনেকে বসিয়া আছেন, আমরাও এই বারাণ্ডায় বসিলাম। রামচন্দ্র ব্যতীত ঠাকুরের আরও কয়েকটী বিশেষ ভক্ত—অর্থাৎ গিরিশচন্দ্র, মনোমোহন এবং হরমোহন প্রভৃতি তথায় উপস্থিত ছিলেন। ইঁহাদিগকে ঘেরিয়া বসিয়া গৃহ মধ্যে প্রায় ১০।১২ জন এবং বাহিরের বারাণ্ডায়ও প্রায় ১০।১২ জন বসিয়াছিলেন। ঠাকুরের মধুর লীলাপ্রসঙ্গ চলিতেছিল। আমরা নির্ব্বাক অবস্থায় বসিয়া উহা শুনিতে লাগিলাম।* যে সমস্ত যুবকবৃন্দ নারিকেলডাঙ্গায় উৎসব করিয়াছিলেন, তাহাদেরও অনেকে এই দিনে উপস্থিত ছিলেন। প্রিয়নাথ সময়মত চুপে চুপে কথা কহিয়া আমাকে অনেকের নাম কহিয়া মুখ চিনাইয়া দিতে লাগিলেন। বেলা প্রায় ৩।০ ঘটিকার পর মনোমোহনবাবু কহিলেন, "এইবার একটু কীর্ত্তন হউক।" তখন গৃহ মধ্যস্থিত কুঞ্জ নামক ভক্তটী খোল ও করতাল নামাইয়া যথাযোগ্য ব্যক্তিকে উহা সঙ্গত করিবার জন্য দিলেন। রামচন্দ্র তানপুরা লইলেন, গাহিতে লাগিলেন—

"মজলো আমার মনভ্রমরা শ্যামাপদ নীল কমলে।
(শ্যামাপদ নীলকমলে—ও মন কালীপদ নীলকমলে)
বিষয় মধু তুচ্ছ হল, কামাদি রিপু সকলে॥
(মায়ের) চরণ কালো, ভ্রমর কালো, কালোয় কালো মিশে গেল,
পঞ্চতত্ত্ব প্রধান মত্ত রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে॥
কমলাকান্তের মনে, আশাপূর্ণ এতদিনে,
দুখসুখ সমান হোলো, আনন্দসলিল দুলে॥

গানটী শেষ হইলে গিরিশবাবু কহিলেন,—"গয়া গঙ্গা"—

রামচন্দ্র গিরিশচন্দ্রের মানসিক ভাব বুঝিয়া মাথা নাড়িয়া একটু হাস্য করিলেন, পরে গানটী ধরিলেন,—

"গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশীকাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী কালী বলে, (আমার) অজপা যদি ফুরায়॥
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা যার সন্ধানে ফিরে, কভু সন্ধি নাহি পায়॥
কালীনামে কত গুণ, কেবা জান্তে পারে তায়।
দেবাদিদেব মহাদেব যার পঞ্চমুখে গুণ গায়॥
জপ যজ্ঞ পূজা বলি, আর কিছু না মনে লয়।
মদনের জপ যজ্ঞ (সব) ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায়॥

রামচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই গানটী গাহিতে লাগিলেন। গানটী দুই তিন বার গাওয়া হইল।

ইহার পর আবার গান হইল—

নামের ভরসা কেবল করি গো তোমার (ওমা)।
কাজ কি আমার কোশাকুশি, দেঁতোর হাসি লোকাচার॥
নামেতে কাল পাশ কাটে, জোটে তা দিয়েছে রটে,
আমরা তো সেই জোটের মুটে হয়েছি আর হ'ব কার॥
নামেতে যা হবার হবে, মিছে কেন মরি ভেবে,
নিতান্ত করেছি শিবে, শিবের বচন সার॥

এই গান শেষ হইলে রামচন্দ্র তানপুরাটী কুঞ্জর হাতে দিলেন, তিনি যথাস্থানে উহা রাখিয়া দিয়া আবার উপবেশন করিলেন। এইবার কীর্ত্তন গান হইতে লাগিল।

"যাদের হরি বল্‌তে নয়ন ঝরে, তারা দু'ভাই এসেছে রে।
তারা—তারা দু'ভাই এসেছে রে!
যারা জীবের দুখ সইতে নারে—এ নদীয়ায় তারা দু'ভাই এসেছে রে।
যারা ব্রজের মাখন চোরা ছিল, যারা জাতির বিচার নাহি করে,
যারা পাপী তাপী কোলে করে, যারা আপনি মেতে জগৎ মাতায়,

যারা আপামরে দয়া করে, যারা জগাই মাধাই উদ্ধারিল,
যারা হরি হয়ে হরি বলে, যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে,
যারা আপন পর না হ বাছে, যারা ব্রজের কানাই বলাই ছিল,
জীব তরাতে তারা—তারা দু'ভাই এসেছে রে (গৌর নিতাই)॥

এই গানটী এমন মাতোয়ারা ভাবে গীত হইয়াছিল, যে আমাদের শরীর মাঝে মাঝে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল। মনোমোহনবাবু মাঝে মাঝে আঁকর দিতে লাগিলেন, "একাধারে তারা দু'ভাই" "রামকৃষ্ণরূপে তারা দু'ভাই।" গিরিশচন্দ্র অতি ধীর ও গম্ভীর ভাবে বসিয়া শুনিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ পরে গানটী শেষ হইল।

বেলা প্রায় ৫টা। ইতি মধ্যে গিরিশবাবুর বেহারা (নাম শিউপাল) গিরিশবাবুর জন্য গাড়ী লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। তিনি বাড়া যাইয়া তৎপরে থিয়েটারে যাইবেন। গিরিশবাবু বেহারাকে ডাকিয়া তামাক সাজিতে কহিলেন। তামাক খাইয়া গিরিশবাবু ও তৎসহ মনোমোহনবাবু, হরমোহনবাবু এবং আরও দুই একজন কলিকাতায় যাইবার জন্য উঠিয়া ঠাকুর প্রণাম করিতে গেলেন। রামচন্দ্র, তাঁহাদের সহিত কথা কহিতে কহিতে তদভিমুখে চলিলেন। তখন ঠাকুর ঘর খোলা হইয়া ঠাকুরের বৈকালিক শীতল দেওয়া হইয়া গিয়াছে। তারক নামে একটী ভক্ত ঠাকুরের প্রসাদ সকলকে বাটিয়া দিতে লাগিলেন। আমরাও ঠাকুর প্রণাম করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলাম। গিরিশবাবু প্রভৃতি যানারোহণে যোগোদ্যান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অবশিষ্ট সকলে এবার বৈঠক গৃহের সম্মুখের বারাণ্ডায় আসিয়া রামচন্দ্রের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিলেন।

এইবার বাড়ী ফিরিবার জন্য আমি প্রিয়নাথকে চুপে চুপে কহিলাম। তিনি কহিলেন, আচ্ছা, চল যাই। আমরা উঠিয়া রামচন্দ্র এবং অপরাপর ভক্তগণ সম্মুখে প্রণত হইয়া বিদায় প্রার্থনা করিলাম। রামচন্দ্র কহিলেন,—'আবার তোমরা এসো।' আমাদের সঙ্গে আরও দুই তিনটী ভক্ত (অর্থাৎ প্রিয়নাথের বন্ধুগণ) কলিকাতাভিমুখে আসিতে লাগিলেন। ফিরিবার সময় নারিকেলডাঙ্গায় মোগল গার্ডেন, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী, গ্যাসঘর ইত্যাদি প্রিয়নাথ একে একে সব দেখাইতে ও চিনাইতে লাগিলেন। মোগল গার্ডেনে

তাঁহারা এক একদিন আসিয়া সন্ধ্যার সময় সকলে ধ্যানে বসিতেন এবং রাত্রি প্রায় ৯টা ৯।৵টা পর্য্যন্ত তাঁহারা ধ্যান জপ করিতেন।

৯ই কার্ত্তিক রবিবার, ১২৯৮ সাল, (২৫শে অক্টোবর ১৮৯১ খৃঃ) অপরাহ্ণ প্রায় ৩ ঘটিকার সময় যোগোদ্যানে তৃতীয়বার উপস্থিত হই। অনেক ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। কতকগুলি নবাগত তত্ত্বপিপাসু ব্যক্তি রামচন্দ্রের সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতেছিলেন। মনে পড়িতেছে, রামচন্দ্র বলিতেছিলেন—"মহাশয়! পরমহংসদেবের কাছে গিয়ে আমরা নূতন কথা শুনেছি, নূতন জিনিস দেখেছি। তার আগে যে সব দেখেছিলাম বা শুনেছিলাম, সে সব যেন খড়কুটো বা আলুনি বলে বোধ হতে লাগলো। আমরা গিয়ে যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, মহাশয়! ঈশ্বরকে কি পাওয়া যায়? তিনি বল্লেন যে, দিনের বেলায় আকাশে তারা দেখতে পাওনা, তাই বলে কি বলবে, যে আকাশে তারা নাই? সূর্য্যের প্রখর তেজে তারার জ্যোতিকে ম্লান করে দিয়েছে, তাই তারা দেখা যায় না। তেমনি জীবের অন্তরে মহামায়ার প্রভাব ও কামিনীকাঞ্চনের লালসা প্রবল হয়ে রয়েছে, ঈশ্বরের চিন্তা নাই, ভাবনা নাই—তাঁকে পাবে কেমন করে? লোকে বিষয় হলো না বলে দু ঘটী কাঁদবে, ছেলে হলো না বলে চার ঘটী কাঁদবে, কিন্তু হে ঈশ্বর! তুমি কেমন, একবার আমায় দেখা দাও, এ কথা বলে কি কেউ এক ফোঁটাও চখের জল ফেলে? তাঁর জন্য যে কাঁদিতে পারে, তাঁকে পাবার জন্য যার প্রাণ ব্যাকুল হয়, সে নিশ্চয়ই তাঁকে পায়। আমাদের এই কথা বল্‌তে বল্‌তে তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন, কতক্ষণ পরে তাঁর হুঁস হ'ল। বাহিরের তর্ক, ছেঁদো কথায়, তাঁকে লাভ হয় না, তাঁর তত্ত্বও বোঝা যায় না। সরল প্রাণ, আর তাঁর প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ, এই দুটি হ'ল তাঁকে পাবার একমাত্র উপায়। একটী গানে আছে—

"কেবল অনুরাগে তুমি কেনা,
প্রভু! বিনা অনুরাগ, করে যজ্ঞযাগ
তোমারে কি যায় জানা।
(তোমায় ধন দিয়ে কে কিনতে পারে
হৃদয় না দিয়েছে।)

একজন ভদ্রলোক কহিলেন,—মহাশয়! আমরা সংসারে মায়ায় জড়িত হয়ে

রয়েছি, কেমন করে কি হবে? আমাদের কি আর তাঁর প্রতি অনুরাগ আসে? রামচন্দ্র কহিলেন, যা বলচেন সে ত ঠিক কথাই। তবে ঈশ্বরের কৃপা হলে সবই হয়। তুলসীদাস বলেছেন,—

সদ্ গুরু পাওয়ে, ভেদ বাতাওয়ে,
জ্ঞান করে উপদেশ।
তব্ কয়লাকি ময়লা ছুটে
সব্ আগ্ করে পরবেশ॥

যারা মোহান্ধ জীব, যাঁরা মায়াবদ্ধ, তাদের সদ্ গুরু বিনা আর গতি নাই। পরমহংসদেবের কাছে, আমরা একবার সংসার ত্যাগ করবো বলে বলেছিলাম, তাতে তিনি বল্লেন, কেন? সংসার কি দোষ করেছে? সংসারে নির্লিপ্ত হয়ে থাকো। পাঁকাল মাছ যেমন পাঁকের মধ্যে থাকে, অথচ তার গায়ে একটুও কাদার দাগ নাই। সংসার ছেড়ে যাবে কোথা? যেখানে যাবে সেইখানেই ত সংসার। তোমার মন থেকে যদি সব ত্যাগ না হলো, তুমি বনে যেয়ে কি করবে? সংসার বরঞ্চ ভাল যায়গা। কেল্লায় থেকে যেমন শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য বেশী ভাবনা হয় না—কারণ গোলা, গুলি, রসদ্, সব কেল্লায় মজুত রয়েছে, সেই রকম সংসার থেকে যে হরিসাধন করবার বাসনা করে, তারপক্ষে সে সাধন সহজ হয়ে পড়ে, কারণ তার যখন যে কোন অভাব বোধ হবে, সংসারে তখনি তা পাবে।

এই প্রকারের কথাবার্ত্তা শুনিতে শুনিতে চারিটা বাজিয়া গেল। আগন্তুকগণ যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন তাহাদিগকে ঠাকুরের কিছু কিছু প্রসাদ দেওয়া হইল। উহা গ্রহণান্তে তাঁহারা প্রস্থান করিলেন। তৎপরে রামচন্দ্র ঠাকুরের জলপানি দেওয়ার জন্য কাপড় ছাড়িয়া ঠাকুর ঘরে গিয়া ঠাকুরকে তুলিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। আমরা তখন ৮।১০ জন যোগোদ্যানে ছিলাম। সকলেই প্রসাদ পাইলাম। প্রসাদ গ্রহণান্তে কয়েক জন চলিয়া গেলেন। আর ২।৪ জন যাহারা ছিলেন, তাহারা এ দিকে সে দিকে বেড়াইতেছিলেন। রামচন্দ্র এমন সময়ে ঠাকুরের ঠিক সম্মুখে চাতালে যাইয়া উপবেশন করিলেন। তাহার কিছু পরেই আমি গৃহে ফিরিবার উদ্দেশ্যে ঠাকুর প্রণাম করিতে গেলাম। ঠাকুর প্রণাম করিয়া উঠিলে রামচন্দ্র আমাকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

তোমার নাম কি? তোমার বাস কোথায়? তুমি কি কর? এখানে কেন আইস? এ সব কিছু ভাল লাগে কি? আমি অতি বিনীতভাবে যথাযথ উত্তর প্রদান করিলাম। তখন তিনি কহিলেন, তোমার এখানে বিশ্বাস হয়? আমি যে কি উত্তর দিব তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। প্রাণের অভ্যন্তরে যেন কেমন একটা কি হইল! বুকের মধ্যে গুর্‌গুর্ করিয়া উঠিল। দুইটী চক্ষে আপনা হইতে জল পড়িতে লাগিল। আমি যেন কেমন হইয়া গেলাম, কাঁদো কাঁদো স্বরে বলিলাম—তাঁহার কৃপা ভিন্ন কিছুই হয় না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—ঠাকুরের ধ্যান কর কি? উত্তরে বলিলাম যে, আমি ত কিছুই জানি না, প্রাণ বড়ই টানে তাই আসি, তবে যদি কৃপা করে আপনারা কিছু বলে দেন। তখন তিনি কহিলেন, ঠাকুর এখানে পঞ্চবটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, যদি ইচ্ছা হয়, তবে একটা শনিবারে উপবাস করিয়া এখানে আসিও, সমস্ত শিখাইয়া দিব।

রামচন্দ্রের এরূপ কথাবার্ত্তায় আমার হৃদয় যেন গলিয়া গেল। আমি কাতর-নেত্রে অনেকক্ষণ তাঁহার পানে চাহিয়াছিলাম। আমার চক্ষে জল দেখিয়া, তাঁহার চক্ষেও জল ঝরিতেছিল। ঠাকুরের আজ এ কি খেলা, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। রামচন্দ্র আগন্তুকগণের সহিত আজ অনেকক্ষণ 'চখের জলের' কথা কহিয়াছিলেন। ভক্তরাজ দয়া করিয়া কি আজ আমায় চক্ষের জলে অভি-ষিক্ত করিলেন। ঠাকুর! দয়াময়! চোখের জলে যদি তোমাকে পাওয়া যায়, তবে কৈ, তোমাকে আমি পাইলাম কৈ? কৈ আমার অন্তর হইতে মায়া মোহ বাসনা কামনা আসক্তি—এ সমস্ত আবর্জ্জনা বিদুরিত হইল কৈ? হায় ঠাকুর! হায়—চাহিয়া দেখ, এই পরিণত বয়সে—এই স্খলিত দন্ত—পলিত কেশ অবস্থায়ও কামিনীকাঞ্চনের আসক্তিতে ডুবিয়া রহিয়াছি। কৈ দেব! তোমার পানে, তোমার পথে ছুটিলাম কৈ? সারাজীবন অনেক ভাবিয়াছি, অনেক চিন্তা করিয়াছি, অনেক প্রয়াস পাইয়াছি—বুঝিয়াছি—আমরা তোমার হাতে কলের পুতুল, তুমি আমাদের যেমন নাচাও তেমনি নাচি। আমাদের নিজের স্বাধীনতা স্বাবলম্বন কিছুই নাই। তুমিই হাসাও, তুমিই কাঁদাও, তুমিই আমাদের অন্ধকারে ফেল, আমার তুমিই আলো এনে প্রাণ বাঁচাও। লীলাময়! এ লীলার সংসারে, তোমার অদ্ভুত লীলা-রহস্য বুঝিতে পারে—এমন শক্তি কার? ঠাকুর! যখন

যে অবস্থাতেই থাকি না কেন, তাতে দুঃখ নাই, এইটি কোরো, যেন তোমাকে কখনও না ভুলি। কৃপা করে তুমি তোমার ভক্তের সম্মুখে আমার মুখে প্রথমে 'কৃপা' কথাটি তুলিয়া দিয়াছিলে, অন্তরে কৃপার আশা ফুটাইয়া কৃপার ভিখারী করিয়া—গুরুরূপে কৃপাবারি এ হৃদয়মরুতে সিঞ্চন করিয়াছিলে। সংসারে বিপদে সম্পদে, উৎসবে ব্যসনে, এই ভীষণ জীবন-সংগ্রামে তোমার কৃপা দেখিয়া শত শতবার মুগ্ধ হইয়াছি—ভাবিয়াছি বুঝিয়াছি আমরা তোমাকে ভুলিয়া পথভ্রষ্ট হইলেও তুমি আমাদের ছাড় না—তোমার কৃপা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে—ফিরিতেছে, সহস্র অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিতেছে। ঠাকুর। তোমার এই কৃপা হইতে অনন্তজীবন যেন তোমার কৃপার অধীন হইয়া থাকি।

যাহা হউক, সেই দিন রামচন্দ্রের সহিত পূর্ব্বরূপ কথাবার্ত্তা ও আলাপের পর বাটী আসিবার জন্য উঠিলাম। ঠাকুর ও তাঁহার ভক্তকে এক অতি অপূর্ব্ব আনন্দের ভাবে দেখিয়া প্রণাম করিলাম। প্রাণে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লইয়া ঠাকুর ও তাঁহার ভক্তগণের কথা ভাবিতে ভাবিতে একাকী গৃহপানে চলিতে লাগিলাম। সে দিন প্রাণে যে কি আনন্দই পাইয়াছিলাম, তাহা ব্যক্ত করিবার ভাষা আমার নাই।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রিয়নাথের গৃহে (রামকৃষ্ণ পরমহংস নাম নিম্নে লেখা) ঠাকুরের একখানি ছবি ছিল, প্রিয়নাথ সে ছবিখানি আপনার নিকট কিছুদিন রাখিয়া পরে সেখানি আমাকে দিয়াছিলেন, (উহা অদ্যাপিও আছে)। আর বরাহনগর কুঠিঘাটার অবিনাশচন্দ্র দাঁর নিকট হইতে আমরা কয়খানি ক্যাবিনেট সাইজ ফটোগ্রাফ্ কিনিয়াছিলাম। সে সময়ে একমাত্র অবিনাশবাবুর নিকট ভিন্ন আর কোথাও ঠাকুরের ছবি মিলিত না। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সমাধি অবস্থার তিনিই সর্ব্বপ্রথম ঠাকুরের বসা ছবি তুলেন। ঠাকুর যখন সেই ছবি দেখেছিলেন, তখন তাকে বলেন যে, এই থেকেই তোর হবে। মা আমায় বলেছে যে, লোকের ঘরে ঘরে এ যাবে। এই ছবিগুলি বাধাইয়া আমি পড়িবার ঘরে রাখিয়াছিলাম। বটতলা প্রচলিত নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি পাঠান্তে নিত্য ঠাকুরকে ফুল দিতাম ও প্রণাম করিতাম। আমার জেঠাইমায়ের বরাবরই এই নিত্যকর্ম্ম পাঠ ছিল, তাঁহার উৎসাহে আমি সেইগুলি মুখস্থ করিয়াছিলাম। সে দিন যোগোদ্যান হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঠাকুরের ছবিগুলিতে কতবার যে মস্তক

স্পর্শ করিয়াছিলাম, তাহা আর বলিতে পারি না। ঠাকুরের নাম শিখিব, ধ্যান শিখিব, এই আনন্দে হৃদয় উদ্বেলিত হইতেছিল।

এই সময়ে আমার ঠাকুরমায়ের বড়ই অসুখ। জ্বর ও উদরাময় পীড়ায় তাঁহার ৬৫ বৎসরের শীর্ণ দেহখানি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, বাঁচিবার আশা নাই। তাঁহার বিশেষ যত্নে আমি লালিত পালিত, আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাঁহার নিকটে বসিয়া দুটি কথা কহিলে তিনি সন্তোষলাভ করিতেন। আমি সন্ধ্যার পর তাঁহার কাছে বসিয়া ঠাকুরের গল্প করিতে লাগিলাম।

তৎপরে পড়িতে বসিয়া নোটবুকখানিতে অদ্যকার বিবরণটুকু লিখিতে গিয়া দেখিলাম, পাঁচ দিন পূর্ব্বে ঠাকুরের চরণ উদ্দেশ্যে 'মনস্তাপ' নামে যে কবিতাটী লিখিয়াছি—অদ্যকার অপরাহ্নে তাহার সার্থকতা সম্পন্ন হইয়াছে। কবিতাটী গিরিশবাবুর ছন্দের অনুকরণে লেখা। কবিতাটী এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

একি অকস্মাৎ। একি বজ্রাঘাত।
কেন হেন তাপ? অনুতাপ দাও হৃদে।
যাহে চক্ষুজল, বহি দরদর—
ধুয়ে যাবে মন মলা।
অনুতাপে সব তাপ ঘুচে—
এস অনুতাপ। কোথা আছ তুমি?
ডাকি তোমা আমি—
কেন নাহি শুন তুমি অভাগার ডাক?
আরেরে ঘরের শত্রু। মজালি রে মোরে—
যথা কালসর্প দংশে তায়—
দুগ্ধ কলা দিয়া যেবা পুষে।
আরে ওরে মন। তবু তুমি নাহি ছাড়
ইহাদের আশা—
কুপ্রবৃত্তি এতই কি তোমাতে পশেছে?
এত কি অধীন তুমি হয়েছ তাদের?
কর দৃঢ় মন, প্রাণপণ,
ত্যজিবারে কুৎসিৎ আচার—

ভেবে দেখ তুমি, ওরে পাপ মন,
সম্মুখেতে ভীষণ বিচার।
ছাড়ি দাগাবাজী, কাম আদি ত্যজি,
নিরঞ্জনে কর আশ —
রিপুরে সেবিবে, পাপেতে ডুবিবে,
শেষেতে ভীষণ ত্রাস।
ছাড় ছাড় সমুদায়, ধরাময় লোভ খায়,
এ সংসার মায়াময় — মোহময় —
বিভীষিকা পিশাচের এই বাসস্থান।
ছাড়ি প্রলোভন, ওরে মুগ্ধ মন।
ত্যজি অ কঞ্চন, কামিনী কাঞ্চন,
বিষয় সেবন, রিপুর পোষণ,
রামকৃষ্ণে দাও মন।
ঘুচিবে বন্ধন, যমের যাতন,
পাপের শাসন, অনায়াসে
পাবি তুই অভয়চরণ॥

ঠাকুর প্রায়ই তিন বৎসর তিন মাস, তিন দিন, তিন ক্ষণ, তিন দণ্ড ইত্যাদি বলিয়া 'তিন' কথাটীর উপরে জোর দিতেন। আরও বলিতেন, 'আসা যাওয়া করলেই লাভ।' যোগোদ্যানে আমার তিনদিন যাইয়া প্রকৃতপক্ষে তাহাই হইল। ঠাকুরের আদি ও পরম ভক্তের কৃপাকটাক্ষ লাভ করিয়া আমি জীবনে ধন্য হইলাম। তাঁহার অহেতুকী কৃপাগুণে আমি আমার জীবনপথের চিরসম্বল পাইবার আশ্বাস পাইলাম। আমার মুক্তি ও পবিত্রাণের জন্য তাঁহার উদ্বেগ ও দুই চক্ষে জল দেখিলাম। আমার মত কাঙ্গালকে ঠাকুররূপ অমূল্য ধন দান করিবার জন্য ব্যাকুল দেখিলাম। আমার ন্যায় অজ্ঞ, মূর্খ, জ্ঞানভক্তিহীন দুর্মতি ব্যক্তিকে অসৎ হইতে সৎ পথে লইয়া যাইবার জন্য লালায়িত দেখিলাম। জগতে ইহাপেক্ষা দয়ার কার্য্য আর কি হইতে পারে। ধন্য ঠাকুর। ধন্য ঠাকুরের ভক্ত। তোমাদের চরণে আমি কোটি কোটিবার প্রণাম করি। (ক্রমশঃ)

সেবক শ্রীবিজয়নাথ মজুমদার

এস।

এস পেতেছি আসন হৃদয়ে আমার
তোমারি তরেতে সখা,
এস যেওনা ফিরিয়া হয়ে নিরদয়
দিয়ে ক্ষণেকের দেখা।
ওগো তোমারি কারণে হৃদয় আমার
পাতিয়া রেখেছি প্রভু।
ওগো তোমারে আদরে লইতে হৃদয়ে
বিফল করোনা কভু॥
আমি তোমারি গো সখা এ জীবন ঐ
পদতলে দিছি পাতি।
আমি পাইতে তোমারে কত আরাধনা
করি যে গো দিবা রাতি॥
হের তব আগমনে প্রফুল্ল হইয়া
বনবিহঙ্গিনী গাহিছে।
হের আসিবে বলিয়া ধীরে কল্লোলিনী
মৃদুল উচ্ছ্বাসে বহিছে॥
তুমি আসিবে বলিয়া ফুটিয়াছে ফুল
কুঞ্জে কুঞ্জে হরষে।
তুমি আসিবে বলিয়া আসে নব দিন
চির নব এই বরষে॥

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী।

আত্ম-সমর্পণ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সিমসন্ সা[illegible]।

নীলরতনের অবস্থা পূর্ব্ববৎ। এখনও পর্য্যন্ত সংজ্ঞা হয় নাই, বরং আরও অনেকগুলি নূতন উপসর্গ দেখা দিয়াছে। যোগীন ডাক্তারই চিকিৎসা করিতেছে, তবে গতকল্য বৈকালে হঠাৎ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হওয়াতে প্রতিবেশীরা পরামর্শ করিয়া জেলার সাহেব ডাক্তার মিঃ সিমসনকে আনিয়াছিল। সিমসন্ সাহেব রোগীকে যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া এবং রোগের আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "সান্নিপাতিক বিকার হইয়াছে, জীবনের আশা খুব কম, তবে চেষ্টা করিলে এ যাত্রা বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন।" তাহার পর যোগীনকে ঔষধ সম্বন্ধে পরামর্শ দিয়া চলিয়া গেলেন। যোগীনও প্রায় রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত থাকিয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। যোগীন ডাক্তার চলিয়া গেলে চাঁপা একাকিনী স্বামীর শয্যা পার্শ্বে থাকিয়া নিয়মিতভাবে ঔষধ সেবন করাইতে লাগিল; হতভাগিনী সাহেব যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারে নাই। বিপদ কখনও একা আসে না। দুলালেরও ভয়ানক জ্বর, নিস্তারিণী তাহাকে লইয়া শয়ন করিয়াছে। বিপদের রাত্রি সহজে কাটিতে চাহে না। চাঁপার ত রাত্রি অতি দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সে সমস্ত রাত্রি দেবদেবীর নিকট পূজা মানসিক করিতে লাগিল।

চাঁপা কখনও বা নীলরতনের অমঙ্গল ভাবিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতে লাগিল, কখনও বা হৃদয়ে আশার সঞ্চার হওয়ায় প্রকৃতিস্থ হইতেছিল। এই ভাবে কোন রকমে রাত্রি কাটাইল। প্রভাত হইবামাত্র সে নিস্তারিণীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁরে দুলাল কেমন আছে?"

নিস্তারিণী। ছেলেটা সমস্ত রাত্রি চোখের পাতা বুজেনি—এখন একটু ঘুমিয়েছে, আর জ্বরটাও কিছু কম ব'লে বোধ হচ্ছে। হ্যাঁ বৌদিদি, দাদাবাবু এখন কেমন আছেন?

চাঁপা। সেই রকমই—কি রোগই হ'ল, বাড়ীতে বসে কারুর সঙ্গে একটা কথাও কইতে পারলেম না, বা একবার চোখ মেলে চাহিতে পারিলেন না।

এই বলিয়া চাঁপা স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা চক্ষু মার্জ্জিত করিয়া পুনরায় বলিল, নিস্তারিণী,' তুই একবার ডাক্তারের বাড়ী যা—তাকে শিগ্‌গির ডেকে নিয়ে আয়। শেষ রাত্রি থেকে ঘাম হ'চ্ছে—আর আজ যেন একটু বেশী কাতর হ'যে পড়েছেন বলে বোধ হচ্ছে।

নিস্তারিণী। তাকে আর ডাকতে যেতে হবে না, সে নিজেই আসবে এখন।

চাঁপা। কাল অত রাত্রে গেছে, যদি এ বেলা না আসে।

নিস্তারিণী। সে আবার আসবে না! সে ত আর দয়া করে আসে না। সে 'পয়সা খোর', মানুষ পয়সার জন্যে সব করতে পারে। ঢের ঢের মানুষ দেখেছি বাপু, এর মতন 'চসমখোর' পৃথিবীতে দুটী নেই। লোকটার চোখের চামড়া একেবারে নেই। রোজ ২।৩ বার ক'র আসচে, এত করে বল্লুম তবুও চার টাকার এক পয়সা কম কর্‌লে না। তা ছাড়া কাল দুলোকে দেখেছিল বলে যাবার সময় আমার কাছে তার জন্যে টাকা চাচ্ছিল।

চাঁপা। তার পর—

নিস্তারিণী। তার পর আর কি, ইচ্ছে হ'ল মুখটা পুড়িয়ে দি—তা আর পারলুম না—এ রকম 'চসমখোর' আর পৃথিবীতে দুটো আছে?

চাঁপা। তুই তাকে কিছু বলিস্‌নি ত? আমায় জানাস্‌নি কেন? কাল টাকা পায়নি হয় ত আর আস্‌বে না?

এমন সময়ে নীলরতনের প্রতিবেশী একটী অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক সরোজকুমার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে আস্‌বে না বৌদিদি?

নিস্তারিণী। যোগীন ডাক্তার—দাদাবাবু তুমি কাল বল্লে না যে ডাক্তার এনে দুলোকে দেখান। তোমার কথামত ছেলেটাকে কাল দেখিয়েছিলাম। তাই সেই 'অনামুখো' যোগীন ডাক্তার রাত্রে বাড়ী যাবার সময় আমায় বল্লে, "তোমাদের ছেলেকে দেখলুম তার টাকা কই?"

আমি বল্লুম বাবু আমরা গরীব লোক দেখতেই ত পাচ্ছেন। একটু দয়া না করলে আমরা মারা যাবো। আর দাদাবাবুকে এমন রোগে ধরলে যে মাইনের টাকা পর্য্যন্ত একটীও ঘরে এলো না। রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন হয় ত টাকা পকেটে রেখেছিলেন কেহ নিয়ে নিয়েছে, না হয় পড়ে গেছে—আর বউদিদির গয়নার মধ্যে হাতে দুগাছা বালা ছিল, তাই বাঁধা দিয়ে চিকিৎসা হচ্ছে।

আপনি ভদ্রলোক, আপনাকে আর বেশী কি ব'লবো—যা ভাল বোঝেন করুন। সে তখন আমার কথা শুনে বল্লে যদি পয়সাই নেই, তবে নবাবী ক'রে সাহেব ডাক্তার আনতে গেলে কেন? আমি বল্লুম—বাবু রাগ ক'রবেন না—নবাবী ক'রে নয়, প্রাণের দায়ে এনেছিলুম—আর আপনারাও ত সবাই আনতে বল্লেন। এই কথা শুনে সে রেগে চলে গেল।

সরোজ। বৌদি। তুমি তার জন্যে ভেবো না—আমি নিজেই যাচ্ছি—যদি সে রাগ করে থাকে, ভাল করে বুঝিয়ে তাকে নিয়ে আস্‌বো। এখন নীলরতনদা' কেমন আছেন বল দেখি?

চাঁপা। সেই এক রকমই—এখনও পর্য্যন্ত ভাল হয়নি, কিংবা চোখের পাতা ফেলেন নি। তবে ভালর মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে হিক্কা উঠাটা বন্ধ হয়েছে—আর শেষ রাত্রি হ'তে ঘাম হ'চ্ছে।

এই কথা শুনিবামাত্র সরোজকুমার নীলরতনের গায়ে হাত দিয়া দেখিয়া বলিল, বৌদিদি এখনও ঘাম হচ্ছে—আর গায়ের উত্তাপও খুব কম বোধ হয়—আজকে জ্বরটা ছাড়িবে। আমি যোগীন ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আসি, তুমি ঐ ঔষধ হ'তে এখনি এক দাগ খাইয়ে দাও। আর বৌদিদি তুমি কিছু ভেবো না, যদিও দেখ্‌তে পাচ্ছ আমাদের কেউ নেই, কিন্তু সেই অসহায়ের সহায়, অনাথনাথ দীনবন্ধু হরি আছেন। তিনিই নীলরতনদাকে সারিয়ে দেবেন। হ্যাঁ, আর একটা কথা বল্‌ছিলুম কি—নীলরতনদা আমার যা ক'রেছেন মায়ের পেটের ভাইতে আজ কাল তা করে না। আমার লেখা পড়া যা কিছু তা সমস্তই ওঁর জন্যে। উনি যদি তখন দয়া ক'রে আমায় কলিকাতায় না নিয়ে যেতেন, তা হ'লে কি আমার লেখাপড়া হ'ত, না পাশ করতে পারতুম। সে ঋণ আমি কখনও পরিশোধ ক'রতে পারবো না—আর জীবন থাকতে এ কথা ভুলতেও পারবো না। ৺পূজার ছুটীর আগের দিনে যখন ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, তখন ত ওঁর কোন অসুখই ছিল না, আমার সঙ্গে কত কথা কইলেন। আর কাল বাড়ী এসে যা দেখলুম, দেখেই ত আমার চক্ষু স্থির হয়ে গেল। এখন ভগবানের কৃপায় শীঘ্র শীঘ্র সেরে উঠুন, এই প্রার্থনা ক'র। মা, বাবা তারক-নাথের নিকট মানসিক করেছেন যে নীলরতনদা সেরে উঠলে ৺তারকেশ্বরে গিয়ে বাবার ভাল ক'রে পূজো দেবেন।

চাঁপা। ঠাকুরপো কত পূজাই ত মান্‌ছি—কই—কিছুতেই ত কিছু হ'চ্ছে না। তা হ'লে ঠাকুরপো তুমি আর দেরী ক'রো না, শিগ্‌গির করে ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এসো।

সরোজ। হাঁ যাচ্ছি—আর তুমি এই দশটা টাকা রেখে দাও। আমাদের ত অবস্থা ভাল নয় তা না হ'লে কেন এ সময়ে কিছু সাহায্য করি না। আমি কিছুই করতে পারলুম না, কোন রকমে এই দশটী টাকা সংগ্রহ করে এনেছি। কিন্তু আজকে আর একবার সাহেব ডাক্তারকে নিয়ে এলে ভাল হয়।

চাঁপা। ঠাকুরপো তুমিই এখন আমাদের একমাত্র আশা ভরসার স্থল। কাল তুমি না এসে প'ড়লে কি হ'ত ভগবান জানেন। তুমিই ত জেদ করে সাহেব ডাক্তারকে নিয়ে এলে তাই আনা হ'ল। এখন যা ভাল বুঝ কর। আমার ত গায়ে ছাই কিছুই নেই—দুগাছা বালা ছিল তাই শ্যামসুন্দরের ঠাকুরবাড়ীতে বন্ধক দিয়ে চিকিৎসা হচ্ছে। আর ত ঠাকুরপো ঘরে কিছুই নেই—২।৪ খানা থালা বাসন আছে, তুমি একবার ও পাড়ার তোমার জেঠামশায়ের কাছে শুধু হাতে কিছু ধার ক'রে আন্‌তে পারবে না ?

সরোজ। কে বেণী জ্যাঠা—হ্যাঁ, সেই ত শুধু হাতে ধার দেবার লোক! দেখা যাক, যে রকম করেই হ'ক্ চিকিৎসা ত ক'রতেই হবে।

চাঁপা। কি ক'রে হবে ঠাকুরপো! তবে এক কাজ কর, বালা দুগাছা তাঁর কাছেই আছে, বিক্রী করে এসো—যা ২০।৩০ টাকা পাওয়া যায়, তাইতে আর নয় দশ টাকা দিয়ে সাহেব ডাক্তারকে নিয়ে এসো।

সরোজ। আজকে না হয় ওতে হ'ল, তারপর কাল কি হ'বে? যাক, বৌদি, তুমি আর কত ভাববে, তুমি কিছু ভেবো না এ দায়— আমার—তুমি সমস্ত ভার আমার উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হও যে রকম করেই হ'ক আমি চিকিৎসা করাব। ভগবান কি এমনিই ক'রবেন যে নীলরতনদা বিনা চিকিৎসায় মারা যাবেন—তা কখনই হবে না। তুমি কিছু মনে কর্‌য়ো না বৌদি, আজ যদি আমার মা'র অসুখ হ'ত আমি কি করতুম। আমার বাবার যে সোণার ঘড়ীটা আছে আমি সেইটা বিক্রী করিগে। পয়সা হ'লে ঢের ঘড়ী হবে, কিন্তু প্রাণ গেলে আর প্রাণ হবে না। আমি বলছি কি যে আজকে যে রকম করেই হ'ক, সিমসন্ সাহেবকে নিয়ে আসি আর পাড়ার ঐ অমৃত ডাক্তারকে ডেকে আনি। সেও ত চিকিৎসা

মন্দ করে না—আর তা ছাড়া অমৃতের শরীরে মায়া দয়া আছে, একবারের জায়গায় দশবার আসবে, এমন কি যদি দরকার হয় নিজে সাহেব ডাক্তারের বাড়ী গিয়ে কি ঔষধ দিতে হবে না হবে সে বিষয়েও পরামর্শ করে আসবে। তুমি কি বল ?

চাঁপা। আমি আর কি বলবো ঠাকুরপো, তুমি যা ভাল বুঝ করগে—

"আচ্ছা, তবে আমি একবার অমৃতকে আগে ডেকে নিয়ে আসি" এই বলিয়া সরোজকুমার চলিয়া গেল। সরোজ চলিয়া গেলে নিস্তারিণী চাঁপাকে বলিল, বৌদি যাও, তুমি সকাল সকাল স্নান করে এসো। কাল মহাষ্টমী গেছে, নির্জ্জলা উপবাস করে আছ। মায়ের চরণামৃত এনে রেখেছি, খেয়ে একটু জল-টল খাও। নিজের শরীরটাও ত চাই—তোমার যদি আবার অসুখ করে কে এদের দেখবে বল দিকিন্। চাঁপা নিস্তারিণীর কথা এড়াইতে না পারিয়া পুকুরে স্নান করিতে গেল ও নিস্তারিণী ঘর পরিষ্কার করিতে আসিল।

নিস্তারিণী নীলরতনের সংসারে অনেক দিন ধরিয়া আছে। সে নীলরতনকে স্বহস্তে মানুষ করিয়াছে। আজ নীলরতনের এরূপ অবস্থা দেখিয়া তাহারও মন অত্যন্ত খারাপ—সে কখন ভাবিতেছে তাও কি কখনও হয়, ঐ 'অনামুখো' যোগীন ডাক্তারই রোগটা আরও বাড়িয়ে দিয়াছে। ও বাড়ীর দাদাবাবু ত বলে গেল, আজকের অবস্থা ঢের ভাল। যখন ও বাড়ীর দাদাবাবু এসে পড়েছে, তখন আর ভাববার কিছু নেই। আজকে সাহেব ডাক্তার এলেই কালকে দাদাবাবু নিশ্চয়ই উঠে ব'সবেন।" যদি তা না হয়, এ কথা সে কিছুতেই মনে স্থান দিতে পারিল না। সে কথা মনে আসিলেই সে অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িতে লাগিল। যখন সে মনে মনে উক্ত প্রকার চিন্তা করিতেছিল, সেই সময় পাড়ার একটী ছোট মেয়ে দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, "ওগো তোমাদের বাড়ীতে সাহেব আস্‌ছে, শিগ্‌গির সদর দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসো।" নিস্তারিণী তাহার কথা শুনিয়া অন্যমনস্কভাবে বলিল, কে সাহেব ? এমন সময় কে একজন বাহির হইতে বলিল, বাড়ীতে কে আছ বাইরে এসো, ডাক্তার সাহেব এসেছেন। নিস্তারিণী এই কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া সিমসন্ সাহেবকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল।

সিমসন্ সাহেব অনেক দিন বাংলা দেশে আসিয়া বাংলা কথা বেশ ভাল বলিতে

ও বুঝিতে পারিতেন। তিনি গৃহ মধ্যে আসিয়াই তথায় অন্য কাহাকেও না দেখিয়া নিস্তারিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মায়ি! বাবুর আর কে আছে।

নিস্তারিণী। কেউ নাই সাহেব, কেউ নাই—কেবল ঈশ্বর আছেন সাহেব—দেথ্ মায়ি তুই কিছু ডর করিস্ না—আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিব তাহার জবাব দিয়া যাও।

নিস্তারিণী। সাহেব তোমায় আমার আবার ডর কি; তুমি ত আমার ছেলের মতন।

সাহেব এই কথা শুনিয়া হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন, হাঁ মায়ি আমি তোমার ছেলে—তোমার কিছু ভাবনা নাই—

তাহার পর নিস্তারিণীকে ঘরের একটী জানালা খুলিয়া দিতে বলিয়া সাহেব অতি মনোযোগসহকারে রোগীর রোগ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে সরোজকুমার অমৃত ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সে সাহেবকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইল, এবং কে তাহাকে লইয়া আসিল জানিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুকনয়নে নিস্তারিণীর দিকে চাহিয়া রহিল। নিস্তারিণী একমনে সাহেব কি করিতেছিলেন তাহাই দেখিতেছিল—সরোজকুমার যে গৃহমধ্যে আসিয়াছিল সে তাহা জানিতেও পারে নাই। সাহেব রোগীর রোগ পরীক্ষান্তে সরোজকুমারকে দেখিয়া বলিলেন, এই যে বাবু আসিয়াছে, রোগী কাল কেমন ছিল, রাত্রে বেশী ছটফট করেছিল? আর হিক্কা উঠছে?

সরোজ। না হিক্কা উঠা বন্ধ হ'য়ে গেছে। শেষ রাত্রি হ'তে ঘাম হ'চ্ছে। আর আজ যেন বড় অচেতন হয়ে পড়েছেন। ঐ রকম অবস্থাতেই আছেন, কোন সাড়া শব্দ নাই।

নিস্তারিণী। সাহেব, বাবুকে ভাল করিয়া দাও,—নিস্তারিণীর কথায় বাধা দিয়া সাহেব বলিলেন—মায়ী গোল করিও না, বাবু সারিয়া যাইবে, কোন চিন্তা নাই। তাহার পর সরোজকুমারকে রোগীর বিষয়ে আরও ২।৪টী প্রশ্ন করিয়া বলিলেন—দেখ আজ রোগীর অবস্থা অনেক ভাল—এ ঔষধে যে এতটা উপকার হইবে তা আমি ভাবি নাই। আমার বোধ হয় জ্বরটা ছাড়িয়া যাইবে। কাল-কের ঔষধের কাগজখানা লইয়া আইস। তোমাদের ডাক্তার কখন আসিবে?

সরোজ। সাহেব! ঔষধের কাগজখানা ডাক্তারের কাছেই আছে, তার

বাড়ী অনেক দূরে। তাহার পর সরোজকুমার সাহেবকে নীলরতনের অবস্থার বিষয় জানাইয়া এবং যোগীন ডাক্তার দুলালকে দেখার জন্য তাঁহার দর্শনী না পাওয়াতে রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, সে কথা বলিতেও ভুলিল না।

সাহেব সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন—খোকাকে লইয়া আইস, আমি দেখবো। চাঁপা ইতিমধ্যে ঘাট হইতে আসিয়া অন্তরালে থাকিয়া সমস্ত কথা শুনিতেছিল। সে দুলালকে পার্শ্বস্থিত ঘর হইতে আনিয়া নিস্তারিণীর ক্রোড়ে দিল। সাহেব দুলালকে কোলে লইয়া তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—এখন জ্বর নাই, আমি ইহার ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি। তাহার পর সরোজকুমারকে বলিলেন—একজন ডাক্তার না হইলে ত চলিবে না। না হয় অন্য একজন ডাক্তার লইয়া আইস। আমি তাহাকে সমস্ত বিষয়ে পরামর্শ দিয়া চলিয়া যাইব। সরোজকুমার অমৃত ডাক্তারের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিল—ইনিও একজন ডাক্তার, এবং ইঁহাকে এই জন্যই লইয়া আসিয়াছি, সাহেব অমৃত ডাক্তারকে রোগীর বিষয়ে পরামর্শ দিয়া সরোজকুমারের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—বাবু, আমি তোমার কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। তোমাদের নিজের দেশের লোক যে তাহার স্বজাতির প্রতি এরূপ ব্যবহার করে, তাহা আমার ধারণা ছিল না। এত লেখাপড়া শিখিয়া ডাক্তার যে এরূপ কার্য্য করিল, তাহা অতি দুঃখের বিষয়। সরোজকুমার সাহেবের কথায় বাধা দিয়া বলিল—শুধু যোগীন ডাক্তার নয় সাহেব, আমাদের দেশের অনেক ডাক্তার আছেন যাঁহারা সকলেই এক একজন যোগীন ডাক্তার। রোগীকে দেখিতে আসিয়া দেখিলেন—হয়ত সে রোগী মারা গিয়াছে, তবুও তাঁহার দর্শনীর টাকা ছাড়েন না। গরীব দুঃখী বলিয়া কিছুমাত্র বিবেচনা করেন না। তাঁহারা মনে করেন যে, গরীব দুঃখীর প্রতি দয়া প্রকাশ করিলে, তাঁহাদের ব্যবসার ক্ষতি হইবে—তাহার পর অমৃত ডাক্তারকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, ইনি কিন্তু সে রকম লোক নন। এঁর শরীরে দয়া মায়া আছে।

সাহেব সেই কথা শুনিয়া অমৃত ডাক্তারকে বলিলেন,—শুনে সুখী হ'লাম। দেখ বাবু, আমরা লোকের যেরূপ উপকার করি, তাহা অর্থের দ্বারা পরিশোধ হয় না। তাহা বলিয়া যে সকলের নিকট হইতেই অর্থ পাওয়া যাইবে, সেরূপ আশা করা উচিত নহে। যাহারা গরীব, তাহারা যদি অর্থ দিতে না পারে,

তাহা হইলে কি তাহাদের চিকিৎসা হইবে না ? এরূপ কার্য্য করিলে ঈশ্বর রুষ্ট হন। আর যদি তুমি তাহাদিগের নিকট হইতে পীড়ন করিয়া লও, সেই অর্থের দ্বারা তোমার অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হইবে না। যদি তুমি রোগীর প্রতি দয়া প্রকাশ কর, তোমার তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না, অন্য দিক্ হইতে তাহা শীঘ্র পূরণ হইয়া যাইবে। তুমি দয়ালু, তোমাকে আর অধিক কি বলিব, তুমি ইহাদের প্রতি একটু দয়া করিবে। আমি তোমার মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি। তাহার পর সরোজকুমারের প্রতি বলিলেন,—আমি কাল যখন আসিয়াছিলাম ইহাদের অবস্থার বিষয় কিছুই জানিতে পারি নাই। আজ এই ধারে আমি একটী রোগী দেখিতে যাইতেছিলাম, মনে করিলাম ইনি কেমন আছেন একবার দেখিয়া যাই। এখন তোমার নিকট যাহা শুনিলাম তাহাতে আমারও ইহাদের নিকট অর্থ লওয়া কোন মতে উচিত নহে। কল্য আমি তোমার দর্শনীর টাকা যাহা লইয়াছিলাম তাহা গ্রহণ কর। এবং ঔষধাদি যাহা দরকার হইবে, আমার সহিত গাড়ীতে এস, আমি তোমায় সরকারী হাঁসপাতাল হইতে সে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি। সরোজকুমার সাহেবের কথা শুনিয়া বলিল, সাহেব! আপনি বিজাতীয় হইয়া আমাদের প্রতি যেরূপ সহানুভূতি করিলেন, তাহা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। সে জন্য আপনাকে শত সহস্র ধন্যবাদ।

সাহেব সে কথা শুনিয়া বলিলেন, বাবু জাতি বিজাতি ভগবানের নিকট নাই। তাঁর নিকট সকলেই সমান। আমি এমন কি আর করিলাম, আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মই করিয়াছি।

সরোজ। না সাহেব, আপনি মানুষ নন—আপনি দেবতা।

সাহেব। দেবতা বলে কোন জিনিয পৃথিবীতে নাই। মানুষ যথার্থ মানুষের মত কার্য্য করিলেই দেবতা। চল আর দেরি করিও না তোমার ঔষধের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আমি রোগী দেখিতে যাইব। এবং বৈকালে পুনরায় আসিব। তাহার পর অমৃতের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—ডাক্তার, মনে থাকে যেন এ রোগীর জীবন তোমার হাতে।

অমৃত। সাহেব! আমাকে আর বলিতে হইবে না। আমি এতদিন আপনার নাম কেবলমাত্র শুনিয়া আসিতেছিলাম, আজ আপনাকে দেখিয়া জীবন সার্থক মনে করিলাম।

সাহেব অমৃতের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সরোজকুমারকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন। উভয়ে চলিয়া যাইবার পর অমৃত ডাক্তার নিস্তারিণীকে বলিলেন, কোন ভয় নাই নীলরতনবাবু সারিয়া উঠিবেন, সে জন্য তোমরা কোন চিন্তা করিও না। যখনই কোন আবশ্যক হইবে, আমাকে সংবাদ দিও আমি শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিব। এই কথা বলিয়া অমৃত বাসায় চলিয়া গেলে চাঁপা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। নিস্তারিণী চাঁপাকে দেখিয়া বলিল, বৌদিদি শুনলে ত ডাক্তারবাবু বলে গেলেন কোন ভয় নেই। এখন চল একটু জল খাবে চল। এই বলিয়া সে রান্না ঘরের দিকে গেল। চাঁপার তখন মুখ দিয়া কথা নিঃসরণ হইতেছিল না—যে তখন জাগ্রত বা নিদ্রিত কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহার পর জানু পাতিয়া উর্দ্ধনেত্রে করযোড়ে বলিতে লাগিল—ভগবান! তোমার এত করুণা, তাই তোমায় লোকে করুণাময় বলে। তুমি আজ যাহা দেখালে তা আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনি। আমি তোমার কাছে কি চাহিব? তুমি নিজে হতে আমাদের অভাব দেখে তা মোচন করে দিলে। জগদীশ্বর! আর কিছুই চাই না, এ বিপদ তুমিই দিয়াছ তুমিই কাটাইয়া দাও। আর যদি ভগবান্—তাহার পর আর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, এবং নয়নদ্বয় দিয়া অশ্রু দরদর বেগে ধাবিত হইতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ।

শ্রীশ্রীযীশুখ্রীষ্টের উপদেশপ্রসঙ্গ।

ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "সব শেয়ালের এক রা।" অর্থাৎ সকল মহাপুরুষদিগের উপদেশাদি প্রায় এক—কেননা সত্য এক বই দুই নয়। ধর্ম্ম লইয়া আমরা যে নানাপ্রকার বাদবিসম্বাদের কথা শুনিয়া থাকি, তাহা কেবল ভূত-প্রেতের ঝগড়া ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। মানবের স্বভাব এই যে, সকল বিষয়ে ভেদবুদ্ধি লইয়া কার্য্য করিবে, মিলন তার পক্ষে অসম্ভব বলিলেও বলা যাইতে পারে। কিন্তু বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য, নানক ও রামকৃষ্ণ প্রভৃতি দেব-মানব বা অবতারগণের কথা মানবের সঙ্গে তুলনীয় হইতে পারে না। তাঁহাদের কথায়

আমরা সাদৃশ্যই দেখিতে পাই, বৈসাদৃশ্য অতি অল্প; তাও কেবল দেশকালপাত্র লইয়া। সেইজন্য যাঁহারা প্রকৃত ধার্ম্মিক, তাঁহারা হিন্দু হইলেও খ্রীষ্টানকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু খ্রীষ্টকে পরিত্যাগ করেন না, বৈষ্ণবকে দূর হইতে নমস্কার করিতে পারেন, কিন্তু বিষ্ণুকে হৃদয়ে আসন দিতে কুণ্ঠিত নহেন, মুসলমানের নিকট হইতে তফাতে থাকিতে পারেন, কিন্তু মহম্মদকে অন্তরে অন্তরে ভক্তি করেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা প্রথমেই দেখিতে পাই যে, ভগবান্ বুদ্ধ যেমন উপগুপ্তকে, শ্রীচৈতন্য যেমন ঈশ্বর পুরী ও কেশব ভারতীকে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন তোতাপুরীকে গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন; প্রভু যীশুও তেমনি জন্ দি বেপ্‌টিষ্ট (John the Baptist) কে গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলে যে জগদগুরু তাহা কে অস্বীকার করিবে? তবুও মানব সমাজে অবতীর্ণ হইয়া মানবের মধ্যে প্রচলিত গুরু-শিষ্য প্রথার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে বোধ হয় জগদ্‌গুরুগণের গুরুকরণ। যাহাই হোক্, প্রভু যীশুকে আমাদের দেবদেবীর সহিত অভিন্ন বোধে তাঁহার মধুময় লোকহিতকারী উপদেশমালার আলোচনাই আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রভু যীশু জন্ দি বেপ্‌টিষ্টের নিকট দীক্ষিত হইলে আকাশবাণী হইল— "ইনিই আমার প্রিয় পুত্র এবং ইহাঁতে আমি বেশ সন্তুষ্ট।" তৎপরে ভূতাকৃষ্ট হইয়া এক অরণ্যে প্রবেশ করিলে সয়তান বা মায়া তাঁহাকে লোভজালে নিক্ষেপ করিবার প্রয়াস পায়। তিনি চল্লিশ দিন দিবারাত্র উপবাস করিবার পর যখন সাতিশয় জীর্ণ শীর্ণ এবং ক্ষুধাক্লিষ্ট হইয়াছেন, তখন সয়তান তাঁহাকে বলে "তুমি যদি সত্য সত্য ঈশ্বরের পুত্র, তবে এই পাথরখানাকে রুটিতে পরিণত কর দেখি? তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন যে, মানব কেবল রুটি খাইয়া জীবন ধারণ করে না, সে ভগবানের কথামৃতপান করিয়াও বাঁচিয়া থাকে। সয়তান ইহাতে নিরস্ত হইল না। সে তাহাকে পবিত্র পেলেষ্টাইন্ (Paleatinc) নগরের একটি মন্দিরচূড়ায় বসাইয়া বলিল "তুমি যদি সত্য সত্য ভগবানের পুত্র হইয়া থাক, একবার সেই চূড়া হইতে পড়িয়া যাও দেখি, কেমন তোমার রক্ষণ-ভারপ্রাপ্ত দেবদূতগণ তোমায় রক্ষা করে দেখা যাইবে? শাস্ত্রে বুঝি লেখা আছে যে, তোমায় দেবদূতগণ রক্ষা করিবেন? প্রভু যীশু এই কথা শুনিয়া অর্ব্বাচীনের মত লাফাইয়া পড়েন নাই। স্বল্লাধারযুক্ত দুর্ব্বল

ভক্ত হইলে তাহা করিলেও করিতে পারিত, কিন্তু ভগবৎসন্তান জগদ্‌গুরু জ্ঞানীর শিরোমণি খ্রীষ্টের দ্বারা তাহা হইল না। তিনি অন্তরে অন্তরে বেশ করিয়া জানিতেন যে, "সমগ্র পৃথিবীর লোক যদি বলে যে তুমি ভগবানের ছেলে নও, তাহা হইলেও আমি বিলক্ষণ জানি যে তিনি আমার এবং আমি তাঁর।" আমরা অনেক সময় শুনিয়া থাকি যে, বহু লোকে আপনাকে ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিবার লালসায় হয়ত জলের উপর দিয়া চলিয়া যাইলেন কিম্বা মৃতকে জীবিত ও জীবিতকে মারিয়া ফেলিলেন; কখনও হয়ত সামান্য সিদ্ধাইয়ের বলে লোক দেখান কত কি করিয়া বসিলেন এবং অনিত্য মানবের অনিত্য বশে যশস্বী হইবার জন্য নিত্য ভগবানের মঙ্গলময় ইচ্ছা ভুলিয়া যাইলেন। সয়তানের প্রলোভনে অটল-হৃদয় যীশু যে উত্তরটী করিলেন, তাহা সকলের অনুধাবন এবং পরিপালনের বিষয়। তিনি সয়তানকে বলিলেন, "It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God. অর্থাৎ শাস্ত্রে এও লেখা আছে যে, তোমার প্রভু পরমেশ্বরকে পরীক্ষা করিতে যাইও না।" মানব-জগৎ কি এই উপদেশে যথেষ্ট শিক্ষা পাইবে না?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তবৃন্দ জানেন যে, ভগবান রামকৃষ্ণ সিদ্ধাইকে বড়ই ঘৃণা করিতেন এবং সিদ্ধাইয়ের অসারতা প্রতিপাদন করিতে কত গল্প বলিতেন। এমন কি দীর্ঘকাল তপস্যান্তে ভগবান লাভ হইল না বলিয়া যাঁহারা ধর্ম্মভাবের প্রতি বিরক্ত, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন যে, খানদানী চাষা বারো বৎসর অনাবৃষ্টি হইলেও কৃষি পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। তবে যারা সখের চাষ করিতে যায়, তারা দু'এক বৎসর অনাবৃষ্টি দেখিলে কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করে। তেমনি যাহার মধ্যে ভগবানের সত্তা আছে, সে কখন তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে যায় না; সে জানে যে ভগবানকে বা প্রিয়জনকে পরীক্ষা করা অতি নীচ মনের কার্য্য। আমরা শুনিয়াছি, সেবক রামচন্দ্রের কোন কোন ভক্ত কিছুদিন সাধন ভজন করিয়া এতদিন কিছু দেবদর্শনাদি হইল না বলিয়া আক্ষেপ করায় তিনি বিরক্ত হইয়া বলিতেন, "ভগবানকে আবার খতাতে চাও কি? সাংসারিক ব্যক্তি যেমন সংসারের প্রত্যেক কথায়—লাভ লোকসানের হিসাব রাখিতে ভালবাসে, ভগবৎ বিষয়েও তার সেই নীচ বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি পায়। সেই শ্রেণীর বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া যাঁহারা ঈশ্বরকে পরীক্ষা করিতে যান, তাঁহারা প্রভু যীশুর

উপরোক্ত উপদেশটী ভুলিবেন না। আমরা অনেক সময় অনেকের মুখে শুনিয়া থাকি, "প্রভু! তুমি যদি সত্য হও, মা তুমি যদি সত্য হও, আমার অমুক কাজটী করে দাও বা আমার ছেলে যদি পাস হয়, কি মোকর্দ্দামায় জয় হয়, কি অমুক কার্য্যটী সফল হয়, তবেই জানবো যে তুমি সত্য, প্রত্যক্ষ।" এই ভাবের কথা কেবল ভগবানকে পরীক্ষা করিবার প্রবৃত্তি হইতে প্রসূত। এই নীচ প্রবৃত্তি থাকিতে কেহ কখন প্রকৃত প্রেম-ধনের অধিকারী হইতে পারে না। সুতরাং ভগবান যীশুর সেই মধুময় উপদেশটীর পুনরাবৃত্তি করি, Thou shalt not tempt the Lord thy God.

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেন গুপ্ত, বি, এ।

এই ভিক্ষা চাই।

(১)

রামকৃষ্ণ করুণা-নিদান—
শুনিয়াছি তুমি প্রভু,
নিদয় হওনা কভু,,
দুঃখীর কথায় দাও কান্।

(২)

আসিয়াছি তাই তব দ্বারে—
যোড় করি দুটী হাত,
করিতেছি প্রণিপাত,,
নিরাশ কোরোনা, অভাগিরে।

(৩)

জানি না গো ভজন পূজন—
নাহি আছে বিল্বদল,
নাহি আছে গঙ্গাজল,,
নাহি মম সুগন্ধি চন্দন।

(৪)

মানস-পূজার (৩) কিছু নাই—
নাহি প্রেম অশ্রুজল,
নাহি ভক্তি সুবিমল,,
কৃপাময়, তব কৃপা চাই॥

(৫)

দেখেছিনু দয়াতে তোমার—
কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান,
মনোহর মনোরম,
কিবা সেথা শান্তির নির্ঝর॥

(৬)

আত্মপর নাহি সেথা ভেদ—
হাসিমুখে সর্ব্বক্ষণ,
রয়েছেন ভক্তগণ,,
কিছুতেই নাহি কোন খেদ॥

(৭)

তাঁহাদের দেখে মনে হয়—
কোথা হতে এত শক্তি,
কি সুন্দর শুদ্ধা ভক্তি,,
মোরে কি দেবেনা, দয়াময়॥

(৮)

দয়া কর পরম দয়াল—
হৃদে নাই শুদ্ধা ভক্তি,
পূজা করি নাহি শক্তি,,
আমি যে গো আজন্ম কাঙ্গাল॥

(৯)

তুমি পিতা জগতের গুরু—
ষড়রিপু বিনাশক,

মুক্তিপথ প্রদর্শক,
পতিতপাবন, কল্পতরু ॥

(১০)

প্রার্থনার অন্ত কিছু নাই—
(যেন) তোমারই শ্রীচরণে,
রহে মতি নিশি দিনে,,
চিরদিন এই ভিক্ষা চাই ॥

ভক্তপদাশ্রিতা বিনীত সেবিকা
শ্রীমতী গোলাপবাসিনী দেবী।

মনমন্থন।

ওঁ নমো নারায়ণায় রামকৃষ্ণায় নমঃ।

মহাজন! রাজেশ্বর! তোমার চক্ষু, তোমার কর্ণ অনন্ত, সর্ব্বত্র। তুমি আমায় যেমন বলাইতেছ, তেমনি আমায় ব'লতে হইবে। হে সর্ব্বজনপরিচিত রাজা! আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ত্রিলোকবাসী দেবগন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ নর সকলেই তোমায় জানে। গিরিগহ্বরে ধ্যানমগ্ন পর্ব্বতশৃঙ্গে বিচরণশীল, সংসারে জড়িত জীব সকলেই তোমাকে জানে। তুমি সর্ব্বজনপ্রিয় সর্ব্বজনপরিচিত। আবার তুমি নিরাকার। আশ্চর্য্য তোমার কলকৌশল।

তোমায় যে দেখেছি বা জানি, এমনও বলতে পারি না, আবার জানিনা যে, এমনও ত বলিতে পারি না। তাই বলি, তুমি, এই জানি আর না জানি, এই দুইটীর পরে যা তাই তুমি। শোকে দুঃখে তাপে যখন সংসার সরিয়া যায় তুমি যেন আমার অন্তরে অন্তরে আহ্বান কর। যখন আমায় হাসিতে দেখ, তুমিও আমার সঙ্গে সঙ্গে যেন হাস। এমন জীবনবন্ধু তুমি। ত্রিলোকবাসীই তোমার চরণাশ্রয়ের অতিথী। তোমায় না ভালবেসে কেহই থাকিতে পারে না। তোমার বিচারে দণ্ড লইতে সকলেই ভীত, তোমার গুণ ও মধুরতায় সকলেই মুগ্ধ। তোমার দ্বারে জীবমাত্রই আত্মদোষ লইয়া দীন। কিন্তু আমরা দীন হইয়াছি তুমি দীননাথ তোমায় পাব বলিয়া। অন্তর্য্যামিন! তোমায় যদি ভয় করিব, তবে

আর কাকে ভালবাসিব প্রভু? তোমার কার্য্য দেখিয়া আর ত সাধ পূর্ণ হয় না, এখন একবার তোমায় দেখিব। আমি আমার ভিতর কেন তোমায় দেখিব নাথ? তুমি আমার পূজ্য আর আমি তোমার চরণাশ্রিতা, এই ত মধুর। আমি তোমায় এত ডাকি, তুমি থাক কোথায়? সংসারসাগরের পরপারে কি জ্যোৎস্নাপূরিত কান্তমলয়ভাসিত অলিগুঞ্জরিত-কুসুমরাজ্য আছে? সেই কি তোমার বাসস্থান? সেই সংসারবাসনাবিতাড়িত প্রণবঝঙ্কারিত অমিয়বর্ষিত কূটস্থে তোমার বাসস্থান? মরি, মরি, ওঁ রামকৃষ্ণায় নমঃ। কিন্তু সাধন ভজন মন্ত্র জপ একি তোমার দর্শনের মূল্য হইতে পারে? না তুমিই সব। তবে আমার ব্যাকুলতা যদি তোমায় অস্থির করে। আমার অশ্রু যদি তোমায় বিচলিত করে, আমি যে জানি না যে তুমি পরম দয়াল। তুমি আড়াল থেকে সদাই দেখ। তুমি আর আড়ালে থেকোনা। এস সাধপূর্ণ করে একবার সাকার হও, একবার সেই মধুর মোহন শ্রীরামকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে দাঁড়াও। আমাকে কাঁদাও তাতে আমি দুঃখ করি না, একবার তোমার স্বজাগ মূর্ত্তির সম্মুখ দর্শনে সাধ পরিপূর্ণ কর প্রভু! আমাদের এ যে পাগলা গারদে পুরেছ প্রভু! একি সব দিয়েছ নাথ! এ যে সব ক্ষণভঙ্গুর অস্থায়ী জিনিষ। তোমার ভোলান জিনিষ আমায় বোঝাইয়াছে আমি ঠকিয়াছি, এখন মহাজন তোমায় একবার দেখিতে চাই।

তুমি কাঙ্গালের ধন দীনের বন্ধু। সেই ভরসায় তোমায় দেখিবার সাধ হইয়াছে, তুমি আমায় মত্ত করে কেন গুপ্ত রবে নাথ! এস তোমার মধুর মনমজান প্রাণমাতান শ্রীরামকৃষ্ণরূপে আমায় দেখা দাও। তোমার দত্ত ফাঁকী আঁখিতে আমায় অনেক ভুলাইয়াছ, তোমার করুণা বারিতে আমার আসল আঁখি ফোটাও। আমার সব লও, আমার দর্শেন্দ্রিয় লও, আমায় অন্ধ খঞ্জ বোবা কালা কর, তাতে ক্ষতি নাই, আমার এখন সাধ মেটাও, ধরা দাও। তুমি তোমার মায়া দাসীর দ্বারায় আমার গলায় ফাঁসি বেঁধে দিলে। কণ্ঠাগত প্রাণে অসারের মধ্যে অযাচিত সব দ্রব্যে বদ্ধ করিলে। আমি ত প্রাণ বিনিময়ে কিছুই কিনিতে পারি নাই নাথ! জননীর ক্রোড়ে পাঠালে, পিতার স্নেহে বদ্ধ করে পতির চরণে পৌঁছাইয়া দিলে, পুত্রের দ্বারায় পরীক্ষায় ফেলিলে! আমি ত এ সব কিছু চাহি নাই প্রভু, এ সব অযাচিত তোমার জোর কোরে গছান। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে তাহা মঙ্গলপ্রদ তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, এখন কল্পতরু! আমার ইচ্ছা আমার প্রাণ

বিনিময়ের ধন "তুমি" একবার এস। মহাজন! তোমার বাজারের চাকচিক্য বস্তুতে আর আমার রুচি নাই। তুমি এমন যা, তা, দান, আমায় কোরোনা দয়াল! মহাদানি! যদি দান করবে, তবে দীন, আকুল প্রার্থনা জানায়, এস ধরা দাও! আমি তোমার বাজারের কিছু চাই না, তোমায় চাই! তোমার পদের রেণু হইব, তোমাব চরণ সেবা করিব, আর তোমার অনন্ত রূপমাধুরী প্রীতিভরা প্রফুল্ল মধুর হাস্যময় মুখ দেখিব।

তুমি খ্যাতনামা মহাজন, পরম দয়াল বিশ্বরাজা, কত লোককে কত দিয়াছ। আমিত ফিরে যাব না, তোমায় দেখিব দেখিব করিয়া জীবন অন্ত হউক তার পর কি তুমি তোমার নামের টানে আসবে না প্রভু? তুমি অনন্তসুন্দর, তোমার দর্শন ইচ্ছা কি আমার বেশী কথা? তাত নয়, তুমি আমার চিরপ্রিয় চির আপনার চিরবন্ধু, তুমি আমার আমি তোমার। একবার তুমি আমার জড়চক্ষু ঘোচাও আর তোমার গোলকের রূপ, রামকৃষ্ণরূপ আমাকে দেখাও। তুমি কেমন আমার সহিত রঙ্গ কর লীলাময়! সংসার পদাঘাত করিল মুখে রক্ত উঠিল, শ্রীগুরু পদে আসিলাম, হরি হরি শ্রীগুরু বলিলেন গোবিন্দ ভজ। শ্রীগুরু আজ্ঞা শিরোধার্য্য। তাই তোমায় ডাকিতেছি। তুমি গুরু রূপে তোমায় ডাকিতে বলিতেছ, তুমি ইষ্টরূপে অভীষ্ট পূর্ণ করিবে, সে ভরসা দাও, এস ধরা দাও। চুপ করিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া তোমার নাম মন্ত্র জপ করিব কি, তুমি যে কি আকুলতা ব্যাকুলতা দাও আমি যে আর থাকতে পারিনা প্রভু! অমনি তোমায় দেখিব বড় সাধ হয়, আমার ধ্যান ভঙ্গ হয়। আমায় একি করিলে?

তোমার নাম কল্লেই তোমায় দেখবার জন্য প্রাণ যে নেচে উঠে প্রভু! আমার মন উঠবে কি, কুঠস্থে যাব কি, মন ছুটে যেন তোমায় ধরতে উধাও হয়।

তুমিই আমার শ্রীগুরু, তুমিই ইষ্ট, তুমিই সব। তোমার অসার দান এখন যা আছে অযাচিত দ্রব্যে ক্ষতি প্রীতি নাই, থাকে থাক, যায় যাক, হে সর্ব্ব সুন্দর! বাসনা দিয়েছ তুমিই, পূর্ণ কর তুমিই। গুরু তুমিই, ইষ্ট তুমিই, বক্তা তুমিই শ্রোতা তুমিই। আমার কিছুই নাই। তুমি যেমন রাখ তেমনিই থাকি। ব্যাকুলতা কেন দিলে নাথ? এস ধরা দাও, ঐ বিশ্ববাসী ত্রিতাপ তাপিত নরনারী ত্রাহি ত্রাহি ডাকিতেছে উদ্ধার কর! এস দাঁড়াও, স্বরূপ চেনাও।

প্রাণারাধ্য! তোমায় কতই বলিলাম, আমার ভাবের ভিতর অনেক ব্যাকুলতা, এত তোমারি দেওয়া। আমার মঙ্গলময় রাজা, তুমিত অন্তরে আছ, নাথ! তবে এমন মাঝে মাঝে ব্যাকুলতা জাগাও কেন? এ লীলা তোমারই। আমি ত কিছু জানি না প্রভু! আজ আমার কোটী কোটী প্রণাম গ্রহণ কর। প্রাণতম! বিশ্ববাসীর প্রতি প্রসন্ন হও। চিরশান্তিময় রাজা! আজ তোমার জন্মতিথিতে আশ্রিত জনগণের কোটী কোটী প্রণাম গ্রহণ কর।

ওঁ রামকৃষ্ণায় নারায়নায় নমঃ
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

ভক্তকিঙ্করী।

জয় রামকৃষ্ণ নাম।

যবে অদৃষ্ট তাড়নায়,
ভাবি দুঃখ কল্পনায়,
আবেগ দগ্ধ হৃদয়ে,
জ্ঞান বুদ্ধি হারা হয়ে,
ভ্রমিতেছি দিবানিশি,
কি জানি কি অবকাশে,
কোথা হতে তুমি আসি,
উদিল মম চিত্ত আকাশে

বিবেকে ধরে, কহিলে মোরে,
"কব রামকৃষ্ণ নাম সার।"
তবু অবহেলে কাটাই,
নামে রুচি নাহি পাই,
বিষাদ বাড়িল আর।
ক্রমে নামে রুচি আসে,
তাপজ্বালা সকলি ভাসে।
পাইলাম শান্তির আশ্রয়,
নবোল্লাসে পূর্ণিত হৃদয়

মোহ অজ্ঞানতা ঘুচিল,
আনন্দ অশ্রু ঝরিল;
বিষাদ সাগর হ'তে,
কে তুলিল নিজ হাতে।
চিন্তা বিবেক, মন প্রাণ,
যুক্তি তর্ক বুদ্ধি জ্ঞান,
যাহা কিছু বলিতে আমার,
ঢালিলাম চরণে তোমার।
বিকাইলাম আপনায়।

স্বপনেতে দেখা দিলে,
যা সন্দেহ ঘুচাইলে,
লভিয়া তোমারি করুণা
উচ্ছ্বাসে করেছি বর্ণনা।
দেব, অতি ক্ষুদ্র আমি,
তুমি মম হৃদয় স্বামী।
তোমারি মুরতি খানি,
মানস নয়নে আনি
পূজিতেছি অবিরাম।

শ্রীবিরাজকৃষ্ণ চৌধুরী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব।

বিগত ২২শে ফাল্গুন ইংরাজী ৫ই মার্চ্চ রবিবার কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পূজা এবং ২৩শে ফাল্গুন সোমবার ঠাকুরের রাজভোগ কার্য্য অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

বিগত ২৯শে ফাল্গুন ইংরাজী ১২ই মার্চ্চ রবিবার বেলুড় মঠে মহা সমারোহে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রতি বৎসর লোকের সংখ্যা বাড়িতেছে।

বাঙ্গালোর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে স্বামী যোগেশ্বরানন্দ কর্ত্তৃক রামকৃষ্ণ জন্মোৎসব অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ সহরে এই উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে যেমন মান্দ্রাজ, বোম্বাই, রেঙ্গুন, এলাহাবাদ, নাগপুর, কাশী, বৃন্দাবন, হরিদ্বার-কনখল, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিং, ইত্যাদি।